চ

হুমায়ুন কবির প্রতিষ্ঠিত

তু

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

র

বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৮১

ঙ্গ

With the best compliments from

The Asarwa Mills Limited

Regd. Office : 9 Brabourne Road
Calcutta, 1

Telephone : 22-9121/6
Telegram : MILLASARWA
Telex : CA-7611

MILLS

ASARWA
Ahmedabad, 16

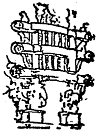

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য...

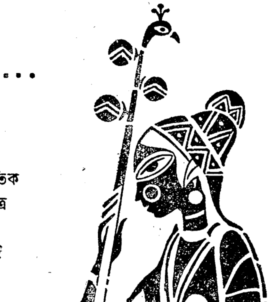

চারু ও কারুশিল্প, ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত ও নৃত্যকলার কী বৈচিত্র্যই না রয়েছে আমাদের স্বদেশে। স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বকীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে এই বিচিত্র ভারতভূমি গঠিত। রেলপথ প্রতিষ্ঠার আগে যে সব অঞ্চল ছিল বিচ্ছিন্ন ও দূরধিগম্য তাদেরই একসূত্রে গ্রথিত ক'রে এক বিচিত্রবর্ণ পুষ্পহারের সৃষ্টি করেছে আমাদের রেলপথ—ভৌগলিক সান্নিধ্যে তাদের অন্তরঙ্গ করেছে। ভৌগলিক অখণ্ডতাকেও অতিক্রম ক'রে যে আত্মিক ঐক্যে আজ সারা ভারতবর্ষ প্রাণময়—তা' আন্তঃআঞ্চলিক সাংস্কৃতিক সংযোগের জন্যই সম্ভবপর হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

আপনি কি 40 পেরিয়েছেন?

তাহলে এখন থেকেই—
নিজের পেনশানের ব্যবস্থা নিজে করুন

অবসর নেবার পর অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্যে আমাদের এই প্রকল্পটি রচনা। ধরুন আগামী সাত বছর পর্যন্ত আপনি যদি প্রতি মাসে ডাকঘরে 100 টাকা করে জমিয়ে যান (পঞ্চম পর্যায়ের জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট চেয়ে নেবেন), তাহলে 1981 সালের শুরু থেকে সাত বছর পর্যন্ত, প্রতি মাসে, আপনি 198 টাকা করে ফেরত পাবেন।

1981 সালের পর থেকে সুবিধা আরও বেশি—

এই প্রকল্প পরের সাত বছরের জন্যেও চালু রাখতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রতিমাসে আরও 2 টাকা করে জমা দিন এবং নতুন সার্টিফিকেট কিনুন। 1988 সাল থেকে শুরু করে সাত বছর পর্যন্ত আপনি প্রতি মাসে 396 টাকা করে পাবেন।

গোড়ায় মাসে মাসে যে 100 টাকা করে সঞ্চয় করেছিলেন তা প্রায় চার গুণ বেড়ে যাবে।

এই প্রকল্পের জন্য বয়সের কোন ধরাকাট নেই। এতে নারী-পুরুষ সকলেই যোগ দিতে পারেন। তাছাড়া 100 টাকাই এর সীমা নয়। আপনি মাসে মাসে 200, 300 কি 500 টাকা করেও সঞ্চয় করতে পারেন। এতে আপনার লাভই বেশি।

যা সঞ্চয় করছেন		যা ফেরৎ পাবেন
প্রথম 7-বছর	দ্বিতীয় 7 বছর	তৃতীয় 7-বছর
100 টাকা প্রতি মাসে	2 টাকা প্রতি মাসে	396 টাকা প্রতি মাসে

আপনার ডাকঘরে
কিংবা
জাতীয় সঞ্চয় কমিশনার, নাগপুর-এ খোঁজ নিন

davp 74/192

বাড়ি তৈরি করছেন ?
স্টিল টিউবের দুনিয়ায়
ITC টিউব সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কেন
তার ৫টি কারণ জেনে রাখুন

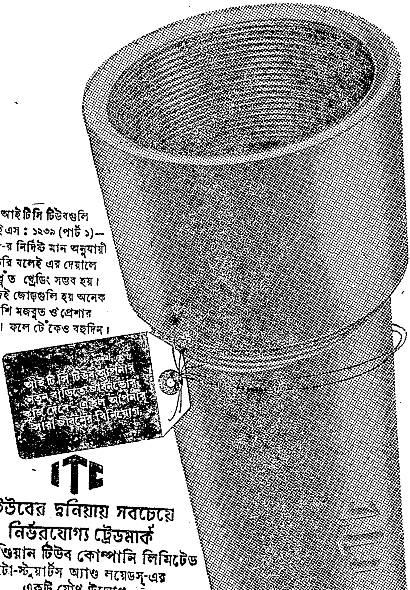

১ আইটিসি টিউবগুলি
আইএস : ১২৩৯ (পার্ট ১)—
১৯৬৮-র নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী
তৈরি বলেই এর দেয়ালে
নিখুঁত থ্রেডিং সম্ভব হয়।
তাই জোড়গুলি হয় অনেক
বেশি মজবুত ও প্রেশার
টাইট। ফলে টেঁকেও বহুদিন।

২ একমাত্র আইটিসি টিউবই
'হট' কনটিনিউয়াস ওয়েল্ড
প্রসেসে তৈরি হয় এবং
তার ফলে কোল্ড-বেন্ট করার
সময় ওয়েল্ড সিম খুলে
যায় না।

৩ 'হট' ওয়েল্ডিং প্রসেসের
স্বাভাবিক প্রভাবের দরুন
আইটিসি টিউবগুলির আগা
থেকে গোড়া পর্যন্ত একই রকম
চাপ থাকে এবং ওয়েল্ডের
জায়গাগুলিতে স্বাভাবিক ক্ষয়ের
দরুন কোনো ক্ষতি হয় না।
এর ফলেও এই টিউবগুলি অনেক
বেশি টেঁকসই হয়।

৪ আইটিসি টিউবে ওয়েল্ডের
জন্যে ভেতরে কোন উঁচু নীচু
প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় না।
ফলে আটকে থাকা কণিকা-
গুলিতে প্রতিহত হয়ে তরল
পদার্থের গতিও রুদ্ধ হয় না।

৫ আইটিসি টিউবের (সাধারণত
টাটা পাইপ নামে পরিচিত) গায়ে
মোটামুটি এক মিটার অন্তর
আইটিসি ছাপ থাকায় সহজেই
চেনা যায়। গ্রাহকদের
সুবিধার জন্যে, বর্তমানে মাঝারী
জাতের টিউবের গায়ে 'এম' (M)
ছাপও দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যাতে
তাঁরা সহজেই হাল্কা
ও ভারী জাতের টিউবের সঙ্গে
এর পার্থক্য বুঝতে পারেন।

ITC

টিউবের দুনিয়ায় সবচেয়ে
নির্ভরযোগ্য ট্রেডমার্ক

ইণ্ডিয়ান টিউব কোম্পানি লিমিটেড
টাটা-স্টুয়ার্টস অ্যাণ্ড লয়েডস্-এর
একটি যৌথ উদ্যোগ

(ITC-133 BEN)

In all humility, we confer upon ourselves a new degree:

C. Tech.

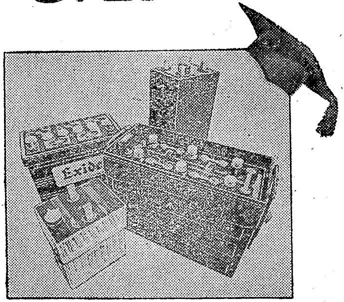

C. Tech. stands for Chloride Technology.

It is a degree we have earned ourselves —and ourselves alone.

And Chloride Technology shows itself in the performance of our wide range of rechargeable batteries. It is the wealth of technical know-how, resources in men, machines and materials.

Chloride Technology grows out of our modern storage battery plants at Chinchwad and Shamnagar.

You can see it working on city roads and highways of a growing nation.

In far-flung forward areas, our soldiers keep in touch with base—thanks to the excellent performance of our telecommunication batteries.

When the lights go off during a surgery, our stand-by power puts them on again instantly.

And it is Chloride Technology that has resulted in the acceptance of our products overseas—to the extent of earning over Rs. 1 crore in foreign exchange last year.

The list goes on—and wherever you find our product, you will find Chloride Technology has resulted in peak efficiency and performance.

At a crucial period in our nation's growth, involvement is a nice feeling indeed.

CHLORIDE *Chloride Technology makes us more involved than you think!*

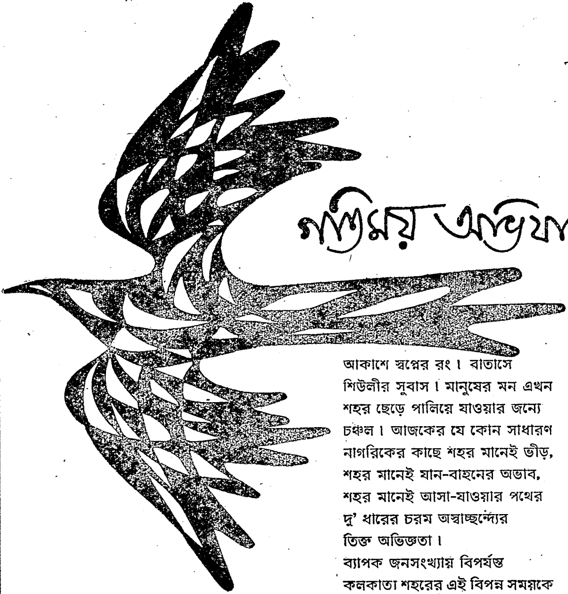

গতিময় অভিযান

আকাশে স্বপ্নের রং। বাতাসে শিউলীর সুবাস। মানুষের মন এখন শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে চঞ্চল। আজকের যে কোন সাধারণ নাগরিকের কাছে শহর মানেই ভীড়, শহর মানেই যান-বাহনের অভাব, শহর মানেই আসা-যাওয়ার পথের দু' ধারের চরম অস্বাচ্ছন্দ্যের তিক্ত অভিজ্ঞতা।

ব্যাপক জনসংখ্যায় বিপর্যস্ত কলকাতা শহরের এই বিপন্ন সময়কে পটভূমিকায় রেখেই ভূগর্ভ রেলের ব্যাপক ও বিপুল পরিকল্পনা। ভূগর্ভ রেল মানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ যাত্রীর দ্রুত এবং নিরাপদ ভ্রমণের প্রতিশ্রুতি। ভূগর্ভ রেল মানেই জাতীয় শান্তি সমৃদ্ধির পথে এক গতিময় অভিযান।

MTP

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ-রেল

মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

medium

নতুন আশার একটি নাম পালি

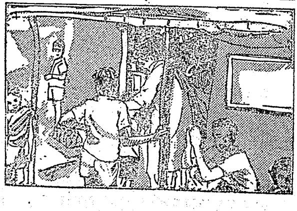

পালি একটি গ্রামের নাম। গ্রামটি হলো বিহারের রাঁচি জেলার রাতু ব্লকে। দেশের অধিকাংশ গ্রামের মতই পালিতেও যুগ যুগ ধরে জীবনযাত্রা মন্থর গতিতে চলছে। চাষীরা জমি থেকে বছরে মাত্র একটি ফসল পেয়ে আসছেন। আর, মূলধন নেই বলে গ্রামের কারিগরদের চিরকাল অভাবের সংসার।

সম্প্রতি ইউবিআই রাতু ব্লকের পাশাপাশি কয়েকটি গ্রাম উন্নয়নের জন্যে বেছে নিয়েছে; পালিও তাদের মধ্যে আছে। ইউবিআই-এর সাহায্যে চাষীরা জমিতে দুটি ফসলের চাষ করে উৎসাহজনক ফল পেয়েছেন। এখন পালিতে একটা বড় কুয়ো খোঁড়া হচ্ছে। সেচের জলে বছরে দু'তিনটি ফসল ফলানো সম্ভব হবে। আয় বাড়ানোর জন্যে খুব ছোট চাষী ইউবিআই-এর সাহায্যে হাঁসমুরগি পালন করছেন। তাছাড়া ইউবিআই গ্রামের খুচরো দোকানদার, দরজি এবং লোহার জিনিষপত্র, ঝুড়ি ও গয়না তৈরীর কারিগরদেরও আর্থিক সাহায্য করছে।

ইউবিআই-এর বহু প্রকল্পের মধ্যে পালি হলো একটি উদাহরণ মাত্র। জাতীয় অর্থনীতির বিকাশে গ্রামোন্নয়ন ইউবিআই-এর কর্মসূচীর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

UNITED BANK OF INDIA

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

UBI-278

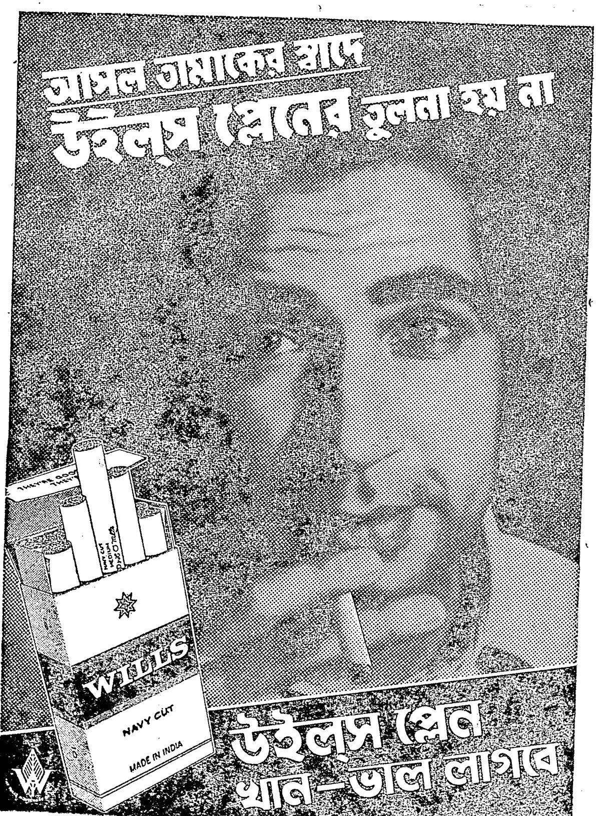

আই. টি. সি. লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন
WP 7984-1

আর একটির দফা রফা হ'ল

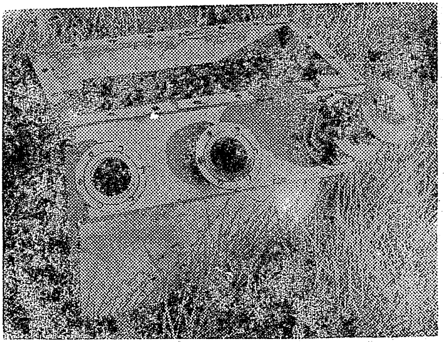

এ ধরনের কাজের জন্য দায়ী কারা?

নিশ্চয়ই কিছুসংখ্যক সমাজবিরোধী দুর্বৃত্ত

লোড-শেডিংয়ের ফলে আপনার দুর্ভোগ যেখানে
মাত্র কয়েক ঘণ্টার, সেখানে এ ধরনের উৎপাতের দরুন
আপনার ভোগান্তি কয়েক সপ্তাহ ধরে চলতে পারে।
বিদ্যুৎ পর্ষদের যন্ত্রপাতি দেশ ও দশের সম্পদ।
এই সম্পদ রক্ষায় সচেষ্ট হোন।
নগদ পুরস্কার ছাড়াও উন্নত বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
চালু রাখতে সাহায্য করুন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY BOARD ESTD. 1955

জাতীয় সম্পদ রক্ষায় সাহায্য করুন

With the Compliments of —

TATA STEEL

বিশ্বভারতীর বই

রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে একটি বৃহৎ দেশকালের রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাস। বিধৃত হয়েছে খ্রীষ্টানির সঙ্গে হিন্দুয়ানির বিরোধ, তাৎকালিক সাময়িক পত্রপত্রিকা এবং গ্রন্থ প্রকাশের ইতিবৃত্ত, বাংলা গদ্যের ধীর অথচ সুনিশ্চিত পদক্ষেপের কাহিনী। রঙিন চিত্র ও সুদৃশ্য প্রচ্ছদে ভূষিত। মূল্য ১২·০০, শোভন ১৫·০০ টাকা।

আধুনিক শিল্পশিক্ষা

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

আধুনিক ভারতে শিল্পশিক্ষার ইতিহাস, তিনটি পর্যায়ে আলোচিত: ১, ইংরাজ প্রবর্তিত আর্ট স্কুলের শিক্ষা, ২, ভারতীয় পদ্ধতিতে শিল্পশিক্ষা এবং ৩, আধুনিকতম শিল্পশিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য। এই রচনা শিল্পী ও শিল্প-অনুসন্ধিৎসু হিসাবে লেখকের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ফলশ্রুতি, অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের শিল্প সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা সংবলিত। মূল্য ৬·০০ টাকা।

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ

শ্রীরাণী চন্দ

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টির চিত্তাকর্ষক কাহিনী এবং ব্যক্তি অবনীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয়। অবনীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত। শিল্পীগুরুর আত্মপ্রতিকৃতি, বিখ্যাত রঙিন চিত্র 'কালো মেয়ে', কুটুম-কাটামের তিনখানি প্রতিলিপি এবং সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটে অলঙ্কৃত। মূল্য ১০·০০ টাকা।

রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

রবীন্দ্রনাথের প্রথম-প্রকাশিত গ্রন্থ কবি-কাহিনী থেকে রাজা ও রানী পর্যন্ত ২৫ খানি গ্রন্থের প্রকাশ, বিভিন্ন সংস্করণে বিবর্তন ও পাঠভেদ, সম-সাময়িক সাহিত্য-সমাজে প্রতিক্রিয়া ও প্রাসঙ্গিক বিবরণ এই খণ্ডে সঙ্কলিত। আলোচিত প্রত্যেক গ্রন্থের আখ্যাপত্রের বিশদ বিবরণ এবং কয়েকখানি গ্রন্থের প্রচ্ছদের প্রতিচিত্র গ্রন্থখানির মূল্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। এই জাতীয় গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে প্রথম। প্রথম খণ্ড: ১৪·০০ টাকা।

চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ডরুজ

শ্রীমলিনা রায়

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একনিষ্ঠ সেবক, বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচারে রবীন্দ্রনাথের একান্ত সহকারী বন্ধু, গান্ধীজি ও দ্বিজেন্দ্রনাথের সহোদরতুল্য চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ডরুজের বহুবিচিত্র জীবনের সরস ও সুখপাঠ্য আলেখ্য। বহুবর্ণ চিত্র, পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি এবং সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটে অলঙ্কৃত। মূল্য ১০·০০ টাকা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

কার্যালয়: ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৬

বিক্রয়কেন্দ্র: ২ কলেজ স্কোয়ার / ২১০ বিধান সরণী

স্বাদ আর আমেজে
ভরে তুলুন
উৎসবের দিন
আর অবসরের
মুহূর্তগুলি
LIPTON
লিপটন
বললেই
ভালো চা
RUBY DUST
LIPTON'S GREEN LABEL TEA
THE DUST TEA
LAOJEE
FOR THE HOTEL
HIMALAYAN
FINEST GOLDEN DUST TEA
LIPTON'S YELLOW LABEL TEA
LIPTON'S RICHBRU
TOP QUALITY LEAF TEA

LGC-142 BEN

With best compliments of

RADHAKRISHNA BIMALKUMAR

Dealers : **INDIAN OIL CORPORATION LTD.**

32 Chowringhee Road
Calcutta 700 016

Telephone : 24-8875
24-8876

With the best compliments from

COOKE & KELVEY LIMITED

JEWELLERS & WATCH MAKERS

Calcutta / New Delhi

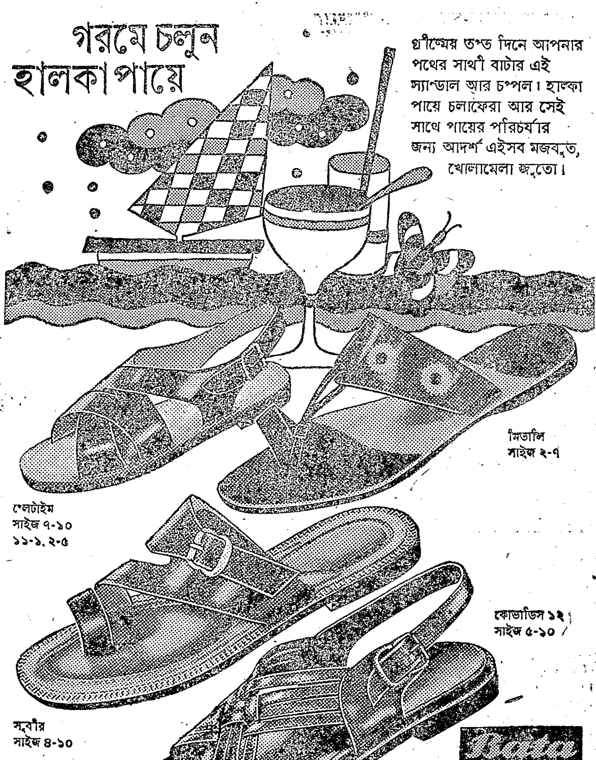
গরমে চলুন
হালকা পায়ে
গ্রীষ্মের তপ্ত দিনে আপনার পথের সাথী বাটার এই স্যাণ্ডাল আর চপ্পল। হাল্কা পায়ে চলাফেরা আর সেই সাথে পায়ের পরিচর্যার জন্য আদর্শ এইসব মজবুত, খোলামেলা জুতো।
মিতালি
সাইজ ২-৭
প্লেটাইম
সাইজ ৭-১০
১১-১, ২-৫
কোভাডিস ১২
সাইজ ৫-১০
সুবীর
সাইজ ৪-১০
Bata

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৩৬ বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৮১

সূচিপত্র

অন্নদাশঙ্কর রায়। হুমায়ুননামা ১
অসীম রায়। আবহমানকাল ৬
শামসুর রাহমান। যখন আবহাওয়া খারাপ ৪৩
সুরজিৎ দাশগুপ্ত। রূপান্তর ৪৫
নবনীতা দেবসেন। ট্রাপিজ ৪৬
রফিক আজাদ। উদ্ভূত সেই পরিস্থিতিতে আমি যা যা করতে পারতাম ৪৭
রমাবাই দে। বৃষ্টি ৪৮
মিহির মুখোপাধ্যায়। ফিরে দেখা ৪৯
রমাকান্ত চক্রবর্তী। বাঙালী কৃষক ও বাঙালী রেনেসাঁস ৫৭
অমিয়ভূষণ মজুমদার। রাজনগর ৭৮
সমালোচনা। সুরেশচন্দ্র মৈত্র, সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন মজুমদার ১০১

সম্পাদক : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

আতাউর রহমান কর্তৃক নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা, ১৩ থেকে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা, ১৩ থেকে প্রকাশিত।

For comprehensive consultancy services...

In every field of engineering activity DEVELOPMENT CONSULTANTS Consulting Engineers to Indian Industry

For more than two decades, we have been providing technical consultancy services from start to finish. For every aspect of engineering involving power generation and distribution, paper, fertiliser, cement, metallurgical, mining, material handling, textile, docks and harbours etc. involving architectural, structural, mechanical, electrical, and project-development-construction-management-operation activities.

But we do not stop with providing technical consultancy to key industries in India alone. We also have the privilege of being the first major exporter of Indian engineering expertise to U.A.R., Syria, Nepal, Nigeria, Kenya, Thailand and the Phillipines.

From a feasibility report to a plant commissioning—our veteran engineers bring all their experience and know-how to the task, assisted by computerised technology to turn your proposals into working projects.

We have full-fledged Design Offices in Calcutta, Madras, Bombay and Damascus.

DEVELOPMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED

24-B Park Street, Calcutta 700016

Phone : 24-8153, Cable : ASKDEVCONS,

Telex : 7401 KULCIA CA

Branches : BOMBAY . NEW DELHI . MADRAS . DAMASCUS

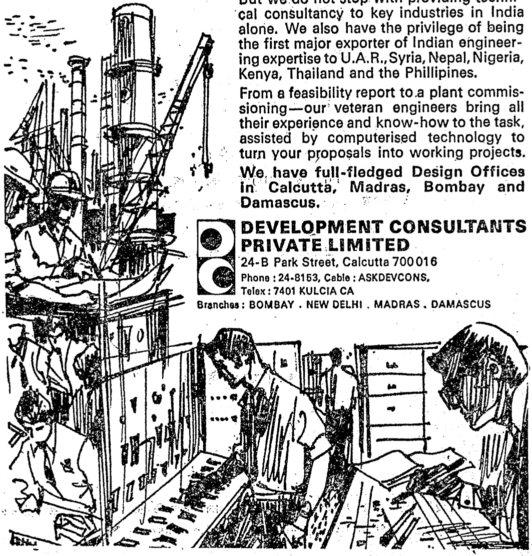

বর্ষ ৩৭ বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৮১

হুমায়ুননামা

অন্নদাশঙ্কর রায়

হুমায়ুন কবিরকে আমি প্রথম দেখি লণ্ডনে নিরঞ্জন পালের বাড়িতে। সেদিন ছিল বাঙালীদের দেশীয় মতে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ। বেশ মনে পড়ে কবিরের গলায় ছিল লাল রঙের টাই। আমি তাই নিয়ে একটু কৌতুক করি।

কবির চলে যান অক্সফোর্ডে। সেখানে পড়েন মডার্ন গ্রেটস। অর্থাৎ ইতিহাস, অর্থনীতি ও দর্শন। ইংরেজী নয়, যদিও ইংরেজীতেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। বিষয় মনোনয়নটা তিনি ঠিকই করেছিলেন, দেশে ফিরে এলে একটা না একটা বিষয়ে চাকরি জুটে যেত। না জুটলে মূল বিষয়ে তো জুটতই। অমনি করে তিনি হন সব্যসাচী বা সবজান্তা। পরবর্তী জীবনে যে-কোনো বিষয়ে বলতে ও লিখতে পারতেন। বিদ্বান মহলে অপরাজেয় বাগ্মী ও তার্কিক। অক্সফোর্ডের ইণ্ডিয়ান মজলিশেই তার হাতেখড়ি। পরে তিনি অ্যাসেম্বলিতে ও পার্লামেন্টে যাবেনই সেটা যেন পূর্বনির্ধারিত।

কমিউনাল হতে চাইলে হুমায়ুন কবিরকে ঠেকাত কে? অবিভক্ত বঙ্গের মন্ত্রী তো হতেনই, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপদেও পূর্বপাকিস্তানের নেতৃত্ব করতেন। কমিউনাল না হয়েও ভারত সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা ও শিক্ষাসচিব হন। পরে তো মিনিস্টার অব স্টেট ও পুরোদস্তর মিনিস্টার। ওর চেয়ে উচ্চপদ তো প্রধানমন্ত্রীর পদ। সেটা তিনি প্রত্যাশা করেন নি। হয়তো ওর চেয়ে দায়িত্বপূর্ণ পোর্টফোলিও আশা করেছিলেন। সে আশা অধিকতর বয়সে পূর্ণ হতো। যদি না ঘটে যেত একটা অঘটন। যদি না আসামের প্রভাবশালী মন্ত্রী ফকরুদ্দীন আলী আহমদ সাহেবকে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে আসন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো। সে অবস্থায় কবিরকেও আসন দিলে অন্যের ভাগ থেকে দিতে হতো। অথচ তাঁকে এক ধাপ নামিয়ে দিয়ে মিনিস্টার অব স্টেট করাও চলে না। তাই তাঁকে একেবারে বাদই দেওয়া হয়।

হুমায়ুনের পক্ষে ওটা বিনা মেঘে বজ্রপাত। বলেন, ওরা আমার পার্লামেন্টারি কেরিয়ারটাই

খতম করে দিতে চায়। বলে কি না, মাদ্রাজের গভর্নর হও। কী করে রাজী হই! বেচারার মুখখানি অন্ধকার।

আর কেউ হলে ও পদ লুফে নিতেন। বছর কয়েক বাদে আবার পার্লামেন্টে ফিরে যেতেন ও মন্ত্রিপদের জন্যে চেষ্টা করতেন। কিন্তু হুমায়ুন এ দেশের লয়েড জর্জ বা উইনস্টন চার্চিল। পার্লামেন্ট তিনি কিছুতেই ছাড়তেন না। গভর্নর পদের জন্যেও নয়।

হুমায়ুন যে একজন বর্ন্ পার্লামেন্টারিয়ান (born parliamentarian) এর পরিচয় পাই আমি আরও কয়েক বছর আগে। বলেন,—শিক্ষাসচিবের পদটা আমি ইচ্ছে করেই ছেড়ে দিলুম। আমি চাই পার্লামেন্টে যেতে। তবে লোকসভার জন্য দাঁড়াতে পারব না। নির্বাচনের খরচ অন্তত ত্রিশ হাজার টাকা, রাজ্যসভায় যেতে মাত্র আড়াই টাকা খরচ। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার সদস্যদের ভোট যদি যথেষ্টসংখ্যক পাই।

ভোট তিনি যথেষ্টসংখ্যকেরও বেশী পেয়েছিলেন। কিন্তু ওদিকে জবাহরলাল ওঁকে সাফ বলে দিয়েছিলেন যে মন্ত্রিপদের প্রত্যাশা থাকলে রাজ্যসভার সদস্য হওয়াই যথেষ্ট নয়। এখন থেকে ওটা শুধু লোকসভার সদস্যদের জন্যেই বরাদ্দ। হুমায়ুন তার জন্যে চিন্তিত নন। বলেন,—সংসার কী করে চলবে, জানতে চান? সদস্যহিসাবে আমি যা পাব তার সঙ্গে আরো কয়েক শো টাকা জুড়ে দিলে মাসে হাজার টাকা আয় হয়। সেই কয়েক শো টাকা আসবে লেখা থেকে। পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখব।

জবাহরলাল রাজ্যসভার সদস্যদের মিনিস্টার অব স্টেট করেন। হুমায়ুনকে দেন প্রথমে বিমান দফতর, পরে সংস্কৃতি দফতর। সাহিত্য আকাদেমি তার সামিল। হুমায়ুনের ইচ্ছাতেই আমি এর আগে ছিলুম সাহিত্য আকাদেমির সাধারণ সংসদ তথা কার্যকর পরিষদের সদস্য। সেই সূত্রে আমরা একসঙ্গে বসে কাজ করেছি। আমাদের সঙ্গে ছিলেন স্বয়ং জবাহরলাল, রাধাকৃষ্ণন্, আজাদ, পানিক্কার। সবাই তাঁরা দিল্লীতে থাকেন, যাতায়াতে তাঁদের সময় নষ্ট হয় না। আমার হয়। সাহিত্যের জন্যেই আমি সাহিত্য আকাদেমি ছাড়ি।

তেমনি, হুমায়ুনের নির্বন্ধেই আরো আগে আমি বিশ্বভারতীর সাধারণ সংসদ ও কর্ম পরিষদের সদস্য হয়েছিলুম। শান্তিনিকেতনে গেছলুম শান্তির আশায়। অশান্তির মেঘ দেখে দিশাহারা হই। তা হলে কি শান্তিনিকেতন ত্যাগ করব? না, শান্তিনিকেতন ত্যাগ করব না, বিশ্বভারতীর সংসদ পরিষদ ত্যাগ করব। হুমায়ুনকে একথা জানিয়ে দিই।

জীবনে কতরকম ভুল করেছি, কিন্তু হুমায়ুনের উপরোধে সেই ভুলটি আমি করিনি যেটি করলে আমার পশ্চাত্তাপের সীমা থাকত না। তাঁর অভিপ্রায় ছিল যে রথীন্দ্রনাথের পরে আমিই হব উপাচার্য, তিনি থাকতে আমি যেন কর্মসচিব হয়ে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা ভালো স্টার্ট দিই। আমার উপর এমন অগাধ বিশ্বাস আমি আর কারো মধ্যে দেখিনি।

হুমায়ুনকে আমি লিখি যে উপাচার্য হবার উচ্চাভিলাষ আমার নেই, কিন্তু কর্মসচিব হয়ে একটা স্টার্ট দিতে আমি রাজী, তবে এক বছরের জন্যে। শান্তিনিকেতনে গিয়ে রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলে ও নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনটা পড়ে আমি সোজা বলে দিই যে আমার দ্বারা ও কাজ হবে না।

তখন হুমায়ুন বলেন,—তা হলে কাকে দিয়ে ও কাজ হবে?

আমি বলি,—দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব রেজিস্ট্রার নিশিকান্ত সেনকে দিয়ে। তখন রথীবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আমরা দু'জনে হাজির হই নিশিবাবুর নিবাসে। ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে পড়েন। তিনি রাজী হন এই শর্তে যে আমি যেন তাঁকে সাহায্য করি। খেয়ালের খেসারৎ আমাকে দিতে হয়েছিল। অকারণে শত্রুসৃষ্টি।

হুমায়ুনের কাছে আমি নানাভাবে উপকৃত। তিনবার তিনি আমাকে দিল্লী থেকে ট্রাঙ্ক কল করে বিদেশে যেতে বলেন। রাশিয়ায় দু'বার, ফিলিপাইনসে একবার। আমি আমার অক্ষমতা জানাই। আর একবার তিনি আমাকে চমকে দেন,—কই, আপনি আমেরিকায় গেলেন না যে! আমি কানাঘুষা শুনেছিলুম যে আমাকে আমেরিকায় যেতে বলা হবে। কিন্তু ওটা শিকেয় তোলা থাকে, বোধহয় ছোঁ মেরে অন্য একজন কেড়ে নেন। দিল্লীতে ওরকম প্রায়ই হয়। তীর্থের কাকের মতো ধর্না দিয়ে বসে থাকেন কতক লোক। তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কি আমার সাজে! হুমায়ুনকে বলি,—কই, আমাকে তো কেউ তেমন কোনো প্রস্তাব পাঠায় নি।

হুমায়ুনের সঙ্গে দিল্লীতে দেখা হয় তাঁর সেই মন্ত্রিপদ থেকে অপসারণের পর। বেচারার চেহারা দেখে আমার মায়া হয়। বলি,—তা গভর্নর না হয়ে আপনি ভালোই করেছেন। আপনার আসল ক্ষেত্র হচ্ছে পার্লামেন্ট। টান পড়লে লিখে সংসার চালাবেন। আপনার সদস্যপদ তো কেউ কেড়ে নিচ্ছে না।

ততদিনে তিনি লোকসভার সদস্য হয়েছিলেন। আমি তাঁকে বলি,—এখন দিল্লীতে বসে আপনি করছেন কী! যান, বসিরহাটে যান। ওখানে পুলিশের গুলীতে একটি ছেলে মারা গেছে। আপনারই কন্‌স্টিটুয়েন্সি। আপনারই কর্তব্য।

সত্যি সত্যি তিনি বসিরহাট রওনা হয়ে গেলেন। কিন্তু পরে যেটা করলেন সেটা আমাদের কারো সঙ্গে পরামর্শ করে নয়। কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ। বাংলা কংগ্রেসের টিকিটে পার্লামেন্টে যাওয়া। সেইখানেই দাঁড়ি টানলে পারতেন। এর পরে ক্রান্তি দলের সাথে মিতালি। লোকদল প্রতিষ্ঠা। লোকদলের জন্যে একে ওকে খাড়া করা।

আমার সঙ্গে শেষ দেখা কলেজ স্কোয়ারে একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্যে সহযাত্রীরূপে। দেখি তাঁর কোলে একরাশ পুস্তিকা। লোকদলের প্রোগ্রাম। একখানা কিনি। পরম আশাবাদী হুমায়ুন বিশ্বাস করেন যে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচনে তাঁর লোকদলের অন্তত ষাটজন জিতবেন।

মেদিনীপুরে না কোথায় সভা করতে গিয়ে তিনি জখম হন। বিষম দুঃখিত হয়ে চিঠি লিখে সহানুভূতি ও শুভকামনা জানাই। তার উত্তরে তিনি লেখেন তাঁর লোকদলের অন্তত ত্রিশজন প্রার্থী কি জিতবেন না?

হাঁ, তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ওই অপরাজেয় আশাবাদ। লোকদল একদম ঘায়েল হয়। একটিও আসন পায় না। হুমায়ুনকে আর সান্ত্বনাবাণী শোনাইনি। জানি, এর কোনো সান্ত্বনা নেই। লোকদলের সঙ্গে সঙ্গে হুমায়ুনের ও রাজনৈতিক পরাজয়।

পরাজয়ের পর মৃত্যু। হয়তো পরাজয়ের ফল মৃত্যু। তিনি কিন্তু পার্লামেন্টারিয়ান রূপেই

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিধাতা তাঁকে সেই গৌরব থেকে বঞ্চিত করেন নি।

রাজনীতি যদি তাঁকে চুম্বকের মতো না টানত তাহলেই তাঁর প্রতিভার সম্যক্ পরিস্ফুরণ হতো। 'চতুরঙ্গ'র মতো অমন একখানা ত্রৈমাসিক পত্র পরিচালনা করা কি কম কৃতিত্বের পরিচায়ক! একজন গুজরাটীর মুখেও শুনেছি 'চতুরঙ্গ'-ই আদর্শ। ওর পেছনে লেগে থাকলে কি না করতে পারা যেত! বাংলার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজীতেও তিনি সম্পাদনা করতেন 'ইণ্ডিয়া'। ওটা অকালে অন্তর্হিত হতো না, যদি তিনি লেগে থাকতেন। দক্ষতা তাঁর ছিল, কিন্তু মনোযোগ ছিল না।

আমি আশা করেছিলুম যে গভর্নরপদ না নিয়ে তিনি হয়তো কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ নেবেন। শিক্ষাবিদ্ মহলেও তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল। তাহলে অবশ্য পার্লামেণ্টে হাজিরা দেওয়া চলত না। উপাচার্য হয়ে যিনিই পার্লামেণ্টে হাজিরা দিতে গেছেন তিনিই দুই নৌকায় পা রেখে পা ফস্কে পড়েছেন। অন্তত একজনের বেলা এটা সত্য। তা হলে কি এই রায় ইতিহাস দেবে যে হুমায়ুন কবির পার্লামেণ্টের জন্যে অন্যান্য সম্ভবপর পদ বিসর্জন দিলেন?

সংস্কৃতি দফতরের শীর্ষে হুমায়ুন কবির না থাকলে সারা ভারত জুড়ে ও ভারতের বাইরে অত বিরাট আকারে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হতো না। সরকার থেকে তিনি বোধহয় এককোটি টাকা মঞ্জুর করিয়ে নিতে পেরেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সদরে তথা ভারতের সদরে তার থেকে রবীন্দ্রনাট্যশালা নির্মিত হয়েছে। সাহিত্য আকাদেমি থেকে বিভিন্ন ভাষায় রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ ও তাঁর উপর লেখা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। হুমায়ুনের নিজের উদ্যোগেও তাঁর সম্বন্ধে বই বেরিয়েছে।

হুমায়ুনের চরিত্রের অপর বৈশিষ্ট্য তাঁর চিরতরুণের মতো উৎসাহ ও উদ্যম। একই সঙ্গে একশোটা কাজ করা হচ্ছে। একটার পর একটা জায়গায় লাট্টুর মতো ঘোরা হচ্ছে। হুমায়ুন কবির কোন্খানে নেই?

একবার দিল্লীতে নিখিল ভারত লেখক সম্মেলন হচ্ছে। সভাপতিত্ব করবেন হুমায়ুন কবির। কিন্তু মাদ্রাজে না কোথায় গেছেন, সেখান থেকে ফেরেন নি। তাঁর বিমানের পাত্তা নেই। বিজ্ঞানভবনের প্রবেশদ্বারে দেখি তারাশঙ্কর ও জৈনেন্দ্রকুমার। আমার দিকে এগিয়ে এসে দু'জনে আমার দুই হাত ধরে ভিতরে নিয়ে যান ও সভাপতির আসনে বসিয়ে দেন। আমি তো চিত্তির। সেই যে রূপকথায় আছে রাজহস্তী পথে বেরিয়ে যাকে খুশি একজনকে শুঁড়ে তুলে নিয়ে হাওদায় বসিয়ে রাজা করে দেয়। সভাপতির ভাষণ দিচ্ছি, হঠাৎ সোর ওঠে, 'হুমায়ুন কবির! হুমায়ুন কবির!' আমি তাঁকে তাঁর আসন ছেড়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

ভারতের লেখক মহলে সত্যিই তাঁর একটি সম্মানের স্থান ছিল। তখনও তিনি মন্ত্রী হন নি। সুতরাং সেটা তাঁর মন্ত্রিত্বের জন্য নয়। নানা মতবাদের লেখকের মাঝখানে তিনি ছিলেন যোগসূত্র বা শান্তিদূত। তাই তাঁকেই সভাপতি করা হয়। নইলে ঝগড়া বেধে যেত। আর সে কী ঝগড়া! সভার কাজ চালাতে গিয়ে আমি দেখেছি হিন্দী লেখকদের মধ্যেই একদল অহি তো একদল নকুল। কখনো মতবাদের দরুন। কখনো আঞ্চলিকতার দরুন। শান্তিজল ছিটিয়ে দেওয়া হুমায়ুন ভিন্ন আর কারো দ্বারা হতো না। তিনি ছিলেন সত্যি সর্বজনপ্রিয়।

বছর চল্লিশ আগে আমি যখন কুষ্টিয়ার মহকুমা হাকিম তখন একবার রেলপথে খান বাহাদুর

কবিরুদ্দীন আহমদের সঙ্গে আলাপ। শুনি ফরিদপুরে তাঁর বাড়ীর কতক অংশ হিন্দু রীতিতে তৈরী, কতক মুসলিম রীতিতে, কতক পাশ্চাত্য রীতিতে। সব ধর্ম সমন্বয়ের সঙ্কেত। তাঁর পুত্র হুমায়ুনও সেইভাবে তৈরী হন নি কি ?

বাংলা সাহিত্য হুমায়ুনকে ভুলে যাবে না। তাঁর প্রথম বয়সের কাব্যগ্রন্থের নাম 'স্বপ্নসাধ'। কবিরূপেই তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ। বিলেতে গিয়ে তিনি 'মৌচাকে'র জন্য লিখতেন অক্সফোর্ডের চিঠি। ছেলেমেয়েরা আগ্রহের সঙ্গে পড়ত। বাংলা সাহিত্যে তাঁর সাহিত্যিক প্রবন্ধের ও প্রবন্ধগ্রন্থেরও সুনাম ছিল। মার্কসবাদের উপর তাঁর একখানি বই তিনি একবার আমাকে পাঠিয়েছিলেন। রাজনৈতিক মতবাদে হুমায়ুন ছিলেন গান্ধী জবাহরলাল ও মওলানা আজাদের কাছাকাছি। তার আগে ফজলুল হক সাহেবের কাছাকাছি। কিন্তু কোনো কালেই মুসলিম লীগ নেতাদের কাছাকাছি ছিলেন না। তরুণ বয়সেও তিনি ছিলেন খদ্দরধারী। শুনেছি সে বয়সে নিরামিষাশীও ছিলেন। কখনো তাঁকে সুরাপান করতে দেখিনি। অত্যন্ত সংযত প্রকৃতির পুরুষ ছিলেন হুমায়ুন। একান্ত একনিষ্ঠ স্বামী। কলেজ জীবনে থাকতেন Y. M. C. A হোস্টেলে হিন্দু ব্রাহ্মণ খ্রীস্টানদের সঙ্গে। তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার সেটাও একটা হেতু। তবে তাঁর পিতার প্রভাবই বোধ হয় আদি কারণ। আর প্রধান কারণ তাঁর পত্নীর প্রভাব।

আবহমানকাল

অসীম রায়

শীতের সন্ধে নাম্‌ছে শহরে। ধোঁয়া আর কুয়াশায় ট্রাম চলেছে। বাসের হেডলাইট একবার জলছে একবার নিভছে। আর এই ধোঁয়া কুয়াশা ছাড়িয়ে জগুবাবুর বাজারের কোণে ছ্যাৎলাপড়া তেতলা ঐ বাড়িটার ঠিক মাথার ওপরেই জল জল করছে একটা তারা। সেখান দিয়েই মিছিলটা বাঁক নিল দক্ষিণমুখী। ছোট মিছিল। মাঝে মাঝে ধ্বনি উঠছে 'জেলের তালা ভাঙতে হবে।' অপেক্ষমান শিখ ট্যাক্সি ড্রাইভার মৃদুস্বরে গাল পাড়ছে। একটা কুকুর ডাকছে মিছিলের অনুসরণকারী পুলিশের ছুটো ওয়্যারলেস ভ্যান লক্ষ করে।

টুটুল ভবনাথের মলিদা জড়িয়ে চলেছে। সেও যেন শীতের ঘুমন্ত জগতের একজন, মিছিলের হাঁক শুনে বেরিয়ে এসেছে। আসলে গত কয়েকদিন ধরে কলকাতার রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে বোমা পাথর অ্যাসিড বাল্‌ব নিয়ে যে খণ্ডযুদ্ধ চলেছে তার প্রত্যেকটার মধ্যেই টুটুল ছিল। কেন ছিল? কেন আছে? টুটুল মাঝে মাঝে নিজেকেই জিজ্ঞাসা করে। ভবনাথ বলেছিলেন, সেন্ট্রাল সার্ভিসের জন্যে তৈরী হতে। তার বদলে টুটুল মিছিল করছে। উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য চারপাশের জগৎটাকে বদলিয়ে দিতে হবে।

এ ব্যাপার নিয়ে টুটুলের সঙ্গে ছাত্রনেতা তপনের একচোট বাদানুবাদ হয়ে গিয়েছিল। টুটুল তপনকে প্রশ্ন করেছিল,—কেন আমরা ছাত্ররা পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে মিছিল করব?—কেন করব? কেন করব মানে কী? তপন উল্টে প্রশ্ন করে। টুটুল বললে,—কেন করব বলুন? আর্থিক কারণে? জীবনবোধ জীবিকাবোধ এক বলে? আমার তো জীবিকাবোধ আমাকে বিলেত পাঠাবে আমার দাদার মতো। কী তাগিদে আমি রাস্তায় নামব?

তপন উত্তর দিতে পারে নি। উত্তর হিসেবে বলেছিল অবশ্য, 'শান্তি, প্রগতি, স্বাধীনতা', কিন্তু এগুলো কেন শুধু কথামাত্র নয়, এগুলোর অন্য সংজ্ঞা আছে তা বোঝাতে পারে নি। সে নজির দিয়েছিল বাংলাদেশের যুবকসমাজের আত্মত্যাগের কথা, যুগের পর যুগ যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে তারা সেই ঐতিহ্যের কথা, কিন্তু একথাগুলো টুটুলের কাছে তো ব্যক্তিগত তাগিদ নয় যদি জীবিকাবোধই শুধু জীবনবোধ হয়।

টুটুল সেই একটা প্রশ্ন করেছিল বরাবর,—আমাকে বুঝিয়ে দাও তপনদা, আমি কোন্ তাগিদে আমার সামনের রাজপথটা ত্যাগ করব?

—তুমি বড্ড হেঁয়ালি কথা বলছো টুটুল। প্রত্যেক দেশেই তরুণরা আত্মবিসর্জন দেয় আদর্শের জন্যে। এটা কোনো নতুন কথা নয়।

—আদর্শটা কী?

—আদর্শটা সমাজবাদ। এই ঘুণধরা সমাজটা ভেঙে চুর চুর করে দিতে হবে।

টুটুল এ কথার খানিকটা দূর পর্যন্ত মেনেছে কিন্তু সবটা মানে নি। শুধু রাজনৈতিক

আদর্শবাদের জন্যে সে রাস্তায় নামে নি, এটা সে টের পায়। শুধু এই বর্তমান শাসক পার্টিকে পাল্‌টিয়ে আর একটা পার্টিকে শাসক বানাবার জন্যে সে তো তপনের সঙ্গে হাত মেলায় নি। তপনের সঙ্গে সে রাস্তায় নেমেছে কারণ তার এখন গোটা জীবনের চেহারাটা পাল্‌টিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। সে যে এতদিন স্বপ্ন দেখেছে চূর্ণী নদীর ধারে বাল্যকালে, কলকাতার লেকের আশেপাশে বর্ষায় ভেজা ঘাসে পা ফেলে ফেলে, তার জন্যে। সেই অতীতটাকে বর্তমানে বইয়ে দেবার জন্যে। একটা ভাবের পরম্পরা রক্ষার জন্যে। এই সমস্ত ভাবের সঙ্গে একেবারে নিপট অফিসবাবুর যোগ নেই। সে একটু সময় চাইছে, বুঝতে চাইছে। তার এই বোমা লাঠি আর টিয়ার গ্যাসের মধ্যে আসাটা আসলে তার যৌবনের প্রতিবাদের মিছিল। একথা সে ভবনাথকে তো নিশ্চয় বোঝাতে পারবে না, বোঝাতে পারবে না স্বর্ণসুন্দরীকে, এমন কি চোঙাকেও। তার এই প্রতিবাদের ভাষা তপনের কাছেও দুর্বোধ্য।

মিছিলটা চলেছে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের দিকে কারণ সেখানে রাজনৈতিক বন্দীরা অনশন করছেন। অনশনকারীরা যাই ভাবুন না কেন, টুটুলের কাছে এই অনশন ধর্মঘট বাংলাদেশের যৌবনের প্রতিবাদের ধর্মঘট, বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখার ধর্মঘট। টুটুল বুঝেছে রাজনীতিকে স্বপ্নময় করে তুলতে হবে, তাকে আর একটা তাৎপর্য দিতে হবে যেমন ১৯১৭ সালে রুশবিপ্লব দিয়েছিল। রুশবিপ্লব কি এই জন্যে যে আমেরিকার শ্রমিকের চেয়ে রুশ শ্রমিক কত বেশী রোজগার করে, সুযোগ সুবিধে পায় তা দেখানো? রুশবিপ্লব মানুষের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে, অথবা মানুষের স্বপ্নের আরও এক মহান রূপ দেবার জন্যে। আজ টুটুল যে মিছিলের সঙ্গে পা ফেলেছে কার্যকরী শক্তিতে তা নিশ্চয় কিছুই নয়, এক ফুঁয়েই নিভে যাবার মতো এ আয়োজন। কিন্তু টুটুলের কাছে এ এক প্রজ্বলিত শিখা; এই শিখা সামনে রাখা ছাড়া বাংলাদেশের প্রতিবাদের কোন ভাষা নেই। এটা কোন হঠকারিতার ভাষা নয়। এটাই মানুষের স্বপ্ন দেখার ভাষা।

যে পুলিশ অফিসারটি নেতৃত্বে ছিলেন পেছনের ওয়্যারলেস্‌ ভ্যানে তাঁর গলায় পুলক স্পষ্ট হয় মিছিলটা আর একটা বাঁক নেবার মুখে।—দে আর টেকিং বেকার রোড স্যর; অফিসারটি ওপরওয়ালাকে জানান। এক অবিশ্বাস্য সৌভাগ্য তাদের সামনে হাজির। মিছিল একেবারে জেলখানার গায়ে গায়ে যাবে এই পরিকল্পনায় প্রায় এক আত্মহত্যার সামনে এগিয়ে চলেছে। ওয়্যারলেসে মেসেজ পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যান ঠিক হয়ে যায়। সামনে কর্ডন, দুপাশে পাঁচিল, পেছন থেকে চার্জ।

জেলের তালা ভাঙতে যে মিছিল চলেছে সে মিছিলের অংশগ্রহণকারী টুটুল সেই জেল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল না যার অবস্থান আলিপুরে। সে তার কৈশোর-যৌবনের জেলখানার কথাটা চিন্তা করতে করতে মলিদাখানা সাপটে জড়িয়ে হাঁটতে থাকে। বি. এ. পরীক্ষায় সে খারাপ করেছে। এই তার জীবনের প্রথম অকৃতকার্যতা। আর এ ব্যাপারটা ঘটেছে ঠিক তখনই যখন সে তার চারপাশের চলমান জগতের সঙ্গে সঙ্গে তার বইয়ের অক্ষরগুলোর কোথাও একটা যোগসূত্র আছে বলে টের পাচ্ছে। এই প্রথম তার অকৃতকার্যতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে লেখাপড়া চিন্তা ভাবনার তীব্র প্রয়োজনীয়তা নতুন করে বোধ করছে সে। সেই আবাল্য মুখস্থ জগৎটা টান মেরে ফেলে দিয়ে এমন এক জগৎ সে খুঁজতে চাইছে যা ঠিক জাদুঘরে কাঁচের তাকে ন্যাপথিলিন-লাগানো জিনিস নয়। আর সেই আলোড়নে সে কী পাচ্ছে বুঝতে পাচ্ছে না, কিন্তু সেই গব গব করে আবিশ্ব বিষয়বস্তু গিলে

ফেলে হড় হড় করে পরীক্ষার খাতায় বমি করে ভাসিয়ে দেওয়া—এ আর সম্ভব না। সে আর জেলখানার জীব হতে রাজী নয়। সেই মুখস্থ জগতের জেলখানা টুটুল ভাঙতে চলেছে। আর সকলের সঙ্গে সেও স্লোগান দেয়,—জেলের তালা ভাঙতে হবে।

অন্ধকার এখন বেশ চেপে ধরেছে শহরকে। কুয়াশা আর ধোঁয়ায় দিক ঠাওর হয় না। বিশেষ করে টুটুলের মতো স্বপ্নাচ্ছন্ন শোভাযাত্রীর নয়, তার আর একটু সামনেই তপন, দুজন মাঝারী গোছের ছাত্রী নেত্রী গীতা বেলা কারুরই ঠিক এ অঞ্চলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ না থাকায় জেলখানার ভূগোল সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। তবে যারা সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের বোধহয় কোন দ্বিধা নেই। ডবল মার্চে প্রায় ছুটতে ছুটতে শোভাযাত্রীরা এগোয়। স্লোগানের আওয়াজ মুহুর্মুহু বেড়ে যায়। বিরাট উঁচু জেলের পাঁচিল অন্ধকারে দুর্গের কালো প্রাকারের মতো লাগে। সেখান থেকেও বোধহয় স্লোগানের আওয়াজ আসে। প্রায় দুশোটি ছেলেমেয়ে এবার উদ্দীপনায় তড়িৎস্পৃষ্ট। তবে ঠিক বোঝা যায় না, বোধহয় সামনে থেকে মিছিল পেছনে হটছে। মিছিলের মুখে ট্রাক ট্রাক ভর্তি পুলিশে রাস্তা বন্ধ। এবার পেছন দিক থেকে অন্ধকার ভেদ করে জোরাল হেডলাইট শোভাযাত্রীদের পিঠে ঘাড়ে এসে পড়ে।

একটা আওয়াজ আসে, বোধহয় তপনের,—কম্‌রেডস্‌, প্যানিকি হবেন না। কিন্তু যিনি বললেন তিনিও আর সকলের সঙ্গে দৌড়চ্ছেন। টুটুলের সারিটা প্রায় শেষ দিকে। তারা একবার পেছন ফিরে দেখলে, কালচে-নীল গরম ওভারকোট পরা পঁচিশ-ত্রিশ জন পুলিশ সার দিয়ে ভূতের মতো দাঁড়াল। তারপর তীব্র হুইসিলের আওয়াজ। লোকগুলো দৌড়ে এগিয়ে আসছে গাল দিতে দিতে। লাঠি চার্জ শুরু।

চারদিক বন্ধ। ছেলেমেয়েরা বেধড়ক মার খাচ্ছে। একটা ছেলের ধুতি খুলে যায়। গেঞ্জি দিয়ে তার রক্তের ধারা নেমেছে। একজন অজ্ঞান হয় চাঁদিতে বাড়ি খেয়ে। পরমুহূর্তেই বুটের ঠোক্করে পাশের ড্রেনে গড়িয়ে পড়ে। সামনের দিকে লোক মার খেয়ে পেছনে ছুটছে, পেছন থেকে ছেলেমেয়েরা সামনে ছুটছে। কেউ কেউ জড়াজড়ি খেয়ে আছড়ে পড়ছে। হঠাৎ কিছু ছাত্রছাত্রী বিদ্যুৎগতিতে ডান দিকে বাঁক নেয়। ডান দিকে সার সার সরকারী কোয়ার্টার। সবাই লাফিয়ে লাফিয়ে খোলা ড্রেনে পড়ে পাশের সরু ফালি জমি দিয়ে সেদিকে দৌড়য়। টুটুলও তার মধ্যে। সামনে খোলা লোহার গেট মুক্তির দিকে হাত মেলে দাঁড়িয়ে আছে। আর বোধহয় দশ-বারো হাত। এমন সময় টুটুলের কাঁধের ওপর ছায়া পড়ে। ঠক করে আওয়াজ হয় মাথায়, তারপর ঘাড়ে। কিন্তু টুটুল তখন যন্ত্রচালিত দুর্বার আবেগে ধাবমান। সে বেগে বাধা পড়ে না। হুড়মুড় করে ছেলেমেয়েরা সেই একতলা কোয়ার্টারগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়তে থাকে। লেপ মুড়ি দিয়ে সিনেমার কাগজ পড়ছিলেন এক ভদ্রমহিলা। টুটুল আর তার সঙ্গের ছেলেমেয়েগুলো ঘরে ঢুকতেই ভদ্রমহিলা আতঙ্কে হাঁউমাউ করে কেঁদে ওঠেন। পাশে ঘুমন্ত সাত-আট বছরের ছেলেটা উঠে পড়ে ভ্যাবাচাকা খেয়ে কাঁদতে ভুলে যায়। ভদ্রমহিলার আতঙ্কিত চোখের চাহনি অনুসরণ করে টুটুল শার্টের কলারে হাত দেয়। জবজব করছে রক্তে-ভেজা কলার। সামনেও রক্তের ছিটে। ভাগ্যি ভেতরে পুলওভার ছিল। বেশ খানিকটা গড়ানো রক্ত চুষে নিয়েছে। টুটুল সেদিকে চিন্তা

না করে আর সকলের সঙ্গে বাথরুমে ঢুকে পড়ে। বাথরুমে দরজা খুলতেই এক মানুষসমান পাঁচিল তোলা উঠোন।

ইতিমধ্যে পুলিশের 'কুম্বিং অপারেশান' শুরু হয়েছে বলে পুলিশের সদর দপ্তরে খবর পাঠানো হল। যারা আশেপাশে আনাচে কানাচে আত্মগোপন করে ছিল তারা সবাই ধরা পড়ে, তারপর প্রিজন ভ্যানে তুলতে তুলতে বেধড়ক মার। এটা পরিষ্কার, পুলিশের লোকজন এদিকেই আসছে। প্রায় পঁচিশ-তিরিশ জন ছেলেমেয়ে এ'দিকে আটকা পড়ে। হয়ত ইতিমধ্যে খবর চলে গিয়েছে। আর মুহূর্ত দেরি না করে পাঁচিল টপকানো শুরু হয়। সবাই হাঁফাচ্ছে আর হাঁফাতে হাঁফ'তে ফিসফিস করে কথা বলছে। টুটুলের পাশ থেকে একজন বললে— কলার গুঁজে দিন, কলার গুঁজে দিন। পাঁচিলের আলসেতে হাত রেখে রেখে ছেলেরা পাদানি করে। মেয়েরা টপটপ পাঁচিল টপকায়। আরও অনেকের সঙ্গে অন্ধকারে ঝাঁপ দেয় টুটুল।

এদিকে প্রচুর গাছ আর অন্ধকার। আশেপাশে আলো না থাকায় চাপ-চাপ অন্ধকারে অস্পষ্ট ম্লান শীতের জ্যোৎস্নায় হঠাৎ ছেলেমেয়েরা নেমে কেমন দিশেহারা হয়ে যায়। সামনেই একটা মূর্তি অনড়, বোধহয় শান্ত্রী। সকলের বুক ছাঁত করে ওঠে। একটি ছেলের সন্দেহ হতে একটু একটু করে এগোয়। অন্ধকারেও তার হাসির আওয়াজ আসে। সকলে এগোয়। চাঁদের আলোয় আশ্চর্য জীবন্ত এক প্রাক্তন ইংরেজ অফিসার, কোমরে তলোয়ার। টুটুল হাঁফাতে হাঁফাতে আকাশের দিকে তাকায়। মেঘ নেই। ঠিক সামনে অন্ধকার মাঠের এক প্রান্তে আকাশে জলজ্বলে কালপুরুষ। মিলিটারি-সঙ্কেত-আঁটা একটা বোর্ড সামনে ছাঁটা ঝোপটার গায়েই। মাঠের এক প্রান্তে কতগুলো আর্মি তাঁবু। বোধহয় জাঠ ব্যাটালিয়ান। এবারে সত্যিই একজন জীবন্ত শান্ত্রী চোখে পড়ে। কাঁটাতারের পাশে নিশ্চল শান্ত্রী। বন্দুকের নল চকচক করে চাঁদের আলোয়।

আবার হুইসিল বাজে। এস্থানটাও যে নিরাপদ নয় তা স্পষ্ট। সেই ঘন গাছ আর অন্ধকারে ম্লান জ্যোৎস্নায় ছেলেমেয়েরা এদিক ওদিক করে। চারপাশে রাস্তা বন্ধ, সামনে পুলিশ পেছনে মিলিটারি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এ'দিকে পুলিশের অপারেশান শুরু হবে। তারা এবার পেছন ফিরে হাল্কা পায়ে দৌড়য়। সামনে একটা জায়গা ফাঁকা, ঝোপ আর কাঁটাতার। এমন চওড়া ঝোপের সারি আর কাঁটাতারগুলো এতই মোটা নতুন আর ঘনসন্নিবদ্ধ যে তা ভেদ করা দুঃসাধ্য। তারা সবাই চেয়ে দেখে সামনেই আলোকিত নির্জন রাস্তা। দুটো প্রিজন ভ্যান বেরিয়ে গেল। তারপর আর একটা ট্রাক। কিন্তু সামনের রাস্তাটা ঠিক পেরোলেই মোড়ের মুখে একশো গজ দূরেই কলকাতার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। বাস স্টপে মুড়িঝুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অপেক্ষমান যাত্রী। একটি তরুণীর হাতে বাজারের থলি, এক বৃদ্ধ ভিখিরীও হাত বাড়িয়ে আছে যাত্রীর দিকে।

এমন সময় চাপা অস্পষ্ট সঙ্কেত শোনা যায়। বিশ হাত দূরে তার কাঁটার নীচে এক জায়গায় দুটি ছেলে ঝুঁকে পড়ে কী দেখছে। একজন হাত নাড়িয়ে তাদের ডাকে। কাছে আসতেই দেখা গেল সেই অটুট কাঁটাতার ঝোপের পাঁচিলে এক ফাটল। বোধহয় বৃষ্টিতে এক জায়গায় মাটি ধসে গেছে। আর শেয়াল-কুকুর জাতীয় জীবও এরাস্তা দিয়ে আনাগোনা করেছে। প্রথম ছেলেটি হাতের নখ দিয়ে কুরে কুরে খাবলে সেই হিমশীতল শুকনো মাটি আলগা করার চেষ্টা করে। একটি

মেয়ে গাছের একটা ছোট্ট শুকনো ডাল আনে। পাঁচ-সাত মিনিটের চেষ্টায় ধড়খানা বেরোতে পারে এরকম একটা রাস্তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রগতিতে প্রথম ছেলেটি অন্তর্ধান হয়। গর্তের ওপরেই টান করে আঁটা শক্ত তারকাঁটা টেনে ধরে টুটুল। দ্বিতীয় ছেলেটি বেরিয়ে যায়। এবার টুটুল। গর্তের মুখে মুখ নীচু করে বাইরে তাকায়। হঠাৎ এক ঝলক্ আলো মুখের ওপর পড়েই সরে যায়। পুলিশের গাড়ির হেডলাইটের আলো। গোঁ গোঁ করে গাড়িটা বেরিয়ে গেল। আবার নির্জন আলোকিত রাস্তা। সাঁ করে বেরিয়ে যায় টুটুল। তারপর দ্রুত পায়ে রাস্তা পেরোয় কোনোদিকে না তাকিয়ে। বাসের মোড় যত এগিয়ে আসে, যত ঝাঁকা-কাঁধে বাড়িফিরতি ব্যাপারীদের দলটা এগিয়ে আসতে থাকে চোখের সামনে, ততই তার উত্তেজনা বাড়ে। অবিশ্বাস্য মুক্তির আস্বাদে টুটুল একেবারে অভিভূত। কাদামাখা ব্যাপারীর ঝাঁকার গা ঘেঁসে সে হাঁফায়। আবার সেই পরিচিত চলমান কলকাতার জীবন,—আগামী নয় বর্তমান কাল, এই বাসস্টপের আলোকিত বর্তমান কালে এসে সে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে।

—কটা বাজে গা ?

টুটুল চমকে ওঠে মাঝবয়সী মহিলাটির প্রশ্নে।—ও! সাড়ে আটটা…মানে আট-টা পঁয়ত্রিশ। ঘড়ির দিকে চেয়ে এতক্ষণে টুটুলের খেয়াল হয় তার বাবার মলিদাখানা শহীদ হয়েছে।

টুটুল সে রাত্তিরে বাড়িতে ফিরতে পারল না। তাদের বাড়িতে পুলিশ এসেছে। ভবনাথের বাড়িতে পুলিশ—একথা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। ভবনাথ বোকার মতো চেয়ে থাকেন, সঙ্গীন উঁচানো দুটো শান্ত্রী তাঁর গেটে। দুটো ট্রাকে পুলিশ থিক থিক করছে। এতক্ষণ পর সারাদিনের উত্তেজনায় ক্লান্তিতে একেবারে অবসন্ন লাগে টুটুলের। তার ওপর মাথা ঘুরতে থাকে। বাড়িতে ঢুকবে কি ঢুকবে না ভাবছিল, এমন সময় শান্ত্রীটি হাঁকে—ভাগো হিঁয়াসে। টুটুল সরে আসে। পা টেনে টেনে হাঁটতে থাকে। তারপর বাজারের পাশে ডাক্তার মুখার্জীর ক্লিনিকে গিয়ে ওঠে।

মোটাসোটা ভদ্রলোক। হিটলারের মতো গোঁফ, তাও সাদা, কিন্তু আশ্চর্য মায়াবী ভাসাভাসা চোখ। ভদ্রলোক ভবনাথের সঙ্গে দেশের একই স্কুলে পড়েছেন, ইছামতী নদীতে ঝাঁপ খেয়েছেন এক-সঙ্গে। এখন ফ্রি চিকিৎসা সরকারী হাসপাতাল থেকে পেনশান পাওয়ার পর। ডিসপেন্সারি বন্ধ করে ওপরতলায় উঠে যাচ্ছিলেন, এমন সময় টুটুল এল।

—এত রাতে? কী মনে করে? জানালার ছিটকিনি লাগাতে লাগাতে বলেন ভদ্রলোক। তারপর টুটুলের দিকে না চেয়েই বলতে থাকেন। —দাদার সঙ্গে রোজ বাজারে দেখা। আজ কিরকম মাছ খেলে? আমি-ই তো বেছে দিলাম। আমাদের সিরাজগঞ্জের লাল টকটকে রুই। ও মাছের জাতই আলাদা।

—কাকাবাবু, আমার মাথাটা দেখুন তো।

—কেন? কী হল? ও বাবা! এ যে মাথা ফাটিয়ে এসেছো?

ঝাঁকড়া চুল ফাঁক করতেই ক্ষতস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রক্ত কালো হয়ে চাপ বেঁধেছে।

—বোসো, ডাক্তার মুখার্জী উঠে গিয়ে জানালাটা খুলেই আবার বন্ধ করেন।

—পুলিশ? পুলিশ এসেছে?

—হ্যাঁ।

ভদ্রলোক চেঁচিয়ে বলেন,—আমার খাবারটা পরে দিও ঠাকুর। কলাইকরা একপাত্র জলে ছুরিকাঁচি দিয়ে হিটারে বসান। সিগারেট ধরিয়ে আস্তে আস্তে বলেন,—দাদা জানেন?

—বাড়িতে পুলিশ এসেছে।

—বাঃ!

ছুটো সেলাই দিতে হল। বিশাল ব্যাণ্ডেজ পড়ল টুটুলের সারা মাথা জুড়ে। ব্যাণ্ডেজে গিঁট দিতে দিতে ডাক্তারবাবু বললেন,—এইখানেই খাবার দিয়ে যাচ্ছে। খেয়ে শুয়ে পড়ো। ওই যে ডিভান আছে। একটা বালিশ পাঠিয়ে দিচ্ছি। দাদাকে খবর পাঠাচ্ছি। ছু-তিনটে দিন আমাদের ছাতের চিলেকোঠায় থাকো। ঘা শুকোক, বাড়ি যাবে।

বেরোতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন ডাক্তারবাবু। পর্দা ফাঁক করে বললেন,—আমাদের সময় ছিল বন্দেমাতরম্, আর তোমাদের সময় ইনক্লাব জিন্দাবাদ—এই তো?

টুটুল ক্লান্তভাবে বললে,—হুঁ।

ছুই

অচিন্ত্য চৌধুরীর সাম্প্রতিক এক তীক্ষ্ণ পলেমিক, 'অ্যাসিড বাল্ব বিপ্লব অথবা আত্মহত্যা?' খবরের কাগজের জগতে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কারণ, ঘটনার কান ধরে এমন মোচড়াবার ক্ষমতা এত তরুণ অনভিজ্ঞ সাংবাদিকের কাছে প্রায় আশাতীত। তাদের কাগজের এক কর্মকর্তা, যিনি অবশ্য খবরের ব্যাপারটা খুব বোঝেন বলে মনে করার কারণ নেই, তিনিও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আসল জায়গায় বলে বেড়ালেন,—অচিন্ত্য উইল শেপ্ ওয়েল।

গত এক বছর থেকে কাজ করছে অচিন্ত্য কিন্তু এরই মধ্যে তার সম্ভাবনার কথা আলোচ্য বস্তু। আর অচিন্ত্য যে শেপ্ করবে তা যে শুধু সাংবাদিকতার বাঁধা সোজা অভিনবত্বহীন বছরের পর বছর একঘেয়ে চলার রাস্তা ধরেই নয় তার ইঙ্গিত সে ইতিমধ্যে দিতে শুরু করেছে। শানিত ঝকঝকে, কখনও করুণ হৃদয়স্পর্শী, সংবেদনশীলতায় উষ্ণ আবার ভাবাবেগে কখনও গদ্গদ, বিশ্লেষণের খুঁটিনাটিতে প্রাঞ্জল এই সব লেখাগুলো এক ধূমকেতুর আবির্ভাবের ইঙ্গিত বয়ে আনে। আর সেদিন বাড়িতে পুলিশের আগমনে ভবনাথ হতভম্ব, স্বর্ণসুন্দরী অসম্ভব ক্রুদ্ধ, বুড়ির সিনেমা যাওয়া কেঁচে যাওয়ায় সেও অসম্ভব বিচলিত, কিন্তু সবচেয়ে অপমানিত বোধ করেছিল চোঙা—অচিন্ত্য চৌধুরী। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে পুলিশ কমিশনারকে। হতভম্ব ভবনাথ শোনে ফোনে চোঙার ধমকানি। প্রথমে ওদিক থেকে বিশেষ পাত্তা পায় না। কিন্তু ভবনাথ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র ওপরওয়ালার ভঙ্গীতে ধমকাতে পারে যা তিনি সারাজীবনে আয়ত্ত করতে পারেন নি। —আমি আপনার চেয়ে কম অ্যান্টি-কমিউনিস্ট না। বাট আই উইল্ বি দ্য ফার্স্ট ম্যান টু অপোজ হ্যারাসমেণ্ট অফ্ অর্ডিনারি সিটিজেন্স।

অবশ্য ডাল গলে না। অচিন্ত্য আর এক ধাপ নামে। আর এক ডেপুটি কমিশনারকে সিটিজেন্স সম্পর্কে পুলিশের কর্তব্য প্রসঙ্গে ছু লাইনের বক্তৃতা দেয়। বোধহয় অফিসারটিও একই

কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, সে সূত্রে আলাপও ছিল এবং সেই আলাপের ল্যাজ ধরে বলে,—বাট্ অমল, আই মিন্ বিজনেস, তুমি পুলিশ হটাও। ভবনাথ আঁচ করেন, পুলিশ অফিসারটি বোধহয় এত অন্তরঙ্গতার পরিচয় সত্ত্বেও আলাপনকারীর প্রাক্তন সাহচর্য সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ নয়, কারণ চোঙার দু-তিনবার তার নিজের নাম, তার কলেজের নাম পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন ঘটে। শেষে পরিয়ের ক্ষীণ যোগসূত্র আবিষ্কৃত হলেও ওদিক থেকে 'আই শ্যাল সী অ্যাবাউট ইট্' এই ধরনের যান্ত্রিক সান্ত্বনার কথা ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না।

স্বর্ণসুন্দরী শাড়ি পান্টে কাঁচাপাকা চুলগুলো হাত দিয়ে চেপে চেপে কানের দুপাশে পাতা কেটে ঘরের মধ্যে এসে বললেন,—আমি লালবাজার যাচ্ছি। এ কি মগের মুল্লুক নাকি?

—চুপ করো মা, চুপ করো। তোমার ছোট ছেলে যে কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে গত দু বছর ধরে তার খেয়াল রাখো? আমি তো চিরকাল মিডিওকার। কিন্তু তোমাদের যে জুয়েল, সে কী করছে তোমরা খোঁজ রাখো? আমি সব জানি। একেবারে বদ্ধ পাগলামি। সিলি অ্যাডভেঞ্চারিজম্।

—তুই কি বলছিস পুলিশ এসেছিল টুটুলের জন্যে?

—না না, আমি অতোখানি ওকে ক্রেডিট দিচ্ছি না। ও তো আসলে রাজনীতি কিছুই বোঝে না, আমি ওর মত সাপোর্ট করি না বটে, কিন্তু সব পার্টির খবর রাখি। সব ব্যাটা চোর।

স্বর্ণসুন্দরী এদিকে কান না দিয়ে বলে,—আমি যদি একবার গিয়ে পড়ি তবে দেখব ও কমিশনার ড্যাকরা কি বলে! ওর বাবা তো তপেন মিত্তির। মৈমনসিংহে ডি. এস. পি. ছিল। আমাদের বাড়ি দুবেলা পড়ে থাকত।

—ওসব আদ্দিকালের বাসি কথা ছেড়ে দাও মা।

তারপর নিজের মনে চোঙা গজরায়,—বেশ ছিলিস কবিতা লিখতিস। বই পড়তিস। তোর এই সব ডামাডোলের মধ্যে আসা কেন? আমি তো জানি, ওকে যারা নাচাচ্ছে তারা দুদিন পর কোথায় যাবে। আমাদের অফিসেও ওরকম লোক আছে। এককালে পুলিশের সঙ্গে লড়াই করেছিল, বিপ্লব করেছিল। এখন সুড় সুড় করে গর্তে ঢুকেছে।

—তুই তোদের কাগজে ঢুকিয়ে নে না টুটুলকে।

—বাঃ, তুমি এমন বলছো যেন আমি কাগজের মালিক! তারপর বেজারভাবে বলে,—দেখি অফিসের এক মক্কেলকে ফোন করে। এরকম হিউমিলিয়েশানে যে পড়তে হবে ভাবি নি।

—ত্যাখ, তোরা চেষ্টা না করলে আর কে করবে। বাবাদের যুগ তো শেষ হয়ে গেছে।

—সেটা আমার চেয়ে আর কেউ বেশী জানে না, চোঙা ফোন ধরতে ধরতে বলে। তার সবচেয়ে বড় খুঁটিকে সে এ ব্যাপারে বিরক্ত করতে চায় না। যে বড় পেট্রন তার কাছে ছুটকো আবদার মানে হয় না। তার সঙ্গে সম্পর্কটা টেনে নিয়ে যেতে হয় সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক সম্বন্ধের ভেক পরে। সেই ভেক একদিন ছাড়া যায় কেবল নিজের জন্যে। টুটুলের জন্যে, এই রকম যেচে খাল কেটে কুমির ডেকে আনার জন্যে, এ সম্পর্কে নষ্ট হতে দিতে সে নারাজ। দ্বিতীয় খুঁটিকে সে ফোন করে।

—রতনদা, তোমার সঙ্গে সেই শনিবারের পরে দেখা হয় নি। বাট আই মাস্ট সে ইউ সাউণ্ডেড সো ডিভাস্টেটিংলি সিওর। আমার ব্যাঙোর জন্যে কান্না পাচ্ছিল।

ভবনাথ কান খাড়া করে শোনেন ব্যাঙোর সঙ্গে তর্কে রতনদা কি রকম তুখোড় কথাবার্তা বলেছে। শেষ পর্যন্ত বোতল ছুঁড়েছিল ব্যাঙো।

—হি ওয়াজ ডিস্‌গাস্টিং, আই মাস্ট সে হি ওয়াজ ডিস্‌গাস্টিং।

এবার বেশ কিছুক্ষণ চোঙা শুনে যায়। তারপর হাসির কমা-সেমিকোলন ছিটোতে ছিটোতে বলে চলে,—না না, এটা কী বলছো? এটা কী বলছো রতনদা! রীণা কেন আমার দিকে ঝুঁকবে? সি হ্যাজ ফার বেটার ক্লায়েন্টস্। বালু সেন আছে, তরফদার আছে, দে আর অল্ ব্রাইট বয়েজ। তাই না?

চোঙা ফোনে গলাটা বেশ উঁচুনীচু করতে পারে। তার নবলব্ধ আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়তে থাকে গলার আওয়াজে।

—ও, একটা কথা বলতে বেমালুম ভুলে গেছি। যার জন্যে ফোন করছিলাম। আলিপুরে কোথায় কটা কমিউনিস্টদের বোমাপটকা চলেছে। ইউ নো দ্য ইউস্যুয়াল স্টাফ দ্যাট টেক্‌স দ্য নেম্ অব রেভোলিউশ্যান। ছোট ভাইটা ওদের সঙ্গে ভিড়ে গেছে। হি ইজ নট একস্যাক্টলি এ কমি। একটু আইডিয়ালিস্ট' টাইপ, বুকিশ, বোধহয় অ্যারেস্ট হয়েছে, ছাখো তো, অনিন্দ্য চৌধুরী। সোমকে বললাম, ব্যাটা গা করে না। তুমি রতনদা, খোঁজ নিয়ে একটু বল। আমি আছি।

ঠিক এই সময় ডাক্তার মুখার্জীর বাড়ি থেকে ফোন আসে। ডাক্তার মুখার্জী জানিয়েছেন টুটুল ওঁদের বাড়িতে আছে। দু-তিনদিন থাকবে। কোন ভাবনা নেই।

—আমি জানতাম। আমাদের বাড়ির ছেলে কখনও জেলে যাবে না। স্বর্ণসুন্দরী কেঁদে ফেললেন।

তিন

শীতকালে বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যদি হাওয়া চলতে থাকে তবে বড্ড বেকায়দা অবস্থা। আর অফিসের যে জীপখানা চোঙা হাঁকাচ্ছিল তার পাশে ঢাকনিগুলো না থাকায় বৃষ্টির ছাঁটে তার পা ভিজে যায়। আমহার্স্ট স্ট্রীট পার হতে না হতে বৃষ্টির তোড় কমে। জীপখানা একটা গলিতে ঢোকে। ছোট গলি, তার পাশে ময়রার দোকানে প্রকাণ্ড বারকোশে ছানা ছানছে দুটো লোক। বাসি ছানা আর জলে ভেজা ছাই-আবর্জনার গন্ধে বাতাস ভারি। বৃষ্টিতে ভেজা একটা মরা বেড়াল-ছানাকে আর একটু হলেই চেটকে দিয়েছিল চোঙা।

এ পাড়াটায় যতবার চোঙা এসেছে আর বাড়িগুলোর দিকে চোখ পড়েছে ততবার চোঙার একটা কথা না মনে এসে পারে নি। বাড়িগুলো পচে যাচ্ছে। বছরের পর বছর মেরামতের অভাবে চুনবালি খসিয়ে পাঁজরা বার করে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার সমস্ত মন বিদ্রোহ করেছে এই ধ্বসে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী ক্ষয়িষ্ণু বর্তমান ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে চেয়ে। বারে বারেই স্থির করেছে আর আসবে না অতিথি হয়ে এই দারিদ্র্যের জগতে। কিন্তু প্রবল শারীরিক আকর্ষণে ঘুরে ফিরে এসেছে। আজও চলেছে বৃষ্টির ছাঁটে ভিজতে ভিজতে।

বাড়িটার সামনে একটা গ্যাসপোস্ট যার বাতি বহুদিন নিভে গেছে। সেখানে বৃষ্টিতে ভেজা

কাকটা জীপের শব্দে আওয়াজ করতে করতে উড়ে যায়। বাড়ির সামনে রঙচটা সাইনবোর্ডে লেখা 'ইয়াং টিউট রিয়াল কলেজ'। কোন কোন দিন দেখা যায় সবুজ লুঙ্গি পরনে টাকপড়া একটা লোক তক্তাপোশে উপুড় হয়ে পরীক্ষার খাতা দেখছে।

অবশ্য এ দৃশ্যটা খুব বেশী চোখে পড়ে নি। কালেভদ্রে সন্ধেবেলায় এদিকে চোঙা পা মাড়িয়েছে। বেলাগড়ানো দুপুরের নির্জনতা তার বেশী পছন্দ। এ সময় অসময় হলেও অমলাকে একলা পাওয়া যায়। অন্যদিনের মতো পেছনের গলি দিয়ে চোঙা ঢোকে। ভেতরের উঠোনে ছড় করে থাকা বাসন বৃষ্টিতে ভিজছে। অমলার তিন বছরের ছোট ভাইটা বিছানার এক কোণে উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছে। জানালাগুলো বন্ধ থাকায় ঘরখানা আবছা অন্ধকার। খাটের নীচে ধামা থেকে সজনের খাড়াগুলো উঁকি মারছে, মেঝেতে চাকাভাঙা খেলার মোটরগাড়ি। এই অন্ধকারে সবুজশাড়িপরা মূর্তিটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। আলনা গোছাচ্ছিল অমলা। চোঙা পেছন থেকে এসে জাপটে ধরে।

—আস্তে, বুড়ু জেগে যাবে। কুচকুচে কালো লম্বাচওড়া মেয়েটা চোঙাকে সাবধান করে। তারপর চোঙার কাণ্ডে খিঁচিয়ে খিঁচিয়ে হাসে। হাসির আওয়াজ বেশ স্পষ্ট শোনা যায় পাশের ঘরে। অমলার মা পাশ ফিরে ঘুমের ভাণ করেন। চোঙা পাগলের মতো অমলার আগাপাস্তালা চুমু খেতে থাকে। এখনই যেন কেউ এসে যাবে, তার এ প্রক্রিয়াগুলোর বুঝি এখনই ছেদ পড়বে, এ রকম একটা উদ্বেগ তার ঠোঁটে হাতে আঙুলে।

—একটু বোসো, একটু বোসো, মা ঘুমুচ্ছে, একটু বোসো না। একেবারে ঘোড়ায় চেপে এসেছো।

—ঘোড়ায় না, জীপে।

—পান খাবে?

—পান? দাও।

অমলা অন্তত তিন-চার বছরের বড় হবে চোঙার চেয়ে। একটু খুঁটিয়ে দেখলেই দেখা যাবে তার শরীরের লাবণ্য অটুট থাকলেও মুখের পেশী চামড়া শক্ত হতে আরম্ভ করেছে। দুবেলা হাঁড়ি ঠেলা, মায়ের দুরারোগ্য রোগে ক্লান্তিকর শুশ্রূষা, ছোট দুটো ভাই সামলানো, ইস্কুল-মাষ্টার বাপের অজস্র ফাইফরমায়েস—এইসবের মাঝখানে থেকে তার আর কোন প্রত্যাশা নেই তার ছাব্বিশ বছরের জীবনে। চোঙার আগে এক দূর সম্পর্কের জামাইবাবু আসতেন এইরকম জলভরা দুপুরে। তার দু-তিন বছর আগে পাড়ার মাস্তান শিবে ঝুঁকেছিল তার দিকে। তার নিজের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু অমলার বাবা রাজী হন নি। তারপর এক বিপত্নীক উকিলের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব এসেছিল। বয়সটা বেশী হলেও লোকটার বাড়ি ছিল কলকাতায়। এরকম সংসার ঠেলতে ঠেলতে উপর্নিশ্বাস উঠবার সম্ভাবনা কম ছিল। কিন্তু এবারেও বাবা কেঁচে দিয়েছে। এখন উমাচরণের হাবে ভাবে এটা স্পষ্ট মেয়ের বিয়ে দিতে সে চায় না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের আয়েস-আরামের ইচ্ছাগুলো বাড়ছে যেগুলো স্ত্রীর মারফত চরিতার্থ করার সম্ভাবনা নেই। তাই মেয়েকে সে ছাড়তে চায় না।

পানে অনভ্যস্ত হলেও ছোট-এলাচ-দেওয়া মিঠেপানটা চিবোতে বেশ লাগে। পান চিবোতে চিবোতে চোঙা অনেকটা ধাতস্থ হয়। যে উদ্দাম শারীরিক আবেগ গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠে প্রায়

নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছিল তা এখন সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে গেছে। চোঙা সিগারেট ধরিয়ে আরামে টানতে থাকে।

—তুমি একটা বুলুর ব্যবস্থা করে দাও, অমলা হঠাৎ বলে ওঠে।

—বুলু? কেন? কী হল?

—বুলুর একটা চিঠি পেলাম। ফুড ডিপার্টমেন্টের সেই ছেঁদো চাকরিতে পড়ে আছে কবে থেকে। লিখেছে, জীবনে কিছুই করতে পারল না।

—তা আমি কী করব? চাপা অসন্তোষ চোঙার গলায় ফুটে ওঠে।

কেমন এক ভয়ের ছায়া নামে অমলার চোখে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে,—আমি তো পড়াশোনা কিছুই করতে পারলাম না।

আবার এক অসন্তোষের চাপ চোঙার বুকের উপর চেপে বসে। সব সময় এই কাণ্ড হবে, আগেও হয়েছে। কিছুতেই অমলাকে সে আলাদা করে নিতে পাচ্ছে না। অমলার দেহ, তার বুক পিঠ ঠোঁট হাত পা, তার সব কিছু এই ধ্বসেপড়া পচেযাওয়া বাড়ির সারি আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সঙ্গে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছে।

—তোমার হাতটা দাও অমু। দুঃখ কষ্ট তো সকলেরই আছে। বলে হাতটা টেনে নেয় চোঙা নিজের হাতের মধ্যে। সে যেন জোর করে তার পারিবারিক সমস্যা থেকে অমলাকে ছিনিয়ে নিতে চায়।

অমলা সত্যিই খানিকক্ষণের জন্যে তার ভাইয়ের কথা ভুলে যায়। বিহ্বল হয়ে সে চোঙার গা ঘেঁষে বসে থাকে। পাশের ঘরে অমলার মা গলা ঝাড়েন। চেপে বৃষ্টি নামে। বুড় খাটের ওপর জুতসইভাবে শোবার জন্যে দু-তিনবার টাল খায়। ধারেকাছেই বাজ পড়ে।

—পশ্চিম দিনাজপুর তো! একেবারে অজ পাড়াগাঁ। জল আর মেঘডাকার আওয়াজ ছাপিয়ে অমলার গলা ভেসে আসে।

—মন খারাপ লাগলে সিনেমা দেখবে। আজকাল গাঁয়ে গাঁয়ে সিনেমা।

—অতো ঘন ঘন সিনেমা দেখার পয়সা কই। সব কেটেকুটে তো একশো আশিটা টাকা! পাশের ঘর থেকে দীর্ঘশ্বাসের মতো অমলার মা বলেন। তারপর কারুর গলায় কোন আওয়াজ নেই। শুধু জলের একটানা শব্দ। রাস্তার গায়ের দেয়ালে ফাটা পাইপ থেকে ছরছির করে জল পড়ে।

—একটু চা করি। ঘরের কোণে তোলা উনুনটা নিয়ে খুটখাট করে অমলা। পাশের বাড়ির রেডিও থেকে গান বাজে, 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল করেছো দান।'

চাপা অসন্তোষের দমক গলা পর্যন্ত উঠে আসে চোঙার। চায়ের জল চাপিয়ে আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে অমলা আসে।

—কী স্যর! চুপ করে কেন? আঙুল দিয়ে চোঙার কোমরে খোঁচায় অমলা।

—তুমি বড্ড গেঁয়ো অমলা! ভীষণ গেঁয়ো! এই জন্যেই তোমাদের নিয়ে মুশকিল! চোঙার মুখ লাল হয়ে যায়।

—উঃ! কী আমার সাহেব রে!

—সাহেব নই, কিন্তু আমি গেঁয়ো নই তোমাদের মতো ! চোঙা গরম হয়ে বলে।

আসলে চোঙা হয়ত বলতে চায় অন্য কিছু, পশ্চিম দিনাজপুর প্রসঙ্গে সে বিরক্ত, সেই সব দাবী আদায় করার মুহূর্ত এটা নয়। এই রকম জলভরা তার দামী সময় নষ্ট করে সে এসেছে 'দু দণ্ড শান্তির' জন্যে অমলার কাছে। বাস্তবিক আধুনিক বাংলা কবিতা বিশেষ না পড়লেও জীবনানন্দ দাশের বহুলপরিচিত কবিতার লাইনটি তার মনের মধ্যে খেলে যায়। অমলার সান্নিধ্য তার ভাল লাগে। তার সান্নিধ্য অমলার ভাল লাগে। এর ওপর আবার কী থাকতে পারে ? এই ধরনের কিছু ভাবনা তার মনের মধ্যে ভিড় করেছিল। আর একবার মনে হচ্ছিল রতনদার সঙ্গে এই সময়টা কাটালে বোধহয় আখেরে লাভ হত। রতনদা তার সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসেন। কারণ চোঙার মতো গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে কোন বুদ্ধিমান তরুণ তাঁর কথা আগে শোনে নি দিনের পর দিন। প্রায় দিন পনেরো হল রতনদার সঙ্গে বসা হয় নি।

—আসলে বাবা খুব আশা করেছিলেন বুলুর সম্পর্কে। অমলা আবার পশ্চিম দিনাজপুর প্রসঙ্গটা নিয়ে আসে।

—সব বাপেরাই তাই করে, চোঙা বেজারভাবে বললে।

—ও পড়াশোনায় খুব ভাল ছিল কি না।

—তাই বুঝি !

—তোমার বুঝি বিশ্বাস হয় না আমাদের ? আমরা গরিব বলে বুঝি…

চোঙা বিরক্তিতে হাত দুটো তোলে। তার একটা চালু বাংলা নাটকের লাইনও মনে আসে, 'আমরা গরিব হতে পারি কিন্তু নীচ নই।'

চায়ের শেষ চুমুকটা দিয়ে বলে,—কেন বিগড়োচ্ছ। আমি একবার বলেছি এসব কথা? তারপর একটু থেমে বলে.—আর কে না গরিব বলো। আমরা সবাই গরিব। কোন না কোন ব্যাপারে আমরা সবাই গরিব। তাই না ?

চোঙা অর্থপূর্ণভাবে অমলার দিকে চায়। অমলা ঠিক বুঝতে না পেরে হাসে। তারপর হঠাৎ মাথা নীচু করে বলে,—তুমি আমাকে যতখানি বোকাহাবা ভাবো আমি ঠিক ততখানি নই।

অমলা যখন কথাটা বলে তখন তার সাদামাটা গেরস্ত মেয়ের মুখখানা কঠিন হয়ে ওঠে। তার যৌবনের স্বাচ্ছন্দ্যে এমন একখানা ভরাট ভাব আছে যা সহজেই চোঙাকে টানে কিন্তু রেগে গেলে তাকে বড্ড বেয়াড়া লাগে চোঙার। তার গ্রাম্যতা তাকে আরও পীড়া দেয়।

—কাল সন্ধেটা আমার আর ছুটি আছে। চলো একটা সিনেমা দেখে আসি।

অমলা হঠাৎ ফুঁসে ওঠে বলে,—তুমি আমাদের বাড়ি আসো কেন ?

—আমি তো তোমাদের বাড়ি আসি না, আমি তোমার কাছে আসি।

—হ্যাঁ, কেন আসো ?

—কারণ তোমাকে আমার ভাল লাগে। তোমার সাহচর্য…

এবার অমলার বড় বড় চোখগুলো জ্বলজ্বল করে। বলে,—আমরা ঘাসে মুখ দিয়ে হাঁটি না। তার মুখখানা লালচে দেখায়।

চোঙা বেজার মুখ করে বসে থাকে। বৃষ্টি ধরে আসছে। পাশের বাড়ির রেডিওতে পণ্ডিত রবিশঙ্কর মিয়া কি মল্লার বাজাতে সুরু করেন।

অমলা হঠাৎ রেগে গিয়েছিল। অনেক কড়া কড়া চোখা চোখা সত্যি কথাগুলো ফলা উঁচিয়ে বেরিয়ে আসছিল তার মুখ দিয়ে। তুমি তো আসছো আমার শরীটাকে চাটবার জন্যে, এইরকম অজস্র কুৎসিত কথা ছুটবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল জিভের ডগায়। কিন্তু হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে কাঁদতে সুরু করে। সে কি আর কিছু আশা করতে পারে না পুরুষ মানুষের কাছ থেকে এই খামচানো খাবলানো সান্নিধ্যটুকু ছাড়া?

চোঙা উঠে আসে অমলার কাছে। অমলা তাকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে তার কান্না সামলায়। সত্যিই অসম্ভবের পেছনে ছুটে কি লাভ? এমনি চাপাচাপি করলে চোঙা আসবে না। তাতে তার কি লাভটা হবে? উমাচরণ নতুন করে চেষ্টা করবে বিয়ে দেবার? পাড়ার ছেলেরা সবাই আজকাল সেয়ানা। এ বাড়িটা তারা এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানে যে একেবারে পাগল না হলে কেউ যেচে বিয়ে করবে না এ বাড়িতে। অনেক স্বপ্ন দেখেছে আগে, সিনেমার গল্পের মতো স্বপ্ন। কিন্তু এখন আর দেখে না। দেখে লাভ? জলে ভেজা চোখে অমলা তাকায় চোঙার দিকে। চোঙা সেই রোদনভরা মুখখানা দু'হাত দিয়ে সবলে টেনে তুলে চুম্বন করে।

—কাল টিকিট কাটছি। সাড়ে পাঁচটায় আসব।

—এসো।

চোঙা উঠে পড়ে। বাইরে বৃষ্টি ধরে গেছে। সামনে ভেজা হলদে বাড়িটায় বিকেলের রং ধরেছে। পার্কের কোনায় গোলোকচাঁপার গাছ জলে-ভেজা থোলো থোলো সাদা ফুলে ভরা। মৃদু গন্ধ আসে। গলিটায় জল জমেছে। নীচু গীয়ারে গাড়ি বার করে আনে চোঙা। বড় রাস্তার মুখেই উমাচরণ। হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে রবারের পাম্পশু পরে হন্ হন্ করে রাস্তার মোড়ের দিকে চলেছেন। জীপখানার দিকে চোখ পড়তেই উমাচরণ চেঁচাতে থাকেন,—চোঙা, চোঙা! চোঙা জীপখানা রাস্তার পাশে দাঁড় করায়।

—তোমার সঙ্গে আমার জরুরী কথা আছে। এসো।

প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোঙা নামে, লোকটা একেবারে গবেট, কিন্তু অমলার বাবা, হাতে রাখা দরকার।

—আপনাদের বাড়ি থেকেই তো আসছি।

—না না ওদিকে না, এদিকে এসো।

চোঙা অবাক হয়ে দেখল পাড়ার রেস্তোঁরাতে ঢুকলেন উমাচরণ।

—কী খাবে বল?

চোঙা বিরক্ত হয়ে বললে,—না না, আমি কিছু খাব না। এক কাপ চা খেয়েছি, আর এক কাপ খেতে পারি।

—সে কি! শুধু চা? এই বয়সে? একটা ডিমের ডেভিল খাও।...কালী, কালী!

হোটেলের বয় এলে বললেন,—চিকেন কারী হবে?

—হাফ প্লেট ?

—না, ফুল প্লেট।

উমাচরণ মাথা নীচু করে তাঁর হাড়বেরকরা আঙুলগুলো দিয়ে হাড় চিবোতে থাকেন। মাড়ির দুটো দাঁত না থাকায় চিবোনর চেয়ে চোষার কাজটাই ভাল চলে। কব্জি দিয়ে ঝোল গড়িয়ে পড়তে থাকে।

মাংস চুষতে চুষতে উমাচরণ বলেন,— ডাক্তার বলেছে প্রোটিন খেতে। ঝালে অথবা স্বাদের পরিতৃপ্তিতে নাক দিয়ে জল গড়িয়ে আসে উমাচরণের। হাতের পিঠ দিয়ে মুছতে মুছতে বলেন,— তারপর কিরকম বুঝছো ? দেশের অবস্থাটা ?

—আপনার কি জরুরী কথা ছিল বললেন না ?

—সবুর করো, সবুর করো। তোমাদেরই শুধু সময়ের দাম আছে, আমাদের নেই, না ? সকাল থেকে ছেলে ঠেঙাচ্ছি। সন্ধ্যেবেলায় বাড়িতে ফিরে আবার কোচিং ক্লাস। মেয়েটার আবার উড়ু উড়ু মন হয়েছে। কি যে করি ! আসলে তোমাকে বলি বাবা, কাকে আর বলব। মেয়েটা ঠিক ভাল নয়।

ভদ্রলোক আধময়লা রুমাল বার করে পরিতৃপ্তির সঙ্গে মুখ মুছতে থাকেন। আর চোঙার মনে হতে থাকে সে একগলা কাঁদার মধ্যে ক্রমশই ডুবে যাচ্ছে। সাধারণ বুদ্ধিতে তার মনে হয় এই পাড়ায় আর পা মাড়ানো উচিত নয়। কারণ এই অত্যন্ত নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবেশে বাস করা অধিবাসীগুলোর সঙ্গে রোদে জলে পচে যাওয়া চুন-সুরকি আর জংধরা কড়িবরগাগুলোয় কোন ফারাক নেই। আর যে-ই এখানে আসুক না কেন, যতই চেষ্টা করুক তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে, তাকে এই ক্লেদ ক্রমশ স্পর্শ করবে। এখনই উঠে পড়বে কিনা ভাবছিল। চেয়ে দেখলে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ছুঁচলো টাকপড়া চোয়ালভাঙা তামাটে মুখখানা কালো চশমার ফাঁক দিয়ে চোখ গোল করে তাকে দেখছে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে উমাচরণ বললেন,—ওসব কথা ছাড়ো। তোমরা হলে জার্নালিস্ট। কিরকম দেশের অবস্থা বলো। আসলে তোমরা যাই বলো, এভরিথিং ডিপেণ্ডস্ অন ইণ্ডিয়াস্ট্রিয়ালাইজেশান। আমাদের স্কুলের নরেন, ছোকরা তুখোড় ছেলে, থাকবে না এ লাইনে, সে বলছিল লণ্ডন টাইমসে লিখেছে·· উমাচরণ গড় গড় করে কয়েক লাইন ইংরেজী বলে যান।

এবার ক্লান্তিবোধ করে চোঙা, এই সুন্দর মেঘলা দুপুরের স্মৃতিটার জন্যে বড্ড দাম দিতে হচ্ছে বোধ হয়।

—অমলার একটা বিয়ে দিয়ে দিন না !

—কখন কি করব বলো ? আমার কি মরবার সময় আছে !

চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে হঠাৎ বললেন,—বাই দা বাই, কয়েকটা টাকা ধার দিতে পারো ? ইলেকট্রিক বিলটা দেওয়া হয়নি। কাল লাস্ট ডেট। সামনের উইকেই পেয়ে যাবে।

এতক্ষণ চোঙা খেয়াল করে নি। তার পাতলা ফিনফিনে হাউই হাফশার্টের বুকপকেট থেকে কয়েকখানা দশটাকা নোট উঁকি দিচ্ছে।

— গোটা কুড়ি দিলেই হবে। উমাচরণ হাতখানা বাড়িয়ে দেয়।

টাকাটা দিয়ে চোঙা উঠে পড়ে। কুড়ি টাকায় কেনা মেঘলা দুপুরটার স্মৃতি তাকে মুহূর্তের জন্যে পীড়া দেয়। সঙ্গে সঙ্গে চুম্বনের অপেক্ষায় উন্নীত অমলার মুখ, তার জলে ভেজা চোখের পাতা আর মরিয়ার মতো দুহাত দিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরা আলিঙ্গনের স্মৃতিও তার মনটা ভারী করে তোলে।

—বোস না, আর এক কাপ চা হোক। তোমাকে আমার আসল কথাটাই বলা হয় নি।

—কী? চোঙা ভয়ে ভয়ে তাকায় উমাচরণের দিকে।

— দুখানা টিকিট, সামনের সোমবার চ্যারিটি ম্যাচের জন্যে, মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল। ছোকরা নরেনটা ধরেছে, ওকেও দেখাতে হবে।

চোঙা ঘাড় নাড়িয়ে হাঁটা দিচ্ছিল। উমাচরণ পেছন থেকে ডাক দিয়ে বলে,—অমলার হাতে দিয়ে গেলেই হবে।

ইঞ্জিন স্টার্ট দেবার আগে আর একটা ডাকও চোঙার কানে আসে। রেডিয়োতে শিশুদের আসর। একটি কচি গলার ডাক আসে,

ওগো তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে,
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে,

চোঙা সোঁ করে বেরিয়ে যায়।

চার

—আমি বললুম উইলি ব্রাণ্ডকে, বার্লিনের মেয়র—তোমরা ইণ্ডিয়ার ব্যাপারটা ঠিক বোঝ না। ইণ্ডিয়াস্ট্রিয়াল ডেভালোপমেণ্ট ইজ এ মাস্ট, বাট ইটস্ কাল্‌চারাল হেরিটেজ ইজ এ মাস্ট টু। খুব মন দিয়ে শুনলে, বুঝেছো?

সেই বাদলা দুপুরের মাস দুয়েক পর আর এক ভ্যাপসা গরমের অপরাহ্নে রতন সরকার বোঝাচ্ছিলেন চোঙাকে। অবশ্য ভ্যাপসা গরম টের পাওয়া যাচ্ছিল না। ঘরটা এয়ারকণ্ডিশাণ্ড। চোঙা ফ্রিজশীতল লেমন স্কোয়াশে চুমুক দিচ্ছিল। তিন সপ্তাহ পশ্চিম জার্মানী ফেরতা রতন সরকারের ড্রইংরুমে যে কটি জার্মান দ্রব্য হাজির হয়েছে তার প্রত্যেকটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে চোঙা। টেপ রেকর্ডার, টাইপরাইটার, ক্যামেরা, লেডিজ ছাতা, ছোট ছেলের জন্যে খেলার জোরাল এরোপ্লেন, মায় একটা ওভারকোট, বর্ষাতি কিছুই বাদ দেন নি।

—বুঝলে, গ্র্যাণ্ড দেশ! গ্র্যাণ্ড! চোখ বুঁজে বললেন রতন সরকার।

—বৌদির ছাতাটা ভাল হয়েছে, চোঙা হেসে বললে। হাসলে তার সরু মুখে পাতলা গোঁফের নীচে দাঁতগুলো ঝলকায়। ঘিয়ে তসরের প্যাণ্টের ওপর লালনীল ডোরাকাটা হাউইয়ান শার্টে চোঙা ঝলমল করে।

সেই তারুণ্যের প্রতিমূর্তির দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে রতন সরকার বললেন,—ভুল করলে অচিন্ত্য। বৌদির ছাতা গত বছর টোকিও থেকে এনেছি। এটা মেয়ের বায়নার জন্যে আনতে হয়েছে।

—ওদের রিকনষ্ট্রাক্‌শান কেমন দেখলেন ?

—একসেলেণ্ট। মনেই হয় না দেশের ওপর দিয়ে এত বড় ঝড় বয়ে গেছে। আর কি কাজ করতে জানে মশাই! আমরা ওদের ফ্যাক্টরি দেখতে গিয়েছি। লোকগুলো পুতুলের মতো কাজ করে যাচ্ছে। একবারও ফিরেই তাকালো না। গ্রেট! গ্রেট!

উৎসাহের আতিশয্যই রতন সরকারের চরিত্রের প্রধান আকর্ষণ, যদিও চোঙাকে বিশেষ অভিভূত দেখায় না উৎসাহের এই অভিব্যক্তিতে। ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী পাজামা, রিমলেস্ চশমা এবং অসম্ভব বাজখাঁই গলা—এই তিনের সমন্বয়ে একই সঙ্গে একাউন্টস্ সার্কুলেশান বিভাগের সর্বময় কর্তা। চোঙার মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে রতন সরকারের সমস্ত ব্যাপারে উৎসাহ আসলে একটা পোজ, হয়তো ভেতরে লোকটা ক্লান্ত, সিঁটিয়ে আছে। কিন্তু কাগজের জগতে একরকম টগবগে সবজান্তা ব্যক্তিত্ব না হলে চলে না। অন্য কাগজেও ওপরের মহলে একই অবস্থা। কোন বিষয় সম্পর্কে বেশ খানিকটা উপলব্ধি বা কৌতুহল থাকা বোধহয় অপ্রয়োজনীয়। ঐ ধরনের ব্যক্তিত্বও সে অফিসের আনাচে কানাচে দেখেছে। চোঙার ধারণা রতন সরকারের মতো তারা কখনো 'টপে' উঠতে পারবে না। টপে উঠতে গেলে বেশ হাল্কা ডানায় ওড়া দরকার।

—তোমার তো ইয়োরোপটা দেখা হয়নি ?

—কোথায় আর হল ? আপনারা কেউ দেখাচ্ছেন না, হাল্কা হেসে চোঙা বলে।

—আরে এই তো স্বরু করলে। পরে দেখবে একেবারে ঘেঁতরে যাবে, আজ আমেরিকা কাল রাশিয়া। আমি তোমার বউদিকে বলি, আর এ ছোটাছুটি সয় না। তার ওপর যেরকম প্লেন ক্র্যাশ হচ্ছে। বাইরে যাবার কথা শুনলেই বউদির মন খারাপ।

—আপনি আবার বম্বে গেছিলেন ?

—ঐ ভোজরাজ বললে, দ্য গ্রেট মারাঠী রাইটার, যেতে হল। আরে ভোজরাজের বইতে রাজকাপুর নেমেছে। এই যে কয়েকদিন আগে সিনেমার সামনে লাঠিচার্জ হল। ও তো ভোজরাজের নাটক। মারাঠীরা, আই মাস্ট সে, গ্রেট পিপ্‌ল। ওদের লিটারেচার, কালচার…

রতন সরকার উৎসাহের আর একটা বোতল খুলে ছিটিয়ে দিলেন মারাঠী সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য।—বাট আই মাস্ট সে, ওদের এক মিনিস্টার চোর। গভমেণ্টের টাকায় একটা রাজপ্রাসাদ তুলেছে ম্যারিন ড্রাইভে। আমার কাছে সব ডকুমেণ্ট আছে। তাছাড়া, গলা খাটো করে বললেন,— হি কিপস উইমেন।

—আপনি কিসের জন্য গিয়েছিলেন বম্বেতে ?

—ও সেইটাই বলা হয়নি। আমাদের বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন হোল না ওখানে ? এদিকে তো কোন কাগজেই কিছু বেরোয় নি। ওদিকে সব বড় বড় কাগজে আমার বক্তৃতা ছেপেছে। ভাইস প্রেসিডেণ্ট ছিলাম তো।

সাহিত্য সম্পর্কে চোঙার বিশেষ উৎসাহ নেই, তবে রতন সরকার বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে কি বক্তৃতা করলেন সে সম্পর্কে কৌতুহল জাগে।

—কী বললেন ?

—আমি বললাম, কিস্সু হচ্ছে না। ওসব সাহিত্য-টাহিত্য কিস্সু হচ্ছে না। আমাদের লেখকদের গ্রামে যেতে হবে।

—তাই বললেন ?

—তাছাড়া কী ? তোমাদের রবিবাবুও গ্রামে পড়েছিলেন। শরৎবাবু তো গাঁয়েই মানুষ। আর বঙ্কিম সারাজীবন জেলায় জেলায় কাটান। আমি সমস্ত সোসিও-ইকনমিক কারণ দেখালাম এই ডেকাডেন্সের।

—আপনি যে কমিউনিস্টদের মতো বলছেন, মৃদু ঠাট্টায় চোঙা বলে।

—ওয়েল্, আই কাণ্ট হেল্প ইট, ফিনফিনে পাঞ্জাবী পরা ঘাড়টা বিলিতি কায়দায় ঝুম্‌ড়ান।

এবার স্টেট এক্সপ্রেস্ সিগারেটের টিনটা চোঙার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে নিজে একটা ধরান।

—ত্থাখো, ওদের মধ্যে বুদ্ধিশুদ্ধি ভালই রয়েছে। ওরা যদি বিদেশের দিকে না তাকিয়ে থাকত ! …এসব তুমি তো অনেক পড়াশোনা করেছো। তোমাকে আর কি বলব ? আচ্ছা, তুমি বলেছিলে না তোমার এক ভাইয়ের কথা…কি মাথায় ক্যাড়া নেচেছিল, জেলের তালা ভাঙতে হবে…সে সব মিটেছে ? ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছে ? রতন সরকার পাটভাঙা পাজামা পরা পাখানা নাচাতে থাকেন।

চোঙাকে চিন্তিত দেখায় মুহূর্তের জন্যে। আস্তে আস্তে বলে, আপনি যেরকম বলছেন সেরকম হলে ভালই হোত। তবে ঠিক অতো সোজা নয় রতনদা।

— ত্থাখো অচিন্ত্য, কুড়িতে কমিউনিস্ট আর তিরিশে অ্যান্টি-কমিউনিস্ট, এ যদি কেউ না হয় আমি বলব সে ছোকরা গেঁজে গেছে।

—আপনার কথা সত্যি তাহলে খুবই ভাল হয় রতনদা। কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হয় আমার ভাইয়ের ক্ষেত্রে ওটা হবে না। তাছাড়া ও আবার ইন্টেলেকচ্যুয়াল ! আমি ওকে বুঝি না।

—ও বাবা ! সে কি গো ! রতনদা সশব্দে হেসে ওঠেন। ঐ সব যারা দাড়ি রাখে, পাইপ খায়, আর চুলে তেল না দিয়ে সর্বক্ষণ রেভোলিউশ্যানের কথা বলে বেড়ায় ?

—সেরকম হলেও বেঁচে যেতাম। আশ্চর্য রতনদা, এই বছর খানেক বছর দুয়েকের মধ্যে ও একেবারে পাল্টে গেল। আমাকে আজকাল বিশ্বাস করে না। খোলাখুলি কথাই বলতে চায় না।

—আই সি, আই সি, তুমি বুর্জোয়াদের দালাল ! রতন সরকার সশব্দে হাসিতে ফেটে পড়েন।

—হয়তো তাই ! কিন্তু না হয়েই বা কি করতাম। জেলের তালা ভাঙতে যেতাম ! চোঙা নিজেকেই উদ্দেশ করে যেন কথাগুলো বললে।

—একজ্যাক্টলি, একজ্যাক্টলি !

হঠাৎ ইংরেজি শব্দটিতে খাঁটি বাংলা 'জ'-এর ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে মুখ তোলে চোঙা। এত দেশবিদেশ ঘুরছে লোকটা, হরদম ইংরেজি বলছে, অথচ ইংরেজি সাধারণ উচ্চারণগুলো শুদ্ধ করে বলবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না ভদ্রলোক। ভেবে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

রতনদা চোখ বন্ধ করে কয়েকবার সিগারেট টেনে আবার দম ফিরে পান।—ত্থাটস্ দ্য পয়েণ্ট। আরে বাবা, দেশ স্বাধীন হয়েছে। সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে দেশের নেতাগুলো উঠে পড়ে

লেগেছে। তার মাঝখানে খ্যাপার মতো বিপ্লব বিপ্লব করে চিল্লাচিল্লি লাগালেই হল। আরে একটু চান্স দে! তোদের রাশিয়াতে কদিন লাগল বল্।

হঠাৎ উঠে গিয়ে দেরাজের ডালা খোলেন রতনদা। কলমের একটা বাহারে বাক্স বার করে চোঙার হাতে দিয়ে বললেন,—এই পেলিকেনটা তোমার জন্যে এনেছি।

চোখদুটো খুশিতে জলজল করে উঠলেও চোঙা বলে,—এসবের কি দরকার ছিল রতনদা।

—আরে তোমরা হলে রাইটার। তোমাদের পেন ইজ মাইটিয়ার দ্যান দ্য সোর্ড। তোমরা ভাল কলম না ব্যবহার করলে কারা করবে!

তারপর নীচু স্নেহজড়ানো গলায় বললেন,—তোমার লেখাটা তাহলে সামনের উইকে দিয়ে দিচ্ছো।

—আমি ঠিক পরশু দিন দিয়ে যাব।

কিছুদিন পরেই বোম্বাইয়ের এক বিখ্যাত সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকায় চোঙার লেখা 'জার্মানি অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া' রতন সরকারের নামে বেরোল। লেখাটার ওপরে খুব চিন্তাশীল পোজে লেখকের ছবি।

পাঁচ

—গুরু, তুই নাকি আজকাল ভার্নাকুলার কাগজে একটা কেউকেটা? আমি বাংলা কাগজ পড়ি না। বাট রীন্ কিপস মি ইনফর্মড। শী ইজ ফ্রাইটফুলি বেঙ্গলী!

রীন্ মানে রীনা—স্বরূপের ছোট বোন। চোঙার পাশের চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর তার হাল্কা গোলাপী রং করা ছুঁচলো নখ দিয়ে অন্যমনস্কভাবে দাঁগ কাটছিল। এবার দাদার দিকে তার সুন্দর চোখদুটো তুলে বললে—বাঃ, আমরা বাঙালী না?

কালোর মধ্যে এমন দীঘল সতেজ সৌন্দর্য বাস্তবিক চোখে পড়ার মতো। তার চেহারা বেশবাস দেখে এক নজরেই বোঝা যায় সে যেমন জ্যাবড়া সৌন্দর্যে অবিশ্বাসী তেমনি আবার স্বাভাবিক সৌন্দর্য বিকাশের অস্বাভাবিক চেষ্টায় কৃত্রিম নয়। কালোপেড়ে সাদা টাঙ্গাইলের সঙ্গে কালো সাটিনের ব্লাউজ, ফাঁপানো একরাশ চুল কানের পাশ দিয়ে তুলে খোঁপা বাঁধা, কানে দুটো মুক্তো, আর কোথাও গয়না নেই। তার চেহারার সবচেয়ে বড় গুণ তার মুখের গভীর সারল্য, প্রায় শিশুর মতো সজীব আলোয়ভরা চাহনি।

—জাস্ট এ পট বয়লার, স্বরূপ। সিরিয়াসলি বলছি, তোর অফিসে একটা চাকরি দে!

—সে কি! তুই একটা রাজনৈতিক সংবাদদাতা অফ অ্যান এ ক্লাস পেপার। তুই আমাদের মতো বাল্ব বিক্রি করবি?

সামনের ট্রে থেকে প্যাস্ট্রি তুলে নিয়ে চোঙা বললে,—বাবা, বড় সাহেব হয়ে আছো। সেল্স ম্যানেজার অফ এ কম্পানি নোন্ থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড। ওসব সীরিয়াস কথা ছাড়। নীলুর খবর কি?

—নীলু তো আমেরিকায়।

—বুলা, ওর ভাই? তোকে যে বরাবর টেনিসে হারাত?

—শাট আপ, বুলা কোন দিন আমার সঙ্গে এঁটে ওঠেনি। তবে ওর ব্যাক হ্যাণ্ড রিয়েলি

মার্ভেলাস্। ও যদি লেগে থাকতো তবে ইণ্ডিয়ার আর একটা রুস্থান্ হয়ে বেরোত।

বুলার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে একটু গলা বোধহয় চোঙার কেঁপেছিল। রীনা কফির পেয়ালা থেকে একবার তার দিকে চায়। স্বরূপ বললে,—রিন্, ইউ ডোণ্ট গেট হিজ্ লেটার্স?

—না!

স্বরূপ উদাসভাবে বললে,—লা মার্টিনেয়ারে সব চেয়ে ব্রাইট বয় ছিল আমাদের মধ্যে। হি টুক টু বটলস। ঐ যে সেই রাজকুমারটা, তুমি তো দেখেছো চোঙা, আর ওর বোন, ওরাই শেষ করলে। ছাট ওল্ড স্টোরি অফ্ হেলেন।

—কি যে বলো দাদা! আপত্তি করলে রীনা।

—তুমি তো সব জানো। চোঙা জানে না তাই বলছি। আমি ব্যাপারটা সব ক্লীয়ার করে দিচ্ছি। বুলা ফেল ইন্ লাভ উইথ রিন্। কিন্তু রিন্ আবার···হুস্···গলা ঝাড়ল স্বরূপ। তার বোনের ঠিক উল্টো সে। টুকটুকে ফর্সা, ইতিমধ্যেই টাক পড়তে শুরু করেছে। চড়া কমলা লেবু রঙের হাউইয়ান শার্ট আর লাল মুশলো বের করা হাসিতে তাকে চোঙার সহপাঠী বলে মনে হয় না। বছর খানেক হল ভুঁড়িও বেশ জানান দিচ্ছে।

—বুলা নেভার ইম্প্রেস্‌ড মি। হি ওয়াজ সো লাউড। রীনা বললে।

—না না, এটা তুমি অন্যায় করছো। সে একটা নামজাদা খেলোয়াড়, ব্রাইট ছেলে। আই হেট দোজ বেঙ্গলী বাস্টার্ডস্—ঐ সব মিনমিনে থটফুল টাইপ। ওগুলো শেষ পর্যন্ত কেরানী হয়ে কলম পেষে, আর রাস্তায় গিয়ে লাল ঝাণ্ডা তোলে। রিন্, আমি তোমাকে আগে বলি নি। তুমি ওর প্রতি কোল্ড হয়ে গেলে বলেই ওর শেষ পর্যন্ত এই দশা হল। তোমরা মেয়েরা বাবা সত্যি! ফ্রেইল্টি দাই নেম্ ইজ উওম্যান্।

—ওটা একদম বাজে কথা দাদা, তুমি নিজেই জানো। টুনিদি না থাকলে তুমি কোথায় যেতে।

—এই তো, মেয়েরা বড্ড পার্সোনাল কথা বলতে ভালবাসে। তুমি হলে ফ্রান্সফেরতা বাঙালী মহিলা শিল্পী, তুমিও এইসব পার্সোনাল কথা বলছো!'

—ফ্রান্স থেকে ফিরে তো পুরুষ বনে যাই নি। চাপা হাসি খেলে রীনার ঠোঁটে।

এতক্ষণ চুপচাপ চোঙা ভাইবোনের কথাবার্তা শুনছিল। এ জগতে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, শুধু সামাজিক নয়, এখানে মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের ভাব আছে। বিশেষ করে অমলার পরিবেশের সম্পূর্ণ বিপরীত বিদেশফেরতা মহিলা আর্টিস্ট রীনা গাঙ্গুলীর জগৎ। কিন্তু সেই কারণেই বোধহয় কিছুটা অস্বাচ্ছন্দ্যও বোধ করে চোঙা। স্বরূপ তার কলেজের সহপাঠী। পড়ন্ত সলিসিটার বংশের ছেলে। কিন্তু পড়তে পড়তেও ছাত্রাবস্থায় শুনেছিল কলকাতার সম্ভ্রান্ত এলাকায় খান তিনেক বাড়ি তাদের আটকে আছে। তারা দুই ভাই বোন। অনায়াসে রীনাকে সম্পত্তির অন্যতম উত্তরাধিকারিণী ভাবা যেতে পারে। তাছাড়া সম্প্রত্তির ব্যাপারে যদি খ্যাঁচও থাকে, শরিকের গণ্ডগোলে তবু হার্ট স্পেশালিস্ট স্বরূপের বাপ তো এখন একটা গোল্ডমাইন। স্বরূপের বাবা নীরেন গাঙ্গুলি গত আট-দশ বছরে প্রবল পশার গড়ে তুলেছেন। তাঁর চৌরঙ্গীর চেম্বারে মারোয়াড়ি মক্কেলদের গাড়ির হরদম আনাগোনা।

আগে দুচার বার গিয়েছে বটে স্বরূপের বাড়ি, কিন্তু তার বোনের সঙ্গে সামান্য মুখচেনা ছাড়া

পরিচয় এগোয় নি। সম্প্রতি রীনা ফ্রান্স থেকে ফিরে তার প্রথম একজিবিশান করেছে। কলা-সমালোচকরা কেউ কেউ খুব উচ্ছ্বাস করেছেন, কেউ কেউ পাত্তা দেন নি। তারপর চোঙার উৎসাহ দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে 'ফ্লুরি'তে স্বরূপের এই ব্যবস্থা। তার বোনের খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের একটু দুর্ভাবনাও বেড়েছে। রীনা ব্যাপারটা বড্ড সিরিয়াসলি নিচ্ছে বলেই স্বরূপের দুর্ভাবনা।

রীনাই হঠাৎ মুখ তুলে বললে,—কী? আপনি যে একদম চুপচাপ।

—কি বলব! একেবারে আনকালচার্ড লোক। আর্টফার্ট কিচ্ছু বুঝি না।

—আর্টের গল্প করতে আমারও ভাল লাগে না, জানেন? স্টুডিওতে যতক্ষণ থাকি তখন ওসব নিয়ে খালি ভাবি। বেরিয়ে এসে একদম ভুলে যাই। ফ্রান্সে আমার এক সঙ্গী জুটেছিল পার্স বলে। রঙে দারুণ হাত। লোকটা বুড়ো, একখানা ক্যানভাসও বিক্রি হয় না। আমরা দুজনে হাঁটতাম, খালি হাঁটতাম। এত ভাল লাগত।

চোঙার দিকে চেয়ে চেয়ে যখন রীনা কথাগুলো বলে তখন এক ঠাণ্ডা দীপ্তিতে তার চোখ দুটো ভরে থাকে। মেয়েটি কি তার সম্পর্কে যথেষ্ট উৎসুক? এটা কি এমন পরিস্থিতি যাতে আরও এগোন যেতে পারে? এই যে সব হাতের পাঁচ প্রশ্ন কোন মহিলার সঙ্গে আলাপ হলেই যা জেগে উঠত তা এখন চাপা পড়ে।

—কলকাতায় কোথায় হাঁটবেন? একেবারে কিলবিল করছে মানুষ পোকার মতো। তার ওপর ভিখিরি, কাটা ফুটপাত, ময়লা। ওসব ফ্রান্সেই চলে।

—আমি কিন্তু এখানে এসেও হাঁটছি। এই ধরুন, বিকেল-বিকেলে যখন রোদ থাকে না। অফিসগুলো ছুটি হবার ঠিক আগে।

যদিও হাই পাচ্ছিল এই সব ছেলেমানুষি কথা শুনে, তবু উৎসাহ দেখিয়ে চোঙা বললে, —আমাকেও নিন না আপনার সঙ্গে। একটু ভুঁড়ি হচ্ছে না হেঁটে হেঁটে।

খুব হাল্কা কুঁচকানি মেয়েটার ভুরুতে জাগে। মৃদু হেসে বলে,—আপনার আর্টে উৎসাহ নেই। আমি পলিটিক্স একদম বুঝি না। আমার বাবা পলিটিক্সে খুব ইণ্টারেস্টেড। দাদার সঙ্গে তর্ক করেন। দাদা তর্কের খাতিরে সব রকম সাজতে পারে।

স্বরূপ বললে,—পারব না কেন? আমি সব সময় বলি, জিভে কোন হাড় নেই। একটু এদিকে ঘোরালে কমিউনিস্ট, একটু ওদিকে ঘোরালে ক্যাপিট্যালিস্ট। তাই না ব্রাদার? স্বরূপ তার জলজলে টাকটা নাড়ায় চোঙার দিকে।

মনে মনে চোঙার কথাটা পছন্দ। স্বরূপের সঙ্গে একমত। কিন্তু বিশেষ রাজনৈতিক সংবাদদাতা সে, আর পাঁচ-ছ বছর পর রাজধানীর ইন্দ্রদের সঙ্গে রাজনৈতিক খেলায় সেও প্রকারান্তরে যোগ দিয়েছে—এরকম একটা স্বপ্ন যখন খেলছে মনের ভেতর তখন ব্যাপারটাকে এত খেলো করে দিতে তার মন ওঠে না। রাজনীতিকে যারা সহজে সরল চেহারায় চিহ্নিত করতে চায় চোঙা তাদের শত্রু বলে ভাবে। রাজনীতির চেহারা যত ঘোরাল পেঁচালো দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্মের মতো বা মহাভারতের ধর্মের মতো সূক্ষ্মবস্তু হিসেবে চিত্রিত করা যায় ততই তার পক্ষে মঙ্গল।

মুখ গম্ভীর করে বলে,—যতখানি সোজা ভাবছো ব্রাদার ততখানি নয়।

—নাউ য়্য এক্সপার্ট স্পিক্স্। স্বরূপ বললে।

—ঠাট্টা করছো কর। কিন্তু রাজনীতি একটা চেঞ্জিং প্রোসেস। শুধু সাদাকালোতে ভাগ করা যায় না। যেমন ধরো কমিউনিস্টরা বলে, দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ডিভাইডেড ইনটু টু ক্যাম্পস্। ওয়াল স্ট্রীটও তাই বলে। কিন্তু রিয়ালিটি—টা আরও কমপ্লেক্স। যেখানে ক্যাম্প উইদিন ক্যাম্প।

—ব্রাভো! তুই খুব শেপ করবি রে!

রীনা বললে, পার্স মার্কিদের দলে ছিল। অ্যান্টিফ্যাসিস্ট লড়াই করেছিল। আর্টের ব্যাপারেও ভীষণ সীরিয়াস। কোনো কম্প্রমাইজ করেনি।

—ফ্রান্স আর ভারতবর্ষ এক জিনিস না। অসহিষ্ণু হয়ে চোঙা বলে।

—আমিও রিনকে তাই বলি, স্বরূপ বললে।

—পৃথিবীটা সব জায়গায় একই রকম। কোথাও ঠাণ্ডা, কোথাও বা গরম।

—মোটেই নয়, মোটেই নয়, কোথাও অ্যাডভান্সড কোথাও ব্যাকওয়ার্ড।

—দ্যাটস্ রাইট! চোঙার কথায় উৎসাহের সঙ্গে সায় দেয় স্বরূপ।

—আমি তো বললাম আমি পলিটিক্স বুঝি না, রীনা বললে।

—সত্যিই বোঝেন না, যেমন আমি আর্ট একদম বুঝি না।

রীনা ঘাড় নাড়িয়ে বললে, কিন্তু আমি এটুকু বুঝি সমস্ত দেশের মানুষ আসলে একরকম, শান্তিতে নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে চায়। পার্স একটা কবিতার লাইন প্রায়ই আওড়াত যার মানে হল—সীমানায় সীমানায় বিরোধ কিন্তু আকাশটা এক।

স্বরূপ অপ্রস্তুত হাসি হাসে। চোঙা আর রীনার দেখাসাক্ষাৎটা যে তার বোনের একগুঁয়েমির জন্যে মাঠে মারা যেতে বসেছে তা স্পষ্ট টের পায়। তার বোন সম্পর্কে সে মাঝে মাঝে নিজেকেই দোষী করে। ছেলেবেলায় খাতায় দেয়ালে যেখানে সেখানে রীনা যখন তার অঙ্কনবিদ্যার পারদর্শিতা প্রমাণ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল তখন থেকেই স্বরূপ তাকে ও ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে। আর স্কুলের প্রথম কয়েক বছরও ব্যাপারটাতে খেলা খেলা ভাব ছিল। কিন্তু স্বরূপের সন্দেহ শুধু বুড়ো পার্স নয়, কিছু ছোকরা বাঙালী শিল্পীর সাহচর্য তার মাথাটা খেয়েছে, ফ্রান্স থেকে ফেরার পর রীনা প্রায় একটা পারিবারিক সমস্যা। ঠিক এই কারণেই তাদের পারিবারিক স্ট্যাণ্ডার্ডে না পড়লেও চোঙার সঙ্গে তার বোনকে ভিড়াতে চায় স্বরূপ। আরও কয়েক জায়গায় খোঁজ নিয়ে সে জেনেছে চোঙা উঠছে, তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়, কাজেই তারা ঠিক একই রকম বাড়ি থেকে না এলেও ঝুঁকি নেওয়া যেতে পারে। আজ সন্ধ্যার এই সাক্ষাৎকারে মনে মনে চোঙাকে স্বরূপ যত তারিফ করে তত বিগড়ে যায় তার বোনের ওপর।

এতক্ষণে কিন্তু চোঙা তার নিজের বিষয়বস্তু খুঁজে পেয়েছে। মেয়েটি ভাল কিন্তু অপরিণত-মস্তিষ্ক—এইরকম এক চিন্তা মনে খেলে যাওয়ায় সে আনন্দ পায়। আস্তে আস্তে হেসে বলে,—আপনার বন্ধু হয়ত একজন মস্ত শিল্পী, কিন্তু তিনি রাজনীতি কিছু বোঝেন না।

রীনা জেদী ঘাড়খানা তুলে বলে,—পার্স একজন মস্ত মানুষ।

চোঙা হেসে বলে,—মনুষ্যত্ব নিয়ে তো কোন প্রশ্ন নয়। আপনাদের সাহিত্যে শিল্পে বলে না,

মনুষ্যত্ব শয়তানেরও আছে? ওসব কথা আনলেই দেখবেন শেষ পর্যন্ত কোন আলোচনা করা যায় না, শুধু ভাবাবেগে ভেসে যেতে হয়।

চোঙার চিন্তাশক্তি সম্পর্কে তার বন্ধুর এতদিন খুব একটা উঁচু ধারণা ছিল না। বস্তুত বড় ঘরের ছেলে এবং বিলেতফেরতা এই দুটো প্রাথমিক শর্ত কারও ক্ষেত্রে পালিত না হলে তার চিন্তাশক্তি সম্পর্কে তার কোন উৎসাহ জাগে না। কিন্তু চোঙার কথায় সে একটু অবাকই হয়। চোঙা এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং স্বরূপের বিষয়ী বুদ্ধি এটুকু আবিষ্কার করে যে এই গভীর আত্মবিশ্বাস যে কোন বিজনেস ফার্মের পক্ষে তা খবরের কাগজ সিমেণ্ট অথবা ইলেকট্রিক বাল্‌বের ফার্মে হোক,এক অত্যাবশ্যক মূলধন যদি এই ধরনের ব্যক্তিত্ব এবং এস্টাব্লিশমেণ্টের মাঝখানে খাঁচ না থাকে।

রীনা কিছু বলে না। কিন্তু সে এমন মাথা নীচু করে তার কেয়ারিকরা নখগুলো নিরীক্ষণ করতে থাকে যে স্পষ্টতই চোঙার বিশ্লেষণশক্তি তারিফ করে না বোঝা যায়।

—আমার ছোট ভাইটাও কমিউনিস্ট, জানেন?

—রীনা চোখ তুলে তাকায়।

—হ্যাঁ! আমি মাকে বলি, ধরে নাও না ও পাগল হয়ে গেছে। ভাল পড়ুয়া ছেলে, কবিতা লিখত, চলল জেলের তালা ভাঙতে।

—তাই নাকি? রীনা কৌতূহলী হয়ে তাকায়।

—গত একবছর কলকাতা শহরে কত মারপিটদাঙ্গা হচ্ছে—সবগুলোর মধ্যে আছে সে। একবার হাজত বাসও করে এল। ভেবে দেখুন, আমাদের বাড়িতে, বাবা হোম ডিপার্টমেণ্টের···ভেবে দেখুন। কিন্তু যেটা সবচেয়ে ফ্যানটাষ্টিক সেটা জানেন, আমার ভাইও ঐ আপনার ফরাসী বন্ধু পার্স না মার্স তার মতো কথা বলে। অদ্ভুত সব কবিতার কথা, শুনতে ভাল লাগে। কিন্তু ওদের কমরেডরা কেউ পুছবে না ওসব কথা!

রীনা চেয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে চোঙার দিকে, আবার মৃদু কৌতূহলের দীপ্তি তার চোখে খেলে।

চোঙা সিগারেট ধরায়। বুদ্ধিতৃপ্ত মুখখানা ঝলমল করে তার। এবার শ্রোতাদের দিকে একবার দেখে নিয়ে বলতে থাকে,—রাজনীতির একটা নির্দিষ্ট লজিক আছে। কমিউনিস্টরা সেটা মানে, অ্যাণ্টিকমিউনিস্টরাও মানে—যারা রাজনীতি করে তাদের কথা বলছি। তারা দুজনেই দুজনকে ধ্বংস করতে চায়। মাঝখানে থাকে এক ধরনের লোক—আপনার বন্ধু, আমার ভাই—তারা নিজেদের টার্মসে রাজনীতি দেখে, শেষ পর্যন্ত তাই মরে।

এ বিশ্লেষণ স্বরূপেরও মনঃপূত হয়। সে ভেতরে ভেতরে কৃতজ্ঞতাবোধ করে তার বন্ধুর প্রতি। এ ধরনের কথাবার্তায় হয়ত রীনা তার মেজাজের স্বাভাবিক কক্ষপথ আবার ফিরে পেতে পারে এমন বিশ্বাসও জাগে।

রীনা হঠাৎ বললে,—কি আপনার লজিক?

—আমার? চোঙা হেসে ফেলে। স্বরূপ ভাবছিল চোঙা বলবে তার অপরচুনিস্টের লজিক, অন্তত সে নিজেও তাই বলত। কিন্তু চোঙা হঠাৎ খুব ভাবগম্ভীর মুখ করে বলে,—আমরা সবে স্বাধীন হয়েছি। আমাদের অনেক কিছু করবার আছে। গোটা দেশটা ইণ্ডিয়াষ্ট্রিয়ালাইজেশানের

পথে নিয়ে যেতে হবে। বিপ্লব বিপ্লব বলে চেঁচালে তা হবে না। তার জন্যে কাজ করতে হবে। আমার লজিক সেই প্রোসেসটা জোরাল করা। একটু থেমে রীনার দিকে চেয়ে বললে,—জানি না ঠিক বোঝাতে পারলাম কি না।

স্বরূপ উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠল,—গ্রেট গ্রেট! চোঙা, ইউ আর গ্রেট!

ছয়

মাস দুয়েক পর ভ্যাপসা গরমের এক দুপুরে ভিড়ে টাপুর টুপুর বাসখানা হাওড়া ময়দান ছাড়াতে না ছাড়াতেই মিছিলে আটকা পড়ে। হাওড়ার কলগুলো থেকে পিলপিল করে লোক বেরিয়ে আসছে ফ্ল্যাগফেস্টুন নিয়ে কোন শ্রমিক দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে। ডালহৌসী স্কোয়ারমুখী সে মিছিলে বাসটা ঠায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে আর যাত্রীরা সেদ্ধ হয় পচা গরমে। কেউ তর্ক করে, কেউ আষাঢ়ে গল্প ফাঁদে, শার্ট গেঞ্জি ব্লাউজ যত লেপ্টে যেতে থাকে ঘামে শরীরের সঙ্গে ততো চুপ মেরে যায়। তারপর অবিশ্বাস্য ঘটনার মতো হঠাৎ চলতে সুরু করে বাসটা ভিড়ের ভারে বেঁকে হেলে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে।

রীনা স্টপটায় নেমেই ব্যাগ হাতড়ায় রুমালের জন্যে। খোলা ড্রেনের দুধার দিয়ে জমা পচা গলা পাঁক রাস্তার ধারে থরে থরে সাজানো। স্টপের উল্টো দিকেই ছ্যাৎলাপড়া একটা গলি। দুটো মানুষ পাশাপাশি কোনরকমে যেতে পারে এমন রাস্তা, তারও মাঝে মাঝে জমা করা উনুনের ছাই, মাছের আঁশ, মিঠা কুমড়োর বুকো আর বিচি। বাড়ির পাঁচিলটার গায়েই শিবমন্দির। মাথার ওপর ফুলে ভর্তি কাঁঠালিচাঁপা গাছটা থেকে মৃদু গন্ধ আসে। রুমালটা তার ফরাসী হ্যাণ্ডব্যাগে রেখে রীনা রঙজলা উঁচু কাঠের ভেজানো দরজাটা ঠেলা দিয়ে ভেতরে ঢোকে।

একটা মস্ত পুরনো গোলাপি বাড়ির এক অংশ। কর্তাদের আমলে বোধহয় সামনের ঘরখানা বৈঠকখানা ছিল। ঘরভর্তি ছবি। দেয়ালে মুখ উপুড় করা ক্যানভাসের গাদা। চৌকির নীচে মেঝেতে সর্বত্র ছবি। সবই উল্টে রাখা—খালি ইজেলে বসানো ছবিখানা ছাড়া। একটা ঢ্যাঙা রোগা পাজামা গেঞ্জিপরা লোক ইজেলের সামনে দাঁড়িয়ে কাজ করছে। রীনা সেদিকে যায় না। একটা টিপয়ের ওপর টেবিলফ্যানের সামনে ঘামে জবজবে পিঠ পেতে হাওয়া খায়।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। লোকটার ঘাড়ের পাশ দিয়ে রীনা চেয়ে থাকে প্রায়সমাপ্ত ক্যানভাসটার দিকে। নীল রঙের কাজ, নীলের মাঝখানেই ফিকে হাল্কা জমাট নীল! কখনো হলুদে। কখনো কমলায়, কখনো আগুন লালে সমস্ত ক্যানভাসটা এক ঠাণ্ডা আলোয় আলো করে রেখেছে। রীনা সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

—এসেছো? লোকটা পেছনে না ফিরেই বললে।

—হঁ্যা।

প্রায় আধঘণ্টা চুপ করে কেটে যায়। চৌকিটার এককোণে হাঁটুর ওপর মুখ রেখে রীনা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে আর সুহাস যেন ঘুমের ঘোরে রঙের ওপর রঙ চড়ায়। মস্ত বড় ক্যানভাস, প্রায় ছমাস আগে শুরু করে ফেলে রেখেছিল, আবার শুরু করেছে। আর সে কাজ করে

একটা জন্তুর মতো এনার্জিতে। এই রকম প্রায় আট-দশ দিন সমানে চলে। রীনা জানে এই প্রলম্বিত তন্ময়তার মাঝখানে তার কোন স্থান নেই। অথচ সে আজ এসেছে, অনেক কিছু বলতে। তার সমস্ত পারিবারিক চাপ সে একা একা মুখ বুঁজে সয়ে এসেছে। আর পারছে না, এখন এই চাপের খানিকটা তার সবচেয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে ভাগ করে না নিলে পারছে না।

—সুহাস! চাপা গলায় রীনা ডাকে। জানলার বাইরে কাঁঠালিচাঁপার গাছ থেকে হঠাৎ একটা টিয়া টি-টি-টি শব্দে উড়ে যায়। সুহাস একবার সেদিকে চেয়ে আবার রঙ চাপায়। রীনা লক্ষ করে অনেকক্ষণ থেকে সে নীলের মাঝখানে হলুদ ফোটাতে চেষ্টা করছে। আবার সে তন্ময় হয়ে আঙুল নাড়াচাড়া করে। ঘামে সমস্ত পিঠটা ভিজে গেছে। নীল হলুদ, হলুদ নীল, এবারে কি ক্রিম্‌সন্? মাঝখানে কালো কালো কিসের ইশারা? আঙুলের না বাঁকানো গরাদের। রীনার হঠাৎ মনে পড়ে যায় সুহাসের একটা বক্তব্য—আমি গল্প চাই না, আমি রং চাই, লাইন চাই।

—কেমন হচ্ছে? সুহাস হঠাৎ ঘুমের মধ্যে থেকে জেগে উঠে বললে।

রীনা চুপ করে থাকে। ঘরের এক কোণে একটা বিরাট ক্যানভাসের দিকে চেয়ে বললে,—এটা এখানে পড়ে আছে কেন?

—ওখানেই থাকবে।

—কেন? পয়সাকড়ি দেয় নি? ক্লাটারবাক তো ভদ্রলোক বলে মনে হয়েছিল!

এতক্ষণে সুহাস ফেরে। তুলিটা রেখে হাতের তেলোতে তেলো ঘসে। মস্ত বড় মাথাভর্তি কালো চুল গালভর্তি কালো চাপা দাড়ির মধ্যে চোখ দুটো জল জল করে। ক্যানভাসের চেয়ারখানায় গা এলিয়ে দিয়ে বসে চোখ বোঁজে। রীনা টের পায় রাত্তিরের কাজের জন্যে সুহাস তৈরী হচ্ছে। তার আঁকার ব্যাপারটা বানডাকা নদীর মতো এসে তার দিন রাত তোলপাড় করে দিয়ে তাকে দিন দশ-বারোর মধ্যে চড়ায় ফেলে দিয়ে যাবে। তদ্দিন অন্তত রীনা তার মনের মধ্যে নেই।

—তুমি নিশ্চয় ভাবছো কদ্দিন এরকম চলবে? চেহারায় একেবারে বিপরীত গলা সুহাসের। সুরেলা তীক্ষ্ণ চিন্‌চিনে গলা। নিজের মনে বললে,—এখন অনেকটা ধাতস্থ হয়েছি। এখন বোধহয় ভেতরে ভেতরে একটা রিসার্ভয়ার তৈরী করতে পারছি। এখন ঠিক করেছি পাগলের মতো আর কাজ করব না। রোজ কাজ করব।

—রাত জাগছো?

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে সুহাস। ঘরখানায় পায়চারি করতে করতে বলে,—ক্লাটারবাকের কথা বলছিলে না? আমি দিই নি। চারখানা ছবি—ঐ বড় দুটো, এইটা, আর ঐটা পছন্দ করেছিল। চারহাজার টাকার অর্ডার। দিলাম না।

আবার চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বলে,—দিলাম না কেন? জলজলে চোখ মেলে তাকায় রীনার দিকে।—দিলাম না কেন তার মানে আমরা ভিখিরি নয়, সেইজন্যে।

—তার মানে?

—লোকটার হঠাৎ ট্রান্সফার অর্ডার এল। লোকটা ছবি নিয়ে যাবে না দেশে সঙ্গে করে। তার চাকরবাকরদের দিয়ে যাচ্ছে শুনলাম। কি রকম আত্মসম্মানে লেগে গেল রীনা। ছবিগুলো

নিয়ে এলাম। আমার বন্ধুবান্ধবেরা কেউ কেউ নিন্দে করছে। তুমিও হয়তো করবে। কিন্তু পারলাম না।

—অনেকগুলো টাকা! রীনার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।

—হ্যাঁ, আর অনেকখানি সম্মান! তারপর হঠাৎ মুখ ফেরায় রীনার দিকে। কপালে গোঁফের ওপর ঘামের বিন্দু এখনও জমে আছে। তীক্ষ্ণ গলায় বললে,—তুমি আমার কাছে আসো কেন বল তো রীনা? কেন আসো? যদি আমাকে না বোঝ তাহলে কেন আসো? আমি তো বলেছি তোমাকে, এই পচা গলির বাসিন্দে আমি, এইখানেই আমার স্বর্গমর্ত, হ্যাঁ এইখানেই আমার সব। আমার কোন প্রাইজ চাই না, ককটেল পার্টিতে গিয়ে তারিফ কুড়োতে চাই না, কন্স্যুলেটগুলোর দাক্ষিণ্য চাই না, চাই না বিখ্যাত কাগজগুলোর বিখ্যাত সমালোচকদের পিঠচাপড়ানি। চাই না, আমি কাজ করতে চাই। হ্যাঁ, আমি রেলের কেরানী হয়ে দশটা-পাঁচটা করব। আর ফিরে রাত জেগে আমার স্বপ্নের রাজত্ব তৈরী করব। তুমি পছন্দ করছো না? কিছু এসে যায় না রীনা, কিচ্ছু এসে যায় না। কিছুতেই কিচ্ছু এসে যায় না। আমি কাজ করব।

বাইরে বিকেল পড়ে আসছে। গলির মধ্যে থেকে একটা ফিরিওয়ালার হাঁক আসে, চাই আলুর দম।

—আমি আমি কোন এস্কেপ চাই না, রীনা, বিশ্বেস করো। সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ—একথাগুলো তুমি একবার বলেছিলে, মনে আছে? তোমার দিক থেকে ঠিকই বলছো। কিন্তু তার মানে ছবি আঁকতে আর একবার পৃথিবীতে আসতে হবে। আমার এই জন্মটা কি খারাপ বলো? আর যদি আমার পরিবেশ বেশ স্বাভাবিক সুস্থ থাকতো তাহলে আমি একটা বড় চাকরি করতাম। আর্টলাভার হতাম, তোমাকে বিয়ে করে তোফা থাকতাম। তুমি—তুমি ঐ যে খবরের কাগজের যে লোকটা এসেছে ওকেই বিয়ে করো। হি উইল মেক্ ইউ হ্যাপি।

—ডোণ্ট বি ক্রুয়েল।

রীনার অনুরোধ সুহাসের কানে পৌছয় না। আবার উঠে পায়চারি করে। এবার চৌকিতে রীনার পাশে বসে বলতে আরম্ভ করে—কাল রাত্তিরে একটায় বাড়ি ফিরে সটান ঘুমিয়ে পড়েছি। বোধহয় রাত দুটোও হয়নি। হঠাৎ মা হাঁউমাউ করে উঠে পড়লেন। কতগুলো আরশোলা ফরফর করে ওড়ে মাঝে মাঝে। খড়খড়ে বাড়ি। অজস্র ফুটোফাটা। মার মুখে পড়েছিল বোধহয়। উঠে চেঁচিয়ে কাঁদেন আর বিশ্রী ভাষায় আমাকে গাল পাড়তে থাকেন। বাইরে রকে গিয়ে মাদুর পেতে শুলাম, কিন্তু ড্রেন থেকে এমন মশার ঝাঁক আসছিল—ভাল করে ঘুম হল না। ভোরে পাঁড়ের দোকানে গিয়ে চা আর বেগুনি। আঃ, কি ভাল লাগল রীনা সেই ঠেলাওয়ালাদের ভিড়ে বসে চা খেতে! হাতের মুঠোয় জীবনটা আবার ফিরে পেলাম!

এক ঝলকে সুহাসদের বাড়িটা রীনার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। থরথরে ক্ষয়া সুহাসের মায়ের কথাবার্তা শুনে রীনা এক চোখে হেসেছিল আর এক চোখে কেঁদেছিল। বলতে গেলে একখানাই ঘর, তার সঙ্গে ফালি বারান্দা, সেখানে তোলা উনুনে রান্নার ব্যবস্থা। উঠোনের কোণে মরচেপড়া করোগেটের টিনের দরজা সাঁটা বাথরুম, তার বাইরে পেঁচকাটা কল থেকে অনবরত জল

পড়ার শব্দ। এক ঘরে মা, বড় ছেলে সুহাস, সুহাসের বোন আর ইণ্টারমেডিয়েট ফেল ছোটভাই নিয়ে সংসারযাত্রা। তবে রীনার বিদেশে থাকাকালীন এক ঘটনায় কিছুটা স্থানসংকুলান হয়েছে। মাস দুয়েক হল দুটো পেট্রোলপাম্প আর লরীর মালিক আগরওয়ালার ছোট ছেলের সঙ্গে সুহাসের বোন নিরুদ্দেশ। সুহাস কিছু হদিস করতে পারে নি এতদিনেও।

হঠাৎ অপরিসীম ক্লান্তিতে রীনা হাই তোলে। ক্লান্তিটা শুধু শারীরিক নয়, মনের দিক থেকেও এক অবসাদ। এখানে কি সব সময় যুদ্ধ করতে হবে? ভালবাসতে গেলেও লড়াই, আর্টের ক্ষেত্রেও লড়াই। সবাই কি সুহাস হতে পারে? আর যে পারে না তার জন্যে সুহাসের কোন ক্ষমা নেই।

—কফি খাবে? একটু কফি খাও। তক্তাপোশের নীচ থেকে কেটলি বার করে কুঁজো থেকে জল ভরে। হিটারে জল বসিয়ে দিয়ে বসে। রীনা কফির টিন বার করে।

—ফুরিয়ে গেছে? তাহলে থাক।

—না না, আছে।

—আলো জেলো না, এই যে চিনি।

দুজনে অন্ধকারে চুপচাপ কফি পান করে।

—এই অন্ধকারে বসে থাকতে বেশ লাগে। এই অন্ধকারে অনেক কথা মনে পড়ে যায় না? কত সন্ধে কত সকাল একসঙ্গে কাটিয়েছি।

—আরও কাটাব সুহাস।

—তোমার দুঃসাহস বড্ড বেশী।

সেই অন্ধকারের ফ্রেমে আঁটা সন্ধের শেষ আলোয় আলোকিত জানলাটার দিকে চেয়ে চেয়ে আস্তে আস্তে বলে রীনা,—আমি নিজের কাছে এতখানি হেরে যেতে চাই না সুহাস। তোমাকে যদি ছেড়ে চলে যাই তাহলে আমার বড্ড হার হয়ে যাবে যে।

—জিদের কথা বলছো?

—তাই বল। বাবা চিরকাল বলে আসছেন টাকা দিয়ে সব কিছু করা যায়। সব কিছু পাওয়া যায়। মাকেও তাই বলতেন। দাদা ঠিক মুখে ওকথা বলে না কিন্তু মনে মনে বলে। আর ওরা দুজনেই প্রাণপণ চায় আমি ওদের মতো ভাবি। দাদা বলতে সুরু করেছে আমি যেন ফ্যামিলির প্রেস্‌টিজটা ভুলে না যাই।

—ওফেলিয়া?

রীনা সুহাসের পিঠে মাথা রেখে আস্তে আস্তে বলে,—আমি ওফেলিয়া হতে চাই না সুহাস, বিশ্বাস করো। কিন্তু আমার ভীষণ সাহসের অভাব হচ্ছে। তোমাকে এক দারুণ সুন্দর ডন কুইক্সোটের মতো লাগে। আর কেউ হলে এতদিনে কোথায় তলিয়ে যেত। কিন্তু তুমি বেড়ে চলেছো। আমি তো জানি আমার এলেম কতখানি। আমি পিকাসো মাতিস কপি করতে পারি, তাই করছি। আর পাঁচটা লোকও তাই করছে, কেউ কেউ এরই মধ্যে পটের কায়দা দেখাচ্ছে, কোকশিল্প করছে। আর তুমি এই খোলা ড্রেনের পাশে রঙের রাজা হয়ে বসে আছো। আমি পারি না, কিন্তু আমি জানি, আমি নিজে পারি না। আশেপাশে একটা লোক নেই যে তোমার

মতো অয়েল পোষ মানাতে পারে। তোমাকে শুধু ভালোবাসি না সুহাস, তোমাকে বড্ড ভয় করি।

আস্তে আস্তে ঘাড়ের পাশ থেকে রীনার হাত দুখানা সরিয়ে নেয় সুহাস। একটু সরে টান হয়ে বসে। অন্ধকারে চাপা গর্জনের মতো লাগে তার গলার আওয়াজ।—প্লিজ, রীনা, প্লিজ! তোমাদের প্রশংসার ধ্বসে চাপা দিয়ে আমাকে মেরে ফেলো না। যদি আমার সত্যিই বন্ধু হও, আমাকে কাজ করতে দাও। আমি কোন রাগ করে বলছি না, আমাকে বুঝতে চেষ্টা করো। আমি তোমাকে কিছু সাহায্য করতে পারব না, তুমিও আমাকে কিছু সাহায্য করতে পারবে না। এটা শুধু ভালবাসার ব্যাপার কী, এটা···এটা···এটা কী বলব? এটা একটা ইণ্টারেস্টের ব্যাপার যা বছরের পর বছর ধরে আমাদের সমস্ত বুদ্ধি হৃদয়ের শক্তিকে টেনে রাখে, আমাদের আলাদা হতে দেয় না। আমি তোমার বাড়ি, তোমার ড্রেসিং গাউনপরা বাবা, অজস্র বাঘা বাঘা চাকুরে আত্মীয়স্বজন—এদের সঙ্গে তাল দিয়ে চলতে পারব না। জীবনটা বড্ড ছোট্ট রীনা, বড্ড ছোট্ট। মানুষের এনার্জি বড্ড কম। আর তার সামনে চ্যালেঞ্জ এত বেশী। আমি আমার সময় নষ্ট করতে পারব না।

—আমি জানতাম, তুমি তাই বলবে। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখো। আমি···আমি···রাজী আছি। আমি···এই খোলা ড্রেন···তারপর সমস্ত মুখে একটা ভয় ও উদ্বেগ নিয়ে বললে,—আর আর মাঝরাতের আরশোলা। মেনে নিচ্ছি। তাছাড়া, আমিও কমার্শিয়াল কাজ নেব। আমি বলছি আমি ঠিক পারব।

অন্য দিক থেকে কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর সুহাস আস্তে আস্তে বলে,—আমি ডুবব, সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে ডোবাব। এবারে অন্যদিক থেকে নৈস্তব্ধ্য। ঘাড় না ফিরিয়ে সুহাস বললে, —কাঁদছো নাকি?

পরিষ্কার আবেগহীন গলায় রীনা বললে,—না।

—কেঁদো না। আমাদের ব্যাপারটা এমন যে কেঁদে ম্যানেজ করা যায় না। নইলে তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও কাঁদতাম।

—তুমি যা বলছো হয়তো তাই ঠিক।

—আমি কোন রূপকথা বিশ্বাস করি না রীনা। রূপকথা বাদ দিয়েই জীবনটা দেখা ভালো।

সাত

প্রায় তিনমাস পর সেই প্রতীক্ষিত দিন এল। মাঝখানে অল ইণ্ডিয়া কার্ডিয়াক কনফারেন্সের ভাইস প্রেসিডেণ্টরূপে ব্যাঙ্গালোরে যেতে হয়েছিল কলকাতার বিখ্যাত হার্ট স্পেশালিস্ট এন. গাঙ্গুলিকে। কিন্তু ঠিক সেজন্যে নয়। স্বরূপের খোঁচানির কোন ত্রুটি ছিল না, কিন্তু খবরের কাগজের লোকজন, সে যে রকমই কেউকেটা হোক না কেন, তাঁর সঙ্গে তাঁদের পরিবারের স্ট্যাণ্ডার্ড মেলে না একথাটা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। বুলা না হয় বকে গেছে, কিন্তু আরও তো ছেলে আছে পৃথিবীতে যাকে তিনি জামাই বলে মেনে নিতে পারেন। শেষ পর্যন্ত স্বরূপের জেদে তিনি রাজী হলেন।

ক্যালকাটা ক্লাবের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় দেখা হল শীতের সন্ধ্যায় নীরেন গাঙ্গুলীর সঙ্গে। ছোটোখাটো শরীর, মস্ত টাক, কিন্তু বেশ কর্মঠ ব্যক্তিত্ব—এক ঝলক চাহনিতেই ধরা পড়ে। বেশ

সৌখীন ভদ্রলোক, দামী ধূসর সার্জের স্যুট, সাদা টাই, ওডিকোলনের ফুরফুরে গন্ধ।

বারান্দায় ঢুকেই চোঙার দিকে এক নজর তাকিয়েই তার পরিচয়দানের অপেক্ষা না করেই গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠলেন,—আ, আই হ্যাভ হার্ড এবাউট ইউ। স্বরূপের দিকে বুড়ো আঙুল বাড়িয়ে বললেন,—হি থিংক্স হেল অফ ইউ।

চোঙা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হল। অ্যাকসেন্ট যতখানি জবরদস্ত ভেবেছিল ততখানি নয়।

স্কচ্ হুইস্কি অর্ডার দিয়ে ব্যাখ্যা করলেন,—আই অলওয়েজ প্রেফার স্ট্যাণ্ডার্ড ইন এভরিথিং। পিতার সম্মানার্থে স্বরূপ হু'গেলাস টোমাটো স্যুপ আনালে।

ছোট ছোট তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে চোঙার আপাদমস্তক দেখে দিয়ে বললেন,—দেশের যা অবস্থা! উই আর পাসিং থ্রু এ ক্রিটিকাল টাইম।

চোঙা আস্তে আস্তে বললে,—প্ল্যানগুলো চালু হলে খানিকটা ইম্প্রুভমেন্ট আশা করা যায়।

ডোণ্ট টক রট, ভদ্রলোক আবার চেঁচিয়ে উঠলেন।—ঐ সব সোশ্যালিস্ট প্ল্যানিং। সোনার পাথর বাটি। আই টেল ইউ, প্রাইভেট ক্যাপিটেলের ইনিশিয়টিভ না থাকলে কোথাও কিছু হয় নি, হবে না।

—তা অবশ্য, চোঙা ঘাড় নাড়ায়। একটু অসোয়াস্তিও হয়। হঠাৎ তার মনের মধ্যে উমাচরণের মুখখানা খেলে যায়। উমাচরণকে সে ঘেন্না করে কিন্তু সে ঘেন্নাটা পরিষ্কার জানিয়ে দিতে পারত। এমন কি তার বাপ ভবনাথকেও সে থোড়াই কেয়ার না করেও পারে। কিন্তু এই কর্মঠ পয়সাওয়ালা বৃদ্ধ কেবল সম্ভ্রমের দাবীর ভিত্তিতেই আলাপ চালাবে মনে হয়।

—বাবা ভীষণ পলিটিক্সে ইণ্টারেসটেড! স্বরূপ বললে।

—রীনাও সেদিন বলছিল, চোঙা নীরেন গাঙ্গুলীর চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে বললে।

—ও! ইউ নো হার। গুড! একটু চুপ করে থেকে বললেন,— সি ইজ এ গুড গার্ল, অ্যাবসলিউটলি এ ওয়ান্। কিন্তু ভেরি মুডি!

—মেয়েরা একটু ঐরকমই হয়! চোঙা তার স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠল।

—দ্যাটস্ রাইট! দ্যাটস্ রাইট! মেয়েরা ঐ রকমই হয়। দ্যাটস্ এ ফাইন ডিগ্। অ্যাবসলিউটলি এ ওয়ান আই মাস্ট সে। ওয়েটার!

ভদ্রলোক হঠাৎ দাক্ষিণ্যের ভরা কোটালে ছলছল্ করে ওঠেন। ওয়েটার আসতেই ছেলেকে বলেন,—ডোণ্ট বি সিলি! হ্যাভ এ স্কচ্।

আধঘণ্টা আলাপের পর নীরেন গাঙ্গুলী আত্মকাহিনী বলতে শুরু করেন। বাবা সৎ লোক ছিলেন, তাঁর প্রকাণ্ড ভালমানুষেমির ফলে ঠাকুরদাদার ফার্ম ডুবতে বসল। বড়লোক হবার জন্যে গেলেন বড় মাঠে। তাতে দুটো বাড়ি বিকিয়ে গেল। তাঁর দাদা কোনরকমে ফার্মটা ঠেকা দিয়ে রাখলেন। তারপর তাঁর ডাক্তারি জীবন। বিলেতে বড় বড় পেপার করেছেন। চোঙা ঠিক ধরতে পারলে না, বোধহয় এক নরউইজিয়ান ভদ্রলোকের নাম করলেন এমনভাবে যেমন লোকে লেনিন কিংবা অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের নাম করে। কিন্তু এহেন লোকের প্রশংসা পেয়েও দেশে এসে কিছুই করতে পারলেন না। তবে গীতার কর্মযোগে তিনি বিশ্বাস করতেন। ইউ নো উই কাম্ ফ্রম এ গ্রেট পণ্ডিতস্ ফ্যামিলি। মাই গ্রেট গ্র্যাণ্ডফাদার…

চোঙাও কিঞ্চিৎ বয়স্থ। বললে—হ্যাঁ, আপনাদের বেশ একটা ব্যালেন্স দেখছি। অ্যাণ্ড রীনা ইজ ওয়াণ্ডারফুল।

নীরেন গাঙ্গুলী হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন,—আই হেট্ পভার্টি ইউ নো। অ্যাণ্ড রীনা অলসো হেট্স্ ইট। সন্দেশে যদি মিষ্টি না থাকে, রসগোল্লায় যদি রস না থাকে, তাহলে মেয়েরা আপত্তি করবেই, অ্যাণ্ড দে আর রাইট! অ্যাবসোলিউটলি রাইট! ও সব আইডিয়ালিজমে চিড়ে ভেজে না।

—আই অ্যাম্ নট এ ম্যান অফ প্রপার্টি মিস্টার গাঙ্গুলী, স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে চোঙা বললে।

—আই ডোণ্ট মিন্ দ্যাট।

—আমি জানি আপনি কী বলছেন। তবে খবরের কাগজে চাকুরি, আর ব্যারিস্টারি ডাক্তারি অনেক আলাদা।

—একজ্যাক্টলি, একজ্যাক্টলি।

—তবে আমাদের মধ্যে যাঁরা টপে আছেন সে পজিশানে বোধ হয় আপনার আপত্তি হবে না!

—গুড গুড! আমি স্বরূপকেও ঠিক এই কথাই বলছিলাম। এত তাড়াতাড়ির কী আছে! তোমাদের আলাপসালাপ চলুক। বাই দা বাই, ডাজ শি লাইক ইউ?

প্রশ্নটা যতই হাল্কাভাবে করা হোক, এক অনিশ্চিতির ছায়া সঙ্গে সঙ্গে চোঙার উদ্দীপ্ত মুখের ওপর নেমে আসে। এই অনিশ্চিতির লক্ষণ গাঙ্গুলী সাহেবের চোখ এড়িয়ে যায় না। ছেলেটাকে আর একবার ওজন করেন মনে মনে। পাত্র হিসেবে একেবারে ফ্যাল্না নয়, যদিও স্ট্যাণ্ডার্ডে ঘাটতি আছে। গাঢ় নেভি-ব্লু গলাবন্ধ ফুলহাতা সোয়েটার, চোঙার তীক্ষ্ণ সরু গোঁফ, সপ্রতিভ চাহনি, লম্বা একহারা চেহারা—সবটার মধ্যেই আকর্ষণের অভাব নেই।

সামান্য ইতস্তত করে একটু হেসে চোঙা বললে,

—মেয়েদের মন! জানেনই তো! তবে আপনারা কোঅপারেট করলে········

—আই সি, আই সি! ভদ্রলোক উঠে পড়লেন। ঘড়ি দেখে বললেন, অনেক রাত হয়ে গেল। তারপর তাঁর বড় গাড়িতে লিফট দেবার আহ্বান জানালেন। চোঙা হেসে জানালে তার গাড়ির ব্যবস্থা আছে। তারপর গাড়িবারান্দার নীচে অপেক্ষমান বাবা-ছেলেকে রেখে সে অফিসের গাড়িখানা নিয়ে সোঁ করে বেরিয়ে গেল।

সেদিকে চেয়ে চেয়ে মৃদু গলায় নীরেন গাঙ্গুলী বললেন,—ইয়েস্, এ ব্রাইট বয়!

চোঙা সেদিন তার ইণ্টারভিউয়ে ভাল করলেও ডাক্তার সাহেবের মন থেকে খচখচানি গেল না। খবরের কাগজের যে ঐতিহ্য তার সঙ্গে তাঁর একমাত্র কন্যার ভবিষ্যৎ একাকার করায় তাঁর মন ওঠেনা। বরং তিনি প্রদীপ মেহেটাকে মেনে নিতে পারেন। প্রদীপও সেণ্টজেভিয়ার্সে স্বরূপের সহপাঠী। ভারতবর্ষের এক গণ্যমান্য রাষ্ট্রদূতের ভাইপো। যথেষ্ট কাল্চার্ড। তাঁদের ছুটো বাড়ির পরেই সাদার্ন অ্যাভিনিউতে মস্ত বড় বাড়ি উঠেছে তাদের। চমৎকার চেহারা, তার ওপর চমৎকার বাংলা বলে। আর তাছাড়া দেশটা যখন এক তখন বাঙালী-বাঙালী বলে মাথা কুটে লাভ কী? নিজেই তো

দেখছেন। গত কয়েক বছরে তাঁর যে প্রচণ্ড পসার তার মূলে কতটুকুই বা বঙ্গসন্তানের কড়ি? ও ব্যাপারটা শুধু আবেগ দিয়ে ভাবলে চলবে না। বাংলা দেশে দুটো দেশ তৈরী হয়ে গেছে। একটা বাঙালী সমাজ দারিদ্র্যে পচে মরবে, আর ঝাণ্ডা নিয়ে মিছিল করে যেভাবে, রাজনৈতিক নেতাদের শিকার হবে, আর একটা বাঙালী সমাজ উত্তরোত্তর সর্বভারতীয় সমৃদ্ধির সঙ্গে হাত মিলিয়ে এগিয়ে চলবে। দুটোকে এক করা যায় না। অচিন্ত্যর প্রসপেক্ট সম্পর্কেও তিনি ভেবে দেখেছেন। ব্যক্তিগত এলেমে কদ্দূর যাবে ছোকরা? তিনি খবর নিয়ে জেনেছেন, বড় ভাই ফ্ল্যাট নিয়েছে অন্য পাড়ায়, বাপ পেনশানার, ছোট ভাই ভাল ছেলে হওয়া সত্ত্বেও ঝাণ্ডা তুলে বেড়াচ্ছে, বাড়ির সবচেয়ে ভাল অংশটায় মাদ্রাজী অফিসার ভাড়া বসেছে। ছোকরাকে যদি উঠতে হয় তাহলে এই অবস্থা থেকে বেরোতে হবে। বেরোতেও পারে। কিন্তু যদি না পারে তাহলে আবার সেই বাঙালী নিম্ন-মধ্যবিত্ত গাড্ডায়! সেই পয়সার জন্যে পারিবারিক ড্রামা! তিনি মেয়েকে হাতপা বেঁধে জলে ফেলে দিতে পারেন না!

সেদিন সন্ধ্যায় আগাথা ক্রিষ্টির একটা জমজমাট উপন্যাস হাতে নীরেন গাঙুলী চুরুট খেতে খেতে এত অন্যমনস্ক হয়েছিলেন যে প্রায় আধখানা চুরুটের ছাই জামায় পড়ে। আবার সেই রহস্য-গ্রন্থের পাতায় কে খুন করেছে এবং কে করেনি সেই সব নায়কনায়িকার পেছনে ধাবমান হতে হতে কখন জমে গেছেন খেয়াল নেই। হঠাৎ খুব হাল্কা পায়ের শব্দে চোখ তুলে চান। রীনা, ঘাড়ে ব্যাগ ঝুলছে, সমস্ত মুখে পরিশ্রান্তির ছাপ।

—তোমার সঙ্গে চা খাব বলে বসে আছি।

—আমি আসছি বাবা।

—মুখে হাতে জল দিয়ে রীনা বাপের কাছে এসে বসে। চা জলখাবার আসে।

—আজ একটা একেবারে মরিবাণ্ড কেস্ এসেছিল। মস্ত বড় কাঠগোলার মালিক। সাহেবের অনেক নামডাক শুনে এসেছে। ওকে সারানো শিবেরও অসাধ্য। নিলাম কেস।

পট থেকে চা ঢালতে ঢালতে রীনা বললে,—বলেই দিলে পারতে। কেন কষ্ট করে আর আসা!

—বাঃ, লোকে কষ্ট করতে চায়। তুমি কষ্ট করতে দেবে না? সে লোকটা স্বপ্ন দেখছে বেঁচেবত্তে থাকবে, আর তুমি বলবে শ্রাদ্ধের জোগাড় ছাখো?

একবড়ি স্যাকারিন চায়েতে ফেলে গাঙুলী সাহেব বললেন,—তোমার একটা ছবি নাকি ভাল দাম পেয়েছে? স্বরূপ বলছিল।

শ্রান্তিতে ক্লান্ত কিন্তু হাসিতে ভরা রীনার মুখখানা মুহূর্তে কঠিন হয়ে পড়ে।

—ওটা তো একটা ইনভেস্টমেণ্ট বাবা, তুমিও জানো!

—এটা তুমি কী বলছো রিন্। প্রদীপ ইজ এ গ্রেট কনয়শার অফ্ আর্ট।

—কনয়শার হলে আমার ক্যানভাস কিনতো না, সুহাসের ছবি কিনতো।

আবার জামায় চুরুটের ছাই পড়ে গাঙুলীসাহেবের। ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলেন,—আমি তোমাদের আর্টফার্ট বুঝি না।

এবার রীনা হাসে। সহজভাবে বলে,—তুমি মানুষের শরীরটা বোঝ। সুহাস বোঝে মনটা।

এবার ভুরু কুঁচকান, আস্তে আস্তে চুরুট টেনে বলেন,—ভাত ছিটোলে কাকের অভাব হয় না।

—মানে ?

মানে সুহাস তোমাকে পাকড়াতে চায় তোমার টাকার জন্যে। তুমি তাকে পুষবে। আর সে জীনিয়াস। সে ছবি এঁকে যাবে। ছবি বিকলো কি বিকলো না—কিচ্ছু এসে যায় না।

এবার হেসে ফেলে রীনা।—বাবা, তোমার কথাগুলো যদি সত্য হোত! কী ভাল হোত!

—শুধু আর্টে কিছু এসে যায় না। আমাদের দেশ তো ফ্রান্স নয়। এখানে যারা আঁকে তাদের গরিব হতে হবে। আই হেট পভার্টি। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের এই বোধগুলো আরও হওয়া দরকার। ঐসব প্লেন লিভিং হাই থিংকিং—ওগুলো সব ব্লাফ। যাদের টাকা আছে তারা ঐ ব্লাফ তৈরি করে। আমাকে পরিষ্কার করে বল্ তো রিন্, তুই পারবি ঐ পভার্টির মধ্যে পচতে? ওর মধ্যে কোন কাব্য নেই। বিলিভ মি। তোর বয়স কম, আর ঐসব আর্টফার্ট নিয়ে মেতে আছিস। এভাবে চললে আর কয়েক বছর পর চোখে অন্ধকার দেখবি।

মৃদু গলায় রীনা স্বগতোক্তি করে, আমি যে সুহাসকে ভালবাসি।

—গুড্, তোমার ফ্র্যাঙ্কনেস্‌কে আমি তারিফ করছি। বড়কা সে যুগে স্টার থিয়েটারের বিনোদিনীকে ভালবাসত। টাকাও ঢেলেছিল বিস্তর। ব্যস ঐ পর্যন্ত। তোমাকে তো আমি বারণ করিনি। তুমি সুহাসের ক্যানভাস কিনেছো, আরো কেনো। তাকে কংক্রিটলি হেল্‌প করো। সেটাই দরকার। কিন্তু একমাত্র প্রেমের জন্যে বিয়ে করা তো সর্বনাশ। তাতে তুমি যেটা চাইছো সেটাই নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি তো মরবে। সঙ্গে সঙ্গে সুহাসের ছবি আঁকাও বন্ধ হবে।

রীনা ভয়ে ভয়ে তার বাপের দিকে তাকায়। ঠিক এই কথাই সুহাস তাকে বলেছিল না? এই কমাসের ক্লান্তি, সুহাসের বারবার প্রত্যাখ্যান আর নিজের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধে মানসিক অবসাদ তাকে একসঙ্গে চেপে ধরে।

—তুমি কী বলো? আস্তে আস্তে ও বলে।

—আমি? আমি আমার মতামত তোমার ওপর ইম্‌পোজ করতে চাই না। তোমার কাণ্ডজ্ঞানের ওপর—বলতে কি স্বরূপের চেয়েও—আমার আস্থা আছে। আমি তোমাকে আর একবার ব্যাপারটা ভেবে দেখতে বলি। লাইফ ইজ ওয়াণ্ডারফুল—এই বুড়োহাড়েও বলছি। কারুর ভালবাসা না পেলেই জীবনটা খেলো হয়ে যায় না।

রীনা অসহিষ্ণুভাবে মাথা নাড়িয়ে বললে,—তুমি কী বলছো বলো না।

—প্রদীপ ম্যোহটা ইজ এ ব্রাইট বয় উইথ এ ব্রাইট ফিউচার।

—বড্ড তাড়াতাড়ি গায়ে উঠতে চায় বাবা, ফ্র্যাঙ্কলি ওকে আমার পছন্দ হয় না। ওর অনেক টাকা, অনেক প্রতিপত্তি ওদের, মনে করে তুড়ি মারলেই মেয়েরা দৌড়ে আসবে। অনেকে হয়তো আসেও। কিন্তু আমি পারব না। তার চেয়ে,…তার চেয়ে…

রীনা ইতস্তত করে। নীরেন গাঙ্গুলী বুঝতে পারেন। বলেন,—ঠিক আছে। আর একদিন আলাপ করা যাবে। ইউ লুক টায়ার্ড।

—হ্যাঁ, মাথাটা ধরেছে।

—মাথার কী দোষ! আজও হাওড়ায় গেছিলে?

—হ্যাঁ।

—কী বললে?

—তুমি যা বললে তাই। আগেও বলত।

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকেন নীরেন গাঙ্গুলী। ফ্রান্স থেকে আসার পর কখনও এভাবে তাঁর মেয়ে তাঁকে সব কথা খুলে বলে নি। এতদিন কেন স্বরূপের মারফত কথা চালিয়ে এসেছেন ভেবে অনুতপ্ত বোধ করেন। নিজের কর্মদক্ষতার ওপর তাঁর স্বাভাবিক আস্থা আরও তুঙ্গে ওঠে। মেয়ের পিঠে হাত রেখে বললেন,—কিচ্ছু ভাবিস না রিন্। সব ঠিক হবে যাবে। লাইফ ইজ ওয়াণ্ডারফুল।

আট

শীত গিয়ে ঘামে দরদর গ্রীষ্ম। আবার শহরভাসানো বর্ষা। এ অঞ্চল ব্যাঙে হিসি করলেও ভাসে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এদিকে দু-তিন দিন ছাড়া খুব জল জমে নি এবার এখনও। সকাল থেকে আকাশ অন্ধকার, তার সঙ্গে ইলশেগুঁড়ি। মুখুজ্জেদের গেটের পাশে গোলকচাঁপা গাছটা ফুলে ভর্তি, পাশে একটা উঁচু কুরুশ পাঁচিলের শ্যাওলার ওপরে ধবধবে শাদা ছড়া বের করে আছে। আর টাকপড়া পার্কটা আবার সতেজ সবুজ ঘাসে ভরে উঠেছে। পক্ষাঘাতিগ্রস্ত উমাচরণের স্ত্রী জানালার দিকে চেয়ে চেয়ে শ্রাবণের কলকাতার মায়াবী শোভার দিকে চেয়ে ছিলেন। আবার ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হল। তারই মধ্যে একটা আলো আকাশে বাড়িগুলোর ধসা দেয়ালে পার্কের বেঞ্চিতে খেলা করে। সেদিকে চেয়ে চেয়ে মুখ বেঁকিয়ে আওয়াজ করেন।

পাশের ঘর থেকে অমলার গলা আসে,—আমি পারব না অচিন্ত্যকে বলতে। চুরি করেছে, হাজত বাস করুক।

তারপর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে। এ কয়েক মাসে আর একটু মোটা হয়েছে অমলা। সে যখন চোঙার দেওয়া দামী শাড়ি পরে জিপে এসে ওঠে তখনকার চেয়ে তার এই গেরস্থালি চেহারা অনেক বেশী আকর্ষণীয়। তার চেহারা ও স্বভাবের যে স্থূলতা—যেমন মুখ ঝামটে চোখ মটকে হাত নেড়ে কথা বলা—তা অনেক মানানসই লাগে এরকম বেশে, সাধারণভাবে আঁচড়ানো চুলে। চোঙা তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে একবার চৌরঙ্গীর কোন দোকান থেকে তার মাথায় এমন চুড়ো বেঁধে এনেছিল যে সে কদাকার মূর্তি দেখে সঙ্গতভাবেই গলির স্কুলফেরতা ছেলেরা সিটি মেরেছিল। অমলা তার হাত-খোঁপা ঠিক করতে করতে বলে,—তাই বলি! কদিন থেকে মোটা মোটা ইলিশ মাছ আসছে। এটা যে চুরির টাকা তা তো বুঝি নি।

আবার গোঙানো আওয়াজ আসে। এবার আওয়াজের দৈর্ঘ্য আগের চেয়ে বেশী।

অমলা বললে,—তোমরা আমাকে কি ভাবো বল তো। তোমরা আমাকে ওরকম ভাবো বলেই অচিন্ত্যও ওরকম ভাবে। আমি শালা সেজেগুজে বসে থাকব ওঁর জন্যে। আর বাবুর যখন সুবিধে হবে তখন আসবেন। অমলা হাত নেড়ে নেচে নেচে বলে। তারপর নিজের মনেই গজরায়,—ওঃ,

বাবুর বড় পীরিত করার শখ ! শখ তো যা না এদিক সেদিকে যত দোকান পাতা আছে সেখানে। না, সেখানে যাব না, সেখানে গেলে লোকে কী বলবে !

তারপর অমলা কাঁদল, কেঁদে চোখ মুছে পাউডার মেখে শাড়ি পালটে পাশের মুখুজ্জেদের বাড়ি ফোন করতে গেল।

অমলা কখনও অফিসে ফোন করে নি। ফোন পেয়ে অবাক হয় চোঙা।

—কী! আঁতকে উঠলে মনে হল !

—না না, বল না, কী ব্যাপার ? আমার আজ স্পেশাল ফিচারের দিন। বলে ফেলো।

—বাবা অ্যারেস্ট হয়েছেন। জামিন দিচ্ছে না।

—সে কী!

—হ্যাঁ, স্কুলের তহবিল তছরুপের অভিযোগে। বেশ কিছুদিন থেকেই নাকি ব্যাপারটা ঘোঁট পাকাচ্ছিল। যাই হোক, তুমি জামিনের একটা ব্যবস্থা করো।

চোঙা চটে যায় অমলার এই হুকুমের গলায়। সঙ্গে সঙ্গে মায়াও লাগে। অমলা তো জানে না সে কতদূর সরে এসেছে তার কাছ থেকে, এমনকি সে যে নিজের আত্মীয়স্বজন পাড়াপড়শী বন্ধু-বান্ধব থেকে সরে আসছে ক্রমশ তার খবরও তো তার নাগালের বাইরে। চটে উঠলেও পরমুহূর্তে তার প্রতি অমলার নির্ভরতায় সে আত্মতৃপ্ত না হয়ে পারে না। দূরত্ব বজায় রাখলেও লোকে তাকে আপনার ভাবছে—এতে সে আত্মপ্রসাদ বোধ করে।

—মুচিপাড়া থানা তো ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, আমি দেখছি। একটু থেমে বললে,—এত কাজের মধ্যে পড়ে গেছি অমু, বিশ্বাস করো। একদম যেতে সময় পাচ্ছি না।

কিন্তু অমলা ফোন ছেড়ে দিয়েছে।

চোঙা তার কথা রেখেছিল। সেই সন্ধ্যেবেলায় গোটা দুনিয়াটাকে গাল পাড়তে পাড়তে উমাচরণ বাড়ি ঢুকলেন।

—শালা জামিন দেবে না ? তোর বাবা দেবে !

চায়ের পেয়ালা বাপের হাতে দিয়ে অমলা বললে,—অতো ফড়ফড়িও না। অচিন্ত্যদার জন্যে তো জামিন পেলে।

অমলার কথা শেষ হতে না হতেই চা-ভর্তি পেয়ালাটা ছুঁড়ে দিলে গুরুচরণ মেয়ের গায়ে। অমলা উঃ বলে দৌড়ে পালায়। ধোঁয়া-ওঠা চায়ের ছেঁকায় অমলার গলায় ফোস্কা পড়ে।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা চোঙা উমাচরণের চৌকাঠে পা দিতেই অমলা বললে,—তুমি আর আমাদের বাড়ি এসো না।

—মানে ? তোমাকে নিয়ে আমি আজ চিনেবাড়ি যাব। অনেক দিন ভালমন্দ খাওয়া হয় নি। ওসব ন্যাকামি কোর না, ওঠো। চট করে শাড়িটা পাল্টে নাও। বাব্বাঃ, মেশোমশাই কি কাণ্টাই না করেছে! যাই হোক, তুমি ওসব কিচ্ছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। একটু পয়সা খরচা হবে,

ঐ যে কেরানী ছোকরাটা আছে, স্কুলের ক্যাশ দেখে। ওকে হাত করতে হবে। লোক লাগিয়েছি। হয়ে যাবে।

—আমি যাব না তোমার সঙ্গে। বাবার বারণ আছে।

—বাবার বারণ! ভূতের মুখে রামনাম! তারপর উত্তেজিত হয়ে চোঙা বলে,—তোমার লজ্জা করে না অমু, একটা চোরের নাম করতে। জানো, প্রায় হাজার তিনেক টাকা মেরেছে। রেসে টাকা উড়িয়েছে। আমি সব খবর নিয়েছি। সমস্ত পরিবারটাকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছে লোকটা!

প্রায় একটা বক্তৃতা করে ফেললে চোঙা।—

—আমি কী করে যাব? দেখছো না? চোখ নেই?

—কেন, কী হয়েছে? বলেই চোখ পড়ে অমলার গলায় জলভরা বড় বড় ফোস্কাগুলোর ওপর।

—কী করে হল?

—তোমার জন্যে! তোমার জন্যে জামিন হল বলতেই বাবা — —

অমলা মাথা নীচু করে থাকে। চোঙা লক্ষ করলে সে কান্না সামলাচ্ছে।

মেজাজটা একদম ঝুলে যায়। বলতে কি, তার চারপাশের সাফল্যের মধ্যে চোঙা এমনভাবে এগিয়ে চলেছে যে কোথাও হোঁচট খেলেই সে অবাক হয়। বেকায়দা জায়গাটা আবার গরম করতে গিয়ে আর একবার ইচ্ছে করেই হোঁচট খায়।

—মেশোমশাইয়ের ভীমরতি ধরেছে।

—তুমিও আর এসো না। গাড়ির চাকার হাওয়া খুলে দেবে বলেছে পাড়ার ছেলেরা।

মুখটা একেবারে তিতো হয়ে যায় চোঙার। আধুনিক জীবনের জয়যাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রকাণ্ড-কুনোমির কাদায় গড়াগড়ি-খাওয়া পচাগলিটার জীবন তাকে অস্থির করে। অস্থিরতা দমন করবার জন্যে বলে,—চা করো, চা করো, বাজে কথায় কান দিও না।

আবার ঝিম ঝিম করে বৃষ্টি শুরু। গদাম করে পার্ক থেকে ফুটবল পড়ে বাড়িটার বন্ধ দরজায়। চোঙা চমকে ওঠে। চোঙা মনে মনে অমলা ও রীনা এই সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের বাসিন্দেকে পাশাপাশি রেখে বিচার করে আরাম পায়। অমলা অশিক্ষিত, স্থূল, রীনার পাশে তো বটেই। কিন্তু অমলাকে যেমন তেমন ইচ্ছে গড়ানো যায় পেটানো যায়, রীনার প্রসঙ্গে কোন কথাই ওঠে না। সে যেভাবে জাল ফেলেছে তাতে রীনা তার দিকে ক্লান্তিতে অবসাদে সমস্ত পথ হারিয়ে এগিয়ে আসছে—একথা অবধারিত। তার স্টেটাসের জন্যে, তার জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্যে রীনাকে প্রয়োজন, কিন্তু এই যৌবনের এনার্জিতে ঝলমল, উৎসুক উচ্ছ্বসিত, আঙুলনাড়ানো চোখমটকানো সঙ্গিনীটি তার জীবন থেকে সরে গিয়ে একটা মস্ত ফাঁক রেখে যাবে একথাও নিশ্চিত।

—তোমার একটা বিয়ে ঠিক করেছি অমু, চোঙা বললে কথাগুলো ধীরে ধীরে অমলার চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে।

অমলা সে কথায় কান না দিয়ে বললে,—কোথায় যাবে বলছিলে। শাড়িটা পাল্টে আসি।

অমলার হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নিয়ে জুত করে পা তুলে বসে চোঙা। আবার সেই তুলনা-মূলক আলোচনার দিকে তার মন ছোটে। অমলা সতিই কুমোরের কাদা, তাকে যেমন ছাঁদে ফেলো

তেমনি তার গড়ন নেবে। আর রীনা একেবারে ব্রোঞ্জের কিংবা পাথরের ভাস্কর্য। তার ছাঁদ ফেরানো অসম্ভব। বাইরের বৃষ্টির মৃদু আওয়াজ আর ফুটবল পেটানোর শব্দ।

—তুমি চা খেলে না?

—আমি চিনে খাব। চোঙা হেসে বলে,—অমু, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

অমলা ভয়ে ভয়ে তাকায়। বলে,—সেসব পরে হবে। বাবার আসতে অনেক দেরি। এই বেলা চলো ঘুরে আসি। রান্না করতে করতে গায়ে শ্যাওলা পড়ে গেল।

—আমি তোমার একটা বিয়ে ঠিক করেছি অমু।

অমলার হাসিতে ভরা মুখখানা হঠাৎ গম্ভীর থমথমে হয়ে পড়ে। এত তাড়াতাড়ি ভাবান্তর চোঙা কল্পনা করে নি।

—আমাকে খাওয়াবে না?

অমলা চুপ করে থাকে।

—না না, ব্যাপারটা যে আমি একেবারে ভাবিনি তা নয়। আমাদের স্টোরে কাজ করে। ছেলেটা ভাল, বয়স একটু বেশী হবে। তবে ছেলেটা সত্যিই ভাল। উত্তরপাড়া থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে, স্বাস্থ্যটাস্থ ভালই, এক বোন, তার বিয়ে হয়ে গেছে, ঝামেলা নেই।

অমলা উঠে গিয়ে আলনা গুছোতে থাকে। চোঙার প্রস্তাবে তার মৌন প্রতিবাদ ক্রমশ প্রকট হয়। কিন্তু চোঙা দমে না। বলে,—ত্যাখো অমু, শুধু ভাবের গঙ্গায় ভাসলেই চলে না। মানুষকে উঠে দাঁড়াতে হয়।

—চুপ করো। অতো গলাবাজি কোরো না। তারপর চোঙার মুখের সামনে হাত নেড়ে অমলা বলে,—এতদিন যে ভাবের গঙ্গা কুল কুল করে বইছিল। এই এক মাসেই সব শুকিয়ে গেল?

—ছেলেমানুষি কোরো না।

—বেশ করব। আমি ছেলেমানুষি করি কি বুড়োমানুষি করি তার ওপর তোমাকে খবর্দারি করতে হবে না।

—কেন এসব ঝামেলা বাড়াচ্ছো? কথাটা শোনো।

—কী কথা? কথাটা কী? করুণা, অনুকম্পা! আহা, মেয়েটাকে একেবারে জলে ফেলে দিলেম গো! অমলা সুর করে চেঁচিয়ে ওঠে।

—এভাবে আর বেশীদিন চলতে পারে না অমলা।

—সেটা স্তর আপনাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলেও চলবে।

তারপর প্রায় জন্তুর মতো চোঙার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে,—তুমি আমায় কী পেয়েছো বল তো? কী পেয়েছো? রাগে পাগলা হয়ে চোঙার গাল খামছে ধরে অমলা।

—কী করছো? পাগল হয়ে গেলে নাকি? ছাড়ো।

—হ্যাঁ, পাগল হয়ে গেছি। আমি পাগল হয়ে গেছি! চোঙাকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কাঁদতে থাকে অমলা।

আর সেই রোরুদ্যমানা নারীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে নোনাধরা ইটবারকরা দেয়ালের দিকে

একান্ত বিরক্তির সঙ্গে চেয়ে থাকে চোঙা। নিজেকে সে আগেও বলেছে যে পাঁকের পদ্মফুলের দিকে সে হাত বাড়িয়েছে। কিন্তু সে পদ্মের সংস্পর্শে আসতে গেলে এক এত পাঁক ঘাঁটতে হয় যে তার পোষায় না। আর সে এই পাঁকে পড়ে থাকতে চায় না। একবার সে ভেবেছিল দুই নারীর সান্নিধ্যই চালিয়ে যাবে। কিন্তু তার জন্যে যে চাপ সৃষ্টি হবে তার ধকল সামলানো মুশকিল হবে। সেদিক থেকে অমলার কাছ থেকে বিদায় অপরিহার্য। কিন্তু অফিসের আরও অনেক ব্যাপারের মতো, তার কেরিয়ারের প্রাকারে নতুন নতুন বিজয়কেতন ওড়ানোর মতো অমলার ব্যাপারটাও ঠিক ছকে পড়ে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু তা না হওয়ায় তার বিরক্তি বাড়ে।

চোখ মুছে জলভরা গলায় অমলা বললে,—তোমাকে আর যাবার আগে দয়া দেখিয়ে যেতে হবে না। দয়া তো দেখালেই। বাবার কেসটা চাপা দিয়েছো, ঐ যথেষ্ট।

—ছেলেটা ভাল ছিল অমলা। দুদিন পরে পস্তাবে।

নিষ্প্রাণ কণ্ঠে অমলা বললে,—ছেলেবেলা থেকেই পস্তাচ্ছি, জন্মানো অবধি। তারপর যখন বয়স বাড়লো, পস্তানো আরও বেড়ে গেল। আর কী পস্তাব?

একটুক্ষণ চুপ করে গলাখাঁকারি দিয়ে বললে,—আমার জন্যে ভেবো না, ও একটা কিছু হয়ে যাবে। আর আমি জানতাম; তুমি যে আমাকে কোনদিন বিয়ে করবে না, এটা আমি প্রথম থেকেই জানতাম। তার জন্যে তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। মাঝখানে তুমি আসতে। এই একটু হেসে খেলে দিন কাটতো। তা আর কাটবে না, তাতে কী।

আলমারির তাকে ডেটলগোলা জল ছিল। একটা কাপড়ের টুকরোয় লাগিয়ে চোঙার গালে আঁচড়ের ক্ষতের ওপর লাগিয়ে দেয় অমলা।

চোঙা বোকার মতো নীচু গলায় বললে,—ছেলেটা কিন্তু ভাল ছিল।

—বৃষ্টি ধরে গেছে। এবার তুমি এসো।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে পেছন ফিরে তাকায় চোঙা। চৌকাঠে পৌরাণিক নায়িকার মতো দাঁড়িয়ে আছে অমলা।

নয়

মাস ছয়েকের মধ্যেই চোঙার অভীষ্ট পূর্ণ হল। চোঙার কলাম সাংঘাতিক জনপ্রিয়তা অর্জন করলে। মাখনের ডেলার মধ্যে ছুরির অবলীলাক্রম গতির মতো বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হৃদয়ে তার লেখনী প্রবেশ করল। ঘটনাকে ঠিক ঘটনা রূপে তুলে না ধরে তাকে নাটকীয় করার শক্তিমত্তায় দেশে বিদেশে আধুনিক খবরের কাগজের যে রূপ সে রূপকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টায় চোঙা উঠে পড়ে লাগল। সে সমস্ত সামাজিক কাহিনী তার কলামে লিপিবদ্ধ করে তার বেশীর ভাগই হয়তো ধোপে টেকে না, কিন্তু তাদের আকর্ষণ দুর্নিবার।

ছ'মাস পর রতন সরকার খবরটা দিয়ে বললেন,—তোমার নতুন পোস্টিং নিয়ে আপত্তি উঠেছিল, বুঝলে? বেশ কয়েকটা লোককে ডিঙোতে হল তো! আমি বোর্ড মিটিংয়ে বলেছিলাম—আপনারা কী চান? কাগজটার উন্নতি চান?

চোঙার উন্নতিতে অফিসের লোকজন দুই শিবিরে বিভক্ত হয়—এফিশিয়েন্সি ও সিনিওরিটির শিবিরে। চোঙা এই সমস্ত ব্যাপারটা খুব দূর থেকে দেখেছে, ঠিক দল পাকায়নি। অথচ যেখানে যেখানে ফুলকলা দেওয়া দরকার ঠিক দিয়ে এসেছে। সম্প্রতি ছুটির দিনে ভবনাথের বাড়ির সামনে গাড়ি থাকে। পার্টির নেতা যিনি আর এক পার্টিকে ল্যাং দিতে চান, জনৈক শিক্ষাবিদ যিনি তাঁর সংস্থায় দুর্নীতির অভিযোগ চাপা দিতে চান, বেকায়দা-পড়া পুলিস অফিসার, প্রাইজ-অভিলাষী লেখক, ট্রান্সফার-উন্মুখ অধ্যাপক, এ ছাড়া কোন কোন মহিলা যাঁরা লিখতে চান, অথবা আর্ট মহলে জঘন্য ষড়যন্ত্র প্রকাশের তাগিদে যাঁরা উদ্গ্রীব—কেউই বাদ যাদ না। ভবনাথ অবাক হয়ে দেখেন যার সম্পর্কে কখনও স্বপ্ন দেখেননি সেই দ্বিতীয় পুত্রই তাঁর বাড়ির মান রাখলে।

কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন চলে না। চোঙার পক্ষে তার পরিবেশ ক্রমশ খুব ছোট্ট হয়ে পড়ে। স্বর্ণসুন্দরী আগে খবরাখবর জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। এখন আর করেন না। বুঝতে পারেন চোঙা তার নিজস্ব কক্ষপথে বিচরণ করছে। আর তার সাবালকত্বে তাঁর এবং ভবনাথের মানসিক নির্জনতা আরও বেড়ে যায়।

ইতিমধ্যে একদিন সকালে টুটুলের ঘরে ঢুকে পড়ে চোঙা। টুটুল সম্প্রতি দাড়ি রেখেছে। চোঙার মতো লম্বা নয়, আরও স্বাস্থ্যবান চেহারা। মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল আর ছুঁচলো দাড়ি মিলে তার যে চেহারা বছর দুয়েক আগের চেহারার সঙ্গে তার মিল নেই। ঘরভর্তি পোস্টার—'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক', 'দুনিয়ার মজদুর এক হও।' লেনিন-স্ট্যালিনের ছবি ঘরের দেয়ালে।

টুটুল পড়ছিল। চোঙাকে দেখে টুটুল বলে,—কী মনে করে?

চোঙা চেয়ারে বসে সিগারেট ধরায়।—তুই কোথায় চলেছিস ভেবে দেখেছিস?

—আমাকে কন্‌ভার্ট করতে এসেছো?

—দূর! তোকে কি কন্‌ভার্ট করব! আমার বোধহয় কিছু দিনের জন্যে বাইরে যেতে হবে।

—এমেরিকা?

—হ্যাঁ।

টুটুল তার হাতের বইটা রেখে বলে,—আচ্ছা, ছোড়দা, তোর মনে হয় না তুই একেবারে ছকে পড়ে গিয়েছিস! একবারও মনে হয় না?

—তোর ছকটাও তো ছক। এই পুলিশের সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় হাঙ্গামা—আর কদ্দিন চালাবি? অনেক বয়স তো হোল? প্রেম-ট্রেম করছিস?

টুটুল হঠাৎ চটে গিয়ে বলে,—ছাখ, তোর ঐ পিঠচাপড়ানি তোর অফিসে চালাস, যেখানে তুই হিরো।

—আমি শুধু অফিসের চারদেয়ালের মধ্যেই থাকি না। আমার লেখার জন্যে কত চিঠি পাই জানিস?

—প্লিজ, তোর ঐ খবরের কাগজের খ্যাতি দিয়ে সারা দেশটাকে বিচার করিস নে। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বলে,—তোরা আসলে কিচ্ছু না, একেবারে পোকা। রঙচঙে বাহারে পোকা, ফরফর ফরফর করে নাকের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছিস।

—আর তুই ? ইউ আর এ ফুল! ঝাণ্ডা কাঁধে করে বিপ্লব বলে চেঁচালেই বিপ্লব আসে না।

—সম্পাদকীয় লিখলে আসে।

চোঙা দমে যায়। সমস্ত পৃথিবী জয় করে এসে ছোট ভাইয়ের তীব্র উপেক্ষা তার কাছে অসহনীয় লাগে। অবাক লাগে ভাবতে এই মাত্র কয়েক বছর আগেই তারা একসঙ্গে স্কুলে দৌড়েছে, মাঠে বাগানে খেলা করে বেড়িয়েছে।

—আচ্ছা, আমি না হয় এসটাব্লিশমেন্টের দালাল কিন্তু···

—যাক, স্বীকার করছো নিজের মুখে···

—হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু তুই এটা কী করে বেড়াচ্ছিস ? তোকে ভাবতাম, কবি, আদর্শবাদী, ভালছেলে। তুই যে শেষ পর্যন্ত এরকম শার্টের হাতা গোটানো রগফোলানো জনতার মাত্র একজনে পর্যবসিত হবি স্বপ্নেও ভাবি নি।

এবার তার দাড়ি আর চুলের মাঝখান থেকে টুটুলের বড় বড় চোখ দুটো একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে দাদার দিকে।—তুই একটা খুব ভাল কথা বললি। আমার কবিতা, আমার আদর্শ, আমার পড়াশোনা, বিশ্বেস কর, ওগুলো আমি ছাড়তে চাই না, যত দিন যাচ্ছে ওগুলোর প্রয়োজনীয়তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। আমার চারপাশের জগৎটা একেবারে ফোতো হয়ে গেছে। আমি সেখানে বাঁচবার কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছি না। এক-একবার চোখ রগড়ে ভাবছি। কোন্‌টা রিয়াল ? সেই স্বপ্নেভরা ছেলেবেলার বাঁচাটা, না এই চারপাশের বাঁচা ? আমি—আমি এখনও হাতড়াচ্ছি।

—একেবারে নন্-মার্কসিস্টদের মতো কথা। শেষ পর্যন্ত গান্ধিবাদী হয়ে যাবি না তো ?

—ছোড়দা, স্মার্ট হোস নে, প্লিজ! জীবনটা আরও অনেক জটিল, বিচিত্র, ওরকম স্মার্টভাবে রায় দিলে বাহবা পাওয়া যায়। কিন্তু ওতে কিছু হয় না।

—কিসে হয় ?

—আমার কথা ছাড়। আমাদের দুটো জগৎ একেবারে আলাদা। তার থেকে তোর নিজের কথা বল। শুনলাম তোদের অফিসের কর্তৃপক্ষের মধ্যে গণ্ডগোল বেধেছে ?

—হ্যাঁ, রতনদা নক-আউট হয়ে গেছে। ওর ক-আনার মালিকানা কিনে নিয়েছে কর্তা।

—তাহলে ? তোর পেট্রন তো ডুবল।

চোঙা গম্ভীরভাবে বললে,—তার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না। আমি এখন খোদ কর্তাকে তালিম দিচ্ছি।

—বাঃ। অদ্ভুত আওয়াজ বেরোয় টুটুলের গলা দিয়ে।

—এতে অবাক হবার কী আছে! আসলে জিভটা অন্যভাবে ঘুরানো। একদিকে ঘুরাতাম, আর একদিকে ঘুরাবো। কোনো ঝামেলা নেই, জিভে কোনো হাড় নেই।

[ক্রমশঃ]

যখন আবহাওয়া খারাপ

শামসুর রাহমান

হাওয়ায় সে নয় আর, এখন তো বিশ্বাসঘাতক ক্ষুরধার
হাওয়া সারাক্ষণ শাঁ শাঁ বয়। তার ওড়ার দুর্বার
ইচ্ছা চোখ বুজে থাকে নিষ্ক্রিয় ডানায়; বৃষ্টির শলাকা,
ঝাঁক ঝাঁক, করেছে এমন কোণঠাসা তাকে, এখানেই ঢাকা
বস্তুত থাকতে হবে ডালে,
জবজবে পাতার আড়ালে।
নিজস্ব আকাশ মুছে যাবে? ধুন্ধুমার যুদ্ধক্ষেত্রের মতন
থাকবে সর্বদা পরিবেশ? বাসনার রঙধনু যতক্ষণ
আবার না জ্ব'লে ওঠে সে আর সে নয়। পারলে হাওয়ার ঝুঁটি
নিমেষেই কাটতো সে ইস্পাতের মতো নখে কুটি কুটি।

কী ভীষণ বোকা আর উদ্যমরহিত তাকে লাগছে এখন,
যেন সে পুঁটুলি ন্যাকড়ার, সপসপে। প্রেতায়িত ঘন বন
ব্যাপ্ত শহরের রুক্ষ বুকে; ভাবে, যে-পানি তৃষ্ণিত প্রাণে আনে
সুস্নিগ্ধ উচ্ছ্বাস, তারই এত হুল? দুঃখ দিতে জানে
জলধারা; অন্ধকার আসে ব্যেপে, বৃষ্টি অবিরল,
সে কি হলো দৃষ্টিহারা? দেখবে না কখনো কিছুই আর? একা, হীনবল
এখানে থাকবে প'ড়ে সর্বক্ষণ পরিণামহীন? আধ ঘণ্টা হবে—
এরই মধ্যে ভুলে গেলে ওড়া? কে ছড়ালো কালি ডানার গৌরবে?

নাস্তির ডমরু শুনে এখনই এ দ্বিপ্রহরে পঙ্গু হ'লে ডানা,
অস্তাচলে যাবে স্বপ্ন, নীলিমার অনেক সীমানা,
কে জানে কী শোভাময়তায়, রইবে অগোচরে, স্পর্শাতীত। অস্ত
নেই অতৃপ্তির, অন্ধ গুহাতেও পুশিদা রোদ্দুর চায় সন্ত!
মনের ভেতর তার আর্তি আর ভীতির উদ্যান—
সঙ্কুচিত অস্তিত্বে অকাল শীত দিয়েছে কামড়, খুব ধ্যান
ক'রেও ঘ্যাখে না কোনোখানে ফসলের কোনো শীষ,
কখনো আসে না ভেসে এ তল্লাটে উর্মিল মধুর শিস্;
তাহ'লে পাখিরা মৃত সব? এখন তো ফুল শুধু,

পাথরের বোন, যতদূর দৃষ্টি যায় শূন্যতায় কাঁপে, ধু ধু ;
দিগন্তে দিগন্তে এলো ছেয়ে ছত্রাকের দল ; এলো এ কেমন কাল ?
চতুষ্পার্শে লভ্য নয় কোনো কিছু, এমনকি স্মৃতিরও আকাল।

চকিতে আবার বয় হাওয়া ভিন্নতর, বিকশিত স্মিত রোদ
মাটিতে আকাশে ডালে ডালে, সে নির্ভার ওড়ে, কী স্বচ্ছন্দ বোধ
এখন সত্তায় তার, কী প্রত্যাবর্তন ! পারবে যথেচ্ছ যেতে
এখন সে সহজেই, কুড়াবে সপ্রাণ শস্য নীলিমার ক্ষেতে।

রূপান্তর

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

কিরণ বাতাস ঢেউ কিংবা অন্য কোনও আন্দোলন
কিছুই ছিল না তবু অন্ধকার থেকে শুরু হলো
প্রস্তুতিবিহীন এক গন্ধের সহজ সঞ্চরণ,
যদিও প্রচ্ছন্ন নয়, কিন্তু তাকে আবার স্বচ্ছলও
বলা ভুল, অচিহ্নিত, অনির্দেশ্য বেপথু সূচনা,
যেমন শিকড় ঢেলে মাটির গভীরে গূঢ় পাখা
বনস্পতি মেলে দেয়, আকাশ আবৃত প্রযোজনা,
বিদগ্ধ শূন্যের গায়ে লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা
ক্রমশ রূপান্তরিত : মিশে যায় মসৃণ তরঙ্গে,
চলে গিয়ে ফিরে আসে মেঘে মেঘে, হয়তো তখনই
আরও বেশি স্পর্শময়, আশ্লেষে সঘন অঙ্গে অঙ্গে
গন্ধের মূর্চ্ছনা বাজে যেন দূরাগত প্রতিধ্বনি
আহ্নিক পুষ্পের মতো পুনরায় ফুটে ওঠে ধীরে
বাহুতে জাহুতে স্তনে সুষমার আশ্চর্য শরীরে।

ট্রাপিজ

নবনীতা দেব সেন

লক্ষ্যস্থির করা আছে, অথচ এ তীরন্দাজি নয়
এ তো ট্রাপিজের খেলা
দূরে কাছে দূরের দোলন।
অথচ, এ সূত্রহীন নিরালম্ব টানা ও পোড়েনে
কিছুই হবে না বোনা।
শুধু মহাশূন্য কেটে অবিরাম সর্পিল ঝুলন।

এবং যেহেতু নিচে, বহু শূন্য পার হয়ে, নিচে
উর্ধ্বমুখ, রুদ্ধশ্বাস, সংখ্যাহীন দর্শকের ভিড়
এবং নাইলনজাল পাতা নেই সভার সৌষ্ঠবে,
সাবধান! হাতের মুঠো হয়ে যাক লোহা
চরণে মরণ ঠেলে ফ্যালো।

চোখেরই নৈপুণ্য নয়, এই লক্ষ্যভেদে
সর্বাঙ্গে দক্ষতা চাই। মৃত্যুপণ করে দড়িখেলা।
আলগোছে ছুঁয়ে থাকা
ছন্দোবদ্ধ স্পন্দিত ত্রিকাল।

উদ্ভূত সেই পরিস্থিতিতে আমি যা যা করতে পারতাম

রফিক আজাদ

আমি তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে সারারাত আদর করতে পারতাম ;
যেমনটি করতে ইচ্ছে করতো দশ বছর আগে।

আমি তাকে উপেক্ষা করতে পারতাম ;
যেন তাকে কোনোদিন, কখনো, কোথাও দেখিনি।

মধ্যযুগের রাজা-রাজড়ার মতো তার স্বামী ও সন্তানকে মেরে ফেলে
তাকে নিয়ে ঘর করার চেষ্টাও করতে পারতাম ; কেননা, তখন
'ক্ষমতা'-নামে এক অন্ধ দানব আমার আজ্ঞাবহ ছিলো।

কিম্বা তার অসহায়, আশ্রয়-প্রার্থী, ক্ষুধার্ত স্বামী ও কিশোর
সন্তানের সামনেই তাকে আমি বলাৎকার করতে পারতাম।

কিন্তু এ-সবের কিছুই আমিই তাকে করি নি।

বৃষ্টি

রমাবাই দে

তোমার ডাক আমি শুনতে পাইনি
বৃষ্টির শব্দে
তুমি আমাকে ডেকেছিলে কি ?
বুঝতে পারিনি
বৃষ্টির শব্দে।
দেখেছো, জলের ফোঁটা কত ভারি
তবু তো ঝরেই চলেছে

নিউটন বলেছেন জানি
মাধ্যাকর্ষণ আছে
কিন্তু তার ব্যাখ্যাটাই আগে আমি
পুরোপুরি বুঝিনি
ভেঙ্গে গুঁড়াবে অথবা টোল খাবে
কিম্বা নানা বিকৃত ভঙ্গিমায়
মাটির সাথে মিলিয়ে যাবে
উর্ধ্বমুখী হয়ে চেয়ে দেখো
উপরের ঐ দৃপ্ত মেঘ
ক্রন্দনের ভারে কালো হয়ে আছে
তবু ঝরার পালা এখনো থামেনি।

তুমি আমায় ডেকেছিলে কি
এই বৃষ্টির মাঝে ?
আমি শুনতে পাইনি।

ফিরে দেখা

মিহির মুখোপাধ্যায়

দুবছর আগের কথা। সকালবেলা শেয়ালদা স্টেশনে এসেছি। ছ'টা বারো মিনিটের বনগাঁ লোকাল ধরব। তখন পৌনে ছ'টা। শীতের সকাল। শহরের ঘুম ভালভাবে ভাঙেনি। কিন্তু শেয়ালদার ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। ছোকরা হকারদের হাঁকাহাঁকি।

কেউ স্টেশন এলাকায় ঢুকলেই ছুটে এসে তিন-চারজন ঘিরে ধরবে। ওরা কিন্তু আমার কাছে আসে না। আমি রোজ এক বুড়োর কাছ থেকে কাগজ কিনি।

তেরো-চোদ্দ বছরের রোগা একটি মেয়েকে পাশে নিয়ে নর্থ প্লাটফরমের সামনে বসে বুড়ো। বসে বসেই ব্যস্ত হাতে পয়সা গোনে। টুকরো কাগজে পেনসিল দিয়ে হিসেব লেখে। আর মেয়েটি তখন সাজানো ইংরেজি-বাঙলা কাগজ থেকে তুলে তুলে খদ্দেরদের হাতে দেয়। আজও আমার হাতে কাগজ দিল। আমি পয়সা দেবার সময় একখানি সেকেণ্ড ক্লাশ ঘোড়ার গাড়ি কাছেই এসে দাঁড়াল। কাছাকাছি বয়সের চারপাঁচটি ছেলেমেয়ে, তিনজন মহিলা, একজন পাকাদাড়ির বুড়ো মানুষ নামলেন গাড়িটা থেকে। সঙ্গে প্রচুর লটবহর। এদের তদারক করছিল একজন শক্তসমর্থ যুবক। গাড়ির ভেতরে জায়গা কুলোয়নি বলে সে বসেছিল গাড়োয়ানের পাশে। তার মুখে কালো কুচকুচে চাপদাড়ি, চোখে সুর্মা, মাথায় গোল কাপড়ের টুপি, পায়জামা পাঞ্জাবি। দেখলেই বোঝা যায়, এরা সব বাঙলাদেশের যাত্রী। হাঙ্গামার সময় কলকাতা পালিয়ে এসেছিল। এখন দেশ স্বাধীন হবার পর, অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসায় আবার দেশে ফিরে যাবে। রোজ সকালে এই বনগাঁর গাড়িতে এরকম বহু পরিবারকে আমি ফিরে যেতে দেখি। সুতরাং তেমনভাবে কোন মনোযোগ না দিয়ে আমি স্টেশনের ভেতরে এলুম। ছ'টা বাজতে মিনিট দশেক বাকি। এখনো প্লাটফর্মে গাড়ি দেয়নি। আমি একটা বেঞ্চে বসে খবরের কাগজের বড় বড় অক্ষরগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিচ্ছি। একটু পরেই সেই পরিবারটি আমার কাছেই এসে গুছিয়ে বসল। সেই যুবাটি জিনিসপত্তর রাখার ফাঁকে ফাঁকে আমার দিকে তাকাচ্ছিল। আমি বেঞ্চির এককোণে বসে মুখের সামনে কাগজ ধরে ওদের লক্ষ্য করছিলুম। এক-সময় যুবাটি আমার সামনে এসে বললো,—স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—বলুন।

—আপনি কি কখনো বরিশালে ছিলেন?

আমতা আমতা করে বললুম—হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

মনে মনে তখন পুরনো স্মৃতির দরজায় ধাক্কা দিচ্ছি।

—আপনার নাম তপনবাবু না?

—হ্যাঁ, কিন্তু আমি তো ঠিক—

—আমি মুকুল, শামসুলকে মনে আছে আপনার? আমি শামসুলের ভাই।

মুহূর্তে স্মৃতির দরজা খুলে গেল। আর সেই খোলা দরজা দিয়ে একরাশ টুকরো টুকরো ছবি

শুকনো পাতার মত আমার সামনে ছড়িয়ে পড়ল। আমার সঙ্গে এক ক্লাশে পড়তো শামসুল। ক্লাশ ফাইভে এসে প্রথম ভর্তি হয়েছিল। প্রথম দিনের কথা মনে আছে। মনে রাখার মত ঘটনা। প্রথম ঘণ্টায় শচীপতিবাবুর ইংরেজির ক্লাশ। বাঘের ক্লাশ। আমরা সব কেঁচো হয়ে বসে আছি। উনি পড়া ধরছিলেন। যে কোন বেঞ্চি থেকে এক-একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করছেন।—ইউ, ইউ, স্ট্যাণ্ড আপ। তারপর ইংরেজিতে প্রশ্নোত্তরের পালা। তারপর ইংরেজি শব্দের বানান এবং বাংলা মানে বলতে হবে। কার পালা কখন আসবে, আন্দাজ করা যায় না। সে কারণে সকলেই সমান উদ্বিগ্ন। চল্লিশটা ছেলের ক্লাশে সূচীপতন নৈঃশব্দ্য। এমন সময় একটি ছেলে গটগট করে ক্লাশে ঢুকল। আমাদের চেয়ে মাথায় কিছু লম্বা, বয়সেও দু-তিন বছরের বড় হবে। ধোপদুরস্ত পায়জামা-পাঞ্জাবি, পাম্প-শু। ঘাড়ে-গলায় পাউডার। চোখে সুর্মা, গায়ে ভুরভুরে সুগন্ধ। এবং নতুন জুতোর মচমচ শব্দ। ক্লাশে ঢুকে কাউকে কিছু না বলে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে একেবারে লাস্ট বেঞ্চিতে রজনী পণ্ডিতমশাইর নাতি ভুদুর পাশে বসে পড়ল। আমরা হতভম্ব। শচীপতিবাবু ভয়ানক গম্ভীর মুখে ছেলেটির দিকে তাকালেন। অজিত দাশ ওরফে লেদু পড়া বলবার জন্য সবে দাঁড়িয়েছিল। ওই রকম একটা আবির্ভাব দেখে সব গুলিয়ে গেল। কিছু না বলেই দাঁড়িয়ে রইল। লাস্ট বেঞ্চে ভুদুর ডান পাশে বসেছিল মাখন বক্সী, বাঁ পাশে নতুন ছেলেটি। কয়েক সেকেণ্ডের আবহাওয়ার মধ্যে হঠাৎ মাখন মুখ নিচু করে খুক খুক করে হেসে উঠল। পরক্ষণেই একটা চাপা হাসির ঢেউ উঠল সারা ক্লাশে। আরো গম্ভীর গলায় হাঁক দিলেন শচীপতিবাবু,—সাইলেন্স, চুপ, চুপ করো সব। আবার সব চুপচাপ। আলপিন পড়লে শোনা যায়—শচীপতিবাবু আবার খনখনে গলায় হাঁক দিলেন,—এই তুমি, তুমি উঠে দাঁড়াও।– নির্বিকার ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়াল ছেলেটি।

—তোমার নাম কী?

—শামসুল হক।

—তুমি কি আজই নতুন ভর্তি হয়েছ?

—জী।

—আগে কোন্ স্কুলে পড়তে?

—রহমতপুরের পাঠশালায়।

রহমতপুর জেলাশহর থেকে আট মাইল দূর। শামসুলদের দেশের বাড়ি ছিল ওখানে।

আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন শচীপতিবাবু,—তোমার বাবার নাম কী?

আব্বার নাম বলেছিল শামসুল। শচীপতিবাবুর মুখচোখের চেহারা এবার নরম হল। কিছুটা সহজ গলায় বললেন,—ও, তুমি খলিফা সাহেবের নাতি।

সেকালে, অর্থাৎ তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে আমাদের সেই জেলা-শহরে খলিফা সাহেব বললে একডাকে সবাই চিনতো বাবন খলিফাকে। নামজাদা দর্জি। শহরের উপর তিনটে বড় বড় দর্জির দোকান। একটা নতুন বাজারে। একটা পুরনো বাজারের পাশে কাঠপট্টি রোডে। আর একটা আমাদের স্কুলের সামনে রাস্তার ওপারে। আমাদের ক্লাশঘরের জানালা দিয়ে ওদের দোকানের সাইনবোর্ড দেখা যেত। মস্ত সাইনবোর্ডে বড় বড় অক্ষরে শুধু শামসুলের দাদুর নামটা লেখা। বাবন

খলিফা। আর কিছু নেই। এটাই আমাদের কাছে অন্যরকম লাগত। অন্যসব দোকানের সাইনবোর্ডে কত কী লেখা থাকে। উত্তমরূপে অমুক করা হয়, তমুক করা হয়, পরীক্ষা প্রার্থনীয় ইত্যাদি। আর শামসুলদের তিনটে দোকানের তিনটে সাইনবোর্ড জুড়েই বড় বড় অক্ষরে শুধু ওই একটা নাম। বাবন খলিফা। আমাদের স্কুলের সামনে দোকানঘরের পেছনে ওদের বাড়ি। আটচালা টিনের ঘর। তিন-চারখানা ঘর। তার মধ্যে দুটো দোতলা। যৌথ পরিবার। দুই চাচার ছেলেমেয়েদের নিয়ে অনেকগুলি ভাইবোন। শামসুলদের দুই চাচা দুই বাজারের দুটো দোকানে বসতেন। এই দোকানটা ওর আব্বা দেখাশোনা করতেন। চারটে সেলাইকল নিয়ে চারজন কারিগর কাজ করতো। আর শামসুলের আব্বাকে দেখতুম নিচু একটা তক্তপোশে লুঙ্গি আর ফতুয়া পরে বসে তালপাতার পাখা নেড়ে হাওয়া খাচ্ছেন। কাঁচাপাকা চাপদাড়ি, গোঁফ কামানো, মাথায় কদমছাঁট চুল। সবসময় মুখে পান। ফরসির নলে মুখ দিয়ে গুড়ুক গুড়ুক করে তামাক টানতেন আর মধ্যে মধ্যে হাঁক দিতেন,—ওরে আবু, আবু রে—

কখনো কখনো সেই হাঁক আমাদের ক্লাশঘর থেকেও শোনা যেত।

আবু ছিল দোকানের চাকর, তামাক সেজে আনত, ফাইফরমাস খাটত।

বাবন খলিফাকে আমরা কখনো চোখে দেখিনি। শামসুলের মুখেই শুনেছিলুন তিনি খুব বুড়ো হয়ে গেছেন। আশীর উপর বয়স। রহমতপুরে দেশের বাড়িতেই থাকতেন। আমরা বোধহয় ক্লাশ এইটে পড়ার বছর তিনি মারা গিয়েছিলেন। তখন হিটলারের যুদ্ধ সবে শুরু হয়েছে। সেই প্রথম দিন শচীপতিবাবু শামসুলকে আরো বলেছিলেন,—পায়জামা পাঞ্জাবি পরে ক্লাশে আসবে না, স্কুলের য়ুনিফর্ম পরে আসতে হবে। আমাদের স্কুলের পোশাক ছিল খাকী হাফপ্যান্ট আর সাদা হাফশার্ট। সব ওই বাবন খলিফার দোকানের তৈরী। শামসুল জবাব দিয়েছিল,—জী।

—কখনো জিজ্ঞেস না করে, অনুমতি না নিয়ে ক্লাশে ঢুকবে না।

—জী।

—অত পাউডার মাখবে না, আর আতর মেখে ক্লাশে আসবে না।

এতক্ষণে আমরা বুঝতে পারলুম শামসুলের গায়ে আতরের গন্ধ। যে রকম গন্ধ, তাতে দামী আতর বলেই মনে হয়েছিল।

ওদিকে শচীপতিবাবুর সব কথার উত্তরে শামসুলের এক জবাব,—জী। অর্থাৎ হ্যাঁ।

শেষকালে হুকুমজারি করেছিলেন শচীপতিবাবু,—আজ তুমি বাড়ি যাও, আজ তোমার ছুটি, কাল থেকে ঠিক সময়ে আসবে, যেভাবে বললুম সেইভাবে আসবে, আজ চলে যাও।

বইখাতা নিয়ে আবার সেই নির্বিকার ভঙ্গীতে চলে গেল শামসুল।

পরের দিন থেকে ঠিক সময়ে ক্লাশে আসতে শুরু করল। আমাদের মতই খাকী হাফপ্যান্ট, শাদা হাফশার্ট পরে আসতো। স্কুলের সামনেই ওদের বাড়ি। রাস্তার এপার-ওপার। সুতরাং একদিনও লেট হত না। একদিনও কামাই করত না।

শচীপতিবাবুর কথামত পাউডার মাখত না, আতরও নয়। তবে চোখে সামান্য সুর্মা লাগাত

আর মধ্যে মধ্যে দুই কানের ভাঁজে আতরমাখা তুলো গুঁজে আসত। আমরা সেই সুগন্ধি তুলো নিয়ে কাড়াকাড়ি করতুম।

ক্লাশের চল্লিশটা ছেলের মধ্যে বয়সে সকলের বড় আর সবচেয়ে লম্বা ছিল বলে ওকে ফুটবল টিমের গোলকীপার করেছিল বিনোদ। বিনোদ পাল ছিল আমাদের ফুটবলটিমের ক্যাপ্টেন। পাশের বাণীপীঠ স্কুলের ফাইভের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচের দিন আমরা দুটি গোল দিলুম। আমি ব্যাকে খেলতুম। গোলকীপার শামসুল। বিনোদ দ্বিতীয় গোলটি দেবার পর শামসুল নেচেকুঁদে কাদাভর্তি মাঠে গড়াগড়ি খেল। তারপর একতাল কাদা তুলে আমার মাথায় মুখে মাখিয়ে দিল। টুকরো টুকরো অনেক ছবি। অনেক স্মৃতির ভিড়।

ক্লাশ সেভেনের বছর মনে আছে, আমাদের সেই মফস্বল শহরে সুভাষচন্দ্র এলেন। দেশগৌরব বসু। তখনো তিনি নেতাজী হন নি।

আমরা সব ভলান্টিয়ারের দলে নাম লেখালুম। আমি, শামসুল, বিনোদ, লেদু, গোবিন্দ, মাখন। দাদাদের পেছন পেছন ঘুরছি। ফাইফরমাস খাটছি। পোস্টার সাঁটছি, ফেস্টুন টানাচ্ছি, তোরণ সাজাচ্ছি। কটা দিন খুব হইচই উত্তেজনা। বাণীপীঠ স্কুলের মাঠে মস্ত মিটিঙ হল। মনে আছে, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বাণীপীঠ স্কুলের হেডমাস্টার বৃদ্ধ রসরঞ্জনবাবু বক্তৃতা দিতে উঠে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলেছিলেন,—বাঙলা-মা-র নসু-উ। সুভা-ষ বসু। নসু অর্থাৎ আদরের ছেলে। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে বরিশাল জেলায় আদরের ছোট ছেলেকে নসু বলে ডাকত। আজকাল কী হয়েছে, জানি না।

সে বছর শামসুল ওদের দোকানঘরে সুভাষচন্দ্রের একখানি ছবি টানাল। কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র। শাদা ধুতি চাদর, মাথায় গান্ধীটুপি।

তারপর ক্লাশ এইট। আগেই বলেছি, সে বছর শামসুলের দাদু মারা গেলেন আর হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করলেন। শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

ক্লাশ নাইনে পড়ার বছর একদিন ক্লাসে এসে দেখি দারুণ উত্তেজনা। কী খবর? না শামসুলের বিয়ে। আমাদের সকলের বয়সই চোদ্দ-পনেরোর ঘরে। শামসুল কিছু বড়। ওর বয়স ষোল-সতেরো। বারো-তেরো বছরের একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে শামসুলের। এই আশ্চর্য খবরে সেই কিশোর বয়সে অদ্ভুত আনন্দ, বিস্ময়, মুগ্ধতা, উত্তেজনার নেশায় আমরা যেন মেতে উঠেছিলুম। হই-হই করে উপহারের জন্য চাঁদা উঠল। কয়েকখানা গল্পের বই আর একজোড়া ফাউণ্টেন পেন কেনা হয়েছিল। বউ নিয়ে বাড়ি এল শামসুল। বিকেলে আমরা নিমন্ত্রণ খেতে গেলুম। খুব আপ্যায়ন করেছিল আমাদের। তখন গ্রীষ্মকাল, গায়ে গোলাপজল ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করেছিল। আতরমাখা তুলো দিয়েছিল। খেতে দিয়েছিল কলা, শশা, তরমুজ, আম, লিচু, সন্দেশ, রসগোল্লা, দই। আর বরফ-দেয়া সরবৎ, ডাবের জল। যার যত খুশি খাও। গেলাশের পর গেলাশ। তারপর মিষ্টিমশলা-দেয়া মিঠে পান। খুব আনন্দ করেছিলুম। হাসি-ঠাট্টা-ইয়ার্কি, সব কিছু হল। কিন্তু শামসুলের বউ এর দেখা পেলুম না। আলাপ হওয়া তো দূরের কথা। ওদের বাড়িতে পর্দাপ্রথার খুব কড়াকড়ি। মেয়েরা বেশী বাইরে আসতো না। কখনো এলেও, আগাগোড়া বোরখা-ঢাকা। পরের দিন আমরা

শামসুলকে ক্লাশে ধরলুম,—কি রে, তোর বউ দেখালি না ?

—দেখাব।—আমতা আমতা করে জবাব দিয়েছিল শামসুল,—আর কয়েকটা দিন যাক, এখন নতুন বউ, বাড়ির সবাই চোখে চোখে রাখছে, একটু পুরনো হোক—তখন দেখাব। কয়েকটা দিন যেতে না যেতেই দেখলুম, কোনদিন যা করেনি শামসুল, নতুন বউএর টানে তাই আরম্ভ করল। ক্লাশ কামাই করতে শুরু করল। বরাবরই শৌখিন ছিল। এখন ওর আতরমাখা, স্নো-পাউডার ঘষার বহর আরো বেড়ে গেল। ক্লাশে এসে লাস্ট বেঞ্চে বসে ঝিমোত। রাতে ভাল ঘুম হয় না। এই নিয়ে আমরা ঠাট্টা করতুম,—কেন রে, ঘুম হয় না কেন ?

—খুব গরম, গরমের জন্য ঘুমুতে পারি না।

—আমরা সবাই পারি, তোর এত কিসের গরম রে ? মাখনের মুখে মজা-দেখার হাসি।

—ওর শরীর গরম। বিনোদের মন্তব্য,—বুঝিস না, দেহের গরমে ঘুমুতে পারে না, খুব করে ডাবের জল খাবি, বুঝলি শামসুল, শরীর ঠাণ্ডা থাকবে।

আমরা সবাই হাসতুম। শামসুলও লাজুক মুখে হাসত।

কোন কোন দিন প্রথম চার পিরিয়ড কোন রকমে কাটিয়ে টিফিনে বাড়ি চলে যেত। আর আসত না। কয়েকদিন পরে ক্ষেত্রবাবুর নজরে পড়ে গেল। আমাদের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ক্ষেত্রনাথ গুহ। বেঁটেখাটো গোলগাল চেহারা বটে, কিন্তু জবরদস্ত কড়া মেজাজের মানুষ। থার্ড পিরিয়ডে আমাদের ক্লাশ নাইনে অঙ্ক কষাতেন। অন্য ক্লাশেও দু-একটা পিরিয়ড নিতেন। কিন্তু বেশীর ভাগ সময় একখানি বেত হাতে নিয়ে সারা স্কুলময় গুটগুট করে ঘুরে বেড়াতেন। কোন্ ছেলে দুষ্টুমি করছে, কে ক্লাশ পালাচ্ছে, ছেলেরা ঠিকমত জল পাচ্ছে কিনা, ক্লাশ নোঙরা করছে কিনা, দেয়ালে কেউ কিছু খারাপ কথা লিখল কিনা, সব তদারক করে বেড়াতেন। এই ক্ষেত্রবাবু একদিন শামসুলকে পাকড়াও করলেন।

—ক'দিন ধরে লক্ষ্য করছি, তুই টিফিনে বাড়ি চলে যাস, আর আসিস না, ব্যাপারটা কী ?

—আজ্ঞে, দোকানে বসতে হয়, আব্বা ওসময় থাকেন না।

কথাটা ঠিক। শামসুলের এক চাচা দেশে গেছেন। সেজন্য কিছুদিন ধরে রোজ শেষ দুপুর থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কাঠপট্টি রোডের দোকানে গিয়ে বসতে হত শামসুলের আব্বাকে। এছাড়া মধ্যে মধ্যে কোর্ট-কাছারিতেও যেতে হত। ওদের দেশের বাড়ির জায়গা জমি সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমার তদ্বির করতে যেতেন। কিন্তু ওসব ওজর ক্ষেত্রবাবুর কাছে খাটবে না।

—তাহলে দোকানেই বসিস, ইস্কুলে আসার দরকার নেই। তোর আর লেখাপড়া হবেও না। গুরুবাক্য অমোঘ। ক্ষেত্রবাবুর কথাটা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল।

শামসুলের আর লেখাপড়া হয়নি। ওই ক্লাশ নাইনেই পড়াশোনায় ইস্তাফা দিয়ে পাকাপাকি দোকানে বসতে শুরু করেছিল। কিন্তু তার আগে বিয়ের প্রায় মাস দুই পরে আমাদের বউ দেখিয়েছিল।

বাড়ির লোকেরা কেউ টের না পায় গোপনে বউএর মুখ দেখতে হবে। আষাঢ় মাস। গ্রীষ্মের ছুটির পর স্কুল খুলেছে। শামসুলদের বাড়ির পেছনে খিড়কির পুকুরে চারপাশ ঘিরে আম-জাম-

জামরুল নারকেলের বাগান। টিফিনের সময় সেই বাগানে জামরুল গাছের নিচে আমরা পাঁচজন জুটেছি। আমি, বিনোদ, গোবিন্দ, মাখন, ভুলু। ঝাঁ ঝাঁ দুপুর। কাছে পিঠে কেউ নেই। কাছাকাছি দুটো গাছে মুক্তোর মত থোকা থোকা জামরুল ঝুলছে। মাখন গাছে ওঠার তোড়জোড় করছিল। গাছে উঠে ডাল ঝাঁকাবে। আমরা তলায় কুড়োবো। বারণ করল শামসুল।

—গাছে ওঠার দরকার নেই, আঁকশি এনে দিচ্ছি। বাড়ির ভেতর কাকে কী যেন বলে এল। একটু পরেই দেখি খিড়কির দোর দিয়ে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। আগাগোড়া বোরখা-ঢাকা। একহাতে লম্বা আঁকশি আর একহাতে একটি ছোট বেতের ধামা। ফর্সা দুই হাতে সবুজ কাঁচের চুড়ির গোছা, রুপোর চুড়ি। খালি পায়ে রুপোর চুটকি, পায়ের কাছে শাড়ির সবুজ পাড়। পুকুর-পার ঘুরে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল। ধামা আর আঁকশিটা ঘাসের উপর নামিয়ে রেখে শামসুলের পাশে দাঁড়াল। জামরুল গাছটার কাছাকাছি আমরা পাঁচজন দাঁড়িয়ে আছি। একদম চুপচাপ। শামসুল বললো,—কি রে, কথা বলছিস না যে, সব চুপ করে গেলি কেন?

কী বলবো কিছু বলতে পারছি না। বোরখার জালির ভেতর দিয়ে একজোড়া কালো চোখ আমাদের লক্ষ্য করছিল, এটুকু বুঝতে পারছি। আর কিছু বোঝার উপায় নেই। হঠাৎ এক কাণ্ড করল শামসুল। আচমকটা বোরখার মুখের ঢাকাটা একটানে তুলে দিয়ে বললো,—এই দ্যাখ, আমার বউ। আমরাও হতভম্ব। মেয়েটিও তথৈবচ। কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। একখানি গোলগাল ফর্সা মুখ, চোখে সুর্মা, নাকে নাকফুল। কয়েক পলকমাত্র দেখতে পেলুম। তারপরই মেয়েটি জিভ কেটে এক ঝটকায় শামসুলের হাত ছাড়িয়ে একরকম ছুটে পালাল। পরক্ষণেই বাড়ির ভেতর থেকে শামসুলের আব্বার বাজখাঁই গলা শুনলুম,—ওরে আবু, দ্যাখ তো কারা ওখানে। আর দাঁড়াই আমরা! জামরুল খাওয়া মাথায় উঠল। যে যেদিকে পারলুম চোঁচা দৌড়।

আগেই বলেছি, ক্লাশ নাইনেই স্কুল ছেড়েছিল শামসুল। কিন্তু আমাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল না। ওদের দোকানঘরটি দুপুরে আমাদের ক্লাশ পালিয়ে আড্ডার জায়গা হল। সে সময় শামসুলের আব্বা থাকতেন না। কারিগরেরাও বাড়িতে খেতে যেত। কাজের চাপ কম। সুতরাং দুপুরের দু-তিন ঘণ্টা আমাদের অবাধ আড্ডার কোন ব্যাঘাত ঘটত না। বড় দোকানঘরটির মাঝে আরেক-খানি ছোট ঘর ছিল। সেখানে একটি তক্তাপোশ, দুখানি চেয়ার আর লম্বা দুটি আয়না ছিল। দর্জির দোকানের ট্রায়াল রুম। আমরা সেই ঘরে প্রথম সিগারেট টানতে শিখেছিলুম। লম্বা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে আমরা যুবক হয়ে উঠেছিলুম।

স্কুলের পরীক্ষা পেরিয়ে কলেজে ভর্তি হলুম। ব্রজমোহন কলেজ। কলেজে আমাদের ইংরেজি পড়াতেন কালো রঙের শান্তশিষ্ট এক অধ্যাপক। তিনি কোথাও বিশেষ যেতেন না। কারো সঙ্গে তেমন মিশতেন না। কলেজের কোন হইচই গোলমালের ত্রিসীমানায় তিনি থাকতেন না। খুব নম্র স্বভাবের লাজুক প্রকৃতির মানুষ। তাঁর নাম জীবনানন্দ দাশ।

যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ, এর মধ্যে কলেজের বছরগুলি পেরিয়ে এলুম। সামনে স্বাধীনতার সাফল্য। দিল্লীতে অন্তবর্তী সরকার গঠিত হল। সেই সরকারের মন্ত্রিসভায় মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে যে পাঁচজন যোগ দিলেন, তাদের মধ্যে আমাদের জেলা শহরের উকিল মণ্ডলমশাইর নাম দেখে আমরা

খুব অবাক হয়েছিলুম। যাকে আমরা রোজ কালো কোট গায়ে রিকশা চেপে কোর্টে যেতে দেখি। কিম্বা কতদিন মক্কেলহীন বৈঠকখানাঘরে বসে হাতপাখা নেড়ে হাওয়া যেতে দেখেছি। সেই মণ্ডলমশাই দিল্লীতে গিয়ে নেহেরু-লিয়াকত আলীর পাশে বসে মন্ত্রিত্ব করবেন। একথা ভাবতেই আমাদের যেন কেমন লেগেছিল। সে সময় আরো একটি ব্যাপারে খুব অবাক হয়েছিলুম।

একদিন শামসুলের দোকানে আড্ডা দিতে গিয়ে দেখি সুভাষচন্দ্রের ছবির পাশে জিন্নাসাহেবের ছবি। বেশ জমকালো ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। সাইজেও বড়।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম,—এ কি রে শামসুল? হঠাৎ এই ছবি?

—কায়েদে আজাম জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ। গম্ভীর গলায় জবাব দিয়েছিল শামসুল।

—সে কি রে, তুই না নেতাজীর ভলান্টিয়ার ছিলি?

—তখন ছেলেমানুষ ছিলুম, হুজুগে মেতেছিলুম, কিছু বুঝতুম না।

—তুই না নেতাজীর ভক্ত?

—আমি এখনো নেতাজীর ভক্ত, নেতাজী ফিরে এলে হয়তো দেশের চেহারা অন্যরকম হত, হয়তো আমরা পাকিস্তান চাইতুম না, কিন্তু কী হতে পারতো, তা নিয়ে আজ আর মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, এখন আমরা কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি, পাকিস্তান চাই, আমাদের বাঁচার জন্যই পাকিস্তান দরকার, নেহেরু নিশ্চয় ভালমানুষ, কিন্তু তাঁর ভালমানুষি আমাদের বাঁচাতে পারবে না, সত্যি বলতে কি, তোমাদের ওই প্যাটেলসাহেবকে আমরা বিশ্বাস করি না। বেশ উত্তেজিত শামসুল। ওর মুখে ওরকম কথা আগে শুনিনি কোনদিন। কী আর বলবো! আবাল্য বন্ধু আমরা। তর্ক করলে তিক্ততা বাড়বে। তাই চুপ করে গেলুম। দেশ ভাগ হয়ে গেল। দলে দলে লোক দেশছাড়া হতে লাগল।

শান্তি মিছিলে শামসুলের পাশাপাশি হেঁটে হেঁটে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে চেঁচিয়েছিলুম, 'হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই। পাকিস্তানে ভয় নাই।' কিন্তু ভয় না থাকলেও ভরসা ছিল না। কয়েকমাস পরে পাকাপাকি কলকাতা চলে এসেছিলুম।

তারপর প্রায় পঁচিশ বছর শামসুলের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। আজ এই শীতের সকালে শামসুলের ছোটভাই নুরুলকে দেখে সব মনে পড়লো। চার-পাঁচটি ভাইবোনের উপরে সবার বড় ছিল শামসুল। নরুলকে খুব ছোট দেখেছি। স্কুলের নিচু ক্লাশে যাতায়াত করত। ওর সম্বন্ধে আর কিছু মনে নেই। এতদিন পরে নিজে এসে পরিচয় না দিলে চিনতে পারতুম না।

বনগাঁ লোকাল লেট করে প্ল্যাটফর্মে এল। এখন সওয়া ছ'টা। হাতঘড়িতে দেখলুম পঁচিশ মিনিটও হয়নি, এর মধ্যে আমি পঁচিশ বছর পেছনে ঘুরে এলুম।

আরও মিনিট পনেরো পরে সাড়ে ছ'টায় ট্রেন ছাড়ল। নুরুল ততক্ষণে গুছিয়ে আমার পাশে বসেছে। আমি বাঁ ধারে জানালার পাশে। আমার ডানপাশে নুরুল। তারপর ওর তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। তারপর ওর বউ। তারপর ওর এক চাচা, চাচী। মুখোমুখি চাচার ছেলে, বউ, বউএর কোলে বাচ্চা। তিনপুরুষের সংসার। প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এসেছিল। এখন দেশ স্বাধীন হতে আবার ফিরে যাচ্ছে। কথায় কথায় নুরুল জানাল, ওর শ্বশুরবাড়ি পার্কসার্কাস। শ্বশুরের

দর্জির দোকান। সেখানেই ওরা ছিল গত কয়েকমাস।

শামসুলের খবর জিজ্ঞেস করলুম। আস্তে আস্তে সব খুলে বললো নুরুল। পাকিস্তান কায়েম হবার বছর দুয়ের মধ্যেই মোহভঙ্গ হয়েছিল শামসুলের। মাতৃভাষা, মুখের ভাষাই তার মনোভাব বদলে দিয়েছিল। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সে প্রথম থেকেই যুক্ত ছিল। প্রথমে আওয়ামী মুসলিম লীগ, পরে আওয়ামী লীগের সক্রিয় সদস্য। গতবছর, একাত্তরের মার্চমাসে ইয়াহিয়া খাঁর মিলিটারি নামল। গা-ঢাকা দিয়েছিল শামসুল। পুলিশের গোয়েন্দারা তিন মাসের মধ্যে তার পাত্তা করতে পারেনি। শেষে মরীয়া হয়ে উঠেছিল। মিলিটারির লোকেরা এসে শামসুলের দুই ছেলে রফিকুল আর জিয়াউলকে ধরে নিয়ে গেল। রফিকের বয়স চোদ্দ-পনেরো। জিয়াউলের দশ। মিলিটারির মেজর হুকুমজারি করে গেলেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শামসুল ধরা না দিলে ছেলেদের আর ফেরত পাওয়া যাবে না। খবর পেয়ে সেদিন বিকেলে বাড়ি এসেছিল শামসুল। বলতে বলতে নুরুলের গলা ভারী হয়ে এল। চোখের পাতা ভিজে উঠল,—আপনি তো জানেন কি রকম শৌখিন মানুষ ছিলেন, দামী শিল্কের পায়জামা, পাঞ্জাবি পরেছিলেন, সারা গায়ে আতর মেখেছিলেন, তারপর সকলের কাছ থেকে হাসিমুখে বিদায় নিয়ে, সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে একটা রিকশা ডেকে মিলিটারি ক্যাম্পে চলে গেলেন।

শামসুলকে হাতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ছেলে দুটিকে ছেড়ে দিয়েছিল মিলিটারিরা।

তারপর সন্ধ্যার সময় আরো কয়েকজনের সঙ্গে একটা দেয়ালের সামনে শামসুলকে দাঁড় করিয়ে একঝাঁক গুলি চালিয়েছিল।

শামসুলের সেই রক্তাক্ত শরীরের দৃশ্য আমি কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু নিশ্চিত জানি সেই আষাঢ়ের ম্লান সন্ধ্যায় সেখানে তখন রক্তের গন্ধ, বারুদের গন্ধ ছাপিয়ে আতরের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল।

বাঙালী কৃষক ও বাঙালী রেনেসাঁস : ১৮০০-১৮৫০

রমাকান্ত চক্রবর্তী

১৮০০ থেকে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়টি ছিল তথাকথিত বাঙালী রেনেসাঁসের আদিপর্ব। বাঙলাদেশের কৃষক সম্পর্কে বাঙালী রেনেসাঁসের নেতাদের চিন্তাধারার মৌলরূপ এ সময়ে তাঁদের কথায়, কাজে, এবং রচনায় প্রকাশিত হয়। আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথমে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উল্লেখ করা প্রয়োজন। পলাশীর যুদ্ধের (খ্রীঃ ১৭৫৭) আগে থেকেই কিছু সুযোগ-সন্ধানী বাঙালী ইংরাজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেদের সুবিধা করতে থাকে। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে থেকে এদের কেউ বা হলো বানিয়ান, কেউবা দেওয়ান, কেউবা ইজারাদার-জমিদার, কেউবা মুন্সী, কেউবা তালুকদার। বংশ-কৌলীন্য এদের ছিল না। তাই অর্থ-কৌলীন্যকে এরা ক্রমশ বড় করে তুলল। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এদের একরোখা উন্নতির যুগ। অর্থাৎ অনিবার্য ভাবে এদের সামাজিক ক্ষমতা বেড়ে যায়। তাই একাধিক সহকর্মীর বিরোধিতা সত্ত্বেও কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে এইসব 'নবরঙ্গকুলপতি' 'খাজনা-পরিদর্শক'দের বানালেন জমির মালিক, এবং দেশের চাষীদের হর্তাকর্তাবিধাতা। যদিও সরকারি নথিপত্রে কোন প্রমাণ নেই, তবুও সন্দেহ হয়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম করার আগে কর্নওয়ালিস প্রতিনিধিস্থানীয় দেশী দালালদের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। তার কিছু পরোক্ষ প্রমাণ অবশ্য আছে। টিপু-সুলতানের পরাজয়ের পরে কর্নওয়ালিস কলকাতায় ফিরে এলে কলকাতার ১৬২ জন প্রধান 'নেটিভ' তাঁকে বাংলা ও ফারসিতে মানপত্র দিয়েছিলেন। কর্নওয়ালিসের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠ ছিল, এই মানপত্র থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়। [*Selections from Calcutta Gazettes*, Vol. III, Ed. Seton-Karr, Pp. 342-44] দ্বিতীয়ত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম হওয়ার পরে সরকার সে বিষয়ে জমিদারদের অভিমত জানতে চেয়েছিলেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আসল উদ্দেশ্য ছিল সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব সুনিশ্চিত এবং সুনির্দিষ্ট করা। কিন্তু বাঙলার নব্যধনীদের সহযোগিতা ছাড়া তা করা অসম্ভব ছিল। শাসনযন্ত্র ছিল অত্যন্ত দুর্বল। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বনিয়াদ তখন নড়বড়ে। কোম্পানির উদ্দেশ্য ছিল এ-দেশের টাকা এ-দেশে সাম্রাজ্য বিস্তারে খরচ করা। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর রচিত অর্থনৈতিক ইতিহাসে একাধিকবার এ কথা বলেছেন; ডিগ্‌বি ও দাদাভাই নওরজী তাঁর এ বক্তব্য সমর্থন করেছিলেন। এ কথার যাথার্থ্য এখনও অবিচলিত। টাকাটা যখন এখান থেকেই আসবে, তখন এখানকার নেটিভ মাতব্বরদের হাতে রাখা কর্নওয়ালিস যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রায়তের কথা ভেবে করা হয় নি। কোম্পানির সঙ্গে রায়তের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। পরশুরাম-বর্ণিত 'পাপ তো হবে কাসেম আলী'র নীতি অবলম্বন ক'রে কোম্পানি কৃষকদের শোষণ করার কাজে জমিদারদের নিয়োগ করল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের সঙ্গেই হয়;

অর্থাৎ কোম্পানির হাত গরিবের রক্তে রাঙা হবে না। কৃষকদের শোষণ করবে জমিদার; কোম্পানি তার সিংহভাগ পাবে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, কোম্পানি 'বাহাদুরের' দালাল জমিদাররা অশেষ যোগ্যতার সঙ্গে এই নোংরা কাজ করেছিলেন। পেয়েছিলেন প্রচুর বখরা। বে-আইনি খাজনা আদায়, ১৭৯৯-র পর থেকে কিস্তির দিনে খাজনা দিতে না-পারলে প্রজার সম্পত্তি এবং শস্যের ভাগ ক্রোক করা, খাজনা পেলেও তাকে নানা ছুতোয় চাষের জমি থেকে উৎখাত করা, তাকে মহাজনের খপ্পরে ঠেলে দেওয়া, ক্রীতদাস করা, এসব জমিদাররা নির্ভয়ে করেছিলেন। বিক্রমপুর অঞ্চলে কৃষকদের আত্মবিক্রয় এক সময় একটি প্রথা হয়ে যায়। সেখানকার কালীপাড়ার জমিদার-বংশে এক সময় ৩০০ ক্রীতদাস প্রতিপালিত হতো। ১১৯১ বঙ্গাব্দের একটি দলিলে দেখা যায়, মাত্র ৩১ টাকা পেয়ে একটি চাষী স্ত্রী-পুত্র সহ নিজেকে কালীপাড়ার বাঁড়ুয্যেদের কাছে বিক্রি করেছিল। [হিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত "বিক্রমপুর" (২), পৃঃ ১০-১১] কবিগান, বাই-নাচ, টপ্পা ও আখড়াই গান, বুলবুলির লড়াই, পক্ষীর দল, পূজা পার্বণ এবং জাতিভেদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, চরম বিলাসী, অলস এবং ভাঁড় ও উমেদার পরিবৃত সমকালীন 'জমিদার' বাবুদের কৃষকপ্রীতির একটিও বিশ্বাসযোগ্য নিদর্শন নেই। 'থাকি মনের সুখে হাস্যমুখে কে কার রাখে খোঁজ', এই ছিল তাদের মনোভাব। অনেক পরে হুতোম প্যাঁচা লিখেছিলেন, 'বাঙলার নব্যধনীরা ঢাকাই কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে পরতেন; মুক্তাভস্মের চুন দিয়ে পান খেতেন; ভেঁপু বাজিয়ে গঙ্গাস্নানে যেতেন, এবং কুকুরের বিয়েতে লাখ টাকা খরচ করতেন। রাঢ় অঞ্চলের জমিদারদের জীবনযাপনের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন পঞ্চানন মণ্ডল, লিখেছেন: 'জলেশ্বরের ধোলাই ধুতি পরিয়া মদিরা সহযোগে খানার শেষে কুরসিতে বসিয়া সালমৌতে মাথা তামাক টানিতে টানিতে আফিমের মৌতাতে গুমোট বরষায় ঝিমাইতেছেন, এই চিত্র দুর্লভ নহে।' ["চিঠিপত্রে সমাজচিত্র" (১), পৃঃ ২০০-২০১]

কিন্তু আর্তজনের সখা ছিল না বললে ভুল হবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম হবার আগেই রামপ্রসাদ ধনীদরিদ্রের ক্রমবর্ধমান ব্যবধানের বিরুদ্ধে মা কালীর কাছে জোরালো ভাষায় প্রতিবাদ জানান। তিনি লিখেছিলেন, 'কারো অঙ্গে শাল দোশালা, ভাতে চিনি দই / আবার কারো ভাগ্যে শাকে বালি, ধানে ভরা খই / কেউ বা বেড়ায় পাল্কি চড়ে, আমি বোঝা বই / ওমা! আমি কি দিয়েছি তোমার পাকাধানে মই'। রামপ্রসাদের বহু 'সাধন-সঙ্গীত'-এ মামলা-মোকদ্দমায় সর্বস্বান্ত হওয়ার ইঙ্গিত আছে, 'যম'-তুল্য শাসকদের নিপীড়ন কৌল রূপকের ভাষায় অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। গ্রামের কবিরাও এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন। জমিদারি উৎপীড়ন ও সর্বহারা চাষীর কষ্ট অষ্টাদশ শতকে রচিত বহু লোকগীতিতে বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু এ নিবন্ধে তার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। [ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক সংকলিত "প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা", চার খণ্ড।]

বাঙলা গদ্য-ভাষার অন্যতম স্রষ্টা উইলিয়াম কেরী রচিত "কথোপকথন" (১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ) নামক গ্রন্থে কৃষকদের দুর্গতির একাধিক বর্ণনা দেখা যায়। মহাজন-আসামি, মজুরের কথাবার্তা, খাতক-মহাজনি, সাধু-খাতকি, এবং জমিদার-রাইয়ত শীর্ষক অধ্যায়গুলিতে এসব বর্ণনা আছে।

গরিব কৃষককে মহাজন বলদ বিক্রি করে ধার শোধ করার উপদেশ দিচ্ছে, ধনী কায়স্থ মজুরকে দিয়ে কাজ করিয়ে তাকে তার প্রাপ্য মজুরি দিচ্ছে না; কিস্তির দিনে খাজনা দিতে অসমর্থ চাষী সাহ-মহাজনের কাছে যথাসর্বস্ব বন্ধক রেখে মাত্র ১০ টাকা ধার পাচ্ছে; মালগুজারির টাকা দিতে না পারায় নির্দয় জমিদার প্রজাকে কয়েদে পাঠাচ্ছে; জমাদার সেই প্রজাকে ধরে বলছে, চল্ বে চল্! প্রজা তাতে আপত্তি করলে জমিদার বলছে, যা বেটা তুই। আমায় জমি থাকিলে অনেক প্রজা পাইব। কেরী প্রসঙ্গে স্মরণীয়, জমিদারের অত্যাচার এবং প্রজাদের কষ্টের বিবরণ মিশনারিদের জানা ছিল। তাঁরা "হিন্দু" জমিদারদের কবল থেকে দরিদ্র প্রজাদের খ্রীষ্টান ধর্মের 'স্বর্গে' আকর্ষণ করার জন্য খুব চেষ্টা করেন। এইরূপ প্রচেষ্টার বহু বিবরণ পাওয়া যাবে লণ্ডন মিশনারি সোসাইটির পাদরি জর্জ গোগার্লি রচিত *The Pioneers* (London, 1871) নামক গ্রন্থে।

কেরী সাহেবের প্রায় বারো বছর পরে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার "প্রবোধচন্দ্রিকা"র একটি অধ্যায়ে বাঙালী চাষীর দারিদ্র্য বর্ণনা করেছিলেন। অসাধারণ এই বর্ণনা; সমকালীন কোনো বাঙলা রচনায় এমন বর্ণনা দেখা যায় না। অনেক পরে "সংবাদ প্রভাকর", "বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর", "তত্ত্ববোধিনী" প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনসমূহ মৃত্যুঞ্জয়ের বর্ণনাকে তথ্যে ও ভাষার ঐশ্বর্যে অতিক্রম করতে পেরেছিল কিনা সন্দেহ। লক্ষণীয়, মৃত্যুঞ্জয় নিজের ভাষায় বর্ণনা করেননি। একটি বিপন্ন, দুর্গত, এবং দরিদ্র কৃষকবধূর নিজের ভাষায় কৃষকজীবনের দুঃখ, বঞ্চনা ও জমিদারি শোষণের রূপ উদ্‌ঘাটিত করেছেন তিনি। স্বল্পপরিসর এই নিবন্ধে ইচ্ছা থাকলেও মৃত্যুঞ্জয়ের এই রচনাটির পূর্ণ উদ্ধৃতি সম্ভব নয়। কিছু কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি :

(ক) যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয় সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি কেবল উড়ি ধানের মুড়ী ও মটর, মসুর, শাক-পাত, শামুক, গুগলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি।... খুঁদ-কুঁড়া ফেণ আমানি খাই। শাক ভাত পেট ভরিয়া যেদিন খাই সেদিন তো জন্মতিথি। কাপড় বিনা কেয়ো পাচা ঠুকরিয়া যায় তেল বিহনে মাতায় [মাথায়] খড়ি উড়ে... বাসন গহনা কখন চক্ষেও দেখিতে পাইনা...

(খ) এ দুঃখেও দুরন্ত রাজা শুকা হইলেও আপন রাজস্বের কড়া গণ্ডা ক্রান্তি বটধুল ছাড়েনা। এক আদ দিন আগে পিছে সহে না... সুদ দাম দাম বুঝিয়া লয় কড়া কপর্দ্দকও ছাড়েনা।

(গ) যদি দিবার যোত্র না থাকে তবে সানা মোড়ল পাটোয়ারি ইজারাদার তালুকদার জমিদারেরা পাইক পেয়াদা পাঠাইয়া হাল যোয়াল কাল হালিয়া বলদ দামড়া গরু বাছুর বক্‌না কাঁথা পাত্‌রা চুপড়ী কূলা ধূচনী পর্যন্ত বেচিয়া গোবাড়িয়া করিয়া পিটিয়া সর্ব্বস্ব লয়।

(ঘ) মহাজনের দশগুণ সুদ দিয়াও মূল আদায় করিতে পারি না।

(ঙ) হে ঈশ্বর! দুঃখির উপরেই দুঃখ! ওরে পোড়া বিধাতা আমাদের কপালে এত দুঃখ লেখিস তোর কি ভাতের পাতে আমরাই ছাই দিয়াছি।

[ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, "মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী", পৃঃ ২৮৯-৯০]

এই কৃষকবধূটি মনগড়া কথা বলেনি। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে জমিদাররা পঞ্চাশ রকম বেআইনি খাজনা কৃষকদের কাছ থেকে জবরদস্তি করে আদায় করত। থ্যাকার নামক এক অভিজ্ঞ সরকারি কর্মচারী তার উল্লেখ করেছিলেন। [*Fifth Report,* p. 914] দ্বিতীয় দশকে, অর্থাৎ "প্রবোধ-চন্দ্রিকা" লেখার সমকালে এবং তার অব্যবহিত পরেও, চাষীর অবস্থা ভাল হয় নি। নীলচাষীদের অবস্থা কিছুটা ভাল ছিল। কিন্তু নীলের দাদন তারা যে মোটেই পছন্দ করত না, ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে বুকানন হামিল্‌টন তা লক্ষ করেছিলেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াল্‌টার হামিল্‌টন লিখেছিলেন: একজন ঠিকে চাষীর বার্ষিক বেতন ছিল মাত্র ৪ টাকা থেকে ৮ টাকা। ১৭৯৩ থেকে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কৃষির উৎপাদনযন্ত্রের দাম বেড়েছিল শতকরা ৭৫ ভাগ। ১টি গাভী, কিংবা ১টি বলদ কিনতে হলেই ঠিকে চাষীর সারা বছরের আয় নিঃশেষ হয়ে যেত। গ্রামের জলাশয়গুলি যত্নের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। অথচ, বন্যার ভয়ে চাষীরা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-বলদ-ছাগল-গরু সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করত। [*Description of Hindostan.* (Delhi, 1971) Vol. I, Chapter on Bengal] ইতিমধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধুপানের লোভে জমিদার-তালুকদার ছাড়াও আরো অনেক অলি জুটেছিল। ইৎমাদার, ঠিকাদার, ইজারাদার, পত্তনিদার, জোতদার, গাঁতিদার, হাওলাদার প্রভৃতি 'দার'-জাতীয় মধ্যস্বত্বোপভোগী ভ্রমরের দল কৃষকদের গায়ে হুল ফুটিয়ে বেশ বড়লোক হয়ে যায়। সরকার-বাহাদুর ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের "অষ্টম রেগুলেশন" বানিয়ে এদের কৃষকশোষণ আইনের আওতায় নিয়ে আসেন।

ওদিকে ব্রিটিশ সিংহের দুর্দান্ত পরাক্রমে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠারা চিরকালের মত বিবরে প্রবেশ করল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রায় "চিরস্থায়ী" হয়ে উঠল। অমনি এ-দেশের ধনী, সম্ভ্রান্ত ভদ্র-লোকরা শিক্ষাবিস্তারের জন্য, অর্থাৎ ইংরাজি-ভাষার প্রসারের জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তার আগে এঁরা চুপচাপ বসেছিল; দেখছিলেন, কী হয়। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হল। ক্রমে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে এবং পক্ষে আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠল; স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারের জন্য দেখা গেল ব্যস্ততা। ব্রাহ্মধর্মান্দোলন প্রবল হলো; তার বিরুদ্ধে পয়সাওয়ালা বাবুরা হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করতে থাকলেন। এ-সব আন্দোলনের মধ্যে কৃষকদের কথা শোনা গেল না। কারণ শিক্ষিত, ধনী, এবং সাহেবদের আদুরে বন্ধু বাঙালী বাবুদের কানে তখন রেনেসাঁসের 'পায়ল' বাজছিল।

রাজা রামমোহন রায়, বাঙালী-রেনেসাঁসের জনক কৃষকদের অবস্থার বিবরণ জানতেন। এ বিষয়ে তিনি চিন্তা-ভাবনাও করেছিলেন। কিন্তু রামমোহন-রচনাবলীর বিপুল বিস্তারে রাজস্ব-বিষয়ক তাঁর রচনাসমূহ স্বল্প এবং অসম্পূর্ণ। বাঙলা গদ্যের স্রষ্টারূপে প্রখ্যাত রামমোহন এ-সব লেখা ইংরাজিতেই লিখেছিলেন। তাঁর রাজস্ব-বিষয়ক প্রত্যেকটি রচনা বিলেতে ছাপা হয়। তাঁর সমসাময়িক ভক্তরা এ-সব রচনার বঙ্গানুবাদের প্রয়োজনও অনুভব করেন নি।

তবুও রামমোহনই এ-বিষয়ে নতুন পথ দেখিয়েছিলেন। সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের ফলে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উৎপত্তি হয়, তাকে তিনি ঐ-সব আন্দোলনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ করে রাখতে চাননি। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে ঐ দৃষ্টিভঙ্গির সম্প্রসারণ তাঁর কাম্য

ছিল। তাঁর সাহসকেও সাধুবাদ দিতে হয়; কারণ নিজে বাঙালী জমিদার হয়েও তিনি বাঙালী জমিদার শ্রেণীর সমালোচনা করতে ভয় পাননি। অথচ, তিনি নিজে কিভাবে জমিদারি চালাতেন, তা জানা যায় না। তিনি কি 'আদর্শ' জমিদার ছিলেন? তাঁর জমিদারির প্রজাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কই বা কেমন ছিল?

জমিদারদের প্রজাপীড়নের উপায়গুলো রামমোহন জানতেন। তিনি জানতেন, জমিদাররা বেআইনিভাবে প্রজাদের আইনসঙ্গত অধিকার নষ্ট করে দিচ্ছিল, নিজের সুবিধামত জমির শ্রেণী-বিভাগ করে প্রজাদের ওপরে অতিরিক্ত খাজনার বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছিল, চাষীর সম্পত্তি ইচ্ছামত ক্রোক করছিল। তিনি জানতেন, প্রচলিত আইন এবং সরকার জমিদারদের স্বার্থরক্ষা করত, প্রজার স্বার্থ নয়। তিনি লিখেছিলেন, "The power of imposing new leases and rents given to proprictors by Reg I and VIII of 1793 and subsequent Regulations have considerably enriched comparatively a few individuals—the proprietors of land—to the extreme disadvantage or rather ruin, of millions of their tenants; and it is productive of no advantage to the government." [*Paper on the Revenue System of India*, Para 11] সাহসে ভরা কথা, সন্দেহ নেই। তথাপি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল্যায়নে রামমোহনের স্ববিরোধ একাধিক রচনায় সুস্পষ্ট। কিছু দৃষ্টান্ত:

(ক) উপরের উদ্ধৃতিতে তিনি বললেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নতুন ইজারা দেওয়ার অধিকার ও খাজনা আদায় করার অধিকার মেনে নেওয়ার ফলে সরকারের কাছে লাভজনক নয়। কিন্তু আবার বললেন, রায়তোয়ারি বন্দোবস্তের তুলনায় তা বিশেষ লাভজনক। [*The English Works of Raja Rammohan Roy*, ed. J. C. Ghose, Calcutta, 1901, Vol II, P. 100। অতঃপর এই বই শুধু *English Works* নামে উল্লিখিত হবে]

(খ) একবার বললেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির মালিকের অবস্থা ভাল হয়েছে, তাদের সম্পদ বেড়েছে। [*English Works*, P. 68, Q. 36] আবার বললেন, the generality (of land-holders) are by no means so favourably situated as is generally supposed. [*op. cit.* P. 104, No. IV]

দেশের সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে জমিদারদের সম্পদ বৃদ্ধির সম্পর্ক তিনি লক্ষ করেছেন। (*op. cit*, P. 68, Q. 36)

রামমোহনের রাজস্ব-বিষয়ক রচনাসমূহ পড়ে মনে হয়, [op. cit, Pp. 55-105] কৃষকদের দুর্দশা সম্পর্কে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু ঐ-ব্যবস্থায় সরকারের লাভ-লোকসান, দেশের সম্পদবৃদ্ধির সঙ্গে কৃষকদের দারিদ্র্যবৃদ্ধি, জমিদারদের অর্থনৈতিক অবস্থা, দেশের উন্নয়নে তাদের ভূমিকা, ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে চিন্তার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সুবিবেচিত এবং স্ববিরোধমুক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার আগেই তাঁর অকালমৃত্যু হয়।

তবু না-মেনে উপায় নেই, বাঙালী রেনেসাঁসের প্রথম উল্লেখযোগ্য নেতা রামমোহনই সবার

আগে বাঙালী কৃষকদের দুরবস্থা দূর করার জন্য কিছু কাজের কথা বলেছিলেন। [*Questions and Answers on the Revenue System of India,* Ans. to Q. 34] কৃষকদের আইনমোতাবেক দেয় খাজনার পরিমাণ আর কিছুতেই বাড়ানো চলবে না ; বিচারব্যবস্থাকে কৃষকের স্বার্থের অনুকূলে আনতে হবে ; কৃষকের স্বার্থে জেলার শাসনপর্যায়ে পরিচালক (executive) -ব্যবস্থা ও বিচার-ব্যবস্থার মধ্যে সীমারেখা টেনে দিতে হবে ; [op. cit P. 73, Q. 47] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপকারকৃষকদের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করতে হবে [Ibid, P. 103]—এইসব ছিল তাঁর প্রস্তাব। এখানে উল্লিখিত তাঁর শেষ প্রস্তাবটি ১৮৮৯, ১৮৯২ এবং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বার বার উত্থাপন করে। রামমোহন কিছু জরুরি সংস্কার সাধনের মাধ্যমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে আরো ব্যাপক ও জোরদার ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন ; তাঁর এই ধ্যান-ধারণা উনিশ শতকের বাঙালী রেনেসাঁস-এর অর্থনৈতিক আন্দোলনের প্রধান অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে।[১] তার পরে জমিদারি শোষণের সমালোচনা আরো তীব্র, তীক্ষ্ণ ও ব্যাপক হয়ে ওঠে ; নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনে পরে বাঙালী রেনেসাঁস থেকেই নেতৃত্ব আসে। কিন্তু দেশী জমিদারদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনাই হয়েছে ; অমঙ্গল, কিংবা উচ্ছেদ কামনা করা হয় নি।

কৃষকদের অবস্থা ও দেশের অবস্থা ভাল করার জন্য রামমোহন যে-সব আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন, তাতে একমাত্র ইংরাজদের ছাড়া আর কারু অবস্থাই ভাল হয়নি। রামমোহন বলেছিলেন, ইংল্যাণ্ডেই এ-দেশের প্রয়োজনীয় লবণ তৈরি করা উচিত, এবং এবং সেখানে তৈরি লবণ সস্তা দামে এখানে আমদানি করা উচিত। [J. K. Majumdar, *Rammohun Roy and Progressive Movements in India,* Pp. 467-469] তাঁর উপদেশ অনুসারে বিলেত থেকে সস্তা লবণ আমদানির ফলে প্রায় ছ'লাখ বাঙালী 'মলঙ্গী' (লবণ-কারিগর) বেকার ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়। (N. K. Majumdar, *Midnapur Salt Papers,* P. 146)

এদেশে ইউরোপিয়ানদের জমিদারি করার এবং অবাধে ব্যবসা করার অধিকার আদায়ের জন্য রামমোহন দ্বারিকানাথ ঠাকুর, (রবীন্দ্রনাথ 'দ্বারিকানাথ ঠাকুর' বানান লিখেছেন ; 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ', পৃ ৫৮ দ্রষ্টব্য) প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ রায় প্রভৃতি জমিদারদের সঙ্গে একজোট হয়ে আন্দোলন করেন। দ্বারিকানাথ-পরিচালিত এবং নীলরত্ন হালদার সম্পাদিত "ধনদূত" পত্রিকায় এই আন্দোলনের নাম দেওয়া হয়েছিল 'ক্লোনিজেসিয়ন' (!) অথবা 'কলোনাইজেসন্'-এর আন্দোলন। এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয় বিলেতে ; এই আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসা করার অধিকার রদ করা। [C. H. Philips, *The East India Company,* (1784-1834, P. 287-98] এই আন্দোলনে লণ্ডনের ইংরাজ বণিকদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। দ্বারিকানাথ ঠাকুরের এ-আন্দোলনে যোগ দেওয়ার বিষয়টি বোঝা যায়। তিনি সাহেবদের সঙ্গে ব্যবসা করতেন। তাঁর বেলগাছিয়া ভিলায় 'ছুরি-কাঁটার ঝনঝনি' নিয়ে ছড়া পর্যন্ত কাটা হয়েছিল। দ্বারিকানাথ উচ্চবিত্ত দেশীয় লোকদের সঙ্গে ইংরাজদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চেয়েছিলেন। [Kissory Chand Mitra, *Memoir of Dwarkanath Tagore,* Calcutta, 1870, P. 70-74] তিনি নিজেও নীলচাষ

করতেন, নিজেই তা স্বীকার করেছিলেন। [J. K. Majumdar, *op. cit.* Pp. 407-57] লণ্ডন, লিভারপুল, ম্যাঞ্চেস্টার-এর অবাধ বাণিজ্যনীতির সমর্থক বিলাতি ব্যবসায়ীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি থাকা অস্বাভাবিক ছিল না। জেরেমি বেন্থাম্-এর ভক্ত রামমোহনও অবাধ বাণিজ্যনীতির দোষ বিবেচনা না ক'রে সমকালীন পরিবেশে তার গুণই দেখেছিলেন। তা-ছাড়া ইংল্যাণ্ডের উদারনীতির সমর্থক রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতের মিল ছিল।

কিন্তু 'কলোনিজেশিয়ন' আন্দোলন করে তাঁরা ভুল করেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি তাঁরা চেয়েছিলেন। কিন্তু তার সঙ্গে ভূমি- ও রাজস্ব-ব্যবস্থার প্রশ্নও জড়িত ছিল। সে-প্রশ্নের উত্তর রামমোহন সংক্ষেপে দিলেন। জমিদারি শোষণ বন্ধ করার জন্য, এবং কৃষকদের অবস্থা ভাল করার জন্য সভা করলেন না, সমিতিও গঠন করলেন না; কিন্তু রামমোহন দ্বারিকানাথ এদেশে অবাধে সাহেবদের বাণিজ্য করার অধিকার ও জমিদারি করার অধিকার দাবি করে সভা করলেন। দ্বারিকানাথ প্রস্তাব আনলেন; রামমোহন তা সমর্থন করলেন। (J. K. Majumdar, *op. cit,* P. 438) জেরেমি বেন্থামের মতাশ্রয়ী কোন কোন লেখক, যেমন জেমস্ মিল্, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মেনে নিতে পারেননি। (Mill-Wilson, *History of British India,* Vol. V. Pp. 366-75) বলা হয়, রামমোহনও উপযোগবাদী (utilitarian) ছিলেন। কিন্তু সমালোচনা করেও তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মেনে নিয়েছিলেন, তার ওপরেই নির্ভরশীল ছিলেন। উপনিবেশবাদ-এর পক্ষে আন্দোলন সৃষ্টি করে রামমোহন ও দ্বারিকানাথ বিদেশী সাহেবদেরও ঐ বন্দোবস্তের আওতায় আনতে চাইলেন।

রামমোহন-দ্বারিকানাথ বললেন, সাহেবদের নীলচাষের ফলে দেশের ও দশের উপকার হচ্ছিল। রামমোহনের জীবনী-লেখকদের মধ্যে অনেকেই এই মত সমর্থন করেছেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, যুগপৎ নীলের চাষ শুরু হতেই দেশের মধ্যে দুরকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল—ভালো নীলকরের আশেপাশের লোকদের আর্থিক সাচ্ছল্য স্পষ্টতর হয়ে উঠল; কিন্তু অত্যাচারী দুর্বৃত্ত জমিদারদের ন্যায় নীলকরের অভাব ছিল না, সেখানে শোষণ পেষণ পুরোদস্তুর চলত। আমরা নীলচাষের এই নঙাত্মক দিকটার সঙ্গে সুপরিচিত। কিন্তু industrialization-এর অপর দিকটার প্রতি মনোযোগ দিইনি; "নীলদর্পণে" একপেশে কড়া বাস্তব রূপটা পড়ে। (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য', পৃঃ ২৫) তথাকথিত "ভালো নীলকর"-এর বিষয়টি স্পষ্ট নয়। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে নীলের দাদন সম্পর্কে বুকানান, হামিল্টন কৃষকদের ভীতি লক্ষ করেন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশপ্ হেবারকে নদীয়ার এক ব্রাহ্মণ যুবক বলেছিলেন, "The indigo is a fine thing to put money into the purse of the Baboo, but we poor people do not want to see it. It raises the price of rice, and the rent of land." (Heber, *Narrative of a Journey, etc.,* Vol. I, P. 113) সে-কালে John Crawford নামক লেখক ভারতে অবাধ বাণিজ্য-নীতির একজন সমর্থক ছিলেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি *A Sketch of the Commercial Resources and Monetary and Mercantile System of India* শীর্ষক একটি পুস্তিকা লেখেন; তাতে এক জায়গায় লিখেছেন, আরো অনেক কারণ সহ নীলের অবাধ ফাটকা-

বাজির অনিবার্য পরিণতি ছিল কলকাতা ও বোম্বাইর এজেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলোর পতন। হয়তো ঐ ফাটকাবাজির ফলেই কার-টেগোর কোম্পানির পতন হয়। রামমোহন-দ্বারিকানাথের সময়ে 'ভালো' নীলকররাও নীলের চাষ জনপ্রিয় করতে পারেনি। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ-অধিকৃত পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ক্রীতদাসপ্রথা বেআইনি হয়; সেখান থেকে কতগুলো সাহেব এখানে এসে নীলকর হয়, কারণ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের Charter Act তাদের এখানে এসে জমিদারি করার অধিকার দিয়েছিল। এদের কীর্তি-কলাপ আমাদের অজ্ঞাত নয় (Buchanan, *Development of Capitalist Enterprise in India*, Pp. 36-37) নীলচাষের নঙাত্মক দিক তখন স্পষ্টতর হলো; সমকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার সমালোচনাও হতে থাকল। এজন্য দীনবন্ধু মিত্রকে দোষ দেওয়া যায় না।

রামমোহন-দ্বারিকানাথ এবং তাঁদের বন্ধুরা সাহেবদের ভারতবর্ষে ডেকে এনে জমিদার বানাবার জন্য খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। রামমোহন *Remarks on the Settlement of India by Europeans* [*English Works*, Pp. 113-20] ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে House of Commons নিযুক্ত একটি Select Committee-তে পেশ করেন। সাহেবদের ভারতবর্ষে এসে বসবাস করার নয়টি গুণ তিনি গণনা করেন, যথা :

(ক) উন্নত কৃষিব্যবস্থা, (খ) ভারতীয়দের কুসংস্কারসমূহের দূরীকরণ, (গ) উন্নত, প্রগতিশীল বিচার- ও শাসন-ব্যবস্থা, (ঘ) শিক্ষা ও শিল্পের উন্নতি, (ঙ) ভারতের সঙ্গে ইউরোপের যোগাযোগের সম্প্রসারণ, (চ) ভারতীয় কৃষকদের জমিদার রূপ রাহুমুক্তি, (ছ) বহিরাক্রমণ থেকে ভারতের নিরাপত্তা বৃদ্ধি, (জ) ভারত ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে শক্তিশালী সম্পর্ক, (ঝ) ভারতবাসীর খ্রীষ্টান ধর্ম, ইংরাজি ভাষা, এবং সাহেবী আচার-ব্যবহার গ্রহণ এবং অনুসরণ, এবং তার ফলে ব্রিটেন থেকে ভারত কোন অভাবনীয় কারণে আলাদা হয়ে গেলেও উভয় দেশের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক বজায় থাকার সম্ভাবনা, এবং ধীরে ধীরে বৃটেন ও ইউরোপের সাহায্যে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার।

Assimilation নামক সামাজিক প্রক্রিয়া আধুনিক সমাজতত্ত্বের একটি মৌল ধারণা। কথাটির সংজ্ঞার্থ নির্দিষ্ট হয়েছে এ-ভাবে: 'Assimilation is a process of interpenetration and fusion in which persons and groups acquire the memories, sentiments and attitudes of other persons and groups, and by sharing their experience and history, are incorporated with them in a cultural life.' [R. E. Park & E. W. Burgess, *Introduction of the Science of Sociology*, 1924, p. 735] রামমোহন সাহেবদের সঙ্গে ভারতবাসীর এই assimilation চেয়েছিলেন; শব্দটির ব্যবহার ক'রে তিনি লিখেছিলেন: 'Such assimilation has in some measure taken place at Calcutta, from the daily communication of many of the respectable members of both communities.' [*English Works*, P. 74] Assimilation-এর ব্যাখ্যা করে Ogburn এবং

Nimkoff লিখেছেন : 'One process of assimilation is the suppression of parent culture. The other is the acquisition of new ways, including the new language.' [*Handbook of Sociology*, 1966, 105-106] রাজা রামমোহন যে 'suppression of the parent culture' প্রস্তাব করেছিলেন, নিদেনপক্ষে তার চারটি প্রমাণ দাখিল করা যায়।

(ক) তিনি ইউরোপিয়ান ও ভারতীয়দের 'assimilation'-এর জন্য 'a strong and vigorous police in every village' প্রস্তাব করেছিলেন। [*English Works*, P. 74) বিদেশী সরকার দেশওয়ালিদের এ দেশে ডেকে এনে শক্তিশালী পুলিসের সাহায্যে তাদের ভারতীয় বানিয়ে ফেলবে, রামমোহন নিশ্চয় এ রকম ধারণা করার মতো মূর্খ ছিলেন না। বরঞ্চ তার বিপরীত চিন্তাই স্বাভাবিক ছিল।

(খ) তিনি প্রথম কিস্তিতে, বিশ বছর ধরে, শুধু 'higher and better educated class of Europeans-দের এদেশে আমদানি করার প্রস্তাব করেন। [*English Works*, P 116] এখানে তাঁর স্ববিরোধ সুস্পষ্ট, কারণ তিনি মনে করেছিলেন, এ ধরনের সাহেবরা সহজেই ভারতীয়দের আত্মীয় হতে পারবে। Assimilation-কে তিনি এই প্রস্তাবে উভয় দেশের শিক্ষিত, ধনী, এবং সভ্যলোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন, অর্থাৎ ভবিষ্যতের শাসকশ্রেণীরূপে একটি সঙ্করশ্রেণীর উদ্ভব ইচ্ছা করেছিলেন।

(গ) তিনি প্রেসিডেন্সি আদালৎ-সমূহে 'European pleader'-দের নিয়োগ করার প্রস্তাব করেন। [*Ibid*. P. 117]

(ঘ) পূর্বোক্ত 'ক'-চিহ্নিত প্রস্তাবটি তিনি কমন্স সভার কাছে টোপের মত ক'রে ফেললেন এবং বললেন, 'yet, as before observed, if events should occur to effect a separation (which may arise from many accidental causes, about which it is vain to speculate or make predictions) still a friendly and highly advantageous commercial intercourse may be kept up between two free and Christian countries, united as they will then be by resemblance of language, religion and manners.' [*Ibid*, P. 119, P. 115-116]

এ-সব তথ্য থেকে যদি মনে করা যায় যে, ইউরোপিয়ানদের এদেশে এনে রাজা রামমোহন রায় 'suppression of parent culture' চেয়েছিলেন, অর্থাৎ ভারতীয় ধর্ম, ভাষা ও লোকব্যবহারকে 'Europeanize' করে ভারতীয় সভ্যতার মৌল এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তন চেয়েছিলেন, তবে কি ভুল হবে? যদি তা ভুল না হয়, তবে রাজা রামমোহন রায়কে আধুনিক ভারতের স্রষ্টা তো কোনরকমেই বলা যাবে না। [B. B. Majumdar, *History of Political Thought from Rammohan to Dayananda*, P. 46]

কিন্তু এই বাহ্য। রামমোহন-দ্বারিকানাথ ভেবেছিলেন, বর্ণবিদ্বেষ শুধু নিচুস্তরের অশিক্ষিত সাহেবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বারিকানাথ কোনকালে সাহেবদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন

কিনা, জানি না ; কিন্তু রামমোহন বেশ উঁচু স্তরের এবং উচ্চপদস্থ সাহেবের হাতে লাঞ্ছিত হন, এবং খোদ গভর্নর-জেনারেলের কাছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। ["সাহিত্য-সাধক চরিতমালা"-১৬, পৃ. ২৫-২৯] কর্নওয়ালিস্-প্রবর্তিত Native Exclusion Act-এর মাহাত্ম্যে কোম্পানির চাকরি ক'রে রামমোহন সেরিস্তাদার পর্যন্ত হতে পেরেছিলেন ; আরো ওপরে উঠবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। ভারতের গভর্নর-জেনারেল Marquess of Hastings হিন্দুদের সম্পর্কে লিখেছিলেন : 'The Hindoo appears a being merely limited to mere animal functions, and even in them indifferent." [R. C. Majumdar, ed. *The British Paramountcy and Indian Renaissance*, Vol II, Pp. 337-38]

দ্বিতীয়ত, একটি বিশেষ শ্রেণী হিসাবে জমিদারের মধ্যে খারাপ-ভালোর কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা ছিল না। অথচ তাঁদের মতে নীলকররা অন্যান্য জমিদারদের চেয়ে প্রজাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারে ভালো ছিল। এই মত নিয়ে বিতর্কের ঝড় ওঠে। তাছাড়া পরবর্তী ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, নীলকররা (দু-একটি ব্যতিক্রম সত্ত্বেও) ছিল প্রজার যম, এবং বর্বর।

তৃতীয়ত, রামমোহন-দ্বারিকানাথ ভেবেছিলেন—বিলিতি উদ্বৃত্ত মূলধন এদেশে নিয়োগ করা হলে এখানকার শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হবে। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের পরে বিলিতি মূলধনের কিছু কিছু অংশ এদেশে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু তাতে ফল কী হয় ? ঐতিহাসিক লিখেছেন, ১৮৩৩-এর পরেও 'the continuance of Indian national inferiority remained a cardinal maxim of British policy.' [*History of Bengal*, (C.U), P. 137] ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে মনট্গোমারি মার্টিন লক্ষ করলেন, ভারতের শিল্পোন্নয়ন দূরের কথা, বৃটিশ বণিকদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে ব্রিটেনের একটি 'agricultural farm' বানিয়ে রাখা। ভারতের কাঁচামাল বিলেতের শিল্পবিপ্লব সার্থক ক'রে তুলল। ভারতের গরিবদের ওয়েস্ট ইণ্ডিজে চালান করা হতে লাগল। ১৮২৫ থেকে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দুর্ভিক্ষে মারা গেল ৪০০,০০০ ভারতবাসী ; অথচ ভারতের শস্য সাহেবদের পেট ভরাতে লাগল। [R. P. Dutt, *India To-day* (1970) Part II, Ch. V]

এসব তথ্য থেকে যদি সিদ্ধান্ত করি যে দ্বারিকানাথ-রামমোহনের এই আন্দোলন ছিল সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক এবং জাতীয়তাবাদবিরোধী আন্দোলন, তবে নিশ্চয় ভুল হবে না।

শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহন-দ্বারিকানাথের উপনিবেশবাদী আন্দোলন যে প্রগতিশীল ছিল, তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন ; তিনি লিখেছেন, 'ইংরেজরা দলে দলে এসে পঙ্গপালের মত এদেশের মাঠ উজাড় করে খেয়ে যাক এ সর্বনাশী কল্পনা রামমোহনের মাথায় কখনো আসেনি, আসা সম্ভব ছিল না। ভারতবর্ষের অবনতি দেখে তিনি দুঃখে ও ব্যথায় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিলেন…' ইত্যাদি। [সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "ভারতের শিল্পবিপ্লব ও রামমোহন"] পৃ. ১১৩, রামমোহন-দ্বারিকানাথ তবে পরিণতি চিন্তা না করেই, কিংবা না জেনেই উপনিবেশবাদী আন্দোলন করেছিলেন ! এছাড়া আর কী বলা যায় ?

ইতিমধ্যে বাঙলার সমাজ-জীবনের উচ্চ ও মধ্যস্তরে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছিল। অনেক উল্লেখযোগ্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন ঘটে গেছে যার সুবিস্তৃত ইতিহাস বর্তমানে

আমাদের জানা। শিক্ষাবিস্তারের আন্দোলন, ধর্মসংস্কারের আন্দোলন, সমাজসংস্কারের আন্দোলন —এ-সব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তথাকথিত বাঙালী রেনেসাঁস-এর ভাবমূর্তি প্রকাশিত হয়। এ-সব আন্দোলনের প্রগতিশীলতা এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনস্বীকার্য। রামমোহন-দ্বারিকানাথ এ-সব আন্দোলনের নেতা ছিলেন ; যাঁরা ধর্মের সংস্কার চাননি, সতীদাহপ্রথাকে চিরস্থায়ী করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ, যেমন রাধাকান্ত দেব, শিক্ষাবিস্তারের জন্য সচেষ্ট হন ; এমনকি বিধবাদের চিতায় তুলে মারবার কুসংস্কারের ঘোরতর সমর্থক হলেও রাধাকান্ত দেব স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। দেখা যায়, রেনেসাঁসের আদিপর্বে প্রগতিশীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবধান ছিল না ; রামমোহন বিধবাবিবাহের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু বৈধ মদ্যপান তাঁর মতে ভদ্র ব্যবহার বলা যেতে পারত। তিনি লিখেছিলেন : 'বিধবার বিবাহ তাবৎ সম্প্রদায়ে অব্যবহার্য হইয়াছে সুতরাং সদ্ব্যবহার কহাইতে পারে না কিন্তু বিহিত মদ্যপান ও বৈধ হিংসা সল্লোকেদের মধ্যে অনেকের ব্যবহার্য অতএব তত্তৎ পক্ষে সে সর্বথা সদাচার ও সদ্ব্যবহারে গণিত হইয়াছে।" [দ্রঃ 'রামমোহন গ্রন্থাবলী" সাহিত্য পরিষৎ, (৬) 'পথ্যপ্রদান'] এই একটি উদ্ধৃতি থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, রামমোহনের মতে সামাজিক আচার ভাল কি মন্দ তার বিচারের একমাত্র উপায় লোকমত। এ-সব কূটতর্কের মধ্যে না-গিয়ে বলা যায়, এ-সব সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের ফলে বাঙলার কৃষকদের কোন উপকার হয়নি, এবং তাদের উপকার সাধনের জন্যও এ-সব আন্দোলন হয়নি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝাবার চেষ্টা করি।

(ক) ব্রাহ্মধর্মের কথা ধরা যাক। ব্রাহ্মধর্মান্দোলনে কৃষকের কিছু উপকার হয়নি। প্রথমত, এই আন্দোলনে তার কুসংস্কার দূরীভূত হয়নি। দ্বিতীয়ত, এতে তার ক্ষুধা মেটেনি, তার দারিদ্র্য দূর হয়নি। ব্রাহ্ম ঐতিহাসিকরাও ঠিক জানেন না, কবে মিশনারিদের অনুকরণে, গ্রামাঞ্চলে ব্রাহ্মধর্মের প্রসার হয়েছিল। যোগানন্দ দাস লিখেছেন : 'রামমোহনের ধারা তাঁহার জীবিতকালের মধ্যেই নগর ছাড়িয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের সময়ে গ্রামে প্রচারকার্য আরম্ভ হইয়াছে। পরে শুধু জমিদারীর পেয়াদা বরকন্দাজের মধ্যেই নয়, এই আন্দোলন গ্রামে আরো অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল।' ["রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন," পৃ. ৪৫] প্রথমত, যোগানন্দবাবু গ্রামে ব্রাহ্ম আন্দোলন শুরু হওয়ার তারিখ সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য মত প্রকাশ করেননি। দ্বিতীয়ত, তিনি প্রকাশ ক'রে ফেলেছেন যে, প্রথম দিকে 'জমিদারীর পেয়াদা বরকন্দাজের মধ্যেই' ব্রাহ্ম প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ, রামমোহনের মতাবলম্বী কোন 'প্রভু' অথবা 'শ্রীযুত' ব্রাহ্ম হলেন ; সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভৃত্যরাও ব্রাহ্ম হলেন। কিন্তু প্রশ্ন, ব্রাহ্ম জমিদার কি চাষীর খাজনা শুধু আইন-অনুসারে আদায় করতেন, নাকি তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন শরৎচন্দ্র-বর্ণিত 'রাসবিহারী' ? ["দত্তা" উপন্যাস দ্রষ্টব্য] ব্রাহ্ম 'পেয়াদা বরকন্দাজের' দল কি সত্যি সত্যি সচ্চরিত্র এবং ভদ্রলোক ব'নে গেল ? জেলা গেজেটিয়ার অনুসারে যোগানন্দবাবু পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চলে ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রসারের যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে দেখা যায়, কিছু জমিদার ও মধ্যস্বত্বোপভোগী জোতদার-জাতীয় লোক এই ধর্মের সমর্থক হয়, এবং কোথাও কোথাও দু-একটা বিদ্যালয় খুলে সাধারণ লোকদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের ভাণ করে মাত্র। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলা উচিত, গ্রামে ব্রাহ্মধর্মের প্রসার হওয়া

সম্ভবই ছিল না; তেত্রিশ কোটি গ্রাম্য দেবদেবীর 'ব্রাহ্মনিঃশ্বাস'-এ লুপ্ত হয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

(খ) এবার কৃষকদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে শিক্ষাবিস্তারের আন্দোলনের ফল কী দাঁড়িয়েছিল, দেখা যাক। রামমোহন সহ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধাভোগী বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ব্রিটিশ শাসনের গুণগানে পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা কি জানতেন না, তাঁদের সময় পর্যন্ত কোটি কোটি টাকা এ-দেশ থেকে লুটে নিয়ে, ১৮১৩ সালে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়ার মত মাত্র ১ লক্ষ টাকা কোম্পানি শিক্ষাবিস্তারের জন্য অনুমোদন করেছিলেন? সে-টাকাও কিভাবে খরচ হবে, তা ভেবে ঠিক করতেই শাসকদের দশ বছর সময় লাগল। শিক্ষার জন্য টাকা খরচ সম্পর্কে কোম্পানির নীতি বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক ফিলিপ্‌স্ লিখেছেন: 'No educational policy worth the name could be developed unless adequate funds were available . . . the home government enjoined the Bengal Government primarily to concern itself with quality rather than the quantity of education . . . It should be borne in mind [they said] that were the country to be studded with schools, they would be wholly unprofitable both to the Government and the people, unless the branches of knowledge taught in them were fully useful and their tendency to degenerate were dosely watched and provided against." [C. H. Philips, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, P. 247] জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার সরকার বাহাদুর একেবারেই পছন্দ করেনি। ব্রিটেন থেকে কর্মচারি এনে শাসন চালানোর খরচ বেড়ে যাচ্ছিল; তাই *Cambridge History af India*-র (Vol. VI, P. 109) মতে এদেশের লোকদের ইংরাজি শিখিয়ে কাজে লাগানর কথা কোম্পানির কর্তারা ১৮২২ থেকে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিশেষভাবে চিন্তা করেছিলেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানির ডাইরেক্টরগণ ঘোষণা করেছিলেন: 'The first object of improved education should be to prepare a body of individuals for discharging public duties.' [C. H. Philips, P. 248]। এই হলো কেরানি তৈরির কারখানাগুলোর সূত্রপাত।

রাধাকান্ত দেব, রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার এবং মিশনারিরা, শিক্ষাসঙ্কোচনের এই সঙ্কীর্ণ ও অনুদার নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেননি। রামমোহন রায় বিলাতি ভাষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির এত ভক্ত ছিলেন যে তিনি নিজের থেকে এ-সবের গুণগান গেয়ে, এবং সংস্কৃত ভাষা ও প্রাচীন ভারতের দর্শনসমূহের নিন্দা ক'রে লর্ড আমহার্স্টকে একটি পত্র লেখেন। (১১ই ডিসেম্বর, ১৮২৩) সরকার বাহাদুরকে শিক্ষাবিস্তারের জন্য আরো টাকা খরচ করার অনুরোধ করলেন না; তা তিনি দাবিও করলেন না। তিনি বললেন, যে-টাকা শিক্ষার জন্য খরচ করার কথা, তা কেবল ইংরাজি শিক্ষা প্রসারের জন্য খরচ করা হোক। এ-চিঠির উত্তরে লর্ড আমহার্স্টের তরফ থেকে রামমোহনের জ্ঞান-দান সম্পর্কে মন্তব্য করা হ'লো: '(The letter) is obviously written under an imperfect and erroneous conception of the plan of education and course of study...

that the defects and demerits of Sanskrit literature, and philosophy, are therein represented in an exaggerated light, and that the arguments in favour of encouraging native learning, as well as the positive obligation to promote its revival and improvement, imposed on the Government by the terms of the Act of Parliament . . . have been wholly overlooked by the writer.' General Committee of Public Instruction-এর সভাপতি জে. এইচ. হারিংটন ঐ চিঠি সম্পর্কে মন্তব্য করলেন: 'The application to Government against the cultivation of Hindu literature, and in favour of the substitution of European tuition, is made professedly on the part, and in the name of the natives of India. But it bears the signature of one individual alone, whose opinions are well-known to be hostile to those entertained by almost all his countrymen.' [ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস' (১), পৃ. ৬৭-৭১] মঞ্জুরির সমস্ত টাকাই একটি কলেজ খুলে, সাহেব মাস্টারদের দিয়ে, 'Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, and Anatomy' ইত্যাদি শেখাবার প্রস্তাব করলেন রাজা রামমোহন রায়। দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রচারের জন্য রামমোহন কী করেছিলেন? এ-প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, কলকাতার কিছু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোকদের নিয়ে তিনি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে Commercial and Patriotic Association নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এ-সভার কর্মকর্তাদের মধ্যে বাঙালী হিসেবে একমাত্র রামমোহনই ছিলেন; অন্যান্য সভ্যরা ছিলেন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, এবং তৎকালীন শেয়ার-বাজারের ব্যবসায়ী। যোগানন্দ দাসের মতে রামমোহন '১৮২৮ সালের বহু পূর্ব হইতেই স্টক এক্সচেঞ্জের সহিত যুক্ত ছিলেন।' [পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১২০; পাদটীকা] সে যাই হোক, Commercial and Patriotic Association-এর একটি উদ্দেশ্য ছিল 'to promote the work of sound and wholesome education among the native population...' কিন্তু এই উদ্দেশ্য আদৌ সফল হয়েছিল কিনা, তা জানা যায় না। লক্ষণীয় বিদ্যাসাগরও পরে বেদান্ত দর্শনকে 'false system' হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন; কিন্তু তিনি একা, নিজের চেষ্টায়, গ্রামে গ্রামে যে-ভাবে স্কুল-পাঠশালা খুলেছিলেন, নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য এবং জনশিক্ষার প্রসারের জন্য অক্লান্তভাবে যে-পরিশ্রম করেছিলেন, অন্যান্য বড়মানুষ বাঙালীদের মধ্যে তার নজির খোঁজ করা পণ্ডশ্রম। রামমোহন, রাধাকান্ত, দ্বারিকানাথ, নব্যবঙ্গ—এঁরা কৃষকদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য কী করেছিলেন? এঁদের শিক্ষামূলক চিন্তাধারায় কৃষকদেরও স্থান ছিল, প্রমাণের অভাবে এমন কথা বলা যায় না। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' বাঁশবেড়িয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পাঠশালা স্থাপন উপলক্ষে অক্ষয়কুমার দত্ত যে বক্তৃতা করেছিলেন, তাতে তিনি শুধু শহর অঞ্চলেই শিক্ষাপ্রসারের সীমাবদ্ধতার নিন্দা করেন, বঙ্গভাষার বিস্তার ও 'স্বজাতীয় ধর্ম' রক্ষার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন, এবং বলেন, 'কিয়ৎকাল গৌণে ইংরেজদিগের সহিত আমার দিগের কোন বিষয়ে জাতীয় প্রভেদ থাকিবেক না।'

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, এঁরা স্পষ্টতই পূর্বোক্ত উপনিবেশবাদী আন্দোলনের রামমোহনের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা অস্বীকার করেছিলেন, এবং রামমোহনের শিক্ষা বিষয়ক চিন্তাধারার দুর্বলতা উপলব্ধি করেছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত এই বক্তৃতায় বলেছিলেন, বাঙলা ভাষায় 'বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্রে উপদেশ প্রদান' করার জন্যই 'তত্ত্ববোধিনী' পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। (যোগানন্দ দাস, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৮-৪১)

প্রায় সমগ্র উনিশ শতক ধরেই বিদেশী সরকার এবং স্বদেশী জমিদারশ্রেণী কৃষকদের অজ্ঞানতার অন্ধকূপে চেপে রেখেছিল। নিজেদের বিলাস, আড়ম্বর, খানাপিনার জন্য কোটি কোটি টাকা বাঙলার জমিদাররা ব্যয় করে। মতিলাল শীল, রাধাকান্ত দেব, দ্বারিকানাথ ঠাকুর,—এঁদের এবং আরো কিছু বড় বড় জমিদারের দানধ্যানের বিবরণ অজ্ঞাত নয়। দ্বারিকানাথ 'ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটি'-তে এক লাখ টাকা দান করেন; তা সমকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রশংসিত হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'দ্বারিকানাথ ঠাকুরের তৎকালীন বিপুল ঐশ্বর্যের আমরা যথাযথ ধারণাই করতে পারি না; পিতৃদেবের মুখে শুনেছি যে, পিতামহ যখন বিলাতে অবস্থান করতেন তখন মাসিক তাঁকে লক্ষাধিক টাকা পাঠানো হত।' 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ', পৃ. ৫৮-৫৯] দ্বারিকানাথ ছাড়াও আরো অনেক ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি তখন ছিলেন। তাঁদের ধারণাতীত ঐশ্বর্যের তিলপরিমাণও লোকশিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয়নি; যদি হতো, তবে তার প্রচারে আকাশ কেঁপে উঠত। এ বিষয়ে সমকালীন একজন মাত্র জমিদারের 'বিদ্যোৎসাহিতা'র অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়, তিনি হলেন উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। [অম্বিকাচরণ গুপ্ত, "জয়কৃষ্ণ-চরিত," একাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।] তিনি নিঃসন্দেহে তাঁর জমিদারির মধ্যে স্কুল-পাঠশালা নিজের খরচেই চালিয়েছিলেন। কিন্তু দেশের মানুষের দুঃখে যাদের হৃদয় জ্ব'লে-পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছিল ব'লে মনে করা হয়ে থাকে, যে নব্যবঙ্গের গুণগান এখনও গীত হয়ে থাকে,—তাঁরা গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য কিছু করার মত মানসিকতাও তাদের ছিল না। 'সতীদাহ'-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের আন্দোলন, ব্রাহ্মধর্মান্দোলন, এসব আন্দোলন সমকালীন অবস্থার বিচারে প্রগতিশীল ছিল না—একথা কেউ বলবে না। কিন্তু এ-সব আন্দোলনের পেছনে যে-উদ্দেশ্য ও মনোবৃত্তি সক্রিয় ছিল, তা আসলে ছিল নিতান্তই নাগরিক; এ-সব আন্দোলনের অব্যক্ত উদ্দেশ্য ছিল মধ্যবিত্ত এবং জমিদার-তালুকদারদের মানসিক উন্নতি-বিধান। দেশের অগণিত গরিব এ-সব আন্দোলন সম্পর্কে কোন উৎসাহ বোধ করেনি, দেখায় নি।

অনেক বিষয়ে তথাকথিত 'নব্যবঙ্গ' বা Young Bengal-এর সঙ্গে রামমোহনের মিল ছিল না। প্রতিমা ভাঙবার জন্য নব্যবঙ্গ দলের কোন কোন যুবকের লাঠি হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো, অর্থাৎ iconoclasm, দিনদুপুরে গোলদীঘির ধারে বসে মদ্যপান ও গোমাংস ভক্ষণ, পৈতা ছিঁড়ে ফেলা,—এ-সব সত্যি সত্যি দেশব্যাপী অত্যাচার, প্রবঞ্চনা, অশিক্ষা, পরাধীনতার বিরুদ্ধে গভীর জীবনদর্শন ও উপলব্ধি থেকে স্বতঃ উৎসারিত প্রতিবাদ ছিল না, ছিল বালসুলভ চপলতা মাত্র। 'বিদ্রোহী' ডিরোজিওর শিষ্যরা নিজেদের পত্রপত্রিকায় মাঝে মাঝে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে দু-চার কথা

লিখেছেন ; তা ছাড়া, তাঁরা কৃষকদের অবস্থা ভালো করার জন্য কোন রকমের সক্রিয় অথবা তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন সৃষ্টি করেননি।

নব্যবঙ্গের মুখপত্র ছিল চারটি, যথা "পার্থেনন" (১৮৩০), "জ্ঞানান্বেষণ" (১৮৩১), "হিন্দু পাইওনীয়ার" (১৮৩৫) এবং বেঙ্গল-স্পেক্টেটর" (১৮৪২)। নব্যবঙ্গ অবাধ বাণিজ্যনীতির পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু 'কলোনাইজেসন' আন্দোলন এবং চিরস্থায়ী বন্দোব সম্পর্কে নববঙ্গের সকলেই একমত ছিলেন না। ১৮৩০-খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি 'The Colonization of India' নামে বেনামিতে একটি প্রবন্ধ *India Gazette*-এ ছাপা হয়। বিমানবিহারী মজুমদারের মতে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন নব্যবঙ্গের কোন লেখক। (B. B. Majumdar, *History of Political Thought etc.* P. 24) এই প্রবন্ধে সবরকমের উপনিবেশিকতার নগ্নরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছিল।

নব্যবঙ্গের অন্যতম নেতা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যৌক্তিকতা স্বীকার করেননি। তিনি তার তীব্র নিন্দা করেন। [Abhay Charan Das, *The Indian Ryot*, Calcutta, 1881 দ্রষ্টব্য] "জ্ঞানান্বেষণ" পত্রিকায় নীলকরদের নিন্দা করা হয়। [*India Gazette*, May 22, 1833 দ্রষ্টব্য] কিন্তু 'জ্ঞানান্বেষণ'-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কোন বিকল্প সম্পর্কে আলোচনা হয়নি। কৃষকদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য রামমোহনের প্রায় সব প্রস্তাব এই পত্রিকা আত্মসাৎ করে। [*India Gazette*, May 10, 1833]

কলকাতার বাসিন্দা নব্যবঙ্গ এক সময়ে উপলব্ধি করে যে কৃষকদের অবস্থা না-জেনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা করলে তা জোরদার হবে না। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এ-ব্যাপারে "বেঙ্গল স্পেক্টেটর" এগিয়ে আসে, এবং সে-বছরের ২৪শে জুলাই রায়তদের অবস্থা সম্পর্কে ৩০টি প্রশ্ন প্রকাশ করে। পাঠকদের কাছ থেকে এ-সব প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হয়। অনেক পরে পাদরি লং সাহেব এ-ধরনের *Five Hundred Questions* ছাপিয়ে প্রচার করেন। "বেঙ্গল স্পেক্টেটর'-এ হুগলীর 'মিয়াজান' নামক গরিব চাষীর ওপরে জমিদারের অত্যাচার বর্ণিত হয়। এই বিবরণে তৎকালীন পুলিশ, উকিল, এবং রাজস্ব-সংক্রান্ত বিচার বিভাগের জমিদার-তালুকদার-প্রীতি উদ্ঘাটিত হয়েছে। এখানেও রামমোহনের প্রভাব লক্ষণীয়। মিয়াজানের বিবরণ প'ড়ে মনে হয়, পুলিশ, উকিল ও বিচারক যদি তার প্রতি একটু সহানুভূতি দেখাতো, তবে তার তেমন কষ্ট হতো না। রামমোহন এ-কথাই বলেছিলেন। [বিনয় ঘোষ, "সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র," (৩), পৃ, ১১২-১৭, ১২৪-২৮, ২৬৯-৭১]

কৃষকদের স্বার্থে নব্যবঙ্গ চেষ্টা করলে একটি জোরালো আন্দোলন শুরু করতে পারত। তা করা হয়নি। নব্যবঙ্গের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাহেবদের মত ইংরাজি বলার ক্ষমতা অর্জন করা, iconoclastic আন্দোলন জোরদার করে তোলা, এবং তৎকালে প্রচলিত ব্রিটেনের বুর্জোয়া উদারনীতির এবং অবাধ বাণিজ্যনীতির জয়ঢাক পেটানো। যে-দক্ষিণারঞ্জন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নিন্দা করলেন, পরে তিনিই অযোধ্যা অঞ্চলে তালুকদারি ফেঁদে বসেন, সিপাহী-বিদ্রোহের সময় উত্তর প্রদেশের রাজভক্ত তালুকদারদের নিয়ে একটি সমিতি গঠন করেন। রামগোপাল ঘোষ ব্যবসায়ে চলে আসেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক "ডেপুটি" হন। এঁরা, অর্থাৎ নব্যবঙ্গ, কালক্রমে অবহেলিত, পদদলিত মিয়াজানদের কথা ভুলে যান।

রামমোহন-দ্বারিকানাথ পরিচালিত উপনিবেশবাদী আন্দোলনের সময় বাঙালী জমিদাররা দুই দলে ভাগ হয়ে যান; এই অনৈক্যের একটি কারণ ছিল 'ব্রাহ্ম' এবং 'হিন্দু' জমিদারদের ধর্মীয় দলাদলি। নীলকরদের সমর্থনে যেই রামমোহন-দ্বারিকানাথ কথা বললেন, অমনি 'স্বদেশী' জমিদারদের দেশপ্রীতি যেন উথলে উঠল। তাঁরা "সমাচারচন্দ্রিকা" এবং *John Bull* জাতীয় প্রতিক্রিয়াশীল পত্র-পত্রিকায় নীল চাষীদের কষ্ট, বিদেশী দ্রব্যের আমদানিতে এদেশের কুটীরশিল্পগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়া—এ-সব বিষয় নিয়ে লেখা শুরু করলেন। যেই দেখলেন, কায়েমি স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে চলেছে, অমনি দেশের জন্য এবং কৃষকদের জন্য তাঁদের দরদ উথলে উঠল। কমন্স সভার কাছে একটি আবেদনে তাঁরা নীলচাষের কুফল বর্ণনা করলেন। [J. K. Majumdar, *op. cit*, Pp. 432-33] অনেক নীলকর সাহেব অত্যাচারী ছিল; কিন্তু 'স্বদেশী' জমিদাররা কি সাধু ছিলেন? তাঁরা কৃষকদের মঙ্গলের জন্য কী করেছিলেন? পূর্বে উল্লিখিত ক্রফর্ড সাহেব লিখেছিলেন, ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে একজন বাঙালী চাষীর বার্ষিক আয় ছিল ৩০ থেকে ৪০ শিলিং। মাথা-পিছু করের বোঝা ছিল ৪ শিলিং ৬ পেনস্। মহাজনের কাছে টাকা ধার না-করে কোন কৃষকের পক্ষেই কিছু করা সম্ভব ছিল না। করভারে প্রপীড়িত, দীন-দরিদ্র, নিরন্ন বাঙলার কৃষক ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দেও ক্রফর্ডের মনোজ্ঞ ভাষায়, খেয়ে থাকত 'vilest food,···wild roots, herbs, insects.'

কিন্তু জমিদারদের মধ্যে এই ঝগড়াঝাটি বেশিদিন চলেনি। সরকারের কাছ থেকে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা আদায় করার জন্য এঁরা বিভেদ ভুলে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপন করলেন Zamindary Association of Calcutta। রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন,—এঁরা হাত মেলালেন। যাতে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই বিনা বাধায় বার্ষিক ২৯ টাকা চাঁদা দিয়ে এই সংস্থার সভ্য হতে পারে, সেভাবে এই সংগঠনের সংবিধান রচিত হল। শুধু 'possession of interest in the soil of the country' হলো সভ্য হওয়ার শর্ত। প্রজাদেরও এ-সংগঠনের সভ্য হওয়ার ব্যাপারে নিষেধ ছিল না। কাগজেকলমে রইল গণতান্ত্রিক কাঠামো; কিন্তু কার্যত এই সংগঠন হল শুধু জমিদারদের সংগঠন।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানত দ্বারিকানাথ ঠাকুরের উৎসাহে, এই সংগঠনটির নাম করা হলো Landholders' Society। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে নভেম্বর কলকাতার টাউন হলে Landholders Society-র একটি সভা হয়; দ্বারিকানাথ ঠাকুরের প্রস্তাব অনুসারে তার সভাপতি হন রাধাকান্ত দেব। এটি ছিল উদ্বোধনী সভা। অনেক সাহেব এতে যোগদান করেন। এই সভার পূর্ণ বিবরণ কিশোরীচাঁদ মিত্র রচিত *Memoir of Dwarkanath Tagore* (1870) গ্রন্থের পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে। তাতে দেখা যায়, কোম্পানির শাসনের প্রশংসা, জমিদারদের স্বার্থরক্ষার উপায় বার করা, এবং পুলিশ ও রাজস্ব বিষয়ক সংস্কারের দাবি—এই তিনটি ছাড়া, কৃষকদের সম্পর্কে, অর্থাৎ কৃষকদের ওপরে জমিদারি নিপীড়নের হ্রাসকল্পে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এক সাহেব বক্তা এ-সভায় বলেছিলেন: 'আমার বিশ্বাস, কোম্পানি সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছে (Hear! Hear!). আমার বিশ্বাস, কোম্পানি যথাশক্তি মঙ্গলময় কাজে লিপ্ত! কোম্পানি যে ভারতের কত উপকার করেছে তা বলা যায় না!—ইত্যাদি।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে 'ভূম্যধিকারী সভা' অথবা Landholders' Society-র কৃতিত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছিলেন : 'It gave to the people the first lesson in the art of fighting constitutionally for their rights, and taught them manfully to assert their claims and give expression to their opinions. Ostensibly it advocated the rights of the Zamindars, but as their rights are intimately bound up with those of the Ryots, the one cannot be separated from the other.' [B. B. Majumdar, *Indian Political Associations,* P. 25] দুঃখ হয় এই দেখে যে, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত অমন বিদ্বান ব্যক্তি কৃষকের স্বার্থ ও জমিদারদের স্বার্থের মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখলেন না! এই সংগঠনটির কার্যকলাপ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন, প্রজাদের এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি কী করেছিল, তা বলা মুস্কিল, তবে এই প্রতিষ্ঠানে দেশী-বিদেশী জমিদারদের সমভূমিতে মেলামেশা হয়েছিল। [তদেব]

রবীন্দ্রনাথ পাবনা কনফারেন্সের নেতাদের কৃষকদের প্রতি অবহেলার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে লিখেছেন : 'তখনকার দিনে দেশের পলিটিক্‌স্ নিয়ে যাঁরা আসর জমিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজনও ছিলেন না যাঁরা পল্লীবাসীকে এদেশের লোক বলে অনুভব করতেন।...আমাদের দেশাত্মবোধীরা দেশ বলে একটা তত্ত্বকে বিদেশের পাঠশালা থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন, দেশের মানুষকে তাঁরা অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করেন না।' ["রাশিয়ার চিঠি," পৃ. ২০-২১]

Landholder's Society এবং পরবর্তী Bengal British India Society-র কার্যকলাপ অভিনিবেশসহ বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের এই অত্যন্ত মূল্যবান বিশ্লেষণের যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যাবে। ১৮৩৯ সালে বিলেতে এদেশী জমিদারদের পক্ষে মাতব্বরি করার জন্য রামমোহনের বন্ধু অ্যাডাম সাহেব 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপন করেন। অ্যাডাম অবশ্য এদেশ সম্পর্কে অনেক খবর রাখতেন; শিক্ষা-বিষয়ক তাঁর *Report*-এর ঐতিহাসিক মূল্য অপরিমেয়। এই সোসাইটি বিলেতে Landholders' Society-র পক্ষে আবেদন-নিবেদন চালাতে থাকে। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারিকানাথ বিলাত যান। সেখানে সোসাইটির নেতা বাগ্মী জর্জ টমসনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। ১৮৪২-এর শেষে দ্বারিকানাথ টমসনকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। শেষ পর্যন্ত এককালের ক্রীতদাস-মুক্তি আন্দোলনের নেতা জর্জ টমসন পাকাপাকিভাবে কলকাতার জমিদারদের লণ্ডনস্থ এজেন্ট নিযুক্ত হলেন। টমসন এখানে এসে জমিদারি স্বার্থ এবং ব্যবসায়ী-উচ্চমধ্যবিত্ত স্বার্থের মধ্যে সংযোগ সাধনের চেষ্টা করেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, তিনি জমিদারি আন্দোলনের আওতায় ইয়ং বেঙ্গলের নেতাদের টেনে আনলেন। সেটা সম্ভব হলো দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সমর্থনে। 'নব্যদল' টমসন সাহেবকে সভাপতি ক'রে প্রতিষ্ঠা করল Bengal British India Society। এর সম্পাদক হলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। এঁরা বৃটিশ শাসনের স্থায়িত্ব চাইলেন, শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বনে 'জনগণের' যথার্থ অধিকার রক্ষা করতে চাইলেন, বিচারব্যবস্থা ও পুলিশ শাসনের সংস্কার দাবি করলেন। প্রচুর বঙ্গবাসী সাহেব এ-সভার সভ্য হলেন। জমিদারদের কথা না-হয় ধরলাম না। কিন্তু রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী,

চন্দ্রশেখর দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, যাঁরা 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' এবং "বেঙ্গল স্পেক্টেটর"-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁরাও কৃষকদের সম্পর্কে এই সংগঠনের মাধ্যমে কোন উল্লেখযোগ্য কাজ করার চেষ্টাই করেন নি। শুধু প্যারীচাঁদ মিত্র ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে *Calcutta Review* পত্রিকায় কৃষকদের দুরবস্থা সম্পর্কে একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন।

Landholders' Society-র জমিদার-সভ্যরা ভাবলেন, অল্প বয়সের সব বানিয়ান, ব্যবসায়ী, তালুকদার এবং 'ডেপুটি'র দল বুঝি Bengal British India Society বানিয়ে সাহেবদের কাছে 'দেশের প্রতিনিধি' রূপে হাজির হয়ে মাতব্বরি করার অধিকার বাগিয়ে নিল! তাঁরা ঐ-সোসাইটির সঙ্গে সহযোগিতা করলেন না! শেষ পর্যন্ত দু'টি সংগঠনই উঠে গেল আলস্য, অকর্মণ্যতা, এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে। পরে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে, ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হল দেশহিতৈষিণী সভা (National Association) এবং ভারতবর্ষীয় সভা (British Indian Association)। কৃষকদের জন্য এই দুই সভা সামান্যই কাজ করেছিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন: 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নীলচাষ সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন। ·· কিন্তু এককভাবে নীলচাষীদের সমর্থন তাঁরা করেন নি। ভূস্বামী, প্রজা উভয় মিলেই এই সভা। শ্রেণীবিশেষের স্বার্থ জড়িত বলে তাঁরা হয়ত তখন এ বিষয়ে আগ্রহ দেখান নি। পরে কিন্তু এই এসোসিয়েশন জমিদারশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায়ই ষোলো আনা অবহিত হয়েছেন।' ["মুক্তির সন্ধানে ভারত," পৃ. ৫৭]

আমাদের দেশের তৎকালীন জমিদারি সংগঠনগুলো এভাবেই গণতন্ত্রের এবং শান্তিপূর্ণ 'সংগ্রাম'-এর বাঁধা বুলি আউড়ে দেশের কোটি কোটি মানুষকে ঠকিয়েছিল। বহু বছর ধরে একটানা এ ধরনের সাংঘাতিক প্রবঞ্চনার দৃষ্টান্ত দুর্লভ। অথচ, তথাকথিত বাঙ্গালী রেনেসাঁসে এই সব সংস্থাগুলির স্থান অতি উঁচুতে।

উনিশ শতকের ত্রিশ দশক থেকে পত্র-পত্রিকায় বাঙালী কৃষকদের দুরবস্থা, এবং জমিদারি-তালুকদারি শোষণের তথ্যসমূহ আলোচিত এবং উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে। মার্শমান্-সম্পাদিত "সমাচার দর্পণ"-এ মাঝে মাঝে কৃষকদের খবর ছাপা হতো। নীলকরদের দৌরাত্ম্য, নীল-দাদনের ফলে কৃষকের দুর্দশা, বিলাতি সুতার আমদানিতে বিধবা "চরকাকাটনি"র সর্বনাশ, 'কলোনাইজেশন"-এর সম্ভাব্য পরিণতিস্বরূপ বাঙালী রাজমিস্ত্রী, 'বাড়ুই মিস্ত্রী', স্বর্ণকার, দরজি, নৌকা-ব্যবসায়ীদের বেকার হয়ে পড়া, 'তণ্ডুলের মূল্যবৃদ্ধিতে' বর্ধমানের এক কলুর বিশ বছরের যুবতী স্ত্রীকে বিক্রি করে দেওয়া—এ সব খবর মার্শমান্ অবজ্ঞা করেন নি। (দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা") ওদিকে নীলরত্ন হালদার সম্পাদিত "বঙ্গদূত" ব্রিটিশ শাসনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে 'গৌড় দেশের শ্রীবৃদ্ধি' নিয়ে গবেষণা করে। (১৩ই জুন, ১৮২৯)। বাঙালী জমিদারদের দুশ্চারিত্র্য, সর্বনাশা বিলাস-ব্যসন, স্বার্থপরতা, মূর্খতা প্রভৃতি দোষের বর্ণনা ও সমালোচনা ক'রে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন "কলিকাতা কমলালয়" (১৮২৩), "নববাবু বিলাস" (১৮২৫), "দূতী বিলাস" (১৮২৫) এবং "নববিবিবিলাস" (১৮৩০)। ভবানীচরণ পরে ধর্মসভার প্রধান কর্মকর্তা হন,

এবং ১৮২২ সালের ৫ই মার্চ থেকে তিনি "সমাচার চন্দ্রিকা" পত্রের সম্পাদনা করেন। রক্ষণশীল হলেও ভবানীচরণ জমিদারদের নৈতিক দুর্বলতার সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হন নি।

'বাবু' পরিচালিত কৃষকদের স্বার্থের জন্য 'সংগ্রাম' কালক্রমে কাগুজে লড়াইতে পরিণত হলো; এই লড়াইতে সমকালীন বাঙলা পত্র-পত্রিকার কিছু ভূমিকা ছিল। বিশেষভাবে ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত "সংবাদ প্রভাকর" (প্রথম প্রকাশ, ১১ই জানুয়ারি, ১৮৩১) এবং পরে "তত্ত্ববোধিনী" (প্রথম প্রকাশ ১৬ই আগস্ট, ১৮৪৩), ইংরাজি সাময়িক পত্রিকা *Calcutta Rcview* (১৮৪৩) জমিদারি অত্যাচার, দুর্নীতি এবং কৃষকের দুর্দশার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের ব্যাপারে সক্রিয় ছিল। কৃষকদের স্বার্থরক্ষার সংগ্রামে এ-সব পত্রপত্রিকার অবদান, জমিদার ও নব্যবাবুদের কলকাতায় সমিতি বানিয়ে আবেদন-নিবেদন করার তুলনায়, অনেক বেশি ছিল। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ তাঁর "সংবাদ ভাস্কর" পত্রিকায় মহাজনী কারবার-এর স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেন, এবং সাঁওতাল বিদ্রোহীদের সমর্থনে বৃটিশ অত্যাচারের নিন্দামূলক চিঠিপত্র প্রকাশ করেন (২৫শে নবেম্বর ১৮৫৬-র সংখ্যা দ্রষ্টব্য।) বিনয় ঘোষ লিখেছেন, 'গৌরীশঙ্কর যে বাস্তবিকই কতদূর সাহসী ছিলেন তা ভাস্করে প্রকাশিত এই পত্রখানি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। সমসাময়িক কোন পত্রিকায় এর তুলনা খুঁজে পাওয়া সত্যিই কঠিন।' ["সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র" (৩) পৃ. ৩৩৯-৪০ ; পৃ. ৫৫] গৌরীশঙ্কর বৃটিশশাসকদের আইন-মাফিক প্রজাপীড়নের নিন্দা করে লিখেছিলেন, 'রাজা প্রজাদিগের নিকট শঠতাপূর্বক ধনাপহরণ কার্যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যেরূপ সুনিপুণ হইয়াছেন পৃথিবীর কোন অংশে এতদ্রূপ সুদক্ষ রাজা আছেন কি না আমরা বলিতে পারি না।' (সম্পাদকীয়, ১৮৫৭, ৭ ফেব্রুয়ারি)

পাথুরিয়াঘাটার জমিদার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের অর্থে প্রথম প্রকাশিত, এবং কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত "সংবাদ প্রভাকর" নীলকর এবং তালুকদার মহাজনদের অত্যাচারের সমালোচনা করলেও জমিদারদের সমর্থক ছিল। এই পত্রিকার মতে মহাজনের হাত থেকে কৃষককে রক্ষা করার প্রধান দায়িত্ব ছিল সরকার-বাহাদুরের। বলা হয়েছিল, 'কেহ ২ ভূম্যধিকারিগণের প্রতি সকল দোষ অর্পণ করেন, কিন্তু প্রকৃত বিবেচনায় তাহা কোনমতেই গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না ; কারণ জমিদারেরা ভূমির নির্ণীত জমাই গ্রহণ করিয়া থাকেন।' [বিনয় ঘোষ, তদেব (১), পৃ. ৮৪, ৯৫]

সুবিখ্যাত "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র দৃষ্টিভঙ্গী কৃষকদের ব্যাপারে ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। এই পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। [বিনয় ঘোষ, তদেব (২), পৃ. ১০৮-১৩১] বিনয় ঘোষের মতে প্রবন্ধটি অক্ষয়কুমার দত্ত লিখেছিলেন। এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে অত্যন্ত শক্তিশালী ভাষায় ও সুন্দর বিশ্লেষণের সাহায্যে সমসাময়িক জমিদারদের কৃষক-শোষণের কলঙ্ক-লাঞ্ছিত চিত্রটি আঁকা হয়েছে। ১৮ রকমের দৈহিক অত্যাচারের বিবরণ থেকে শুরু করে নানাধরনের অর্থনৈতিক ও পুলিশি উৎপীড়নের বিবরণ অসাধারণ ভাষায় মর্মন্তুদ রূপে ফুটে উঠেছে। অথচ, প্রবন্ধলেখক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেও শোষণ বন্ধ করার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট ও ব্যবহারিক উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করেননি। তথাপি, তৎকালীন বাঙালী-কৃষকের দুরবস্থা বর্ণনামূলক দলিল হিসেবে এই প্রবন্ধটির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

জমিদারি অত্যাচার বর্ণনমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধের দুটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নব-মূল্যায়ন, এবং সংস্কার। দ্বিতীয়, জমিদারদের একটু সাবধান করে দেওয়া। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রচলিত জমিদারি আইনের কিছুটা সংস্কার করা হয়। প্রটেস্টান্ট পাদরিরা এই সংস্কার আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের রাজস্ব বিষয়ক নতুন আইনে প্রজাদের কাছারিতে নিয়ে এসে জমিদার ও জমাদারদের উৎপীড়ন বন্ধ হয়। বেআইনি খাজনা আদায়ের ব্যাপারে একটু অসুবিধা হতে থাকে। কিন্তু এই আইনে ঠিকে-চাষী বা ভাগচাষীর কোন সুবিধা হয়নি। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের রাজস্ব আইন মেনে প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১২৬৭ বঙ্গাব্দে "সংশোধিত নিয়মপত্র" নামক বিপুলকলেবর বই ছাপান। বইটিতে 'রঙ্গপুরাদি প্রদেশান্তর্গত' কতগুলি জমিদারির পূর্ণ বিবরণ আছে। এই বইয়ের ৪৫ পৃষ্ঠায় প্রজাদের চার কিস্তিতে (আষাঢ়, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন) খাজনা দেওয়ার বিধি বর্ণিত হয়েছে; বলা হয়েছে, 'যদিও আইনে প্রজার বাকী খাজানার নিমিত্ত শস্য ক্রোক বিক্রয় করণে ভূম্যধিকারীর সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে; কিন্তু তাদৃক্ ক্ষমতা জারী করাতে সর্ব্বদা প্রজাগণের ক্লেশ-সম্ভাবনা ও ব্যক্তি বিশেষের অবৈধ উপায়ের বিশেষ কারণ হইতে পারে, অতএব ঐরূপ শস্যাদি ক্রোক করা বিশেষ কারণ ব্যতীত কর্তব্য নহে।'

দেশী জমিদাররা বহুদিন আগে থেকেই নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার চেষ্টা করছিল। দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" নাটকে দেখা যায়, নীলকরদের অত্যাচারে একটি ভাল জমিদার বংশের সর্বনাশ হয়। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং 'হিন্দু' গিরীশচন্দ্র ঘোষ ও শিশিরকুমার ঘোষ নীলকরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। [দ্র. J. C. Bagal, *Peasant Revolution in Bengal*, Calcutta, 1953]

নীল-বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০)-এর নেতা ছিলেন কিছু বুদ্ধিজীবী, কিছু জমিদার, জোতদার এবং মহাজন। এ-ধরনের নেতৃত্ব নীল-বিদ্রোহকে একটি ব্যাপক প্রজা-বিদ্রোহে পরিণত হতে দেয়নি। বুদ্ধিজীবীরা জমিদারদের মধ্যে বহুকাল আগে থেকেই ভালমন্দের শ্রেণীবিভাগ করে ফেলেছিলেন। নীল-বিদ্রোহের ফলে 'ভাল' জমিদারদের ক্ষতি হোক্—এ তাঁরা চান নি। নীল বিদ্রোহের পরে 'স্বদেশী' জমিদাররা বহাল তবিয়তেই রইলেন। পাবনার প্রজাবিদ্রোহের (১৮৭৩) সময় রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছিলেন: 'It is a matter of regret, though not perhaps of surprize, that most of the leading newspapers of the Bengali Community should have taken an entirely one-sided view of the question, and passed unmitigated censure on the acts of the ryots of Pubna." (R. C. Dutt, *An Apology for the Pubna Rioters*, reprinted in *Nineteenth Century Studies*, No. 3) যে-সব পত্রিকা এককালে নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে, বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল, দেশী জমিদারদের বিরুদ্ধে পাবনার প্রজা-বিদ্রোহে তারা জমিদারদেরই সমর্থন করল।

শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের, এবং তাঁদের পরিচালিত পত্রপত্রিকার সমর্থনে দেশী জমিদারদের মধ্যে কেউ কেউ যে কত উদ্ধত হয়ে উঠেছিলেন, তার প্রমাণ, জমিদার প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত 'On the condition of the Bengal Ryot' প্রবন্ধ। এটি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে Bengal Social

Science Association-এর চতুর্থ অধিবেশনে পঠিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধে লেখক কৃষকদের দুঃখকষ্টের জন্য কৃষকদেরই দায়ী করেন, কৃষকদের মামলা-মোকদ্দমা করার তীব্র সমালোচনা করেন, এবং এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, কৃষকদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের কোনই প্রয়োজন নেই। আসলে মামলা-মোকদ্দমা ত জমিদাররাই করত। এক বছরে বর্ধমানের কৃষকদের বিরুদ্ধে ত্রিশ হাজার মামলা করেছিল, তারও নজির আছে। (*Calcutta Review*, Vol. VI, P. 318) তৎকালীন সরকার কৃষকদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য আগ্রহ দেখায় নি। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতি জেলায় মাত্র ১০০টি পাঠশালা প্রতিষ্ঠার জন্য বাৎসরিক হারে মাত্র বারো হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু গভর্নর গ্রাণ্ট সাহেব তার আগেই ঠিক করেছিলেন, এ-সব পাঠশালায় ইংরাজি শেখানো হবে না; 'he would restrict the improved course to the measurement of land, to some short Bengali grammar, and to the very first elements of Geography and Indian History.' এই ব্যবস্থাই চালু করেন গভর্নর বীডন্ সাহেব। (দ্র. Buckland, *Bengal under the Lieutenant Governors*, Vol I) প্যারী মুখুয্যের মত জমিদাররা কৃষকদের শিক্ষার জন্য এই সামান্য ব্যবস্থাও পছন্দ করেন নি। কৃষকদের পদতলে রেখে এই নিদারুণ শোষণের অবসানের সম্ভাবনা দেখা গেল না। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ভয়ে ভয়ে লিখলেন: 'কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে?' তিনি সরকারের কাছে সময় থাকতে আবেদন করলেন: 'আমরা এই দীন হীন ছয় কোটি বাঙ্গালী কৃষকের জন্য তাঁহাদের নিকট যুক্ত করে রোদন করিতেছি—তাঁহাদের মঙ্গল হউক। ইংরাজ রাজ্য অক্ষয় হউক। তাঁহারা নিরুপায় কৃষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।'

কৃষকদের সম্পর্কে তথাকথিত রেনেসাঁসের চিন্তা শেষ পর্যন্ত পূর্বের মত ঐ 'রোদন' এবং 'যুক্ত করে' আবেদনেই শেষ হল।

রাজনগর

অমিয়ভূষণ মজুমদার

বাগচীর ঘুম ভেঙেছে কিন্তু এখনও সে শয্যায়। রোজ সকালে ছটায় সে শয্যা ত্যাগ করে, আজ এখন সাড়ে ছটা বাজে। সে অসুস্থ বোধ করছে কি? বরং উল্টো। তার গায়ের উপরে হাল্কা কম্বল। শয্যার উপকরণে এ পরিবর্তনটা কালই ঘটেছে। বালাপোষের পশমী কম্বল। কারণ এখন নভেম্বরের মাঝামাঝি হলো। আর তা যেন সে অনুভব করছে। তার ভাব দেখে মনে হয় যেন বা আজ স্কুল বসবে না। এটা ভুল, কিন্তু হিসাব করলেও হাল্কা অনুভূতিটা নষ্ট হয় না। বরং উল্টো। কাল দেয়াল ক্যালেণ্ডার যেন তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে আগামী সপ্তাহে রবিবার ছাড়াও স্কুলের একটি বন্ধ আছে, তারপর রানীমার জন্মোৎসবের বন্ধ, তারপর স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা। আর তারপরই ক্রিস্টমাসের ছুটি। বেশ কাজ করার অবসর, বেশ খুসী হওয়ার সময়।

কখনও কখনও মনের মেজাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েই ঘটনা ঘটে। আধঘণ্টা আগেকার আয়নার দুষ্টুমির ঘটনাটা মনে করা যেতে পারে। সাধারণত বাগচী কেটের আগে শয্যা ত্যাগ করে। সুতরাং সে অসুবিধা রোজ হয়না আজ যা হয়েছিলো রাত্রিবাস নিয়ে। কারো রাত্রিবাস ল্যাভেণ্ডারগন্ধ মসলিনের শেমিজ হতে পারে যার বুকের কাছে চেরা, একটা ফিতেতে ধরে রাখা, যার ঝুল হাঁটু পর্যন্ত পৌছায় মাত্র। কেট নিশ্চিত ছিলো যে বাগচী ঘুমিয়ে আছে। উপরন্তু শয্যার দিকে পিছন ফিরেই আয়নার দিকে মুখ রাখা যায়। সুতরাং সে নিশ্চিন্ত ছিলো। কিন্তু আয়নার প্রতিবিম্বর মুখ তো শয্যার দিকেই। এবং সেজন্য বক্ষ-বর্তুল যার রং যেন হাতির দাঁতের এবং উরুর মসৃণতা যা যেন শ্বেতপাথরের তা বাগচীর সদ্য ঘুম ভাঙা চোখে পড়ে থাকবে।

এই সময়ে বাগচী ভাবলো এবারের ক্রিস্টমাস কেটকে নিয়ে কলকেতায় কাটালে হয়। গতবার রাজকুমার ক্রিস্টমাসে কলকেতায় যাবেন কথা ছিলো। তখন সঙ্গী হওয়ার নিমন্ত্রণ ছিলো। কিন্তু ব্যাপারটা তেমন ঘটেনি। রাজকুমার ইস্টারে গিয়েছিলেন।

হাত বাড়িয়ে কেটের পরিত্যক্ত বালিশটায় হাত রেখেছিলো বাগচী। এই পরিতৃপ্তির ক্ষণে শয্যা ত্যাগে বিলম্ব হলো এবং সে ভাবলো স্কুলের পরীক্ষার কথা, কারণ তা পরীক্ষা নেয়ার পরীক্ষা হতে চলেছে—নতুন এবং দুঃসাহসিক। পরে রলের চিঠির কথা মনে এলো কারণ তা নতুন বিষয়গুলোর মধ্যে সব চাইতে নতুন। কাল সন্ধ্যায় চরণদাস দিয়েছে চিঠিখানা।

বাগচী এখন ভাবলো বানানটা যাই হ'ক তার নামের উচ্চারণটা রলেই হবে। বানানের কথা আর বলো না। তার নিজের নামটা রলে যেভাবে লিখেছে ঠিকানায় তাতে সে চান্দরকাণ্ট বাকি হয়ে যায়। কিন্তু আসল কথাটা এই রলে এদিকে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে মিশন হাউস স্থাপন করতে চায়। চিঠির ভাষাটা ভদ্র, এবং সুরুতে রেভরেণ্ড ফাদার বাগচী থেকে শেষের কাইণ্ডেস্ট রিগার্ড পর্যন্ত ইংরেজিটা বিশুদ্ধ এবং মৃদু। কীবলের পরিচয় থেকেই এই চিঠি।

গৃহকর্ত্রী কেট প্রবেশ করলো, তার জ্যাকেটের হাতা গুটানো, কোমরে অ্যাপ্রন বাঁধা। বোঝা

যায় সে ব্রেকফাস্ট তৈরি করছিলো। বাগচীর ঘুম দেখে তার ফিরে যেতে ইচ্ছা হলো, কিন্তু সে সুযোগ ছিলো না। স্বতরাং সে শয্যাপ্রান্তে এসে ডাকলো বাগচীকে। বললো,—অতিথি এসেছে যে।

—কে? রলে নাকি? এই বলে উঠে বসলো বাগচী।

—রলে? কেট এই নতুন নামে অভ্যস্ত নয়। সে ভাবলো ধূমপানের পথিকৃৎ সার ওয়াল্টার রলের সঙ্গে নিজের পাইপকে যার এখনই খোঁজ পড়বে তাকে মিশিয়ে এই রসিকতা। সে বললো রসিকার স্বরে,—ওই যে যাঁর প্রার্থনা ও গড্ মেক্ মি এ সেণ্ট বাট নট ইয়েট্। (হে ঈশ্বর আমাকে নামে সন্ন্যাস দাও কিন্তু এখনই নয়।)

বাগচী অবাক হলো।—বলো কি? কে?

—দু-এক মুহূর্ত ভাবলো সে। তারপর হেসে উঠলো আন্দাজ করে।

—ব্রেকফাস্টে বসতে বলেছো নিশ্চয়ই। দেখো দেখি কি লজ্জা! কত বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছি।

কেট বললো,—ব্রেকফাস্টে বসবেন না। পরে নিজেই ভেবে বললেন পাছে আমরা ভাবি আমাদের ছোঁয়া খেতে বা আমাদের টেবলে বসলে ওঁর জাত যাওয়ার ভয়, সেজন্যই তোমার টেবলে বসে চা বা কফি এক কাপ খাবেন।

বাগচী বললো,—তা হলে তো ঠিক ধরেছি। ভদ্রলোক সব সময়েই ভেবে কথা বলেন, ভেবে কাজ করেন।

সে তোয়ালে নিয়ে গোসলখানায় যেতে যেতে দাঁড়ালো। কেটের চিবুকের নিচে দুই আঙুল রেখে বললো,—কিন্তু ও গড্ মেক মি এ সেণ্ট্ বাট্ নট্ ইয়েট্ এই প্রার্থনা প্রকৃতপক্ষে কার বলো তো?

—কেন, সেণ্ট টমাসের নয়?

বাগচী বললো, কেটের চিবুকটাকে ঈষৎ উঁচু করে,—আমার। রেভরেণ্ড বাগচীর।

বাগচীর বাইরের ঘরে যে বসেছিলো সে সর্বরঞ্জন প্রসাদকুসুম নিয়োগী। বাগচীর স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক। প্রায় এক বৎসর সে এই গ্রামে। কিন্তু এখনও অনেক পরিস্থিতিতেই তাকে নতুন বলে মনে হয়। কারো চরিত্র অদ্ভুত রকমে দানা বাঁধা থাকে। একবার দেখলেই যেন তাকে চিনে নেয়া যায়। কেট যা বলেছিলো তা অবশ্য তার বাইরের চেহারা দেখে। এর আগেও একদিন তাকে সর্বরঞ্জন প্রসাদ কুসুমের আসার কথা বাগচীকে জানাতে হয়েছিলো। সেদিন সে বলেছিলো সেণ্টফ্রান্সিস্ অব অ্যাসিসি। সর্বরঞ্জন প্রসাদের দিকে চাইলেই প্রথম যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা তার শ্মশ্রু; সেই সুপ্রচুর আবক্ষবিস্তৃত দাড়ি যা আকারপ্রকারে মহান্তেরই হতে পারে তা শুধু ঘনকৃষ্ণ বলে যেন ঘোষণা করছে এখনই তা শুভ্র হতে চায় না। তার পরনে কালো চীনাকোট এবং ডাচ্ ট্রাউজার্স। একেবারে কলকেতার আধুনিক কাটছাঁট। সম্ভবত তা ক্ষারে কাচা এবং ইস্ত্রি করাও হয় নি। যেন পোশাকটা ঘোষণা করছে সর্বরঞ্জন কতটা সাদাসিধে এবং মিতব্যয়ী কিন্তু অন্যদিকে কতটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ক্লিনলিনেস ইজ নেকস্ট্ টু গডলিনেস, তাতে সন্দেহ কি?

বসবার ঘরে ঢুকে নিয়োগিকে দেখে বাগচীর মনে পড়লো কেটের রসিকতা। সে প্রফুল্লবোধ করলো। কারো কারো রসিকতার ব্যঙ্গের আড়ালেই স্নেহ ভাবটাই বরং প্রবল।

সর্বরঞ্জন হেসে বললো (এখানে আমাদের বলে নেয়া দরকার বারবার তার এই পুরো নামটা

অর্থাৎ সর্বরঞ্জন প্রমাদকুসুম তা যতই আধুনিক হক এবং একেবারে ইংরেজদের নামের তিনটি সমাহার হলেও উল্লেখ করা অসুবিধার হবে।),—আমি একটু ভুল করেছি, সার, আমার ধারণা ছিলো আপনি ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করে থাকেন।

—ব্রাহ্মমুহূর্ত ? বাগচী চশমার কাচ রুমালে মুছে, চোখে দিয়ে, সর্বরঞ্জনের দিকে চাইলো।

—উপাসনার সেইটি প্রকৃষ্ট সময় নহে কি ? এবং যেহেতু আপনি ধার্মিক, সুতরাং উপাসনা করে থাকেন, এবং সুতরাং ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করতে অভ্যস্ত, এতে আর সন্দেহ কি ?

বাগচী বললো,—আপনি অবশ্যই ব্রাহ্মমুহূর্তেই উপাসনা করেছেন!

সর্বরঞ্জন মাথাটাকে একবার ডান কাঁধ আর একবার বাঁ কাঁধের উপরে ছোঁয়ালো। তার মুখে একটা উজ্জ্বল হাসি দেখা দিলো, অবশ্য সেই প্রচুর কালো দাড়ির মধ্যে হাসির পক্ষে যতটা উজ্জ্বল হওয়া সম্ভব। সে বললো,—ওটাই কি ডায়েরিতে দৈনিক হিসাবে জমার দিকে প্রথম অঙ্কপাত হয় না ?

ব্রেকফাস্টের আগে কেউ যদি বাড়ি বয়ে এসে প্রার্থনার কথা আলোচনায় আনে তবে তাতে একটা কৌতুকের দিক থাকে। কিন্তু ব্যাপারটা বাগচীকে চিন্তার বিষয়ও এনে দিলো। প্রকৃতপক্ষে তার প্রার্থনাগুলো কি সংখ্যায় অনেক কম হচ্ছে না ?

বাগচী যেন অপ্রতিভ ভাবে বললো,—নিশ্চয়ই প্রার্থনা সব সময়েই জমার দিকে পড়ে।—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার জমা অনেক কম।

সর্বরঞ্জন দাড়িঢাকা চিবুকটাকে উঁচুনিচু করলো। সে কি বিব্রত ? অথবা আনন্দিত ? বাগচীর তুলনায় প্রার্থনার ব্যাপারে অগ্রসর থাকায় সে মনে মনে একটা উল্লাসই যেন অনুভব করলো। কিন্তু সুশিক্ষা এ ধরনের উল্লাসকে গোপন করতে বলে না ? সুতরাং তা গোপন করতে গিয়ে যথেষ্ট বিব্রত বোধ করলো সে।

বাগচী বললো,—মিস্টার নিওগি, আপনার নিশ্চয় গুরুতর কিছু প্রয়োজন আছে। আপনি ইচ্ছা করলে এখনই তা বলতে পারেন। সঙ্কোচ করার কিছু নেই। আপনি কি স্কুলের নতুন পরীক্ষা-বিধি সম্বন্ধে কিছু বলবেন ?

সর্বরঞ্জন বললো,—আমি আপনাকে অন্য বিষয়ে কিছু বলতে এসেছিলাম, কিন্তু কথাটা যখন উঠে পড়লো তখন বলি। আজ তো স্কুলে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য পরীক্ষক নির্বাচন করা হবে। এই সুযোগে সম্পূর্ণ বিষয়টাকে আমি আপনাকে আর একবার ভেবে দেখতে অনুরোধ করবো কি ? এমন কি স্কুলের নবনিযুক্ত শিক্ষক শিরোমণি মশায়ও এই মত পোষণ করেন যে ব্যাকরণজ্ঞান না হলে, শব্দকে শুদ্ধভাবে না জানলে, বিদ্যাশিক্ষার কোন উপায়ই নেই। মৌখিক পরীক্ষায় কি ব্যাকরণ, বানান প্রভৃতি বিষয়কে ফাঁকি দেয়া হবে না ?

বাগচীর মনে পড়লো মাত্র কয়েকদিন আগে শিরোমণিকে সংস্কৃত পড়ানোর জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। স্কুল সম্বন্ধে তার অভ্যস্ত চিন্তায় যে কটি মানুষের কথা মনে আসে শিরোমণি এখনও তার মধ্যে একজন নয়।

বাগচী বললো,—এটা তো একটা পরীক্ষামাত্র কিংবা পরীক্ষার পরীক্ষা বলতে পারেন। যদি

আমরা দেখি এটা ব্যর্থ হচ্ছে তা হ'লে আগামী বছর থেকে পরিবর্তন করে পুরনো বিধিতে যাওয়া যেতে পারবে। তবে আমি এখনও বিশ্বাস করি হিমালয় কথাটাকে ঈকার দিয়ে লিখলে বা ভাবলে তার উচ্চতা কমে না, সে অঞ্চলের তুষারে এতটুকু হ্রাসবৃদ্ধি পায় না।

—কিন্তু এর একটা অন্যদিক আছে, সার, কিছুদিন পরে পুস্তকগুলি ভাষার ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠবে না?

—আমাদের এই ছাত্ররা যখন বই লিখবে তখন। সেটা খুব দূরবর্তী ব্যাপার—তা ছাড়া বানান কোন ভাষাতেই স্থির নয়।

—তাও যদি মেনে নেয়া হয়, কলকেতা থেকে পৃথক পথে চলে আমরা কি শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপারে আলোক থেকে সরে যাচ্ছি না অথবা প্রধান স্রোত থেকে বিযুক্ত হচ্ছি না? কলকেতায় যা হয় এখানেও কি তা হওয়া উচিত নয়? বিদ্যালয়-পরিদর্শককে এমন অবহেলা করা কি উচিত? বাগচী হাসলো, বললো,—বরং উল্টো। কলকেতার লোকসংখ্যা বেশী? তাদের সংস্কৃতিকে কি দেশের বলতে হবে নাকি? সেটা কি একটা ভয়ঙ্কর রকমে অস্বাভাবিক জায়গা নয়? সেখানে কি ইংরেজির কয়েকটা শব্দ জানাকে সংস্কৃতির লক্ষণ মনে করা হচ্ছে না?

নিওগি বললো,—সার, আপনার প্রশ্রয় আমাকে তর্ক করতে সাহসী করছে। ইংরেজি ভাষাকে শুদ্ধভাবে লিখতে পড়তে জানার উপরে নিশ্চয়ই জোর দেয়া হচ্ছে। কিন্তু তা কি অন্যায়? রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাত্মাগণ কি ইংরেজি শিক্ষার গুণগ্রাহী নন?

বাগচী বললো,—রাজা রামমোহন ও বিদ্যাসাগর উভয়ের পাণ্ডিত্য শ্রদ্ধার বিষয়, কিন্তু তাঁরা কি ইংরেজি কাব্য ইত্যাদি পড়ে পণ্ডিত? আমি তো শুনেছি রাজা রামমোহনের শিক্ষা সংস্কৃত আরবী ফার্সী প্রভৃতিতে এবং বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কাব্যালঙ্কার ইত্যাদিতেই জ্ঞানসমুদ্রস্বরূপ। কিন্তু আসল কথাটা তা নয়। আপনি কি এ গ্রামের চাষীদের সঙ্গে মিশেছেন? আপনি কি তাদের সঙ্গে ধর্ম নিয়ে আলাপ করেছেন কিংবা রামায়ণ মহাভারত নিয়ে। তা হলে দেখতেন তারা ধর্ম ও কাব্য সম্বন্ধে এত জানে এবং তা কখনও কখনও এত গভীর যে আপনি তাদের কখনই মূর্খ বলতে পারতেন না, বরং সংস্কৃতিবান বলে বিবেচনা করবেন, যদিও তারা এক অক্ষরও পড়তে জানে না।

—সেটা হয়তো কথকতা ইত্যাদির ফলে হতো। কিন্তু তাদের সেই জ্ঞানকেই কি আপনি কুসংস্কারের উৎস বলেন না?

—অনেকাংশে তাদের ধ্যানধারণা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন।

—তা হলে, সার, ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে কুসংস্কারহীন জ্ঞানলাভই কি আমাদের উচিত হচ্ছে না?

—কিন্তু ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে সে সুযোগ আমরা কতজনকে দিতে পারছি? আর আমাদের এ আলোচনাটাও পুরনো। যারা ইংরেজির বিদ্যাসাগর হবে তারা তা হোক। তার সংখ্যা ইংরেজদের দেশেও কয়েকজন মাত্র। কিন্তু ইংরেজের কুসংস্কারহীন জ্ঞান বলতে যা বুঝি তা সবই ব্যবহারিক বিষয়ে, সেটা শিখতে ওরা বইএর ভাষা মুখস্থ করে না। চাইছি যে আমাদের ছাত্ররা আপাতত ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কিছু জানুক—তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তাদের

কুসংস্কারাচ্ছন্ন জ্ঞান দূর করতে এবং আধুনিক জ্ঞানে পৌছে দিতে যে সময়ের ব্যবধান সেটা কমাতে চাইছি। শুধু ইংরেজি ভাষার উপরে জোর দিলে ইংরেজনবিশ একটা সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণী তৈরী হবে, যারা সকলকে মূর্খ মনে করার সুযোগ পাবে। সেকালের পণ্ডিতরা তবু তো এদেশের মানুষই ছিলো। সাধারণ যে কাব্য সম্বন্ধে ধর্ম সম্বন্ধে সহজভাবে জানতো তা তারা আরও গভীর ও বিশদ করে জানতো। এরা একেবারে অন্যদেশের হয়ে যাবে। এদেশে মূর্খ ছাড়া আর কেউ থাকবে না তখন।

এই বলে বাগচী হেসে উঠলো। কিন্তু আলোচনাটাকে গুটিয়ে দিতে সাহায্য করলো কেট। সে ঘোষণা করলো ব্রেকফাস্ট দেয়া হয়েছে। তখন আবার বাগচী নিওগিকে অনুরোধ করলো ব্রেকফাস্টের অংশ নিতে, বাকি আলাপটা টেবলে হতে পারবে বললো। নিওগি তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে জানালো প্রাতরাশ তার ইতিপূর্বে হয়ে গিয়েছে। আলাপের বিষয়টাকে এখন মুলতবী রাখা যেতো, কিন্তু যেহেতু কেউ মনে করতে পারে সে এতদূর কুসংস্কারাচ্ছন্ন যে ক্রিশ্চানদের সঙ্গে একই টেবলে বসতে অনিচ্ছুক, তা যে নয় তা প্রমাণ করার জন্যই টেবলে বসে এক কাপ কফি সে খাবে।

সুতরাং প্রাতরাশের টেবলে বসলো তারা, বাগচী, কেট, এবং নিওগি। এই সময়ে একবার মনে হয়েছিলো কেটের, নিওগির এই প্রমান করার ব্যাপারটা এদেশের খাওয়া-না-খাওয়ার সেই অদ্ভুত ব্যাপারেরই অংশ, কিন্তু যেভাবে নিওগি এই প্রমাণ করার সুযোগটাকে চেপে ধরছে তা হাস্যকর, কিন্তু সে টেবলে বসে এখন অতিথি এবং তাকে নিয়ে হাসা উচিত হবে না।

বাগচীর স্বভাবতই (অভ্যাসবশে) রলের চিঠিটার কথা মনে হলো। ব্রেকফাস্টে চিঠি পড়া অভ্যাস তখনও কারো কারো ছিলো। চিঠিটা তার পকেটেই। চামচ রেখে একবার সে পকেটে হাতও দিলো। কিন্তু চিঠি পড়তে গিয়ে এবং সে বিষয়ে চিন্তা করতে গিয়ে সে যদি অন্যমনস্ক হয় তাতে নিওগির প্রতি অনাদর দেখানো হবে। রলে লিখেছে সে এ অঞ্চলে একটা মিশন হাউস করতে চায়, এবং সে বাগচীর সাহায্য প্রার্থনা করেছে। কীবলের কাছেই বাগচীদের সংবাদ পেয়েছে সে। সংবাদের এই সারাংশ আবার মনে এলো তার।

কিন্তু সে সর্বরঞ্জনপ্রসাদের দিকে ফিরে বললো,—বলুন মিস্টার নিওগি, আমি কোন্ বিষয়ে আপনার কাজে লাগতে পারি। প্রকৃতপক্ষে আপনার দরকারী কথা না বলে আমরা এতক্ষণ অন্য কথা বললাম।

সর্বরঞ্জনপ্রসাদ বললো,—সমস্যা দুরকম সার। আমি গতকাল স্কুল থেকে বাড়ি যাওয়ার আগে এ বছরের ছুটির তালিকা এবং আগামী বৎসরের ছুটির তালিকার খবরটা দেখছিলাম।

বাগচী আগ্রহসহকারে নিওগির দিকে চাইলো।

—দেখলুম, রানীমার জন্মতিথির উৎসবের আগে লাল কালিতে নতুন একটা ছুটি বসানো হয়েছে রাসপূজা উপলক্ষে। এবং আগামী বৎসরের তালিকার খসড়ায় দেখলুম দুর্গাপূজা ছাড়াও কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ইত্যাদি তো আছেই, শিবচতুর্দশীর তিথিতেও দুদিন ছুটি।

বাগচী বললো,—রাসপূজার কথা আমার জানা ছিলো না। শিরোমণির অনুরোধে সেই উপলক্ষে একদিন ছুটি দেয়া হয়েছে। সেজন্যই বোধ হয় লাল কালির কারেকশান। আর আগামী বছরের

শিবচতুর্দশীতে দুদিন ছুটির কারণ রানীমা ফরাসডাঙ্গায় যে শিব স্থাপন করেছেন, শুনতে পাচ্ছি সে উপলক্ষে ভারি বড় মেলা হবে। হয়তো কাছারী ইত্যাদিও বন্ধ থাকবে।

—এ ব্যাপারে, সার, দেওয়ানজিরও কি এই মত ?

—তিনি স্কুলের এসব ব্যাপারে মতামত দেন না।

—তা হলেই তো দেখুন, সার, এসব অন্যায়ের সব দায়দায়িত্ব আমাদেরই থেকে যাচ্ছে। এই বলে সর্বরঞ্জন প্রসাদকুসুম বেশ খানিকটা মাথা ঝাঁকালো।

—কিন্তু ছুটি দেয়া হয়েছে, এখন আর বন্ধ করা যায় ?

নিওগির মুখ দাড়ি সত্ত্বেও লাল হয়ে উঠলো। সে বললো, আপনি আমার উপরওয়ালা। ডিসিপ্লিনের জন্য আপনার কথা আমাকে মানতেই হবে, হাঁ তা মানতেই হবে; কিন্তু এও আমি বলে দিচ্ছি, এতে আমার অন্তরলোকের সায় নেই। প্রত্যেকের একটা মিশন আছে। আমাদের ছাত্ররা যদি তার পিতামাতার অন্ধকারাচ্ছন্ন পুতুলপূজার মানসিকতায় ফিরে যায় তবে বৃথাই আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, বৃথাই শিক্ষকতা করা।

বাগচী বললো,—ছাত্রদের মাতাপিতারও মত থাকতে পারে।

—অন্যায়ও মানতে হবে ?

—অন্যায় বলছেন ?

—অন্যায় নয় ? রাসের কথাই ধরুন। ওটার মতো কুৎসিত জঘন্য নীতিহীন কিছু হতে পারে ? লাম্পট্য ছাড়া কিছু বলবেন ?

—ওটা তো ধর্মের ব্যাপার, শিরোমণি বলছিলো।

সর্বরঞ্জনের মুখে যেন আলো পড়লো, জমকালো দেখালো তাকে। ধর্মের ব্যাপার এবং নীতি-হীন—এটাই তো সে বলতে চাইছিলো। ব্যাপারটার নীতিহীনতাকে আক্রমণ করলে ধর্মকেও সার্থকভাবে আক্রমণ করা যায় এক্ষেত্রে। এটাই তো আর একবার প্রমাণিত হলো প্রতিমাপূজার ধর্ম কত আবিলতা সংগ্রহ করতে পারে।

সে বললো,—তা হলেই দেখুন। সঙ্গে স্ত্রীলোক না থাকলে আমি বলতে পারতুম রাস ব্যাপারটা কতটা নীতিহীন।

সর্বরঞ্জনপ্রসাদের মুখের দাড়িহীন অংশটুকু লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। বাগচী বললো, —আপনি এ বিষয়ে শিরোমণি মশায়ের সঙ্গে আলাপ করে নিন। আপনার মত তাঁকে জানান। নীতিহীন ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া যায় না। আপনার বাড়ির খবর বলুন। ছেলেপুলের স্বাস্থ্য ভালো থাকছে তো ? আপনার স্ত্রীর কি এই সমাজে কিছু অসুবিধা হচ্ছে ? আপনার বাসগৃহ সম্বন্ধে কোন অসুবিধা নেই তো ?

সুতরাং আলাপটা কিছুক্ষণ সর্বরঞ্জনের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে চললো। কফি ও বিস্কুট দিয়েছিলো ইতিমধ্যে কেট। সর্বরঞ্জন তা গ্রহণ করে উৎফুল্ল হলো। তা যে শুধু বিস্কুটের স্বাদ বা কফির তৈরি করার গুণে তা বললে সর্বরঞ্জনপ্রসাদকে হীন করা হবে। সুনীতি সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে কার না সুখ ? প্রাতরাশে কেট ও বাগচীর আলাপ হয়। বিবাহের পর থেকে

একদিন এতবার তারা প্রাতরাশেই তো কথা বলেছে, অন্য সময়ের আলাপের কথা যদি নাও বলা হয়, কি আশ্চর্য, তা সত্ত্বেও তাদের কথা ফুরায় না। আজ তো রেভরেণ্ড রলের চিঠিটা নিয়েই আলাপ করবে স্থির করেছিলো বাগচী। কেট সর্বরঞ্জনপ্রসাদকে আরও কিছু খেতে অনুরোধ করে ভাবলো, এসব হয়তো আমার ভাবা উচিত নয়, কিন্তু ভদ্রলোকের দাড়িটাকে অন্যের বলে মনে হয় যেন। ধর্মাচার্যরা দাড়ি রাখেন। ইনি কি নিজের অজ্ঞাতে তাঁদের কারো মাথা নেড়ে কথা বলার ভঙ্গিটাকে গ্রহণ করেছেন? অন্য একবার ভাবলো ছুটির ব্যাপারটা কত সিরিয়াসলি নিয়েছেন দেখো যে ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠে চলে এসেছেন, কারো প্রাতরাশে ব্যাঘাত হয় কি না হয় তাও ভাবার অবসর পান নি।

সর্বরঞ্জনপ্রসাদের বাসগৃহের সুখসুবিধা, আসবাবপত্রের অপ্রতুলতা—সে সম্বন্ধে দেওয়ানজিকে অনুরোধ করার বাগচীর আশ্বাস প্রভৃতির মধ্যে প্রাতরাশ শেষ হলে বাগচী পাইপ হাতে টপ্ হ্যাট মাথায় স্কুলের জন্য রওনা হলো। অন্যান্য দিনের মতো পাইপ মুখে বসবার ঘরে বসে কেটের সঙ্গে আর কিছুক্ষণ আলাপ করার সুযোগ ছিলো না।

পথে বাগচী ভাবলো গত বৎসর যে ছুটিগুলি দেয়া হয়েছিলো এবার তার থেকে কয়েকটা দিন বেড়েছে। সে অনুপাতে গ্রীষ্মের ছুটি এবং ক্রিস্টমাসের ছুটি কমানো হয়েছে। গত বৎসর কিন্তু কেউ ছুটি নিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করেনি। সে ভাবলো, তা বৈ কি, একটা ব্যক্তিত্ব বৈ কি—সর্বরঞ্জনকে দেখলে একটা শক্ত কিছু বলেই মনে হয়। গতবার সে ছিলো বটে, কিন্তু এত নতুন ছিলো খেয়াল করেনি এসব বিষয়ে। এবার সে আছে, কিছু তফাৎ হবেই।

এখন সকালের রোদ পথে। উজ্জ্বলতায় এবং কবোষ্ণতায় তা তৃপ্তিদায়ক। বাগচী ভাবলো, এই বৎসরের শেষ কটা মাস উৎসবমুখর হবে। রানীর জন্মতিথির উৎসবের সঙ্গেই কালীপূজা, তার আগে রাস, তারপর স্কুলের পরীক্ষা, অবশেষে ক্রিস্টমাস। ছাত্রদের প্রমোশন তারপরে। আজ যখন সকালেই বেরিয়ে পড়েছে মৌখিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলো যা তৈরি হয়েছে-সেগুলোকে সে পরীক্ষা করতে পারে।

কিন্তু সর্বরঞ্জনপ্রসাদ বললো,—সার, দ্বিতীয় বিষয়টার দিকেও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এবার এ গ্রামে নাটক হচ্ছে।

—নাটক? মানে থিয়েটার? কলকাতার হুজুগ এসেছে বটে। হঠাৎ হচ্ছে যে?

—রানীমার জন্মতিথির উৎসবে।

—বাহ্। অন্যান্যবার শুনেছি যাত্রা হয়। আপনি নিশ্চয়ই আমন্ত্রিত হবেন।

—তা হয়তো হব। কিন্তু থিয়েটার বলে কথা। তা কি আরও বাস্তব বলে আরও সত্য বলে প্রতিভাত হয় না?

—তা হয়তো হব। অন্তত অবিশ্বাসটা কিছুক্ষণ দূরে থাকে বোধ হয়।

—আমাদের ছাত্ররা কি তা দেখবে না?

—খুব সম্ভব দেখবে। শুনেছি রাজবাড়ির সদর দরজা সে রাতে বন্ধ হয় না।

—বাজি তুবড়ি দেখতে যেমন, যাত্রাটাত্রা শুনতেও তেমন নিজগ্রামের লোক সবাই যায়। ছাত্ররা তাদের পিতামাতার সঙ্গে, চাপল্যবশে নিজেরা একাও নিশ্চয় যায়।

—তা হলেই দেখুন, সার। উপরন্তু যদি তারা দেখে তাদেরই একজন শিক্ষক সেই অভিনয়ে অংশ নিচ্ছে ?

—সে কি! কে ?

—আমাদের চরণ দাস।

বাগচী হো হো করে হেসে উঠলো। চরণ দাসকে অভিনয় করতে দেখার কল্পনায়। পথের ধারে সে দাঁড়িয়ে পড়লো। হাসি থামলে বললো,—বলেন কি ? আমাদের চরণ দাস ?

সর্বরঞ্জনপ্রসাদ নিওগি বললো,—নাটক মাত্রেই নারীচরিত্র থাকে। থাকে না কি ? এবং তাদের হাবভাব লীলাকলা কখনই ভালো বিষয় নয়।

বাগচী হাসিমুখে বললো,—নারীচরিত্রও নাকি ?

—সেই নারী চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত কোন চরিত্র অভিনয় করা কি ভালো ?

বাগচীর গায়ে সকালের রোদ পড়ছে। অদূরের একটা গাছের ডালপালার ছায়া তার পায়ের কাছে। সে বললো,—এই এক মহাঅনিষ্ট। আজন্ম আমরা নানা নারীচরিত্রের সঙ্গে জড়িত। ওতপ্রোতভাবেই। এমন কি আমরা সুরু হচ্ছি নারীর উদর থেকে।

নিওগি তার বক্তব্যকে বাছাই করে নিলো। তার দাড়িটা কেঁপে উঠলো একবার। সে বললো,—না, না, না, একে আমরা বোধ হয় অত সহজে চিন্তা থেকে সরিয়ে দিতে পারি না। তাদের এই নাটকে পরনারীধর্ষণের চিত্র আছে, ইঙ্গিত আছে। জগদীশ্বর আমাদের পাপকথন ক্ষমা করুন।

নিওগি দুহাত তুলে দুটি তর্জনী অনেকটা করে নিজের কানে ঢুকিয়ে দিলো।

কারো কারো কৌতুকবোধ বেয়াড়া রকমের থাকে। মনে হ'লো বাগচী আবার হেসে উঠবে। কিন্তু সে থমকে গেলো এবং তারপরে চিন্তা করলো। সে অনুভব করলো নিওগির প্রকাশটা কৌতুকের হলেও এর মধ্যে কোথাও একটা চিন্তার বিষয় থেকে যাচ্ছে। নারীধর্ষণ অসম্ভব ঘটনা নয়। নাটকে তার চিত্র থাকা সম্ভব। বিশেষ একজন শিক্ষকের পক্ষে সেই নাটকে অংশ গ্রহণ করার মধ্যে উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে বৈ কি।

তার হাতের ছাতাটা একটু দুললো। সে বললো,—আচ্ছা, এ বিষয়ে আমি চিন্তা করবো। চরণের সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা ভালো করে জেনে নিই।

সে চলতে সুরু করলো। একটু পরে বললো, আচ্ছা সর্বরঞ্জনবাবু, আপনার কি মনে হয় এ গ্রামটায় কি এক বিশেষত্ব আছে। আমার মনে হচ্ছে কথাটা বোধহয় এই যে আনন্দদায়ক শান্তি এখানে খুঁজলেই পাওয়া যাবে।

—ঈশ্বরের কৃপায় তা হতে পারে।

—নিশ্চয় নিশ্চয়, তিনি কৃপা না করলে কৃপা চাইবার বুদ্ধিও হয় না। আমাকে একটা ভালো সংবাদ দিতে পারি, আপনার মতও জানতে পারি। এ অঞ্চলে একটা ক্রিশ্চিয়ান মিশন হাউস হতে পারে এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

—এ তো আশ্চর্যের কথা, সার।

—হ্যাঁ, ব্যাপারটা যেন ঘটতে চলেছে। আপনি ক্রিশ্চিয়ান মিশনারীদের কথা অবগত আছেন।

তাঁদের একজন, রেভারেণ্ড রলে, এ অঞ্চলে মিশন হাউস বসাতে চান। হয়তো একটা চিকিৎসালয়, একটা গির্জা, একটা স্কুলও হবে সেই সঙ্গে। নিওগি মাথা নাড়তে নাড়তে বললো, না, না, সার, এর চাইতে আশ্চর্যের বিষয় কিছু নেই।

—ক্ষতি কি? বরং ভালো, তাই নয়? ধর্ম সম্বন্ধে যত আলোচনা হয় ততই ভালো।

—অবশ্যই, তা অবশ্যই। নিওগি ডাইনে বাঁয়ে মাথা দুলিয়ে নিজেকে সমর্থন করলো।

ধর্মচিন্তা মনে এলো বাগচীর। ধর্ম অর্থাৎ ঈশ্বর, ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার চেষ্টা, তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করার চেষ্টা। তার মুখটা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। রলে রোমান ক্যাথলিক। তার চার্চে হয়তো বহু মূল্যবান শ্বেত পাথরের ম্যাডোনা মূর্তিও থাকতে পারবে। এ থেকেই হঠাৎ তার জানতে কৌতূহল হলো, নিওগি তো নতুন অর্থাৎ ব্রাহ্ম ধর্মমতের আশ্রয়ে আছে, ঈশ্বরকে চিন্তা করতে তার মনশ্চক্ষে কি প্রতিভাত হয়। তার নিজের ব্যাপারে ইতিমধ্যে স্পষ্ট করে বলতে হলে বৃহস্পতিবারে প্রার্থনা করতে বসে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছিলো, তার মন যেন এক ঈশ্বরে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলো। পরে ভাবতে গিয়ে সে আবিষ্কার করেছিলো সেটা মিথায়েলেঞ্জোলের সেই বিখ্যাত মোজেজ ভাস্কর্য। একথা কিন্তু কেট্‌কেও বলা যায় নি।

নিওগিও ভাবছিলো সম্ভবত। কারণ এ সময়ে তার ঠোঁট দুটি ও চোয়াল কিছু চিবানোর ভঙ্গিতে নড়ছিলো। সে বললো,—চরণের এই পদস্খলনের ব্যাপারটা কি আপনি মনে রাখবেন, সার? না, না, একথা আমাকে বলতেই হবে, ওটা তুচ্ছ ব্যাপার নয়। হয়তো অভিনয়ে নর্তকী যোগ দিচ্ছে না, কিন্তু বিষয়টা কি ভয়ঙ্কর ভাবে মারাত্মক। বিশেষ এ গ্রামে, এ গ্রামে সার, রুগ্ন দেহে কুপথ্য সম্বন্ধে যেমন, এসব বিষয়ে সতর্ক থাকতেই হবে।

বাগচী বললো,—কি বলছিলেন? ও হ্যাঁ, মনে রাখবো। কিন্তু এ গ্রাম সম্বন্ধে কি রোগের কথা বলছিলেন?

নিওগি বললো,—সত্যভাষণের সুযোগ সত্যই কম, সুযোগ দেখা দিলে সত্যভাষণই কর্তব্য। আপনি যখন রেভারেণ্ড রলের মিশন হাউস কল্পনা করে আনন্দিত, তখনই দেখুন এই গ্রামে কত না জাঁকজমক সহকারে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

—রানীমার শিবমন্দিরের কথা বলছেন? তা একটু জাঁকজমক কেন, বিশেষ জাঁকজমকই তো হওয়ার কথা। ওঁরা ধনবান।

—কিন্তু, নিওগি গম্ভীর মুখে বললো,—এও কি ভালো সেই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় রক্তচন্দন ব্যবহৃত হবে?

বাগচী হো হো করে হেসে উঠলো, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বললো,—আমার লঘুতা ক্ষমা করবেন। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন আমার পূর্বপুরুষরা ব্রাহ্মণ ছিলেন বটে, শিবপূজায় রক্তচন্দন প্রয়োজনের কিংবা অনর্থ—তা আমার একদম জানা নেই। আপনার কি মনে হয় শ্বেতচন্দনই প্রশস্ত ছিলো?

নিওগি বললো,—না, না, এসব ব্যাপার লঘুভাবে দেখা উচিত হয় না সম্ভবত। রক্তচন্দন কি রক্তের প্রতীক নয়। তা কি সেই লিঙ্গ উপাসনাকে আরও বেশী বাস্তব করছে না? তিনি অন্নদাত্রী, সুতরাং হয়তো আমার আলোচনা করা উচিত হচ্ছে না, কিন্তু একবারও যদি না বলি সত্যই কি

কুণ্ঠিত হয় না? এ আমাকে বলতেই হবে। তা হয়তো রক্তচন্দনও নয়। যে প্রকার শুনি তা রানীমার বুকের রক্তই বা।

বাগচী গম্ভীর হলো। বিশেষ গম্ভীর দেখালো তাকে। তারপরে সে হাসলো নিঃশব্দে। বললো,—আচ্ছা, নিওগি মশাই, নমস্কার। আপনি অনেকদূর এসেছেন। স্নান আহার করে স্কুলে আসতে দেরি হয়ে যাবে যদি এখনই না ফেরেন। আপনি নিশ্চয় পাংচুয়ালিটি পছন্দ করেন।

কোথাও কি কিছু কাঠিন্য প্রকাশ পেলো? বাগচীর হাসিটায় সরসতা কিছু রইলো না।

সর্বরঞ্জনপ্রসাদকুসুম দাঁড়ালো। বললো, নমস্কার, সার, নমস্কার। আজকের প্রভাতটা কি সুন্দরই কাটলো—শান্ত মধুর সমীরণের এই প্রভাত। ঈশ্বর, তোমারই করুণাময় বিধান।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন সংস্কৃতিবান ব্যক্তিদের মধ্যে ধর্মমত নিয়ে, সুনীতি দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছিলো। এখন যেমন তখনও তেমনি সাধারণত মনে করা হতো কলকাতার চালচলন আদবকায়দাই সংস্কৃতি। এবং তখনও, এখনকার মতো, আঁভাগার্দ তারাই ছিলো যারা একেবারে কলকাতার একেবারে হালফিলের ঝোঁক অনুসারে চলতে শিখতো। পৌত্তলিকতা ভালো কি মন্দ তা নিয়ে তো আর গোলমাল ছিলোই না। কালেজশিক্ষিত যুবক মাত্রেই যেন পৌত্তলিকতার সীমাহীন সেকেলে কুসংস্কার ত্যাগ করতে না-পারাকে মনঃরোগ মনে করতো। এমন কি নতুন যে ব্রাহ্মধর্ম, সেখানেও কোন্‌টা আঁভাগার্দ হবে এমন তর্ক দেখা দিচ্ছিলো। উপাসনা পরিচালনার বেদিতে ব্রাহ্মণ কিংবা অব্রাহ্মণ বসতে পারে, এ নিয়ে ব্রাহ্মসমাজ দ্বিখণ্ডিত হবে কিংবা হচ্ছে। নববিধান ও আদি ব্রাহ্মসমাজ কোন্‌টি সত্যধর্ম তার সূচনা হচ্ছে কিংবা হবে। সুতরাং ধর্ম একটা অতিশয় উত্তেজক চিন্তার কারণ হয়ে উঠছিলো। অন্যদিকে তখন এদেশের ভাষায় নাটক লেখা হচ্ছে। জনসাধারণ তারাও কলকেতার আর এক আভাঁগার্দ শ্রেণী সেদিকে উত্তেজক কিছু পাবে মনে হচ্ছে এবং আঁভাগার্দের লক্ষণ হবে নাটকপ্রিয়তা, এমন ঝোঁক দেখা দিচ্ছে। কিন্তু প্রাগ্রসর দলেও অধিকতর প্রাগ্রসর কেউ কেউ থাকে। নাটক সম্বন্ধেই একাংশের মনে তখন বিতৃষ্ণা দেখা দিচ্ছে, কেন না নাটক অলীক এবং নারী-সংযুক্ত বিষয়, অভিনেত্রীরা কি নরকের দ্বারস্বরূপ নয় এবং অলীক ভাবনা কি মানুষকে সত্যধর্মচিন্তা থেকে বিচ্যুত করে না? এই চিন্তাও তখন আধুনিকতম আঁভাগার্দের লক্ষণ হচ্ছে / হবে, এমন সুযোগ দেখা দিয়েছে।

কিন্তু জীবন এমন সাজানো ব্যাপার নয় যে সর্বরঞ্জনপ্রসাদকুসুম নিওগি সেদিন স্কুলের টিফিন পিরিঅডে আলোচনা করার সুযোগটা পেয়ে যাবে। শনিবার পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিলো। যদিও এই আলোচনাটা অনেক দিক দিয়ে তৎকালের আধুনিকত্ব ছিলো।

এখন নিওগির চিন্তাটা ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক হলো। না, না, সে আজ প্রত্যুষে একটা রীতিমতো ভালো কাজ করেছে সন্দেহ নেই। কথাগুলো ডায়েরিতে লিখে রাখবার মতো নয়? ব্যাপকভাবে দেখতে পেলে সে যা করেছে তা স্বদেশের উন্নতির প্রয়াস এবং সুনীতিরক্ষার আর একটা প্রচেষ্টা। তার মুখের মধ্যে কিছুই তিক্ত বোধ হচ্ছে না। সেখানে বরং কফির সুস্বাদ। তার মাথাটা এতটুকুও ভার বোধ হচ্ছে না। বরং সকালের এই রৌদ্র যা শীতের বলে এত মধুর তা যেন তার রক্তধারাকে ক্রমশ আনন্দিত করছে। না, না, এটা ডায়েরিতে লিখে রাখার মতো ব্যাপারই বটে।

এবং ঈশ্বর তাঁর করুণাময় বিধানে যেখানে যাকে স্থাপিত করেছেন সেখানেই তাকে সত্যধর্ম প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস করে যেতে হবে। এবং এই গ্রামে এই নীতি প্রয়োগ করার যথেষ্ট সুযোগ উপস্থিত, কেননা যেখানে অন্ধকার সেখানেই তো আলোকপ্রকাশের সুযোগ।

সে একাও নয়। উপনিষদে লেখে একাহং বহুস্যাম। আমি এক কিন্তু বহু হইব। মানুষও সেইভাবে অগ্রসর হতে পারে। নরেশ ও সুরেন দুজনেই যে সত্যধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। নরেশ কলকাতায় থাকাকালীনই দু-একটি উপাসনায় যোগ দিয়েছে। সুরেনও স্বীকার করে, ঈশ্বর অবশ্যই পুতুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে পারে না। আর চরণ সে বিধবা বিবাহ করার হেতু এই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। মানুষমাত্রেই সমাজ খোঁজে। সুতরাং যদি নতুন এক সমাজে আশ্রয়ের আশ্বাস পায়, অবশ্যই চরণ সেই সমাজকে সাগ্রহে অবলম্বন করবে।

কিন্তু সর্বরঞ্জনপ্রসাদ বুঝতে পারে নি তার চিন্তাটা নতুন পথে না গিয়ে বরং পুরনো পথেই ঘুরে আসছে। হঠাৎ বুঝতে পেরে সে যেন থেমে দাঁড়ালো। হ্যাঁ, এটাই তো তার দুর্ভাবনার মূলে যে এই তিনজনই অর্থাৎ সুরেন, নরেশ এবং চরণদাস তিনজনই থিয়েটারের ব্যাপারে নিতান্ত আসক্ত।

সে বিষয়টাকে নিজের মনের মধ্যে যেন ওজন করে দেখতো লাগলো। এখন হয়তো এই থিয়েটার বন্ধ করার উপায় সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না। খুব দেরি হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে রাজবাড়ির উৎসবের অঙ্গ হিসাবে ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়ে থাকে যদি তবে বাধা দিতে গিয়ে রাজবাড়ির অপ্রসন্নতা আকর্ষণ করা হবে।

সুতরাং—হঠাৎ সে যেন আলোক দেখতে পেলো—রোগের উৎপত্তির পর যেমন ঔষধ তেমন এই থিয়েটার রোগেরও ঔষধ হিসাবে আর একটি উৎসব করা যেতে পারে।

না, না, এটা আদৌ অসম্ভব নয়। বরং অতিশীঘ্রই বন্দোবস্ত করা যায়। তার কনিষ্ঠ সন্তানের নামকরণ উৎসব এখনও হয় নাই। সেটাকেব যথোপযুক্তভাবে পালন করা যায় না কি? নরেশ, সুরেন এবং চরণদাসকে অবশ্যই আমন্ত্রণ করা হবে; এবং নিশ্চয়ই দেওয়ানজি হবেন সেই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ। নরেশ, সুরেন, চরণদাস দেওয়ানজিকে সমাজের আবহাওয়ায়, প্রার্থনা-সভার পরিমণ্ডলে পেলে অবশ্যই বুঝতে পারবে সমাজটি নিতান্ত হীনবল নয়। কলকাতার মানুষ নরেশ এবং সুরেন বরং অনুভব করবে এখানে অতঃপর স্ত্রীপুত্রাদি নিয়ে বাস করা যায়।

আশাবাদী মানুষ সহজেই উৎফুল্ল হয়ে থাকে। সর্বরঞ্জনপ্রসাদ নিওগি স্বদেশের উন্নতি ও সুনীতি রক্ষার গুরু দায়িত্ব নিজের কাঁধে বহন করা সত্ত্বেও দ্রুত দৃঢ় পদক্ষেপে চলতে লাগলো। তাকে বিশেষ প্রফুল্লও দেখালো।

এবং সেই প্রার্থনাসভায়, (ইতিমধ্যে লতাপাতায় সাজানো, দেয়ালে লাল সালুতে তুলোর অক্ষরে ব্রহ্মই সত্য হরেনামৈব কেবলম প্রভৃতি পতাকায় সাজানো উৎসবগৃহের ছবি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে) দেওয়ানজি নিশ্চিত বেদিতে বসবেন এবং প্রার্থনা পরিচালনা করবেন। না, না, এটা করতেই হবে। যদিও সে নিজে ব্রাহ্মণ এবং দেওয়ানজি কায়স্থবংশের এখানে এই সমাজে গোড়া থেকেই ব্রাহ্মণের উপাসনা পরিচালনা করার বিশেষ অধিকারকে অস্বীকার করতে হবে। কলকাতায় আমাদের ধর্মসমাজে যা নিয়ে চাপা অসন্তোষ তা এখানে গোড়া থেকেই দূরে রাখতে হবে।

নিওগি এদিকে ওদিকে চাইলো। তার দরকার ছিলো না, কারণ এগুলি তো চিন্তা মাত্র, উচ্চারিত শব্দ নয় যে কেউ শুনে ফেলবে। কলকাতায় গুজব এই দেবেন ঠাকুর মশায় ব্রাহ্মণদের এই বিশেষ অধিকারের পক্ষপাতী এবং কেশব সেন মশায় বরং উদার। (এ বিষয়ে নিওগির একজন আত্মীয় বলেছে)—কারণ কেশব সেনের স্বশ্রেণীস্বার্থ এই উদারতায় রক্ষিত হবে। (এবং নিওগির নিজের মুরুব্বী মেট্রোপলিটনের অধ্যাপক ভাদুড়ী মশায়, যিনি দেওয়ানজির বন্ধুও, আবার বলেছেন), —দেবেন ঠাকুর মশায়ের মত মূল সমাজের কাঠামোকে কিছুটা মানছে বলে বেশী বাধা পাবে না, কেশব সেন প্রমুখের মত বৈপ্লবিক বলে বাধা পাবে। ফলে ধর্মচিন্তার চাইতে বাধাভয়ের দিকেই নজর দিতে হবে বেশী। সে যাই হোক, এখন ব্রাহ্মসমাজ ভেঙে তিন টুকরো না হয়।

নিওগি ভাবলো: ভাদুড়ী মশায়কে সে শ্রদ্ধা করে, ভাদুড়ী মশায়ের কাছে সে কৃতজ্ঞ, কিন্তু বোধ হয় এই এক বিষয়ে সে ভাদুড়ী মশায়ের চাইতে বেশী দেখতে পায় যে প্রবীণ দেবেন ঠাকুর মশায় ব্রাহ্মসমাজকে ভাঙতে দেবেন না। এবং শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনায় প্রার্থনাবেদিতে অব্রাহ্মণের অধিকার মেনে নেবেন।

না, না, এই উপাসনার বন্দোবস্ত করতেই হবে। এবং সেই প্রার্থনাসভায় দেওয়ানজিই অবশ্য প্রার্থনা পরিচালনা করবেন। এবং পরবর্তী কালে এই অঞ্চলের আধুনিক জাগরণের বিষয় যখন লিখিত হবে দেওয়ানজির সেই প্রার্থনাকেই সূচনা বলে চিহ্নিত করা হবে তাতে সন্দেহ কি।

নিওগি দ্রুত পথ চলছিলো। চিন্তার আবেগে কারো কারো গতিতে বলসঞ্চার হয়। নিওগি তেমন একজন। পথ ঘাটে এখনও লোকচলাচল কম। ভিড় থাকলে তারা নিওগির এই দ্রুত গতিকে বিশেষ দ্রষ্টব্য মনে করতো।

বাগচী স্কুলের দিকে অগ্রসর হলো। সকালের পরিচ্ছন্ন আলো যা বরং উষ্ণতায় সুখদায়ক তাতে মনকে প্রফুল্ল করার কিছু ছিলো। বাগচীর মন ধর্মচিন্তায় ফিরে গেলো। সে ভাবলো এটা একটা নিছক যোগাযোগের ব্যাপার নয় যে ঈশ্বরচিন্তার ব্যাপারে নর-নারীর সংযুক্তজীবনের চিন্তা কোথায় যেন যুক্ত হয়। অনেক ক্ষেত্রে নর-নারীর সংযুক্তজীবনকেই ঈশ্বরচিন্তার পক্ষে অপবিত্র মনে করা হয়। এই যে রুলে চিঠি লিখেছে, সে রোম্যান ক্যাথলিক প্রচারক হিসাবে অবশ্যই অকৃতদার। তার মিশন হাউসে সন্ন্যাসিনীরা আসতে পারেন। তাঁরাও অবিবাহিতাই হবেন। এদিকে কি বৌদ্ধশ্রমণ কি হিন্দু সন্ন্যাসী, নারীসংযুক্ত জীবনকে পরিহার করেন। কোথায় ইউরোপ, কোথায় ভারত—এ বিষয়ে একই সিদ্ধান্ত করেছে। এমন কি যারা সন্ন্যাসী নয় গৃহী, তারাও নারী সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তান্বিত। এই যে নিওগি নাটক সম্বন্ধে তার তীব্র আপত্তি প্রকাশ করলো, তা তো অপবিত্র নারীসংযোগের আতঙ্কই। লোভ, ক্রোধ, ঈর্ষা ইত্যাদিকে এমন আতঙ্কের দৃষ্টিতে দেখা হয় না কেন?

নতুবা বলতে হয় নিওগি হয়তো ভাবেন নাটক সঙ্গীত ইত্যাদি মানুষের মনকে হালকা করে বলে তা সবই ঈশ্বরচিন্তার পরিপন্থী। বাগচী ভাবলো—এরকম কথা যেন কোথায় সেদিন শুনেছি? আলমগীর বাদশার সেই সঙ্গীতকে কবর দেয়ার গল্প? না। সেদিন কৌবল বলছিলো বটে ডব্লু. জি. ওয়ার্ডের গল্প। গল্পটা মনে পড়ায় বাগচীর মুখে হাসি হাসি ভাব দেখা দিলো। ডক্টর পুসে ক্যাথলিক বটেন, কিন্তু এ বিষয়ে শক্ত মত তাঁর।

নিওগির ধরনধারন বরং প্রটেস্ট্যান্টদের মতো কিংবা পিউরিট্যান বলা ভালো। মিতব্যয়ী, হিসেবি, সময়সচেতন, বয়সের পক্ষে বেশী গম্ভীর; নিজের চরিত্র সংশোধন করার জন্য ডায়েরি রাখে।

নিওগিদের এই নতুন ধর্মের আন্দোলনটায় রোমান ক্যাথলিক থেকে প্রটেস্ট্যান্ট মতে পৌছানোর মতো কিছু আছে। মেরির মূর্তি থেকে ক্রুশের প্রতীকে, লাটিন থেকে মাতৃভাষায়, তেমন এরাও সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় যাচ্ছে।

এরকম একটা মত আছে, প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মমত প্রসারের সঙ্গে পোপের রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা অনেকখানি জড়িত ছিলো। সংস্কৃতিকে ভ্যাটিকান-কেন্দ্রিক না রেখে স্বদেশ-ভিত্তিক করার চেষ্টা ছিলো। এখানে কিন্তু নিওগিদের ধর্মমতের সঙ্গে প্রটেস্ট্যান্টদের ধর্মমতের উত্থানের কারণে মিল থাকছে না। এখানে কোন্ মূর্তিবাদীর রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্তি? এখানে বরং সংস্কৃতিকে লণ্ডন-কেন্দ্রিক করে তোলা হচ্ছে যেন। বাগচী কিছুক্ষণের জন্য এই ব্যাপারে গভীর চিন্তা করার কিছু পেলো যেন।

কিন্তু কৌতুকের কথা মেরি এবং যিশাস রূপে যখন ঈশ্বরকে অন্তরে ধারণ করা হচ্ছে না তখন কিরূপে তা ধ্যান করা হচ্ছে। বাগচীর মুখে হাসির ভাব খেলা করলো। তার অর্ধস্ফুট চিন্তায় আবার মিকালেঞ্জেলোর মোজেজের মূর্তিটা দেখা দিলো। সে ভাবলো সত্যিকারের ধার্মিক প্রটেস্ট্যান্ট কাউকে পেলে জিজ্ঞাসা করতে হবে গভীর ঐকান্তিকতায় প্রার্থনা করার সময়ে ঈশ্বর তার অন্তরে কি ভাবে আভাসিত হন। তা কি এক আলোকপ্রসারী ইবনি অথবা অতি উর্জ্জ্বল রূপা কিংবা সোনার ক্রুশ।

বাগচী সুতরাং অন্যমনস্ক ছিলো যখন সে স্কুলের দরজার কাছে ছাত্রদের একটা ছোটখাট ভিড়ের মধ্যে গিয়ে পৌছলো। তাদের মধ্যে দিয়ে দু-এক পা এগিয়ে গিয়ে তবে তার মনে হলো এ সময়ে এমনভাবে তো তাদের আসার কথা নয়। সে বললো, কি ব্যাপার? কে একজন বললো—ইসমাইলের চোখটা, সার।

বাগচী নিজেই ওদের সমস্যা কিংবা কৌতূহলের বিষয়টাকে যেন দেখতে পেলো। ছাত্রদের একজনের চোখ কপাল জড়িয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। কে একজন আবার বললো, ওকে ওষুধ দেন, সার।

পরে এই বিষয়টাকে বাগচীকে মনে আনতে হয়েছিলো। এবং ভাবতে গিয়ে মনে হয়েছিলো ছাত্ররা অদ্ভুত রকমে অনুত্তেজিত ছিলো। হেডমাস্টারকে দেখে এরা সুশৃঙ্খল এবং সুনিয়ন্ত্রিত থাকবে, এটা অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য।

বাগচী মুহূর্তে ছাতাটা একজনকে ধরতে দিলো, কোট খুলে সেটাও আর একজনকে ধরিয়ে দিয়ে ব্যাণ্ডেজ খুলতে সুরু করলো।

অসুখটা কঠিন। চোখটা বিশ্রী রকমে ফুলে বন্ধ হয়ে আছে। যে তুলো দেয়া হয়েছিলো সেটায় কিছু রক্তের চিহ্ন। অন্য চোখটিও আক্রান্ত কিন্তু ততটা ফোলা নয়। আবার সস্নেহে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলো বাগচী। বললো,—একজন আমার সঙ্গে স্কুলের ভিতরে আয়। হাত ধুয়ে আমি ওষুধ লিখে দিচ্ছি। আমার বাংলোয় গিয়ে দিবি।

বাগচী স্কুলে ঢুকে নিজের বসবার ঘরে গিয়ে হাত ধুয়ে ওষুধ লিখে ছাত্রটিকে দিয়ে কোট পরে

আবার রোগীকে উপদেশ দেয়ার জন্য স্কুলের দরজায় এলো।

ছাত্রদের একজন বললো,—আমাদের ইসমাইলের চোখটা সারবে তো সার ?

বাগচী বললো,—তোমাদের ইসমাইল ? আমাদের বুঝি কেউ নয় ? তুমি কিন্তু টক খেয়ো না, ইসমাইল। ভয় পেয়ো না। বিকেলে চরণদাসের বাড়িতে যেয়ো। আমি তাকে বলে দেবো। আবার ওষুধ খাবে।

ছাত্ররা চলে গেলো। বাগচী একটু দাঁড়ালো। স্কুলের দরজার পাশে কৃষ্ণচূড়া গাছ। তার ডালপালার ফাঁকে রোদ এসে পড়লো বাগচীর গায়ে। ঘড়ি বার করে সময় দেখলো বাগচী। আটটা বাজতে এখনও কিছু দেরি। তার অর্থ এই হয় অন্যান্য দিনের চাইতে এখনও সে প্রায় আধ ঘণ্টা এগিয়ে আছে। এখন সে স্কুলের কাজ সুরু করার আগে, রলের চিঠিটার প্রাপ্তি-স্বীকার করতে পারে।

বাগচী যখন এরকম ভাবছে ঠিক তখনই সে পথ দিয়ে চরণদাসকে আসতে দেখতে পেলো। চরণদাসও স্কুলে আসবে। তবে সে দশটায়। তার আগে সে ডাকের কাজ করবে। কি অদ্ভুত খাটে লোকটি। আটটা থেকে দশটা ডাকের কাজ করে স্কুলে। টিফিন পিরিআডের পরেও এক ঘণ্টা স্কুলে কাজ করে, আবার ডাকে কাজ। বিকেলের পর ডিসপেনসারিতে গিয়ে ওষুধ দেয়। এরই মধ্যে আবার নিজের খেতখামারের কাজ করে। এদিকে নিওগি এই গ্রামে আসায় আর একটা কাজ যোগাড় করে নিয়েছে—বোধ হয় সপ্তাহে দু-তিনদিন ইংরেজি বাইবেল পড়ে নিওগির কাছে। ইংরেজি শেখার কৌশলই হয়তো।

চরণদাস স্কুলের দরজার কাছে এলে বাগচীও রাস্তায় এলো। বললো,—চলো, চরণ, তুমি ডাকের থলে পাঠাবে তো। আমিও একটা কার্ড দিয়ে আসি।

চরণের পাশে পাশে চলতে চলতে বাগচী বললো,—এই পথেই তো এসে ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হয়েছে ? বিশ্রী রকমের কনজাংকটিভাইটিস্ মনে হলো।

চরণ বললো বিরস মুখে,—দেখেছি, সার।

—একবার মনে হলো ব্যাণ্ডেজটা তোমার হাতের।

—তাই, সার। গরম জলের সেঁক দিয়ে বেঁধে দিয়েছিলাম।

—ভালো করেছো। বিকেলে ডিসপেনসারিতে যাবে। মার্কসলই আবার দিও। আচ্ছা চরণ, তোমার সেই রসিকতাটা মনে আছে ? ওই যে তুমি আত্মা মানে খৃষ্টানদের আত্মার লাখ বছর ঘুমিয়ে থাকার কথা বলেছিলে ?

—ওটা, সার, গ্রাম্য রসিকতা হয়েছিলো।

বাগচী লক্ষ্য করলো চরণদাস যেন কিছু ভাবছে। আর তা নিতান্ত বিরস কিছু।

বাগচী কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললো,—দেখো চরণ, লোকে বলে আত্মা কৃতকর্মের জন্য অপেক্ষা করে থাকে, অন্যলোকে বলে আত্মার বিচার তখনই সুরু হয়ে যায় ; এরকম মত আছে সমাজের সুবিধার জন্য মানুষের মনে শাসনের ভয় জাগিয়ে রাখার জন্যই আত্মা প্রভৃতি কল্পনা করা হয়েছে ; অন্য কেউ বলে ঘটের মধ্যে যে আকাশ ঘট ভাঙলেই তা মহাকাশে মিলিয়ে যায়। আসল কথা, তুমি

দেখবে যারা আত্মা লাখ বছর বিচারের অপেক্ষায় থাকবে মনে করে তাদের মধ্যেও প্রকৃত ধর্মপরায়ণ মানুষ থাকতে পারে।

হঠাৎ যেন মনোযোগী হলো চরণদাস। বললো,—কিছু বললেন, সার!

বাগচী অবাক হলো কিন্তু হেসে বললো,—আ, চরণ, আমার দার্শনিক বক্তৃতাটা মার গেলো। আচ্ছা চরণ, তুমি কি মিশন হাউস দেখেছো? আমাদের এই অঞ্চলে, মনে করো ফরাসডাঙ্গায়, একটা মিশন হাউস হচ্ছে। এবং সেখানে একজন ইংরেজ পাদরি থাকছেন।

—সরেলগঞ্জে এক বাংলো আছে যেখানে সপরিবারে একাধিক ইংরেজ থাকছেন, সার।

—ও তা হলে তুমি ইংরেজ মিশনারীদের দেখোনি। শিক্ষাদীক্ষা, আধুনিকতা, বদান্যতা অনেক কিছু এই সব মিশনের সঙ্গে জড়িত থাকে। এ অঞ্চলে একটা মিশন হাউস হলে আমাদের গ্রামেও পরিবর্তন আসবে। তুমি শুনলে অবাক হবে ডানকান হোয়াইট নিজেই এ বিষয়ে উৎসাহী।

—দা ডেভিল ওঅজ সিক্ দা ডেভিল্ এ সেণ্ট উড বি।

—কি বললে? ডেভিল? আ, চরণ, তুমি কি কিছু ভালো দেখতে পাও না? তুমি কি বলবে এই মিশন হাউসের পিছনে ডানকানের শয়তানি আছে? ইংরেজি তুমি ভালোই শিখেছো। কিন্তু—

—হয়তো আমার ভুল, সার; আমাকে ক্ষমা করুন। কিন্তু মিশন হাউসটা যদি হয়ই আমরা কি উপকৃত হবো?

—না, চরণ, তোমার উচ্চারণও ভালো। আমি মনে করতে পারছি না ডেভিল নিয়ে ওই ছড়াটা কোথায় আছে। নতুন কিছু পৃথক কিছু আদর্শ সামনে আসার এই এক উপকার, প্রয়োজন মতো তা থেকে আমাদের পুরাতনকে বদলে নেয়া যায়। তাতে ভালো হয়।

—ভালো হয়?

—দেখো, এদেশেই আগে স্ত্রীলোকদের পুড়িয়ে মারা হতো। আর তাও যদি না হতো সেই বিধবারা অন্যের উপগ্রহের লক্ষ্য কিংবা দয়ার পাত্র হতেন। এখন তাঁরা বিবাহিত হচ্ছেন। নতুন জীবন পাচ্ছেন না? কুসংস্কার কেটে যাচ্ছে। এটা ইংরেজরা করেছে এমন বলা যায় না, কিন্তু এটা তাদের সামাজিক আদর্শ দেখে আমাদের সামাজিক আদর্শকে শুধরে নেয়া বলা চলে। অন্য দিকে দেখো রেলের গাড়ি হচ্ছে, তারের খবর চলেছে। হয়তো কিছুদিন পরে আমাদের গ্রামের কত ঘাটে বাষ্পের নৌকাও আসবে। তোমার স্কুলটাকে দেখো। সব কিছু ভুলে যাও যদি, আজ মোগল, কাল মারাঠা গ্রাম লুটে নিলো, খুনখারাবি, উপদ্রব, স্ত্রীলোকের উপরে উৎপীড়ন,—এসব নেই বললেই চলে।

চরণদাস উত্তর না দিয়ে পথ চলতে লাগলো।

বাগচী বললো,—এসব যদি কিছুই নয় মনে করো, তুমি একটা বিষয় লক্ষ্য করো। মিশন হাউসটা যদি হয় সেখানে একটা চিকিৎসালয় হতে পারে, একটা নতুন স্কুল, পরে একটা কলেজ। অন্য দিকে দেখো এই সবগুলিকে সংযুক্ত করে, এবং এই গ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত করে কয়েকটি অন্তত পাকা সুরকিবাঁধানো রাস্তা তৈরি হবে।

চরণদাস বললো,—তাতে কি লাভ হয়?

বাগচী বললো,—যেন তা তার তর্কের টানেই, রানীর শিবমন্দির হচ্ছে। ওতে দেখো কত

লোক কাজ পেয়েছে। মিশন হাউস পথঘাট এসব তৈরি করতেও অনেক লোক কাজ পাবে।

—এটা যথার্থ, সার। চরণদাস অনুভব করছিলো তার কথাবার্তা একগুঁয়ের মতো শোনাচ্ছে। সে একমত হতে পেরে যেন স্বস্তি পেলো। বললো,—তা, ঠিকই সার, ডাকঘরের পরেই দেখুন কাঠি পুঁতে সড়ক বাড়ানোর কাজ সুরু হয়েছে। প্রতি শীতকালেই কিছু কিছু কাজ হয় এ ধরনের। এবার একটু বেশী হচ্ছে। নরেশবাবু বলছিলো নাকি শিবমন্দির তক্ পাকা রাকা রাস্তা হবে স্কুলবাড়ির পিছন দিয়ে রাজবাড়ির দরজা থেকে। সেই পথ নিয়ে যেতে পুরনো ঝিলের খাতের উপর দিয়ে অ্যাকোইডাক্ট তৈরি হবে।

—বলো কি ? কই, আগে তো বলো নি ?

—দু:চারদিন হলো নরেশবাবু রাস্তা জরিপ সুরু করেছেন। ফরাসডাঙ্গার দিকে মিশন হাউসের কথা বলছিলেন, তা ওদিকে সার, আরও কাজ হচ্ছে। পিয়েত্রোর বাংলোর চালা বদলে, দরজা জানালার কাচ বদলে রং করে, দেয়ালে কলি ফিরিয়ে—এসব তো হচ্ছেই। ওদিকে একটা বড় বাড়িও হতে পারে। তা নাকি একটা সাহেববাড়ির মতো হতে পারে।

—তা হলেই দেখো। আচ্ছা, আচ্ছা, ওখানে ও বাড়িটা কেন হবে আন্দাজ করছো।

—নরেশবাবুর মতে, ওটা গেস্ট হাউস হতে পারে। তেমন সব সাহেব-সুবোর জন্য। এমনও হতে পারে রাজবাড়ির কেউ থাকবেন। রানী-মা হতে পারেন কিংবা নয়ন-ঠাকরুনও। তাঁর নিজের বাড়িটা খুব ছোট।

—রানীমা ? রানীমা সেখানে থাকতে যাবেন কেন ?

—সবই তো আন্দাজ, সার ; ভিতরের কথা তো জানা যায় না। রাস্তা হচ্ছে শিবমন্দিরে যাওয়ার সুবিধার জন্য। বাড়িটা হবে হয়তো রাজকুমারের বিবাহের উপলক্ষে।

—বলো কি চরণ ? বিয়ে রাজকুমারের ? এমন আনন্দের সংবাদ ?

বাগচীর মুখে যেন আনন্দের চিহ্ন। কিন্তু তখন সময়টা অন্য রকম। তারা চরণের ছোট্ট গ্রাম্য ডাকঘরের কাছে এসে পড়েছিলো। রলের চিঠির প্রাপ্তিস্বীকারের ভদ্রতা শেষ করে বাগচীকে স্কুলে যেতে হবে। চরণকেও ডাকের থলে রওনা করে দিতে হবে।

বাগচী বললো,—আমি বারান্দায় দাঁড়াই। তুমি ভিতরে গিয়ে পোস্টকার্ড দিও।

দরজা খুলে ভিতরে যেতে যেতে চরণদাস চিন্তা করলো, তার কথাগুলো কি শ্লেষের মতো শুনিয়েছে ? ঈশ্বর জানেন বাগচীর মতো একজন মানুষকে শ্লেষে কিছু বলার ঔদ্ধত্য তার নেই। এ বিষয়ে বাগচীর সঙ্গে একমত হতেই হবে, কিছু কিছু লোক কাজ পাচ্ছে বটে অর্থাৎ তাদের আর্থিক সুবিধা হচ্ছে।

অন্যদিকে, দিন তিনেক পরে বাগচী তার বাংলোর সম্মুখেই নিশানকাঠি পুঁতে রাস্তা জরিপ করতে দেখেছিলো নরেশকে। কিন্তু তা পরের কথা।

রোজকার মতো দুপুরে লাঞ্চে যাওয়ার পথে রলের চিঠিটাকে নিজেই ডাকে দিয়ে এলো বাগচী। পথে চলতে স্বভাবতই তার সকালের কথা মনে হলো। সে একবার ভাবলো শিবমন্দির পর্যন্ত

ফরাসডাঙ্গার দিকে রাস্তাটা পাকা করা হবে, সেখানে একটা নতুন প্রাসাদ হবে—এসব সে কিছুই জানতো না। সে ভাবলো—চরণ দু-একদিন হলো জেনেছে, এবং সেটা এজন্যই যে যারা এসব কাজ করে নরেশ এবং সুরেন তারা চরণদাসের সমবয়সী এবং হয়তো সেই নাটকের ব্যাপারেই রোজ একত্র হয়। পরক্ষণেই নিজের চিন্তাকেই মৃদু পরিহাস করে ভাবলো, দেখো কাণ্ড, রাজবাড়িতে কোন্ হুকুমে কখন কি কাজ হবে তা যেন তার জানার কথা? এবং তা যেন চিন্তার বিষয়ও হতে পারে।

কিন্তু লাঞ্চে বসে বাগচী বললো,—দেখো, ডার্লিং, এবারে আমাদের একটা ফিটনের কথা ভাবতে হয়।

—ফিটন? মানে ইংরেজিতেও যাকে ফিটন বলে?

—হাঁ। কালো কিংবা ডার্ক মেহগ্নি রঙের।

রসিকতাটা কোনদিকে যাচ্ছে তা বুঝতে না-পেরে কেট বললো,—বলো শুনছি।

—আমাদের এখানে তিন সালের বেশী হলো। আমার তো মনে হয় বাকি জীবনটা এখানেই কাটবে। এবং তা ভালোই কাটবে।

—বেশ তো, তার জন্য ফিটন কেন? নয়নতারার বাড়ি যেতে, না রাজবাড়ি যেতে তার ব্যবহার হবে?

—এই দেখো! রাজবাড়ির হাতা থেকে ফরাসডাঙ্গা অবধি সড়কটা হয়তো এই শীতেই বাঁধানো হবে। আর তা হবে রানীমার শিবমন্দির পর্যন্ত। দেখো আমরা পিছিয়ে আছি। খবরটা চরণদাস না বললে জানতেই পারতাম না।

কেট খিলখিল করে হাসলো,—কোন রাস্তায় সুরকি দিতে হবে এটা যে হেডমাস্টারের জানবার কথা তা আমার জানা ছিলো না। তুমি গ্রামকে খুব ভালবাসো তাতে সন্দেহ নেই। সেজন্যই তোমার এমন লাগছে। কিন্তু রাস্তার জন্য ফিটন না হয় হবে, কিন্তু গন্তব্য কি হলো?

—কেন তখন আর পাল্কী চেপে যেতে হবে না যেমন সেদিন গেলে। কিংবা গোরুগাড়ি করেও যেতে হবে না যেমন এর আগে গিয়েছিলে।

আবার তেমন করেই হাসলো কেট। বললো,—আবারও কি লাঞ্চ হবে নাকি পিয়েত্রোর বাংলোয়?

—আরে তা কেন? কাল তোমাকে মিশন হাউসের কথা বলছিলাম না?

—বলেছিলে রলে নামে একজন রোমান ক্যাথলিক মিশনারী এদিকে মিশন হাউস করা যায় কিনা জানতে চেয়েছে।

—সেই কথাই হলো। এদিকে মিশন হাউস হতে গেলে ফরাসডাঙ্গার চাইতে ভালো জায়গা আর কোথায়? তোমার কি মনে হয় না মিশন হাউস তৈরি হলে তুমি কখনও কখনও ফিটন ব্যবহার করবে?

কেট বাস্তববাদীর মতো বললো,—মিশন হাউসটায় লোকজন এলে তখন ফিটনের অর্ডার দিও।

এই বলে বাগচীর গল্পটাকে শেষ করে সে নিজের গল্প সুরু করলো,—আমাদের আণ্ডাওয়ালী কয়েকদিন আগে রাজবাড়িতে আণ্ডা বিক্রি করতে গিয়েছিলো।

—এই দেখো! তুমি কি বলবে রাজবাড়িতে আনাজ হিসাবে আণ্ডার প্রবর্তন শুরু হচ্ছে—এটা এক আধুনিকতা।

—আণ্ডাওয়ালী তার সুরমা-পরা চোখ যেমন করে পাকাচ্ছিলো, আর রেশমী চুড়ি পরা শুকনো হাত দুটো যেভাবে নাড়ছিলো মনে হবে ওটা একটা বড় ঘটনাই। শোন, আণ্ডা কিন্তু আমাদের রাজকুমারের জন্য নয়। সে নাকি অন্য এক রাজকুমার।

—আচ্ছা! গল্পটায় কৌতূহলের বিষয়ে বাগচী মন দিলো।

—একই রকম দেখতে। শুধু গায়ের রঙে তফাত। রানীমা আর নয়ন ঠাকরুনের রঙে যে তফাত সেই তফাত আমাদের রাজকুমার আর সে রাজকুমারে।

—রসো, রসো। বাগচী হাসতে হাসতে বললো,—রানীমাকে দেখেছো নাকি? তাঁর রং কি দুধে আলতায়? অর্থাৎ আমাদের রাজকুমার কিছুদিন রোদ বাঁচিয়ে চললে যে রকম দেখায়?

—ওরা পাশাপাশি না দাঁড়ালে ওসব সূক্ষ্ম তফাত ধরা যাবে না। কিন্তু শোন আণ্ডাওয়ালী যা বলছিলো। এই নতুন রাজকুমার নাকি ছ' আনির রাজকুমার। আর তিনি নাকি টেবলে বসে খান। বোম্বাই না দেরাদুন কোথায় সাহেবদের কাছে পড়েন।

—বোম্বাই আর দেরাদুন পাশাপাশি বটে! তা তোমার আণ্ডাওয়ালী রাজবাড়ির অনেক খবর এনেছে দেখো। এটা কিন্তু লক্ষ্য করার মতো এই নতুন আসা রাজকুমার টেবলে বসেন।

—শুধু কি তাই। এখানে এসেছিলেন রানীমার মত নিতে। এখানে থেকে বোম্বাই, বোম্বাই থেকে বিলেতে যাবেন। নাকি সেখান থেকে চীনে।

—কেন, জ্ঞানঠাকুরের মতো ব্যারিস্টার হতে?

—তা জানি না। এই নতুন রাজকুমারের কথা কিন্তু আমার কাছে একেবারে নতুন।

—সেটা আশ্চর্যের কি? রাজবাড়ির সব কথা সকলের জানার জন্য নয়।

বাগচীর ফিটনের কথা যা রলের মিশন হাউসের কল্পনার সঙ্গে জড়িত সেটা কিছু দূরে সরে গিয়েছিলো। লাঞ্চের শেষের দিকে কেটই বরং নতুন আর এক বিষয় উত্থাপন করলো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাকে একেবারেই নতুন বলা উচিত হচ্ছে না। বাগচী সকালে যে সব বিষয় মনে এনেছিলো তার মধ্যে এটিও ছিলো। আবহাওয়া থেকে অনেক আলাপের বিষয় সৃষ্টি হতে পারে। মৃদুশীতটা কেটের মনে আনলো বিষয়টাকে। যেমন এনেছিলো বাগচীর চিন্তায়। সে বললো, গতবার কিন্তু আমরা ক্রিস্টমাসে কলকাতায় যেতে পারতাম।

—কেন? সে সময়ে দেওয়ানজির বজরা কলকেতায় গিয়েছিলো বলে।

—নিশ্চয়ই। তুমি কি মনে করো সাধারণত যে নৌকাগুলো দক্ষিণদিকে যাত্রা করে সেগুলো ভদ্রলোকের পক্ষে নিরাপদ?

—সব সময়ে নয়। তাছাড়া বিউটি প্রভোকেথ থিফ, সুনার দ্যান গোল্ড। (সৌন্দর্য সোনার চাইতেও চৌর্যকে নুব্ধ করে।)

কেট হেসে বললো,—দ্যাটস্ রকবটম্ উইজডম্। (ওটা চূড়ান্ত বুদ্ধির কথা।) কিন্তু তা ছাড়াও ক্যালকাটার সমাজে সময় কাটানোর সঙ্গী খুঁজতে হতো না।

—বেশ কথা, তোমার মত জানা রইলো। গতবার রাজকুমারেরও যাওয়ার কথা ছিলো। এবার হয়তো যাবেন।

কিন্তু শুধু আবহাওয়াই তো নয়। আমাদের মনে চিন্তা অনেক সময়ে তির্যকভাবে আসে। বড়দিনে কলকাতায় যাওয়ার কথাটা গোড়ায় (একেবারে গোড়ায়) এমন একটা বিষয় ছিলো যাকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলে মনের চালচলনকে কৌতুকের মনে হবে। উল্টো দিক থেকে চিন্তার ব্যাপারটা এইরকম : বড়দিনে কলকাতায় যাওয়ার আগে রাজকুমারের কলকাতায় যাওয়া, বড়দিনের বা ইস্টারের উৎসবের সময়ে (যেমন রাজকুমার গতবার গিয়েছিলেন); তার আগে অন্য এক রাজকুমার বিলেতে যাচ্ছেন, রাজকুমারের কলকাতায় যাওয়ার মূলে কি উৎসবের আসরে ইংরেজ সমাজে মেশার সুযোগ আসে? সে সুযোগের কি দরকার? রাজকুমার একদিন বলেছিলেন বটে রসিকতার সুরে এর পরে তিনি মূর্খদের পর্যায়ে গণ্য হবেন। কিন্তু এই চিন্তাগুলোরও সূচনায় ছিলো আজ সকালের নিওগির শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে বলা কথাগুলি।

—কেট ক্রিস্টমাসে কলকাতায় যাওয়ার চিন্তাটাকে পাশ কাটিয়ে রাজকুমারদের মতো মানুষদের কলকাতার বড়দিনের উৎসবে (অর্থাৎ খানাপিনায়) যোগ দিয়ে কী লাভ হয়, কী লাভ হতে পারে এই চিন্তা করবে যখন তখন তার মনে পড়লো এখন এটা লাঞ্চের ক্ষণস্থায়ী অবসর। এখন তেমন গুরুতর বিষয়ে আলাপ করা উচিত নয়। বরং রবিবারের সকালের জন্য এটা আলাপের বিষয় হতে পারে।

লাঞ্চ শেষে বাগচী পাইপ ধরানোর ব্যবস্থা করছে। পাইপটা শেষ হলে সে স্কুলে যাবে।

কেট হেসে বললো,—সেন্ট টমাস্ কিন্তু মনে মনে তোমার নতুন পরীক্ষাবিধিটাকে মানছেন না।

—আমারও ধারণা তাই। এ বিষয়ে আমি কিছু অসহিষ্ণু। মনে হচ্ছে দেরি হয়ে যাবে।

—কি, জ্ঞানবিজ্ঞান শেখার বিষয়ে?

—তা তো বটেই। শিখতে হচ্ছে সবই ইংরেজি ভাষাকে আগে দখল করে। তাতে সময় চলে যাচ্ছে।

পাইপ সরিয়ে হাসলো বাগচী। বললো,—খারাপ! একজনের মুখের ইংরেজি না শুনলে, একজনের ঠোঁট দুটি কি করে ফুল হয়ে হয়ে শব্দগুলি তৈরি করছে না দেখলে আমার জগৎ অন্ধকার! —না ডার্লিং, স্বপ্নেও ইংরেজি আমার ভাষা।

—কথাটাকে এড়িয়ে গেলে।

—দেখো, আমি অসহিষ্ণু বলেই বোধ হয় এখন থেকেই প্রতিকার খুঁজছি। দেখো স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সব জায়গাতে ইংরেজি ভাষার উপরে জোর দেয়াতে শিক্ষিত বলতে ইংরেজিতে লিখতে বলতে পারে এমন লোককে বোঝাচ্ছে। কিছু দিনের মধ্যে একটা মাইনরিটি জন্মাবে যারা দেশের থেকে পৃথক হয়ে নিজেদের স্বার্থ মাত্রকে দেশের স্বার্থ মনে করবে।

বাগচী উঠলো ট্যাকঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে। পথে স্বাভাবিকভাবে স্কুলের কথাই মনে হলো বাগচীর। এই স্কুলটা কিন্তু একটা সাধারণ ব্যাপার নয়। কলকাতার সেই সব স্কুল যার সঙ্গে বীটন প্রভৃতিরা জড়িত তাদের মতোই একটা দৃঢ় বনিয়াদের বিশিষ্ট কিছু। আর মনে রাখতে হবে

দেওয়ানজি হরদয়ালের এটা হৃদয়ের সৃষ্টি। তাই বলতে হবে। একজন ঔপন্যাসিকের কাছে যেমন তার উপন্যাসগুলি, মনে করা যাক রলের কাছে যেমন তার মিশন হাউস হতে পারে, তেমন হরদয়ালের কাছে এই স্কুল। সেই প্রথম দিকে মনে হয়েছিলো চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে এটা এক আলোক-স্তম্ভ যেন। তখন হরদয়ালের মনে স্কুলটাকে আবাসিক করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিলো। আশঙ্কা করেছিলেন স্কুলে যা শিখবে গৃহের কুসংস্কারের আবহাওয়ায় তা কি মূল্যহীন হয়ে যাবে না? এই কথাটাতে হরদয়ালের স্কুল স্থাপনের আগ্রহটা কোথায় তাও যেন কিছু বোঝা যায়।

আগ্রহ তো বটেই। নতুবা কে নিজের সঞ্চয় উজাড় করে দেন? বেতনের একটা অংশ নিয়মিত অনুদান হিসাবে বহাল রাখেন?

এই চিন্তাগুলো বাগচীকে একেবারে তাঁর আধুনিকতম চিন্তায় নিয়ে এলো। একই সঙ্গে দুটো হয় না। হয় একটা ভালো হস্টেল করতে হয়, অন্তত জনদশেক ছাত্রের মতো, নতুবা প্রেসটাকে করতে হয়। হস্টেল দরকার। কয়েকটি ছেলে নানা জায়গা থেকে দরখাস্ত করেছে। একজন তো লিখেছে স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য যদি খৃস্টান হতে হয় তাতেও সে রাজী। (বাগচী আবার মনে মনে না-হেসে পারলো না।) অন্যদিকে উপযুক্ত বই কোথায়? কিছু কিছু নিজেদেরই লিখে ছাপিয়ে নিতে হয় না? এবার একটা পছন্দ করার পালা। কোন্‌টা আগে দরকার তা ঠিক করতে হবে।

কিন্তু চরিত্রগঠন—যা নিশ্চয়ই হরদয়ালের উদ্দেশ্য, সে বিষয়ে কি স্কুল সাহায্য করছে? যে ছেলেটি স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য খৃস্টান হতেও রাজী (বাগচী কথাটা মনে হলে না হেসে পারে না—ছেলেটা শুনেছে হেডমাস্টার খৃস্টান, সুতরাং খৃস্টান হলেই বিশেষ সুবিধা), কি তার উদ্দেশ্য।

এ বিষয়ে বা অনুরূপ বিষয়ে রবিবারের প্রশস্ত অবসরে বাগচী আলাপ করেছিলো কেটের সঙ্গে। কিন্তু তার আগে শনিবার ছিলো। আর সেই শনিবারে সর্বরঞ্জনপ্রসাদকুসুম নিওগির কথা বলতে হয়, যদিও স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে তার কথা আমাদের এই ইতিহাসের মূল ধারা থেকে কিছু দূরে অবস্থিত। কিন্তু এই এক অসুবিধা এখানে যে ইতিহাসের উপাদানগুলো অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, (না আছে কোন রাজকাহিনী, না আছে পাথরে বা তামার পাতে খোদা-সালতামামির সাক্ষ্য)। বরং মনে হয় ইতিহাস যাদের কথা তাদেরই কারো কারো এরকম চেষ্টা ছিলো যেন পদচিহ্নের স্বাতন্ত্র্যগুলি মুছে দিতে হবে। এই গুহা থেকে যে নিষ্ক্রান্ত হয় কিংবা এই গুহাতে যে প্রবেশ করে সে অন্যান্য প্রাণীগুলি থেকে কিছুমাত্র পৃথক নয়, এরকম প্রচার ছিলো।

শহীদ শব্দটা এবং যার অনুকরণে তার ব্যবহার সেই মার্টার শব্দটা, দুই-ই বিদেশাগত। এই দেশের ভৌগোলিক সীমায় সম্ভবত যে মনোভাব থেকে শহীদ বা মার্টার হওয়াকে মহান কিছু মনে করা হয় সেটা ছিলো না। দধীচি এক মহান উদ্দেশ্যে আত্মবিসর্জন করেছিলো, কিন্তু তাকে তখনও কেউ শহীদ বলেনি। কখনও কখনও মনে হয় এদেশের জলবায়ুতে এমন কিছু আছে যার ফলে শহীদ হওয়ার মতো সিআরিয়াস হতে আমরা জানতেম না। এমন কি হতে পারে যে সেমেটিক জগতের উষর কার্পণ্য এবং ইউরোপের সূর্যহীন শৈত্য মৃত্যুর অন্ধকার ও বন্ধ্যাত্বকে জীবনের সমান্তরাল বলে প্রতিষ্ঠিত করে?

সে যাই হোক, যখনকার কথা বলছি তখন শহীদ কথাটা তত প্রচলিত ছিলো না, কিন্তু ইংরেজি শিক্ষিত মহলে মার্টার শব্দটা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছে। স্বভাবতই শব্দটা সাহিত্যের ছাত্র সর্বরঞ্জনপ্রসাদ কুসুমের জানা ছিলো। উপরন্তু গত চার-পাঁচ দিনের আলাপে (যে আলাপের জন্য গ্রামের ডাকঘরে সন্ধ্যার কিছু আগে যে আড্ডা বসে সেখানে পর্যন্ত সে নিজেকে উপস্থিত করেছিলো) সে বুঝতে পেরেছে স্থরেন এবং নরেশ কলকেতার সঙ্গে সংযোগ থাকায় নতুন ধর্মমত সম্বন্ধে আগ্রহী বটে, তাতে কিন্তু থিয়েটারে আগ্রহ কম নয়। চরণদাসও বলেছে থিয়েটারটা মিটে গেলে সে আবার বাইবেল পড়তে যাবে (সে স্বীকার করে এত সহজে এত ভালো ইংরেজি শেখার অন্য উপায় নেই), কিন্তু অভিনয়ে অংশ যদি নাও নেয় প্রম্‌ট্ করার ব্যাপারে সে বন্ধুদের সাহায্য করবে। দ্বিতীয়ত সে বুঝতে পেরেছে (প্রমাণও তো হাতের কাছেই, এক সপ্তাহের মধ্যেই মৌখিক পরীক্ষার আদর্শ প্রশ্ন হেডমাস্টার মশায়ের হাতে পৌঁছে দিতে হবে), এখানকার যে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা হচ্ছে তা হবে কলকেতার শিক্ষাব্যবস্থা থেকে পৃথক। চারিদিকে যেন অন্ধকার ঘিরে আসার আভাস।

অন্য দিকে কাল বিকেলে তাকে অবাক করে অত্যন্ত সুদৃশ্য এক প্রস্থ আসবাব তার বাসায় পাঠানো হয়েছে। আসবাব সম্বন্ধে হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে কথা হয়েছিলো বটে। ইতিমধ্যে কি সেই আলাপের ফল দেখা দিলো? অথবা এটা তা নাও হতে পারে। যারা আসবাব এনেছিলো তারাই বললো এগুলো দেওয়ানকুঠিতে বাড়তি হয়েছে। অর্থাৎ হাতে কিছু বাড়তি আসবাব হতেই দেওয়ানজি তা পাঠিয়ে দিয়েছেন স্কুলের একজন শিক্ষকের স্থবিধার কথা মনে রেখে।

এরই ফলে সকালেই সর্বরঞ্জনপ্রসাদের মনে একই কালে বেশ কিছু হতাশা এবং অল্প পরিমাণে উৎসাহ দেখা দিয়েছে। এবং সে অনুভব করছে তার এই পঁয়ত্রিশ বছর বাড়তে বাড়তে এক সময়ে পঁয়ষট্টি হবে। তখনও তাকে হয়তো এই গ্রামেই এই অল্পপরিমাণ উৎসাহ এবং সমধিক হতাশা নিয়ে চলতে হবে। না, না, এটা অনিবার্যই, কেন না যারা বি. এ. পাশ করেই হাকিম হতে পারছে তাদের মতো সৌভাগ্যবান নয় সে ; এমন কি বি. এ. পাশ করার পরই সিম্পসন স্যামসন্ অ্যাটর্নি কোম্পানিতে যে আর্টিকেলড্ ক্লার্ক হওয়ার কল্পনা হয়েছিলো তাও অবাস্তব, কেন না ততদিনে তার সংসার কে চালায়? এই অবস্থায় ভাদুড়ি মশায় যখন এই চাকরি করে দিলেন তখন এটাকেই ঈশ্বরনির্দিষ্ট বলে মানতে হবে। যাত্রার সময়ে সমাজবৃদ্ধরা সকলেই উচ্চকণ্ঠে তাকে আশীর্বাদ করেছে। সকলেই এক বাক্যে বলেছে: ইহাকে ঈশ্বরপ্রেরিত জ্ঞান করবে। মনে করো তোমার বদলে যদি পৌত্তলিক কারো এই চাকরি হতো সে কি দেশের ওই অংশকে আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন করতে সহায়তা করতো না? আর এখন তোমার আলোক থেকে কত ছাত্রই না আলো জ্বালে?

এখন প্রদীপের স্বভাবই এই যে তা জলের মতো স্নিগ্ধতায় সার্থক হতে পারে না। তার আলো যখন স্নিগ্ধ তখনও কোথাও যেন একটা দহনের জ্বালা থাকে।

স্থতরাং নিওগির মনে কিছু দাহ ছিলো। আপাতত তা স্থরেন নরেশ প্রভৃতির নাটকপ্রিয়তা, যার অন্যনাম তার চিন্তার পরাজয়, তাকে অবলম্বন করে তীব্র। এই অবস্থায় স্কুলের জন্য পথে বেরিয়ে তার যেন অসংলগ্নভাবে মনে হলো সেন্ট বার্থলোমিউকে ওরা জীয়ন্তে গায়ের চামড়া তুলে নিয়েছিলো, সেন্ট ফ্র্যান্সিসকে ওরা পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলো। হে প্রভু, আমাকে দগ্ধ করো, দগ্ধ করো। স্বর্ণকারের

ন্যায় তুমি আমার খাদ-পান পুড়িয়ে ফেলো। কেন না চারিদিকের ঘনিয়ে আসা অন্ধকার, যার প্রতীক স্থরেন-নরেশের উপরে রাখা আস্থার বিশ্বাসঘাতকতা, এবং স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থা দেশের প্রধান শিক্ষার স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া—তার মধ্যে স্কুলের এই স্থায়ী চাকরি যার বেতন তুলনীয় ভাবে ভালো এবং কাল বিকেলের পাওয়া স্বদৃশ্য দামী আসবাব—(নাকি চাইনীজ লেকারের কাজ) যা তার মনে মৃদু উৎসাহ সঞ্চার করে বর্তমান। নিওগি নিজের চিন্তাকে বিশ্লেষণ করলে দেখতো তার স্বর্ণ ও খাদের কাব্যে স্বর্ণের সঙ্গে আসবাবগুলির ঔজ্জ্বল্য এবং খাদের সঙ্গে নাটকের ব্যাপারে তার পরাজয়ের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।

বোধ হয় মনের এই বিশেষ ভঙ্গিতে চলতে গিয়ে সর্বরঞ্জনপ্রসাদ সেই শনিবারটাকে বিশিষ্ট করে তুলেছিলো যার কথা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি।

তার মুখমণ্ডলে প্রশান্ত শান্তি, চোখে নিজের পরিবেশকে লক্ষ্য করার স্থির দৃষ্টি, কিন্তু অন্তরে আলোক বিকিরণ করার আগ্রহ, যাকে জ্বালার থেকে এককালে পৃথক করা যায় না।

সে চিন্তা করলো এটা এখন আর জায়গীরদারি নয়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে স্থির। এখানে স্থতরাং স্থায়ীভাব আছে। এখানে যা কিছু করবে তা স্থায়ী হতে পারে একশ বছরের জন্য। মনে করা যাক একটা ব্রহ্মমন্দির স্থাপন করা গেলো যেখানে সত্যধর্মের উপাসনা হবে। সেটা স্থায়ী হবে বলে আশা করা যায়।

প্রকৃতপক্ষে এটা তার চিন্তাকুশল মনের পরবর্তী চিন্তার পটভূমি রচনার চেষ্টা যা স্থানকে প্রথমে নির্দিষ্ট করলো। সে ভাবলো, তা ছাড়া এখানে আমরা অতিবৃদ্ধও কেউ নই। (এটা পাত্র সম্বন্ধে বটে কিন্তু সত্যচিন্তা হলো না। যে হেতু তার স্কুলে কৈলাস পণ্ডিত ছিলো যাকে স্থবির বলা উচিত, শিরোমণি নিযুক্ত হয়েছে যার পলিতকেশ তাকে প্রৌঢ়ত্বের সীমার ওপারে স্থাপন করে, রাজবাড়িতে নায়েব মশায় আছেন যাঁকে পরিপক্ব বলতে হয়। সর্বরঞ্জন বরং যেন বাছাই করে নিচ্ছে তার চিন্তাভাবনা কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত একটা টিম হতে পারে এমন মানুষ কয়েকটিকে।) কি আশ্চর্য আমরা প্রকৃতপক্ষে হয় সবেমাত্র চল্লিশ পার হয়েছি কিংবা চল্লিশের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। দেওয়ানজি, হেডমাস্টার মশাই, রানীমা (নিওগির বোন ব্রহ্মঠাকুরানী যে নাকি ঘটকিনী হয়ে এসেছিলো তার হিসাবে) এঁরা সবাই সবেমাত্র চল্লিশ পার হয়েছেন। ওদিকে ডানকান সাহেবও তাই হবে। সে নিজে, স্থরেন, নরেশ, চরণদাস, এবং গৌরী প্রভৃতি আরও অনেকে ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। এ হিসাবে বোধ হয় মিসেস বাগচী এবং তার নিজের স্ত্রীকে ধরতে হয়। কিংবা টিম শব্দটা এখানে ঠিক নয়, বরং তেমন একটা খেলুড়ে দল যাদের থেকে নিজের দলের ও বিপক্ষের খেলোয়াড়দের বাছাই করা যায়।

অর্থাৎ এক কথায় সকলেই কর্মঠ এবং তার ফলে এই গ্রাম দ্রুত অগ্রসর হতে পারে। সর্বরঞ্জন অবশ্যই গ্রামের অসংখ্য বৃদ্ধ এবং তরুণদের হিসাবে আনলো না। এবং সে যেমন ভেবে থাকে ঠিক এই সময়েই ঈশ্বরনির্দিষ্টভাবে এক যোগাযোগ ঘটে গেলো। যা নিজের চিন্তায় তন্ময় থাকায় সে দেখেও দেখলো না। তিনটি ঘোড়া তীরের ফলার মতো অগ্রসর হচ্ছে। পুরোবর্তীটির একটু পিছনে রাস্তার দুপাশে দুটি। পুরোবর্তী ঘোড়ার সওয়ার নিতান্ত তরুণ, তার পোশাক ইউরোপীয়, রাইডিং কোট এবং ব্রিচেস, মাথায় বারান্দা-দেয়া টুপি। পিছনের সওয়ার দুজনের পোশাক কি সর্বরঞ্জনের

পূর্বপরিচিত মনে হলো না ? লাটসাহেবের সওয়ারদলকে সে কি কলকাতায় দেখেনি। সেই রকমই পোশাক, রঙে তফাত ; পাগড়ির যে অংশ পিঠের উপরে তার গাঢ়নীল রঙে রুপার জরির দাগ ; তাদের হাতে খাড়া করে রাখা বল্লম—রুপোর তৈরি মনে হয় দণ্ড, কিন্তু তাহলে ভার হতো, হয়তো পাকা বেত বা বাঁশ রুপোয় মোড়া। বল্লমের ফলার কিছু নিচে একটা করে ছোট সরু গেরুয়া রঙের রেশমী পতাকা। যৌবনের চিহ্ন যেন। কোথায় কার মনে ইচ্ছা হয়ে ছিলো, আজই পথে দেখা দিলো। নতুন রিশালার প্রথম দল।

কিন্তু সর্বরঞ্জন নিওগি ভাবলো : এই পরিস্থিতিতে সব দুঃখজনক নয়। মনে রাখতে হবে এই গ্রামের স্বল্প কয়েকজন কর্মঠ পুরুষ যারা প্রভার বিস্তার করতে পারে তাদের মধ্যে সেও একজন, যদিও সে পরে এসেছে। এবং আমাকেও যা জানি, যা বুঝি তার সম্যক প্রচার করতে হবে।

এ বিষয়ে অবশ্যই দেওয়ানজি তার প্রধান সহায়। পুত্রের নামকরণ-উৎসবে দেওয়ানজি প্রার্থনা-বেদিতে বসলে গ্রামের সকলে এ বিষয়টা বেশ ভালো করেই বুঝতে পারবে। উৎসবের অন্যান্য ব্যবস্থা তার গৃহিণী অনায়াসেই করতে পারবে। এবং তার পরিবারের সকলেই এ ব্যাপারে গৃহিণীকে নিশ্চয় সাহায্য করবে। কিন্তু সর্বাগ্রে দেওয়ানজির মত নেয়া দরকার।

[ক্রমশ]

সমালোচনা

দুঃখে সুখে বাঁচা—নিখিলচন্দ্র সরকার। রবীন্দ্র লাইব্রেরী। কলিকাতা, ১২। মূল্য দশ টাকা।

প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে প্রেমেন্দ্র ও শৈলজানন্দ মধ্যবিত্ত জীবনের ধূলিধূসরতা নিয়ে উপন্যাস রচনা করলেন। তখন শরৎসাহিত্যের স্নিগ্ধ রসে আপ্লুত বিপুল পাঠককুলের অনেকের চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। নরনারীর আসঙ্গকামনার অচরিতার্থতা তবে কি মানবজীবনের মুখ্যতম সমস্যা নয়?

আছে সবই, তবু মানুষ তৃপ্তি পায়নি। মহানগরের গলিখুঁজিতে মধ্যবিত্ত তার বিত্তের মধ্যবর্তিতার উপকথায় নির্মমভাবে পরিহসিত; নিঃস্বতার সীমান্তে দাঁড়িয়ে সে আজ ধুঁকছে। অথচ পুরাতন অন্ধ বিশ্বাসকে ত্যাগ করছে না কিছুতেই। সাগরসঙ্গমে গিয়েও সে পান করছে বদ্ধজলার জল গণ্ডূষ ভ'রে। দেশবিদেশের 'মুক্তিকামী'দের লোভের লালায় গ্রামে-গঞ্জে খাদ্যবস্ত্র অদৃশ্য হয়ে যায়; মহাযুদ্ধের ইতিহাস মানবনিগ্রহের কালো কালো অক্ষরে ভ'রে ওঠে।

মানুষকে খুঁজতে গিয়ে অচিরকালের মধ্যে যেখানে এসে লেখকেরা দাঁড়ালেন, সেখানে মানুষ আর রইল না। যখন শুধু ব্যঙ্গ আর শ্লেষ থাকে, হাসি থাকে না, যখন শুধু দীর্ঘনিশ্বাস আর গোঙানি থাকে, কান্না থাকে না, তখন মানুষ জীবিত থেকেও জীবন্ত নয়। পথের দুপাশে অনেক গোলাপ—সেসব দুপায়ে মাড়িয়ে কি নায়িকা তার মনের শেষ স্তর পরিষ্কার করতে পারে? অথচ সবাই জানে যে সাপুড়ে গর্ত থেকে সাপ খুঁজে বের করে, তার বিষদাঁত ভেঙে নিয়ে খেলা দেখায়, এবং ইনামও পায়। আবার একদিন সে-খেলা মরণখেলা হয়ে ওঠে।

এযুগে একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই নিশ্চিতভাবে জানতেন, এবার খেলা-ভাঙার সময় হয়েছে। কিন্তু যাঁরা খেলা দেখতে এসেছিলেন, তারা তো চটে আগুন! মানিকবাবুর কী অধঃপতন! মাঝপথে এইভাবে প্রস্থান করার অর্থ কি দর্শকদের অসম্মান করা নয়? শিল্পকে অশ্রদ্ধা করা নয়? মানিকবাবুর লেখকজীবনের নানা পর্যায় তাই আধুনিক বাংলা উপন্যাসের গতি ও প্রকৃতির 'মাইলস্টোন'।

সে ইতিবৃত্ত থেকে খুব কম লেখকই শিক্ষা নিতে চান। শিল্পীর স্বাধীনতা বলে অনেক ধূলিঝড় আজকার প্রমত্ত বাজারে সৃষ্ট হয়েছে; আর সেই ধূলিঝড়ে 'শিল্পী' ও 'স্বাধীনতা' উভয়েই অপঘাতে মৃত্যুবরণ করে। ভোরে ডোমের অভাবে সেই মৃতদেহটি শোকহীন কাকশকুনির উৎকৃষ্ট ফলার হয়।

উপন্যাস বা ছোটগল্প বা নাটক বা এমন কি কবিতা—সৃষ্টিধর্মী সকল রচনা পাঠক ও লেখক দুই তরফের সহযোগিতায় গড়ে ওঠে। পাঠক নেই, তবু উপন্যাস হয়েছে—এমন উদাহরণ মিলবে না। উপন্যাস জন্মক্ষণেই পাঠকের মুখাপেক্ষী—যে পাঠক শিক্ষিত, মননশীল এবং জীবন সম্বন্ধে কৌতূহলী। অপরের কথা শুনতে চাই—এই বিশেষ মনোভাব থেকে উপন্যাসের পাঠকের উদ্ভব।

'অপরের কথা শুনতে চাই' এই ইচ্ছার মতো 'অপরের কথা শোনাতেও চাই' এই ইচ্ছাও উপন্যাসরচনার ক্ষেত্রে কম প্রয়োজনীয় নয়। নিজেকে নিয়ে লোকে জবাবদিহি করে, উপন্যাস করে

না। পরকে নিয়েই লোকে উপন্যাস করে। তাই উপন্যাস আত্মজীবনী মাত্র নয়, বরং সে প্রধানত পরজীবনী। এই পরজীবনী সহসা সর্বজনের মনের অন্তরঙ্গ তারে কি করে আঘাত করে? এ প্রশ্ন শিল্পের শাশ্বত প্রশ্ন। এর কোন জবাব নেই, শুধু অনুমান আছে। কিন্তু এটা জানি আমরা যে, যতটা আঘাত করে, লেখকের সাফল্য ততটা সম্প্রসারিত হয়। বাংলা উপন্যাস আজ এই সহজ কথাটা ভুলতে বসেছে। ভরসা এইটুকু যে, সংকটের ভূত শুধু একটি ক্ষেত্রে ভয় দেখায় নি, সর্বক্ষেত্রে তার উৎকট হাজিরা। কেউ কেউ জীবনের পাঁচালী বিকৃত না করেও আধুনিক হয়েছেন। তাঁদের কাছে উপন্যাস আত্মকূপের কর্দম অন্বেষণ নয়।

সুস্থ, সহজ, সমাজমুখী জীবনের দিনলিপি তাঁরা লিখছেন। এ জগৎ বিস্ময়ের আকর। মানব-জীবন এক অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতা। হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষ এদের কথা কতভাবেই না বলছে —বলছে চামড়ার বুকে, পাথরের পিঠে, বৃক্ষের বাকলে, ধাতুর পঞ্জরে ও কাগজের করতলে। তবু সে কথা শেষ হয়নি, কারণ তা শেষ হয় না। শিল্পী এই প্রত্যক্ষ স্পষ্ট ভুবনকে নিয়ে পশরা সাজালে তিরস্কৃত হবেন, এমন আশঙ্কা সব যুগে ছিল না। আজ অন্তর্মুখী নয়, লেখককে বহির্মুখী হতে হবে। দুঃখে সুখে যে বাস্তব মানুষ বেঁচে আছে, এবং মরে যায়নি, তার বিবরণ সংগ্রহ করতে হবে। ঐতিহাসিকের মত নয়, সালতারিখ দিয়ে নয়। অনাবশ্যক আবশ্যক সকল তথ্যের জট পাকিয়ে নয়, শুধু অত্যাবশ্যক ঘটনাগুলিকে সংগ্রহ করে এ ইতিহাস রচনা করতে হবে—যদি রচনার সময় লেখকের গোপন মনের মাধুরী কিছুটা মিশে যায়, তবু আক্ষেপের কিছু নেই।

আজ মন্দভাগ্য মানুষ বারবার সমালোচিত ও ভর্ৎসিত হচ্ছে। তার দুর্বলতার জন্য, তার অপারগতার জন্য। এই ভর্ৎসনার ভয় জয় করে তাকে এগুতে হবে। নিখিলবাবু আমাদের সকলের হয়ে এই কাজটি করেছেন। তিনি তাঁর বর্তমান উপন্যাসে অনেকগুলি ভাঙা পুতুল নিয়ে গিয়েছিলেন হাজারিবাগ রোডে। আলো হাওয়া তাপ আর অপর্যাপ্ত মাটির প্রলেপে সেই ভাঙা পুতুলগুলোর অনেকখানিই মেরামত তিনি করেছেন। একসময় তারা প্রতিমা হয়ে উঠবে। নিখিল-বাবুর অতসী, সান্ত্ব, অনিল, সন্দীপ—সবাই অনেকখানি নিরাময় হয়ে উঠেছে। উপন্যাস পড়ে বলতে পারি আমাদের বাঁচবার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না। দুঃখে সুখে বাঁচা আসলে মানুষেরই মতো বাঁচা। এবং মানুষের জন্য বাঁচা। ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের একটি গ্রন্থের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বহু বৎসর পূর্বে লিখেছিলেন, বই পড়ে বোঝা গেল যে গ্রন্থকার একজন অভিজ্ঞ ধাত্রী। নিখিলবাবুর লেখনী এখনও ততটুকু অভিজ্ঞ হয়নি। গল্পের মধ্যে ছেদ ও যতি স্থাপনে, সংলাপের মধ্যে নানা মীড় রচনায়, চরিত্রের মধ্যে নানা অবস্থার উদ্‌ঘাটনে নিখিলবাবুর এখন অনেক সাধনার প্রয়োজন রয়েছে। পথনির্বাচন নির্ভুল; এখন সেই পথের বিঘ্নগুলি, কাঁটাগুলি উপড়ে ফেলতে হবে।

সুরেশচন্দ্র মৈত্র

Burr. *By* Gore Vidal. Random House. New York. $8·95

১৯৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতালাভের দুইশত বৎসর পূর্ণ হবে। মার্কিনীদের স্বদেশভক্তি প্রায় কিংবদন্তীর জিনিস। আমাদের এখানে আড়াই ঘণ্টাব্যাপী অতি নিকৃষ্ট সিনেমা অম্লানবদনে দেখি কিন্তু এক মিনিটের জাতীয় সংগীত শোনবার সময় ভীষণ দরকারী কাজের কথা মনে পড়ে যায়। মার্কিন মুল্লুকের বিদ্যারম্ভের প্রথম থেকেই ছেলেমেয়েদের স্বদেশভক্তির পাঠ শুরু হয়। প্রত্যেক শিশু জ্ঞানোন্মেষের পর থেকে শোনে স্বাধীনতাযুদ্ধের বীরদের গাথা। সে গাথার মণিমাণিক্য হলেন ওয়াশিংটন জেফারসন লাফায়েট প্রভৃতিরা। এই যুদ্ধেরই এক বীর আরন বার। আমেরিকার তৃতীয় উপরাষ্ট্রপতি। জেফারসনের প্রথম রাষ্ট্রপতিত্বের বৎসরে যিনি উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন।

বার মার্কিন ইতিহাসের এক অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক চরিত্র। তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা বিচিত্র, প্রতিভা বহুমুখী। স্বাধীনতাযুদ্ধে তাঁর বীরত্ব সর্বস্বীকৃত। সে সময় তিনি পুরোপুরি তারুণ্যের কোঠা পার হন নি। দেশের স্বাধীনতার পর আমরা তাঁকে দেখি অত্যন্ত সফল আইনজীবী হিসাবে। রাজনীতিতে তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ। নিউ ইয়র্ক রাজ্য তাঁর প্রভাবাধীন। তারই ফলে তিনি উপরাষ্ট্রপতি। সেসময় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যিনি দ্বিতীয় সর্বাধিক ভোট পেতেন তিনিই হতেন উপরাষ্ট্রপতি। সেবার জেফারসন এবং বার দুজনেই পেয়েছিলেন সমানসংখ্যক ভোট। বার একটু চেষ্টাচরিত্র করলেই রাষ্ট্রপতি হতে পারতেন। সে চেষ্টা তিনি করেননি। তখন তাঁর ধারণা ছিল রাষ্ট্রপতি তিনি পরে হবেনই। তাঁর আগের দুজন উপরাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর উপরাষ্ট্রপতিত্বের শেষের দিকেই তাঁর দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত। এই সময়ে তাঁর সবচেয়ে বিপজ্জনক রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী আলেকজান্দার হ্যামিলটনের সঙ্গে বিরোধ চরমে ওঠে এবং পরিণতিস্বরূপ হ্যামিলটনের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয় এবং সে যুদ্ধে হ্যামিলটন নিহত হন। সেদিন নিজেদের সম্মান রক্ষার জন্য দ্বন্দ্বযুদ্ধ একটা সম্মানজনক ব্যাপার ছিল কিন্তু বারের বেলায় হল অন্যরকম। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ এল দুই-দুইটি রাজ্যে। এ সময় বার উপরাষ্ট্রপতি এবং পদাধিকারবলে তিনি সিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করে চলেছেন। মামলায় তিনি অব্যাহতি পেলেন। রাষ্ট্রপতিপদলাভের জন্য তাঁর সে সময় আর চেষ্টা করে লাভ নেই। কিন্তু তখনো তাঁর দুর্ভাগ্যের শেষ হয়নি। এরপর তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এলো যে তিনি আমেরিকার তদানীন্তন পশ্চিমাঞ্চলকে নিয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়বার ষড়যন্ত্র করছেন। দেশদ্রোহিতার অপরাধে তাঁর বিচার শুরু হলো। এ বিচারেও তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হলেন। কিন্তু দেশের হাওয়া তাঁর অনুকূল নয়, তাই তিনি কিছুদিনের জন্য দেশত্যাগ করলেন। পরে দেশে ফিরে আবার আইনব্যবসা শুরু করেন। প্রচুর অর্থ রোজগার করেন, খরচ করেন তারও বেশী। পরিণত বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

বারকে আমরা চিত্তাকর্ষক চরিত্র বলেছি, বার জনপ্রিয় ব্যক্তিও ছিলেন। স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল দুর্বার এবং মেয়েরাও তাঁর প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হতেন। বহু নারী তাঁর স্নেহধন্য ছিলেন এবং বারের ঔরসে বহু সম্ভ্রান্ত গৃহে বহু সন্তানের জন্ম হয়েছিল। কিংবদন্তী তাই বলে। বারের শত্রুসংখ্যা ছিল প্রচুর। তার জন্য দায়ী তাঁর চরিত্র। এই ভদ্রলোক ইচ্ছা করলেই

রাষ্ট্রপতি হতে পারতেন। ইচ্ছা করলে আমেরিকাকে টুকরো করতে পারতেন। কিন্তু জীবনে তাঁর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। এ ধরনের লোক যে কোনো দেশে যে কোনো সময়ে অবাঞ্ছিত এবং হিসাবী লোকদের কাছে বিপজ্জনক। বারের ভাগ্যেও অন্যথা হয়নি।

গোর ভিডাল তাঁর সাম্প্রতিকতম উপন্যাস এই চিত্তাকর্ষক চরিত্রটিকে নিয়ে লিখেছেন। উপন্যাস শুরু হয়েছে জ্যাকসনের রাষ্ট্রপতিত্বের শেষ দিকে। পরের নির্বাচনে উপরাষ্ট্রপতি মার্টিন ভ্যান বুরিয়েন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দাঁড়াবেন। তাঁকে অপদস্থ করার ষড়যন্ত্র চলেছে। ষড়যন্ত্রের হাতিয়ার বারের একজন সহকারী—উপন্যাসের একমাত্র কাল্পনিক চরিত্র। তিনি একটি জীবনী লিখবেন এই অছিলায় বারের জীবনীর মালমশলা সংগ্রহ করছেন। বার তাঁর সহকারীকে খুব স্নেহ করেন, তাই নিজের স্মৃতিকথা লিখে তাঁকে দফায় দফায় দিচ্ছেন। এই উপন্যাসটি তাই কিছুটা সহকারীর জবানিতে, কিছুটা বারের জবানিতে হাজির হয়েছে। ভ্যান বুরিয়েনের বিরোধীদের ধারণা তিনি বারের জারজ সন্তান। এরই প্রমাণ সংগ্রহ করার চেষ্টা চলেছে। বইটির শেষ পাতায় একটি চমক আছে।

গোর ভিডাল উপন্যাসশেষে এক পরিশিষ্টে নিবেদন করেছেন যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সুবিধা হল যে ইতিহাসনিষ্ঠ থেকেও ঐতিহাসিক ঘটনা অদলবদল করা যায় এবং ঐতিহাসিক বা জীবনীকার যা পারেন না তাই করা যায়—বিভিন্ন ব্যক্তির মতলব সম্বন্ধে আলোচনা করা যায়। ভিডাল আরো বলেছেন যে তিনি কাল্পনিক কথোপকথন ব্যবহার করলেও যেখানে পেরেছেন সেখানেই চরিত্রদের নিজেদের ব্যবহৃত কথাবার্তাই ব্যবহার করেছেন। ভিডাল মার্কিন সাহিত্যের বহুপরিচিত নাম। উপন্যাসটি বের হওয়া মাত্র আলোড়ন তুলেছে প্রচুর। বইটা বিক্রি হচ্ছে খুব, আবার বিতর্কও উঠেছে অনেক। বিতর্কের প্রধান কারণ ভিডাল আমেরিকার লোকগাথার নায়কদের নূতন রঙে রাঙিয়েছেন। জাতির জনক জর্জ ওয়াশিংটন আসলে মোটেই বীর ছিলেন না—যুদ্ধ বুঝতেন না—কোনো বড় যুদ্ধ জেতেন নি—একটু মোটাবুদ্ধির লোক ছিলেন। এর ওপর তিনি ছিলেন দাম্ভিক, গর্বিত আর তোষামোদপ্রিয়। বয়স লুকোবার জন্য গালে লাল রঙ মাখতেন। রাজার আসনে বসবার ইচ্ছা ছিল তাঁর, একথা ভিডাল বলিয়েছেন বারের মুখে। সঙ্গে সঙ্গে ভিডাল একথাও বলেছেন যে ওয়াশিংটনের টাকাপয়সার জ্ঞান ছিল টনটনে।

জাতির জনকের যদি এই অবস্থা হয় তবে অন্যে পরে কা কথা। এই বই পড়বার পর আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধের বহু সেনানীকেই বীর স্বদেশপ্রেমিক না মনে হয়ে মনে হবে চোর জোচ্চর অর্থগৃধ্নু এবং কপট। কপটতার অভিযোগ বারের মুখে প্রায় সকলের বিরুদ্ধেই ভিডাল এনেছেন, একমাত্র ব্যতিক্রম এ্যানড্রু জ্যাকসন। তবে বারের আসল ক্রোধ টমাস জেফারসনের ওপর। শুধু মাত্র মার্কিন দেশে নয়, সারা বিশ্বে টমাস জেফারসন স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ পূজারী বলে খ্যাত। ভিডালের বইতে তিনি পয়লা নম্বরের অপরাধী। তাঁর অপরাধের শেষ নেই—তিনি মুখে যতই সমস্ত মানুষ সমান বলে ঘোষণা করুন না—স্ত্রীলোক, দাস এবং রেড ইণ্ডিয়ানদের বেলা একথা মানতেন না। তাঁর অধীনে যত নিগ্রোদাসী ছিল প্রায় প্রত্যেককে জেফারসন উপপত্নী হিসাবে ব্যবহার করতেন। টাকাপয়সা সম্বন্ধে মোটেও সৎ ছিলেন না। জেফারসন পররাজ্যলোলুপ ছিলেন এবং

পারলে মেক্সিকো এবং কানাডাকে যুক্তরাষ্ট্রভুক্ত করতেন। এ সমস্তই বারের অভিযোগ (অথবা ভিডালের)। মার্কিন দেশে বাক্স্বাধীনতার সম্বন্ধে বারের মুখে ভিডাল বলিয়েছেন বাকস্বাধীনতার অর্থ হল সবাই যে কথা বলছে সে কথা বলার স্বাধীনতা। এ ধরনের ছোটখাট মণিমুক্তা ৪৩০ পাতার বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো ছিটানো রয়েছে।

বইটি সম্বন্ধে কিছু ঐতিহাসিক আপত্তি তুলেছেন—তাঁদের বক্তব্য ঔপন্যাসিকের ঐতিহাসিক হওয়া কিংবা ঐতিহাসিকের ঔপন্যাসিক হওয়া দুইই অনুচিত। ভিডাল যা করেছেন তা না ইতিহাস না উপন্যাস। অন্য পক্ষের লোকেরা বলেছেন কিংবদন্তীর সঙ্গে সত্যের কোনো সম্পর্ক নেই। কিংবদন্তীর মোড়ক ছাড়ালে যা বেরিয়ে আসছে তা দেখে কষ্ট পেয়ে লাভ নেই। কিন্তু তবু ভিডালের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েইছে যে তাঁর আসল উদ্দেশ্য মানীব্যক্তিদের গায়ে কাদা ছোঁড়া।

ইতিহাস ব্যাপারটা এখন আর সহজ ব্যাপার নয়। তার নানারকম ব্যাখ্যান, নানা টীকাটিপ্পনী। বিভিন্ন মতবাদের চশমা দিয়ে ইতিহাস দেখাই এখন রীতি। যেখানে চশমার রঙের সঙ্গে ঘটনার মিল নেই সেখানে ঐতিহাসিক স্বচ্ছন্দে আপন মনের মাধুরী মেশান। আমাদের দেশেও এ কাজ ঐতিহাসিকরা করছেন। সুতরাং একজন ঔপন্যাসিক যদি সেটা করেন তবে মারাত্মক কোন ক্ষতি নেই। এই অতি সুখপাঠ্য বইটি পড়তে পড়তে আমার নিজের দেশের কোনো কোনো নাট্যকার ঔপন্যাসিককে মনে পড়ছে, যাঁরা বাংলার রেনেসাঁর আসল নায়ক হিসাবে খুঁজে পান একজন ঝাড়ুদারকে আর সিপাহী বিদ্রোহের নায়ক করেন বাঙালী তন্তুবায় সন্তানকে। গোর ভিডালও তেমনি খুঁজে পেয়েছেন আরন বারকে। গোর ভিডালের কলমের গুণে অষ্টাদশ শতকের বারের দেশদ্রোহিতার মামলা একেবারে সমসাময়িক হয়ে উঠেছে।

ভিডাল বরাবরই তাঁর পাঠকদের চমক দেখিয়েছেন আঙ্গিকের আর বিষয়বস্তুর নূতনত্বে।

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্রস্মৃতি—পরিমল গোস্বামী। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী। কলিকাতা, ১২। মূল্য বাইশ টাকা।

শুকের মুখে বা ঘোড়ার ডাকে চিঠি পাঠানোর রেওয়াজ অনেক কালের পুরনো হলেও, সেগুলোকে সংগ্রহ করার সদিচ্ছা নিতান্তই হাল আমলের। বলা যেতে পারে, জীবনী-ইতিহাসের উপকরণ হিসেবেই প্রথম চিঠি সংগ্রহ ও সংকলনের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়। সংবাদমূল্যের অতিরিক্ত গুণে চিঠির মর্যাদা আরও পরবর্তীকালের। সেদিক থেকে এখনও চিঠির জাত দু-ধরনের: এক, যেখানে কোনো অজ্ঞাত তথ্যের বা পত্রলেখকের কোনো অবগুণ্ঠিত মতের পরিচয় আছে; দুই, চিঠি যেখানে সাহিত্যের সামগ্রী হয়ে উঠেছে। যেদিক থেকেই দেখা যাক্-না কেন, ব্যক্তিত্বের গূঢ় পরিচয়ে চিঠির অসামান্য গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত।

কিন্তু চিঠির স্বত্ব যেমন একই সঙ্গে লেখকের ও প্রাপকের, তেমনি লেখকের মনোভাব চিঠিতে

যেমন ধরা পড়ে, প্রাপকের মনোভাবও কি কিছুই পড়ে না ? পড়ে অবশ্যই। আমাদের দেশেই তার উদাহরণ আছে শ্রীদিলীপকুমার রায়ের "তীর্থঙ্কর" অথবা নরেন্দ্র দেব ও শ্রীযুক্তা রাধারানী দেবীর পত্র-সংগ্রহে— যার অংশমাত্র প্রকাশিত হয়েছে "কথাসাহিত্য" পত্রিকায় এই সাহিত্যিকযুগলের সংবর্ধনা-সংখ্যায়। এই দুই পত্রগুচ্ছ পড়লেই বোঝা যাবে, এঁদের মন কতো সজাগ ছিলো, কতো বিচিত্র বিষয়ে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা ছিলো।

কোনো সাংবাদিক একবার রসিকতা করে বলেছিলেন, সাংবাদিকরা এ-কালের কাঁটালী কলা। অন্যসব বিদ্যাজীবীদেরই ক্ষেত্রভেদ আছে, সাংবাদিকের নেই। জাত সাংবাদিকের নিশ্চয়ই আছে; যেমন নাম করতে পারি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বা হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের। কিন্তু পত্রিকার বিক্রি বাড়ানোর জন্য যাঁরা শ্রদ্ধেয়দের গাল পাড়ার সহজ পথ বেছে নেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এই দলভুক্ত নন। শেষোক্ত দলের সঙ্গে পরিমল গোস্বামীর মতো সাংবাদিকের তফাত ঐ শ্রদ্ধা করার শিক্ষায়। শ্রদ্ধা কিন্তু পিঠচাপড়ানো নয়। তাই বেশিরভাগ চিঠির মধ্যেই আছে এক সরস কৌতুকোজ্জ্বল রসিকতার বোধ। এককালে শনিমণ্ডলীর সভ্য হয়েও এখানেই তাঁর বিশিষ্টতা। তিনি নিজেকে সম্মান করতে জানেন, তাই নিজের সামর্থ্যের সীমা-ডিঙিয়ে তাঁর পরিচিত কৃতীপুরুষরা তাঁদের স্বক্ষেত্রে কতোটা সার্থক ও সদ্ব্যয়ী সেই অনধিকারচর্চায় তিনি উৎসাহ পাননি। গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতো বিজ্ঞানসাধক থেকে একাধিক বিখ্যাত সাহিত্যসেবী, পর্বতারোহী তপতী বিশ্বাস থেকে নিখিল দাসের মতো মজলিসী সহৃদয় (!) বন্ধু—সকলের সঙ্গেই তাঁর মিতালির সম্পর্ক, সকলেই জন্যই তাঁর কৌতূহল। সেইটুকুতেই তাঁর খুশি। তিনি সর্বজ্ঞ নন, কিন্তু সকল রসের রসিক। তাই বয়োজ্যেষ্ঠ থেকে শুরু করে পৌত্র-দৌহিত্র সকলের প্রতিই তাঁর অনাবিল শ্রদ্ধা। পরিমলবাবুর "পত্রস্মৃতি" পড়ে উঠে এ-কালে দুর্লভ এই স্বাতন্ত্র্য প্রথমেই মনে রেখাপাত করে। আর করে বলেই, এমন অনেকে আছেন তাঁর এই বিপুল সংকলনে, মহাকাল নয় সমকালেও যাঁরা হয়তো তেমন খ্যাতিমান নন, তাঁদেরও অবজ্ঞা করা যায় না কিছুতেই।

পরিমলবাবু সচেতন, তিনি ঐতিহাসিক নন, অহংবর্জনের সাধনায়ও হয়তো তাঁর মোক্ষলাভ ঘটেনি এখনও, তাই সবিনয়েই সম্ভবত তিনি বেছে নিয়েছেন স্মৃতিচারণের পথ। কিন্তু লক্ষ্য তাঁর ঐতিহাসিকেরই। "স্মৃতিচিত্রণ", দ্বিতীয় স্মৃতি", "আমি যাঁদের দেখেছি", "পত্রস্মৃতি" (এবং তারও পরে প্রকাশিত "যখন সম্পাদক ছিলাম")—একাদিক্রমে এই গ্রন্থপরম্পরায় তিনি যেন একটা যুগের চরিত্রকেই ধরতে চাইছেন, অন্তত তাঁর অভিজ্ঞতায় যে-যুগের প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর জীবিকার গুণেই বহু আপাততুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়েও তিনি এমন অনেক বড়ো মনের পরিচয় পেয়েছেন, যেখানে স্বভাবতই মন শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে। কোনো শ্রদ্ধা-বিরাগী সে-মনোভাবকে নানা বিশেষণে লঘু করার চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু সত্যতা বিষয়ে কটাক্ষ করতে পারবেন না। তাঁর স্মৃতিচারণগুলিতে যা ছিলো বিবৃতি, "পত্রস্মৃতি"তে তারই নিরঙ্কু তথ্যের দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু শুধু কি তথ্য-প্রমাণ বিবাদ-ভঞ্জন ? আসলে, পরিমলবাবুর ঝাঁপিতে দুই জাতের চিঠিই আছে—মেজাজের এবং কাজেরও।

কিন্তু চিঠিও হয়তো এখানে ধরতাই। সেই সুতোর গুন টেনেই তিনি ফিরিয়ে আনছেন বহু

জড়িত ঘটনা এবং প্রয়োজনমতো ঘটনাগুলোর পরিচয়ও দিয়েছেন তখনকারই লেখার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করে। আর এ-সব ক্ষেত্রেই যাঁরা "স্মৃতিচিত্রণ" থেকে "আমি যাঁদের দেখেছি" পর্যন্ত পড়ে এসেছেন তাঁদের কাছে বেশিরভাগই মনে হয় পুনরুক্তি। এমন-কি একাধিক চিঠিও আগের বইগুলোতে মুদ্রিত। অসম্ভব নয়, বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য প্রথম দুটি বইয়ের পুনর্মুদ্রিত হওয়ার আশু সম্ভাবনা নেই বলেই "পত্রস্মৃতি"র পাঠকের শ্রমলাঘব করে দিয়েছেন লেখক। প্রকৃতপক্ষে এখন পর্যন্ত শেষতম প্রকাশিত গ্রন্থটিকে ধরলে পাঁচটি বই একই বইয়েরই অঙ্গ। পরিমলবাবুকে অনুরোধ করবো, সম্ভব হলে এগুলিকে একত্রিত করে একটি বই করতে। বহু পুনরুক্তি তখন আপনা থেকেই বর্জিত হতে পারবে—পাঠকের স্মৃতিকে উসকে দেওয়ার জন্য উদ্ধৃতিও বাহুল্য হবে। ইদানীংকালের বইতে ছবি থাকে না, "পত্রস্মৃতি" সে-বিচারে একেলে বই নয়। আর সন্ধানীদের পক্ষে এ-বই সর্বকালের।

স্বপন মজুমদার

চতুরঙ্গ

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

নিয়মাবলী : বৈশাখ হইতে বর্ষ শুরু করিয়া প্রতি তিন মাসে অর্থাৎ আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ এবং চৈত্র মাসে "চতুরঙ্গ" বাহির হয়। সডাক বার্ষিক মূল্য ৮·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা। বৈদেশিক এক পাউণ্ড স্টারলিং (রেজেষ্ট্রী খরচ সহ)

"চতুরঙ্গে" প্রকাশের জন্য রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠান দরকার। প্রাপ্ত রচনা মনোনীত হইলেও কোন বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করিবার জন্য বাধ্যতা থাকিবে না। ঠিকানা লেখা ডাকটিকিটওয়ালা লেপাফা না থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

প্রতি সংখ্যায় বিজ্ঞাপনের মূল্য :

সাধারণ পৃষ্ঠা ৩২৫·০০ টাকা। অর্দ্ধপৃষ্ঠা ২০০·০০ টাকা। কভার পৃষ্ঠা ৪০০·০০ টাকা ও ৫০০·০০ টাকা পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্বে বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি ও ব্লক আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

প্রবন্ধাদি বিনিময় পত্রিকাদি চিঠিপত্র টাকাকড়ি চেক ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি

পাঠাইবার একমাত্র ঠিকানা :

৫৪ গণেশচন্দ্র এ্যাভিনিউ, কলিকাতা, ১৩ ফোন : ২৪-৬১২৭

বুদ্ধদেব বসুর

কবিতার শত্রু ও মিত্র

বুদ্ধদেব বসুর মৃত্যুর পূর্বে তিনটি রচনার মধ্যে এই গ্রন্থটিও একটি। এটি তাঁর কবিতা ও সাহিত্য বিষয়ে সর্বশেষ রচনা। এই গ্রন্থে 'কবিতা ও আমার জীবন' রচনাটি পড়লে বুদ্ধদেব বসুর কবিজীবনের স্বরচিত ইতিবৃত্ত অনেকখানি জানা সম্ভব হবে।

মূল্য : পাঁচ টাকা

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা, ১২

সোনাপদ্মা

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

পরিবেশক : সেঞ্চুরী প্রেস
৫৪ গণেশচন্দ্র এ্যাভিনিউ
কলিকাতা, ১৩

Hada Textile Industries Limited

Manufacturers of : Quality Tere-Cot Yarn, Super-Combed Hosiery Yarn and Other Weaving Yarn in Hanks & Cones.

Registered Office :
4 Government Place North
Calcutta 700 001

Telephone : 23-8942
23-1679

Telex : 021-3417

Factory :
Diamond Harbour Road
Bishnupur
24 Parganas
West Bengal
Telephone : 615-201

Registered with the Registrar of Newspapers for India under R. N. No. 5480/57

সকলের সাহায্যে ইউকো ব্যাঙ্ক

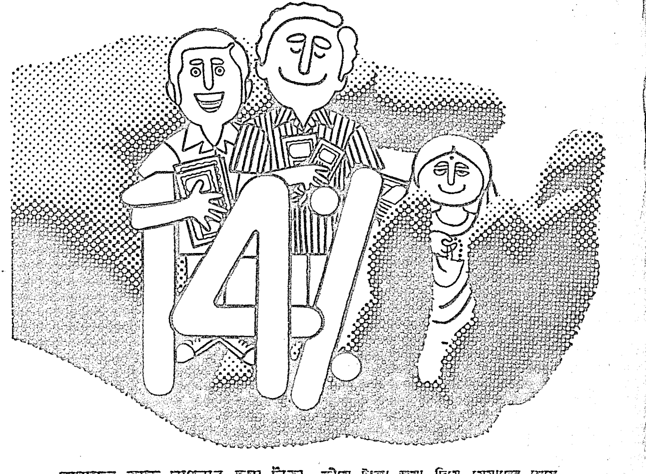

আমাদের কাছে আপনার জমা টাকা এখন শতকরা ১৪ ভাগেরও বেশি কার্যকরী সুদ পাবে

আপনি যদি আপনার জমা টাকার বাড়-বৃদ্ধি চান, তাহলে এখুনি ইউকো ব্যাঙ্কে চলে আসুন। ফিক্সড ডিপোজিটের সুদের টাকা রেকারিং ডিপোজিট প্রকল্পে জমা করে দিয়ে আপনি স্বচ্ছন্দেই শতকরা ১৪ ভাগেরও বেশি সুদ পেতে পারেন। অথবা ১৫ বছরের জন্যে আমাদের ক্যাশ ডিপোজিট সার্টিফিকেট স্কীমে টাকা জমা দিয়ে মেয়াদের শেষে আপনার টাকা ৪ গুণেরও বেশি বাড়িয়ে নিতে পারেন; কাজেই এতে সুদের পরিমাণ দাঁড়াবে শতকরা ২৩ ভাগ।

এছাড়াও, ইউকো ব্যাঙ্কের প্রতিটি শাখাতে সেভিংস, ফিক্সড ডিপোজিট এবং রেকারিং ডিপোজিট স্কীম তো আছেই, উপরন্তু আছে প্রত্যেককে সমান গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত সেবার ব্যবস্থা।

বিশদ বিবরণের জন্যে আপনার কাছাকাছি ইউকো ব্যাঙ্কের শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জনগণকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করছে

UCOC.39 BEN

চতুরঙ্গ

হুমায়ুন কবির প্রতিষ্ঠিত

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

কার্তিক-পৌষ ১৩৮১

HINDUSTAN WIRES LIMITED

Registered Office :

3A, Shakespeare Sarani

Calcutta, 16

PHONE : 44-6745 (3 Lines) TELEGRAM : WIREFIELD

FACTORY : B. T. ROAD, SUKCHAR, 24 PARGANAS

PHONE : 611-203, 611-424

Manufacturers of

Stainless Steel Wires, Alloy Steel Wires, High Tensile Galvanised Steel Wire for ACSR to IS : 398 and High Tensile Wire for Pre-stressed Concrete to IS : 1785

And

Many other specialised High Carbon & Mild Steel Wires such as High Tensile, Spring Steel, Tyre Bead, Cable Armouring, Cycle Spoke, Umbrella Card & Gill Pin Wires and G. I., Annealed, Ball Bearing, Electrode Core Wires etc.

In Technical Collaboration with

MEESRS KOBE STEEL WORKS LIMITED &

MESSRS SINKO WIRE COMPANY LIMITED

J A P A N

কৃষি সংবাদ

আপনার নিজের জমির বীজ পরীক্ষা করিয়ে নিন

প্রত্যেক ফসল চাষ করার আগে আপনার নিজের রাখা বীজ পরীক্ষা করিয়ে নিন। আপনার এলাকার বীজ পরীক্ষাগারের সঙ্গে যোগাযোগ করে নমুনা সংগ্রহের নিয়মাবলী জেনে নিন। প্রতিটি নমুনা পরীক্ষা করানোর জন্য দেড় টাকা ফি লাগবে। তবে বি.ডি.ও বা এ.ই.ও মারফৎ বীজের নমুনা পাঠালে কোন ফি লাগবে না।

বীজ পরীক্ষাগারের ঠিকানা	কোন কোন জেলার জন্য
১। বীজ পরীক্ষণ সংস্থা ২৩৮, নেতাজী সুভাষ রোড, টালিগঞ্জ, কলিকাতা, ৪০	কলিকাতা, ২৪-পরগণা, নদীয়া, হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর।
২। আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষণ কেন্দ্র জেলা কৃষি খামার, কালনা রোড, বর্ধমান।	বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া।
৩। আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষণ কেন্দ্র গৌড় রোড, মালদহ।	মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কোচবিহার।

একমাত্র ভাল বীজ থেকেই ভাল ফলন পাওয়া যায়

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি তথ্য সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত

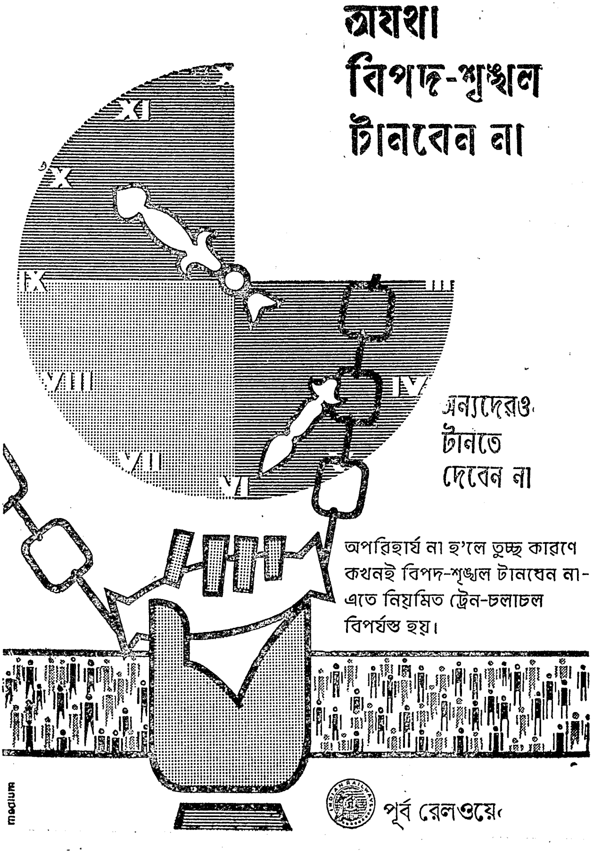
অযথা
বিপদ্-শৃঙ্খল
টানবেন না
অন্যদেরও
টানতে
দেবেন না
অপরিহার্য না হ'লে তুচ্ছ কারণে
কখনই বিপদ-শৃঙ্খল টানবেন না-
এতে নিয়মিত ট্রেন-চলাচল
বিপর্যস্ত হয়।
পূর্ব রেলওয়ে
medium

উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের লক্ষ্যে...

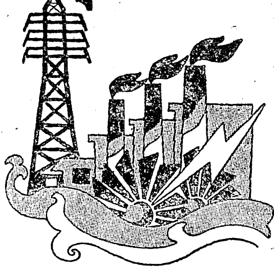

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ এই রাজ্যে কৃষি, শিল্প, রেলচলাচল, গার্হস্থ্য ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। এছাড়া, কলকাতার চাহিদা পূরণেও পর্ষৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে। ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ সালে কলকাতার বিদ্যুৎ সংকটের মোকাবিলায় ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের চারটি ইউনিটকেই বছরের অর্ধেক সময় অবিরাম চালু রাখতে হয়েছিল। সাঁওতালডি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকেও ইতিমধ্যে কলকাতার সরবরাহের জন্যে ডিভিসি-র মাধ্যমে বিদ্যুৎ আসতে শুরু করেছে। উত্তরবঙ্গে জলঢাকা কেন্দ্র নির্ভরযোগ্যভাবে বিদ্যুৎ যোগান দিয়ে চলেছে।

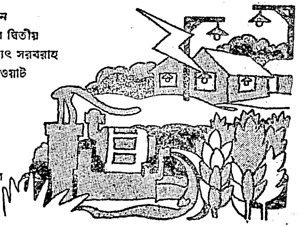

প্রকল্প : ব্যাণ্ডেল ও সাঁওতালডি—এ দুটি কেন্দ্র বর্তমানে সম্প্রসারিত হচ্ছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই সাঁওতালডির দ্বিতীয় ইউনিট নতুন ২২০ কেভি লাইনের মাধ্যমে কলকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে শুরু করবে। এছাড়া কোলাঘাটে তিনটি ২০০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন ইউনিট স্থাপনের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। জলঢাকা ও কার্শিয়াঙের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটির বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর কাজও এগিয়ে চলেছে।

গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ : ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রায় ১০,০০০টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। মাত্র আড়াই বছরের মধ্যেই রাজ্যের ৭০০০ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

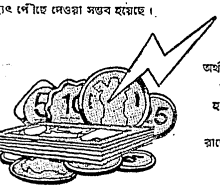

অর্থ : এই বিশাল কর্মকাণ্ডের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড়ের জন্যে পর্ষৎ আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে জ্বালানী, মাশুল এবং অন্যান্য খাতে বর্ধিত ব্যয় সামাল দিতে বিদ্যুতের হার সংশোধন করা হয়েছে। বিভিন্ন অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান থেকে যদি ঠিকমতো অর্থ যথাসময়ে পাওয়া যায়, তাহলে ৫ম পরিকল্পনার শেষে রাজ্যে ১০০০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে যেসব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, সেগুলির কাজ সময়মতো শেষ করা সম্ভব হবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের
লক্ষ্য পূরণে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

TCP/WBSEB312/74

ইউবিআই-এর
রেকারিং ডিপজিট স্কীমে

প্রয়োজনের সঙ্গে
তাল রেখে সঞ্চয়ও বেড়ে ওঠে

কখনো না কখনো নিশ্চয়ই আপনার একসঙ্গে থোক টাকার দরকার পড়ে। আমাদের রেকারিং ডিপজিট স্কীমে আপনার পরিকল্পনামত সঞ্চয়ের সুবিধে আছে। পাঁচ থেকে পাঁচশ টাকার মধ্যে সাধ্যমত একটা নির্দিষ্ট টাকা মাসে মাসে জমাতে শুরু করুন! আপনার পক্ষে সুবিধেজনক মেয়াদ আপনিই ঠিক করবেন। দেখুন না, আপনার সঞ্চয় চক্রবৃদ্ধি সুদে কেমন বেড়ে ওঠে!

অল্পস্বল্প যে টাকা থাকে না, সত্যিকার কাজেও লাগে না, সেটাই নিয়মিত জমালে আপনি একসময় মোটা টাকা পাবেন। ধরুন, ৭২ মাসের মেয়াদে প্রতি মাসে আপনি ১০ টাকা করে রেখেছেন। মেয়াদ শেষে আপনার তাহলে জমলো ৭২০ টাকা। কিন্তু ইউবিআই আপনাকে দেবে ৯৮৩ টাকা! আজই ইউবিআই-তে একটা রেকারিং ডিপজিট অ্যাকাউন্ট খুলুন।

মাসিক কিস্তি	মেয়াদ শেষে আপনি পাবেন					
	১২ মাস	২৪ মাস	৩৬ মাস	৪৮ মাস	৬০ মাস	৭২ মাস
টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
৫	৬৩	১৩০	২০৭	২৮৯	৩৭৮	৪৯১
১০	১২৫	২৬১	৪১৪	৫৭৮	৭৫৭	৯৮৩
২০	২৫১	৫২১	৮২৭	১১৫৫	১৫১৩	১৯৬৬
৩০	৩৭৬	৭৮২	১২৪১	১৭৩৩	২২৭০	২৯৪৯
৪০	৫০১	১০৪৩	১৬৫৪	২৩১০	৩০২৭	৩৯৩২

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

naa-UBI-7427

A crisis isn't a crisis when there's C. Tech.

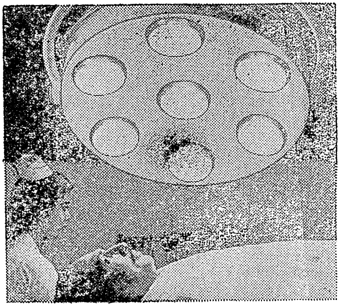

C. Tech. stands for Chloride Technology.

When power suddenly fails during surgery, it is C. Tech. that puts power on again—instantly !

Now imagine a scene like this :

Patient on the operating table. Two surgeons, five nurses, anaesthetists, two o.t. assistants. Ten people trying to save the life of one man.

Plus a host of lights, electronic equipment to monitor heart-beats, feed oxygenated blood—all needing a steady feed of power—and then suddenly—the power fails.

C. Tech. goes into action. In split seconds, Chloride's stand-by power batteries take over and continue—so fast, the surgeons don't even notice !

Today, Chloride's range of emergency storage batteries for stand-by power is working in hospitals and nursing homes across the country—saving and preserving lives whenever a crisis arises.

And wherever you find our product, you will find that Chloride Technology has resulted in peak efficiency and performance.

At a crucial period in our nation's growth, involvement is a nice feeling indeed.

CHLORIDE *Chloride Technology makes us more involved than you think!*

CIC-13

জিনিষ কিনে সন্তুষ্ট হবার উপায় এই একটিই —

খরিদ করা মোড়কবন্দী প্রত্যেকটি জিনিষের গায়ে এই ছাপ দেখে নিন

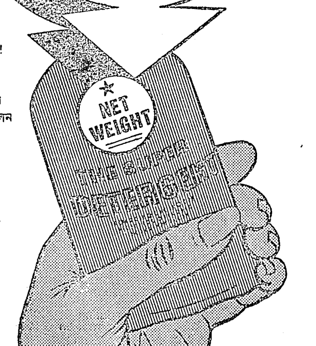

মোড়কে ভরা কোনও জিনিষ কিনে মন ভরেনি, এমনটা প্রায় সকলেরই মনে হয়ে থাকে। মনে হয় দাম বেশি দিয়ে বুঝি কম জিনিষ পেলেন! কখনও কখনও মনে হওয়াটা সত্যি হয়ে দাঁড়ায়। হয়তো কেনাকাটা করার সময়ে আপনি মোড়কের ওপর এই চিহ্নটি···☆দেখতে ভুলে গিয়েছিলেন ···পাঁউরুটী, ডেটার্জেন্ট, তেল বা যে কোনও মোড়কে ভরা দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রী হক না কেন, তার গায়ে ঐ চিহ্ন থাকার অর্থ হল মোড়কে ভরা জিনিষের ওজন সঠিক···দাম অনুযায়ী জিনিষের ওজনও ঠিক ঠিক। ···এই চিহ্ন আপনাকে আশ্বস্ত করবে যে জিনিষ কিনে আপনি ঠকেননি।

কম ওজনের জিনিষ ভরে ভুল ওজন ছাপানো মাপ ও ওজন বিধি অনুযায়ী অপরাধ এবং কঠোর দণ্ডনীয়

মেট্রিক মাপ ও ওজন ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষা করে

davp 74/349

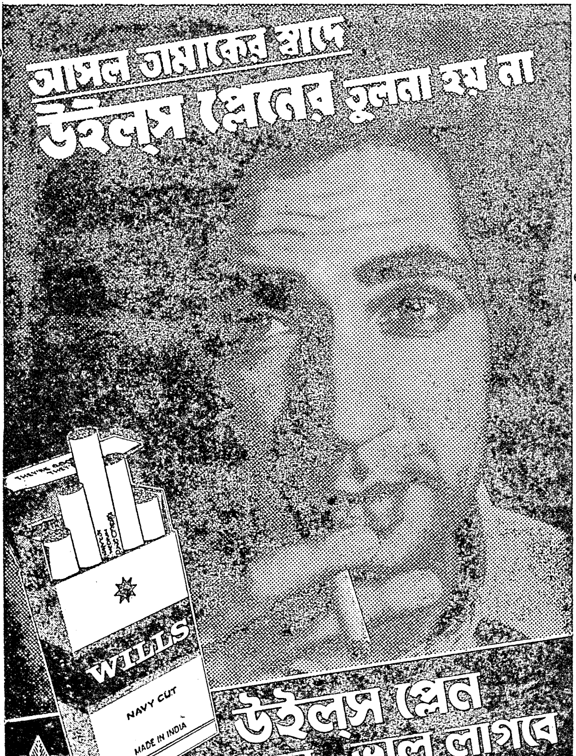

আই. টি. সি. লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন
WP 7984-1

We

DESIGN

and build industrial and domestic structures, warehouses, bridges incorporating Precast prestressed concrete components

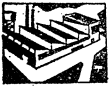

MAKE

TARFELT and SHALIMOID and other roofing felts and waterproof and damp-proof roofs, floors and basements

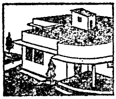

SUPPLY

anti-corrosive Bitumastic compositions for rust prevention

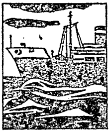

BUILD

roads with our Road Tar and Bitumen Emulsions

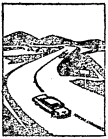

PROTECT

under-carriages of motor vehicles and insulation on vessels and pipes with our SHALIKOTES

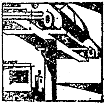

Stp **SHALIMAR TAR**

PRODUCTS (1935) LIMITED

CALCUTTA DELHI BOMBAY LUCKNOW CHANDIGARH

With the Compliments of

HARRY REFRACTORY AND CERAMIC WORKS PVT. LTD.

"Harry House"
640, Rabindra Sarani
Calcutta, 3.
Tel. 55-7181 (4 lines)

Works at :
Kulubathan
Bihar

একজন বাবু বগি করিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহার বাটী কলিকাতা হইতে কিছু দূর। গাড়িখানি মন্থর গতিতে অতি ধীরে ধীরে যাইতেছে। ঘোড়াটি টেঁকচাঁদ ঠাকুরের পক্ষীরাজ বংশ। বেতো ঘোড়ার বাবা। সপাসপ্ চাবুক পড়িলেও চাল বিগড়ায় না। বাবু পথিমধ্যে নিজ গ্রামস্থ কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া কহিলেন, 'শিরোমনি মহাশয়! আমার গাড়িতে আসুন'। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, 'বাবু! আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, শীঘ্র বাটী যাইতে হইবে'।

(রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল একাল' থেকে)

কলকাতা/রাজনারায়ণের কলমে

রাজনারায়ণ বসুর কলমে যে-কলকাতার ছবি, সেটা গত শতকের গোড়ার। কিন্তু আজকের এই দ্রুতগামিতার যুগেও কলকাতার বহুমানুষের মনের কথাটা যেন সেকালের শিরোমনি মশায়ের মতই। শীঘ্র বাটী যাইতে হইবে, অতএব হাঁটাই শ্রেয়। এই মনোভাবের কারণ কি? কারণ একটাই। যানবাহনের গতিহীনতা। কলকাতা শহরে জনতা বেড়েছে। জনপদ বেড়েছে। জনপথ বাড়ে নি। বাড়ন্ত জনসংখ্যার তুলনায় পথ-ঘাট সংকীর্ণ। তাই প্রতি মুহূর্তেই যানবাহনের গতি মন্থর দ্রুতগামী যানও যেন বেতো ঘোড়ার বাবা।

এই সংকটের একমাত্র সমাধান ভূগর্ভ রেল তারই প্রস্তুতিপর্ব চলছে। কলকাতার মানুষ এগিয়ে দিয়েছে সহযোগিতার হাত। আমরা এগিয়ে দিয়েছি শ্রমের মুঠি এই দুয়ের যোগফলে গড়ে উঠবে নতুন কলকাতা। গতি এবং প্রগতির।

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ-রেল

মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

medium

KAMAYANI

By

JAISHANKAR PRASAD

Translated by

JAIKISHANDAS SADANI

[Rs. 25.00]

Prasad was a great cultural and philosophical poet. He was a shaiva and an erudite scholar of Indian literature. He is known as one of the most successful philosophical poets of the modern Romantic poetry of Hindi literature. He is wholly mystic. *Kamayani* is a mystic epic with a deep philosophical approach and understanding. Its mysticism strengthens man to discover the totality of his life — a life of universal love and brotherhood. That is the 'kingdom of god in man'.

Kamayani is reckoned as the second best epic after *Ramcharit Manas* (Tulsidas).

Dr. Roma Choudhury, Vice-Chancellor of Rabindra Bharati University released the book on 1st January. She lauded *Kamayani* as an outstanding poetic work of epic dimension. Dr. Amalendu Bose former Head of the Department of English, Calcutta University, Prof. P. Lal, an eminent scholar of English literature and Prof. K. M. Lodha, Head of the Department of Hindi, Calcutta University spoke highly of translation by Jaikishandas Sadani.

Rupa & Co.

15, BANKIM CHATTERJEE STREET

CALCUTTA 700 012

Also at :

ALLAHABAD □ BOMBAY □ DELHI

LANGUAGE AND LANGUAGE LEARNING

edited by

RONALD MACKIN & PETER STREVENS

LALL is a paperback series intended for all those involved in the modern development of systematic language study.

The Tongues of Men and Speech	*£ 0·55*
Language Testing Symposium *A Psycholinguistic Approach*	*£ 1·05*
The Indispensable Foundation *A Selection from the Writings of Henry Sweet*	*£ 2·00*
Three Areas of Experimental Phonetics	*£ 0·90*
The Scientific Study and Teaching of Languages	*£ 0·80*
The Practical Study of Languages	*£ 1·25*
Studies in Phonetics and Linguistics	*£ 0·65*
The Principles of Language Study	*£ 0·50*
Language in Education	*£ 1·25*
Language Laboratory Facilities	*£ 0·60*
Talking of Speaking : Papers in Applied Phonetics	*£ 1·20*
Modern Language Teaching	*£ 0·65*
Foreign Languages in Primary Education	*£ 0·75*
Papers in Language and Language Teaching	*£ 0·50*
Curso Internacional de Ingles	*£ 0·75*

Please obtain your requirements through booksellers. *A complete list may be had on application.*

OXFORD UNIVERSITY PRESS

Delhi Bombay Calcutta Madras

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

ইতিহাস ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনা এই গ্রন্থে সংকলিত ; অধিকাংশ রচনাই ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি। মূল্য ২·৫০ টাকা।

বিশ্বপরিচয় ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছোটদের উপযোগী করে লেখা বিশ্বের ও সৌরজগতের কাহিনী। মূল্য ৩·০০ টাকা।

পূজাপার্বণ ॥ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

কতকগুলি প্রসিদ্ধ পূজাপার্বণের উৎপত্তি ও প্রকৃতির বর্ণাঢ্য ও সচিত্র আলোচনা। মূল্য ৩·০০ টাকা।

ব্যাধির পরাজয় ॥ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

ব্যাধির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম ও বিজয়ের কাহিনী। মূল্য ১·৫০ টাকা।

বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ ॥ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে যাঁদের কৌতূহল আছে, এই বই তাঁদের পরিতৃপ্ত করবে। মূল্য ২·৩০ টাকা।

বাংলার নব্যসংস্কৃতি ॥ যোগেশচন্দ্র বাগল

উনিশ শতকের বাংলা দেশে যে নব চিন্তা ও নবনির্মিতির সূচনা ও প্রসার হয়েছিল তার সুগ্রথিত চিত্র। মূল্য ১·৪০ টাকা।

বাংলা সাহিত্যের কথা ॥ নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

অল্পের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। রচনার বৈচিত্র্যে সাহিত্যের মতোই সরস ও সুপাঠ্য। মূল্য ২·০০ টাকা।

আহার ও আহার্য ॥ শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য কী ধরনের আহার আবশ্যক তার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা। মূল্য ১·৫০ টাকা।

হিন্দুসমাজের গড়ন ॥ নির্মলকুমার বসু

প্রাচীন ভারতীয় বর্ণব্যবস্থা এবং ভারতীয় সমাজ ও অর্থনৈতিক সংগঠন বিষয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনা। বহু চিত্র সংবলিত। মূল্য ২·৫০ টাকা।

বিশ্বভারতী

কার্যালয় : ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা ১৬

বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার / ২১০ বিধান সরণী

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

গান্ধী রচনাবলী

১ম খণ্ড : পাঁচ টাকা, ২য় খণ্ড : পাঁচ টাকা

৩য় খণ্ড : নয় টাকা

চিত্রে ভারতের ইতিহাস ৪·৬২

ভারতের প্রত্নতত্ত্ব ২·০০

ভারতীয় প্রদর্শশালাসমূহের

বিবরণপঞ্জী ২০·০০

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পচেতনা—হস্তশিল্প

রচনা : শ্রীআশীষ বসু

১·২৫

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আই. এ. এস.

রচিত

বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি

৩·৭৫

(পুস্তক-বিক্রেতাদের জন্য কমিশন ২০%)

শ্রীতারিণীশংকর চক্রবর্তীর

বাংলার উৎসব ১·২৫

শ্রীমণি বর্ধনের

বাংলার লোকনৃত্য ২·৯০

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্রের

বাংলার শিকারপ্রাণী ৩·০০

শ্রীভবতোষ দত্তের

দেশের গান ০·৫০

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আই. এ. এস রচিত

হুগলী জেলা গেজেটীয়ার ৪০·০০

বাঁকুড়া জেলা গেজেটীয়ার ২৫·০০

শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত আই. এ. এস রচিত

পশ্চিমদিনাজপুর জেলা গেজেটীয়ার ১৫·০০

মালদা জেলা গেজেটীয়ার ২০·০০

(এই সিরিজের বইয়ের ক্ষেত্রে

পুস্তক-বিক্রেতাদের জন্য কমিশন ১৫%)

ডাকযোগে অর্ডার দেবার ও মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাবার ঠিকানা :—

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট প্রেস (পাব্লিকেশন ব্রাঞ্চ)

৩৮, গোপালনগর রোড, আলিপুর, কলিকাতা, ২৭

নগদ বিক্রয়কেন্দ্র :

পাব্লিকেশন সেল্স অফিস, নিউ সেক্রেটারিয়েট

১, কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলিকাতা ১

পশ্চিমবঙ্গ (তথ্য ও জনসংযোগ) ১১৯৭/৭৫

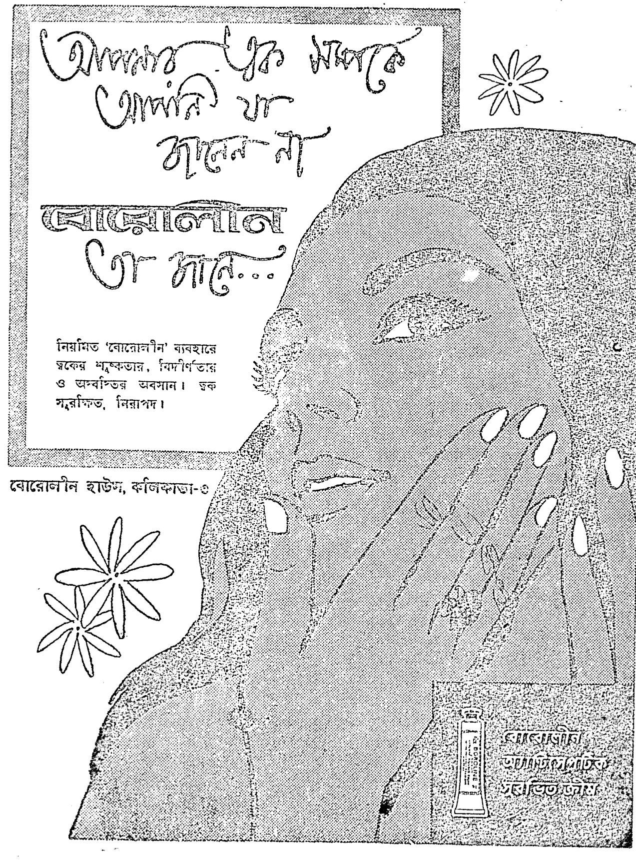
আপনার ত্বক সম্পর্কে আপনি যা জানেন না
বোরোলীন তা জানে...
নিয়মিত 'বোরোলীন' ব্যবহারে ত্বকের শুষ্কতার, বিদীর্ণতার ও অস্বস্তির অবসান। ত্বক সুরক্ষিত, নিরাপদ।
বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩
বোরোলীন অ্যান্টিসেপ্টিক সুরভিত ক্রীম

বর্ষ ৩৬ কার্তিক-পৌষ ১৩৮১

কবিতা নিয়ে ভাবনা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

চারদিকে তাকিয়ে মাঝে-মাঝে খুব ভাবনায় পড়ে যাই। খুব অস্বস্তি বোধ করি। অস্বস্তি আমার একার নয়, অনেকেরই। আমরা কেউই বিশেষ স্বস্তির মধ্যে নেই, অথচ সেই স্বস্তিহীনতার কথাটাকে স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতেও আমাদের দারুণ অস্বস্তি। আমরা প্রত্যেকেই ভাবছি যে, অনেক তো দৌড়ঝাঁপ হল, এইবারে কোথাও একটু বসতে পারলে ভাল হত। কোনও গাছের তলায় না হোক, কোনও গাড়িবারান্দার নীচে, কোনও নদীর ধারে না হোক, কোনও জনবিরল সরাইখানার স্তব্ধতায়। শরীর ক্লান্ত, মন বিশ্রাম চাইছে, চোখ দুটিও দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে, বর্ণ থেকে অন্য বর্ণে অবিশ্রান্ত ধাবিত হতে অনিচ্ছুক,—তারাও এখন, অন্তত খানিকক্ষণের জন্যে, একই দৃশ্যে নিবিষ্ট থাকতে চায়।

অথচ সেই বিরতির ব্যবস্থা আমরা রাখিনি। মাঝে-মাঝেই একটা অদ্ভুত রকমের তুলনা আমাদের মাথায় আসে। অদ্ভুত, তবু একেবারে অবাস্তব নয়। মনে হয়, যেন একটা ট্রেনের কামরায় আমরা বসে আছি, ভীষণ জোরে ছুটছে সেই ট্রেন, ছুটেই চলেছে, দুপাশের বাড়িঘর, গাছপালা, টেলিগ্রাফের খুঁটি, তারের উপরে মাছরাঙা, খেলার মাঠ আর খেত-খামারও সেইসঙ্গে উল্টো দিকে দৌড়চ্ছে, এই এখুনি যেটা আমাদের চোখের সামনে, পরক্ষণেই সেটা পিছনে অন্ধকারে হারিয়ে গেল, অনেকক্ষণ পরে-পরে আসছে এক-একটা স্টেশন, কিন্তু তারাও তাদের প্ল্যাটফর্ম, জলের কল, কলের পাশে কৃষ্ণচূড়া, ডালভর্তি লাল ফুল, টিকিট-কাউনটার, মানুষজন ইত্যাদিকে এক-লহমার বেশী দৃশ্যমান রাখছে না, যেন সেই সবকিছু সমেত মানুষী পরিশ্রমের এক-একটা চমৎকার বিন্যাস মাত্রই এক মুহূর্তের জন্যে ভুল করে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠছে, তারপরেই ঝাঁপ দিচ্ছে উল্টো-দিকে,—চোখের অন্তরালে হারিয়ে যাচ্ছে।

দৃশ্যগুলি দ্রুত ছুটছে; বিশ্ব জুড়ে দ্রুত ঘটছে অসংখ্য রকমের ঘটনা। সে-সব ঘটনার কোনওটিরই গুরুত্ব কম নয়; অথচ বড্ড বেশী দ্রুত ঘটছে বলেই যেন তার গুরুত্ব, তার তাৎপর্য আমরা ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারছি না। ঘটনার পর ঘটনা, চমকের পর চমক; ঘরে বাইরে,

প্রাচ্যে প্রতীচীতে—সর্বত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের দিনগুলিকে মনে পড়ে। খুব বেশী দিন আগেকার কথা তো নয় ; অথচ তখনও, আজকের তুলনায়, ঘটনাস্রোতের গতি ছিল অনেক মন্থর, জগৎ যেন তখনও খুব আস্তে-সুস্থে, বিন্দুমাত্র ব্যস্ত না-হয়ে এগোচ্ছিল। বড় রকমের কোনও ব্যাপার ঘটলে তক্ষুনি সে-বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছবার দরকার হত না, নানান দিক থেকে তাকে বিচার করবার, তার উপরে আলো ফেলবার, তার অন্ধকার দিকগুলিকে যতটা সম্ভব স্পষ্ট করে তুলবার, ব্যাপারটা ভাল কি মন্দ ভেবে দেখবার সময় পাওয়া যেত। এখন যায় না। এখন খুব তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত করতে হয়, নইলে হয়ত আদৌ কোনও সিদ্ধান্তই করা যাবে না, তার আগেই নতুন কিছু ঘটে যাবে, এবং সেই নতুন ঘটনার গুরুত্ব হয়ত আরও বেশী, ফলত সে-ই হয়ত তখন আমাদের সমস্ত আগ্রহ দাবি করে বসবে, পিছনের অন্ধকারে হারিয়ে যাবে আগের মুহূর্তের ঘটনা, তার সমস্ত তাৎপর্য। ব্যাপার দেখে মনে হয় যেন নিষ্ঠুর, অস্থির, অবিবেকী, অসহিষ্ণু কোনও পরীক্ষকের সামনে আমরা পরীক্ষা দিতে বসেছি, তিনি প্রশ্ন করছেন, কিন্তু ভেবেচিন্তে উত্তর দেবার জন্য যতটা সময় চাই, তা কিছুতেই বরাদ্দ করছেন না, আমরা মুখ খুলবার আগেই ছুঁড়ে দিচ্ছেন তাঁর পরবর্তী প্রশ্ন। কিংবা, আমরা কলম খুলবার আগেই, কেড়ে নিচ্ছেন আমাদের খাতা।

ফরাসী বিপ্লবের পটভূমিকায় লেখা তাঁর উপন্যাসের একেবারে সূচনাতেই—সময়টা তখন কেমন যাচ্ছিল তার আভাস দিতে গিয়ে—ডিকেন্‌স বলেছিলেন, অমন সুসময় আর কখনও আসেনি, এবং অমন দুঃসময়ও না। কথাটা, সম্ভবত, আজকের এই সময় সম্পর্কে আরও বেশী খাটে। একই সঙ্গে এমন পূর্ণিমা আর অমাবস্যা সম্ভবত মানুষের ইতিহাসে এর আগে আর কখনও দেখা যায়নি। বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি একালে ঘটেছে, ইতিপূর্বে তা বস্তুত কল্পনার অতীত ছিল। কিংবা আমি হয়ত ভুল বললুম। কল্পনাশ্রয়ী বিজ্ঞান-সাহিত্য, যা কিনা ভবিষ্যতের ছবি এঁকে দেখায়, তো নেহাত আজকের ব্যাপার নয়, অনেককাল ধরেই লেখা হচ্ছে। এবং তার লেখকদের বল্গাবিহীন কল্পনা যে অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবের সঙ্গে, পুরোটা না হোক, চোদ্দ-আনা মিলেও গিয়েছে, তাও স্বীকার্য। জুলে ভার্ন সেই কবে কী স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেটাও কেমন ফলে গেল। কিন্তু প্রশ্ন, স্বপ্ন যে এমনভাবে ফলবে, স্বয়ং স্বপ্নদ্রষ্টাও কি তা ভাবতে পেরেছিলেন ? যাক গে, যেটা আসল কথা, সেটা এই যে, এমন অসংখ্য উপায় একালে মর্ত্য-মানবের মুঠোর মধ্যে এসে গিয়েছে, যার দ্বারা এই মানবসমাজের অশেষ কল্যাণ করা যায়। আবার সেই একই উপায় যে অশেষ অকল্যাণের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে, তাও ঠিক। জীবতাত্ত্বিক ডেসমন্ড মরিস বড় দুঃখের সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন যে, মানুষ যেন বড্ড-তাড়াতাড়ি বড্ড-বেশী উন্নতি করে ফেলেছে, ফলে সে তার উন্নতির তাল সামলাতে পারছে না। সে একরকম-ভাবে তার জীবনটাকে সাজিয়ে নিতে-না-নিতেই দেখা দিচ্ছে আর-একরকমভাবে জীবনযাপনের প্রয়োজন। সে একরকমের একটা বিন্যাসকে দাঁড় করাতে-না-করাতেই সেটাকে ভেঙে ফেলে আর-একরকমের বিন্যাসকে খাড়া করবার দরকার ঘটে যাচ্ছে। ফলে, যাবতীয় উন্নতি সত্ত্বেও, তার স্থিতি হচ্ছে না, তার অগ্রগতি হয়ে দাঁড়াচ্ছে যেমন বেতালা, তেমনি বিশৃঙ্খল। মরিস মিথ্যে বলেননি। ভাবতে অবাক লাগে যে, (সর্দি-জ্বর বা ইনফ্লুয়েনজার মতো সামান্য ব্যাধিরও কোনও মোক্ষম দাওয়াই অদ্যাপি যদিও উদ্‌ভাবিত হয়নি, তবু) মানুষেরই গড়া উপগ্রহ আজ মহাকাশে টহল

দিয়ে ফেরে, এবং মাটির মানুষ আজ চাঁদের পিঠে হেঁটে বেড়ায়। কিন্তু একই সঙ্গে আমরা জেনে গিয়েছি যে, মানবতার ভবিষ্যৎ আর কখনও ঠিক এতটাই অনিশ্চিত ছিল না। মানুষ কি আর-কখনও এত দ্বিধায়-সংশয়ে কেঁপেছে? মৃত্যুর ছায়া কি আর-কখনও তার জীবনকে এত অন্ধকার করে রেখেছে? সভ্যতার, মনুষ্যত্বের এক সার্বিক বিনষ্টির আশঙ্কা কি আর-কখনও মানবসমাজকে এতটা অস্থির করেছিল?

বলা বাহুল্য, অনিশ্চয়তার ব্যাধি সর্বযুগেই ছিল। কিন্তু সর্বমানুষের জীবনে তা আর-কখনও আজকের মতো এত ব্যাপকভাবে দেখা দেয়নি। একদিকে যখন রাজ্যপাটের ভাঙাগড়া চলত, অন্যদিকে চাষী তখন নিত্যকার মতোই, নিশ্চিন্ত না হোক, নির্বিকার চিত্তে মাঠে লাঙল দিতে পেরেছে, বীজ বুনতে পেরেছে, ফসল কাটতে পেরেছে। একালে পারে না। পৃথিবীর এক ব্যাপক অংশ জুড়েই পারে না। অনিশ্চয়তার ব্যাধি আর এখন স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ নয়; নানাস্থানে তা ছড়িয়ে গিয়েছে। এখনও যাচ্ছে। বিস্মিত একটি বিপন্নতার বোধ একালের মানুষের জীবনকে ক্রমে ক্রমে অধিকার করে নিচ্ছে।

অবস্থাটা যে একটু গুছিয়ে, একটু স্থির হয়ে কোথাও বসবার পক্ষে আদৌ অনুকূল নয়, সে-কথা আমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পারছি। তার জন্যে প্রত্যেকেই আমরা অস্বস্তি বোধ করছি। শিল্পীরা, সাহিত্যিকরা আরও, কেননা এমনিতে যদিও ভীষণ রকমের জ্বালা তাঁদের মাথার মধ্যে, দারুণ রকমের অস্থিরতা তাঁদের মনে, তবু, অন্তত সৃষ্টির প্রয়োজনে, স্থির হয়ে তাঁদের বসতেই হয়; অন্তত তখন, অর্থাৎ যখন তাঁরা হাতে তুলি নিয়ে ইজেলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, কিংবা কলম নিয়ে টেবিলে নিবিষ্ট, অন্তত তখন—সৃষ্টির সেই মুহূর্তে—অস্থির হলে তাঁদের চলে না।

ধরা যাক, প্রেক্ষাগারে তাঁরা বসে আছেন, চোখের সামনে—পর্দার উপরে—দ্রুত-অপস্রিয়মাণ দৃশ্যের মিছিল, সেই অবস্থাতেই অন্যের অগোচরে, সহস্রজনের মধ্য থেকে, নিঃশব্দে একসময় তাঁদের বেরিয়ে আসতে হয়, নিজের ঘরে ফিরে এসে প্রত্যেককেই বসতে হয় তাঁর নিজের আসনে; এখন—অন্তত কিছুক্ষণের জন্য—তিনি দ্রষ্টা নন, স্রষ্টা; যেটুকু দেখেছেন, শান্ত হয়ে মগ্ন হয়ে সেইটুকুর কথাই তিনি এখন লিখবেন, নিজের চিত্তে প্রতিফলিত করে তাকে আবার নতুন করে নির্মাণ করবেন।

কিন্তু, হায়, কী তিনি দেখেছেন? যা দেখেছেন, তাকে ভাল করে দেখবার মতো সময় তিনি পেয়েছিলেন কি? কতক্ষণ সেই দৃশ্য তাঁর চোখের সামনে ছিল? তার চেয়েও বড় কথা, যা-কিছুই আমরা দেখি, তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না, সবকিছুকেই তার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে স্থাপন করে দেখতে হয়, নতুন করে আবার যখন তাকে রচনা করব, তখন সেই পরিমণ্ডলকেও রচনা করা চাই, তার মধ্যে স্থাপন করে তাকে দেখানো চাই, নইলে তার তাৎপর্য কিছুতেই স্পষ্ট হবে না, সে প্রাণ পাবে না। সুতরাং প্রশ্ন, ধাবমান দৃশ্যপটে যে-বৃক্ষ কিংবা পাখি কিংবা মানুষটিকে কোনো শিল্পী কিংবা সাহিত্যিক দেখেছিলেন, তার অনুষঙ্গও তাঁর চোখে পড়েছিল তো? শুধু বৃক্ষটিকে দেখলেই কাজ ফুরোচ্ছে না, ঝামেলা মিটছে না, তার পাশের নদী কিংবা পুকুরটিকেও দেখতে হয়; উড়ন্ত পাখির সঙ্গে দেখতে হয় তার আকাশ, কিংবা তার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি নিষাদকে; শুধু কৃষকটিকে নয়, তার চারপাশের শস্যের ঐশ্বর্য কিংবা শস্যহীন মাঠের রিক্ততাও দেখে নেওয়া চাই। আঁকবার কিংবা

লিখবার সময়ে সেই অনুষঙ্গের মধ্যে তাকে স্থাপন করতে হবে, পারিপার্শ্বের সঙ্গে যুক্ত করে তাকে দেখাতে হবে। কিন্তু তেমন করে তিনি কি তাকে দেখেছিলেন ?

সুযোগ ছিল না। সময় ছিল না। না একটু নিবিষ্ট হয়ে দেখবার, না একটু মগ্ন হয়ে আঁকবার অথবা লিখবার। অন্য বিষয়ের কথা অন্যেরা জানেন, আমার ভাবনা কবিতা নিয়ে। একালের কবিতা—শুধু এ-দেশের নয়, অন্যান্য দেশেরও সাম্প্রতিক কবিতা—পড়তে-পড়তে অনেক সময়েই আমার মনে হয়, ইতস্তত যেন-বা অনেক ফাঁক রয়ে গেল, ছবিটা ঠিক সম্পূর্ণ হল না, এক-পলকে-দেখা নিসর্গ কিংবা মানুষকে তাতে কোনোক্রমে চিত্রিত করা হয়েছে, যেন দেখা এবং লেখা, এই দুটি কাজই অতি দ্রুত সমাধা হয়েছিল, যেন যে-বিষয়ে যিনি লিখেছেন, তাকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করবার মতো সময় কিংবা সুযোগ তাঁর ছিল না, এবং লেখার মধ্যে যখন আবার নতুন করে তাকে নির্মাণ করেছেন, তখনও তিনি যতটা দরকার ঠিক ততটাই সময় কিংবা একাগ্র আগ্রহ তাকে দিতে পারেননি।

দোষ সর্বদা কবির নয়, সর্বাংশে তো নয়ই। মগ্ন হয়ে কিছু লিখবার আগে মগ্ন হয়ে কিছু দেখা চাই, কিন্তু তেমন করে দেখতে তাঁকে দিচ্ছে কে ? সবই তো এখন ঝলক-দর্শনের ব্যাপার। ঘটনার পিঠে ঘটনা যখন হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, রাস্তার দু-দিকেই দৃশ্যপট যখন দ্রুত-অপস্রিয়মাণ, তখন কোনও-কিছুই তো তার যাবতীয় অনুষঙ্গ নিয়ে, সমগ্রভাবে স্পষ্টভাবে তাঁর চোখের সামনে ফুটছে না। তিনি খণ্ড-খণ্ড ছবিই শুধু দেখে যাচ্ছেন,—টুকরো-টুকরো মানুষ, টুকরো-টুকরো ভাবনা ; তাঁর লেখার মধ্যেই বা কী করে তবে সমগ্রতার চিত্র আমরা দাবি করব ?

অথচ আমরা জানি যে, যতক্ষণ না সানুষঙ্গ, সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিচ্ছে, কোনওকিছুই ততক্ষণ বিশ্বাসযোগ্য হয় না, সাহিত্যের সত্য হয়ে ওঠে না। কবিতা নিয়ে কতজনেই তো কত মামুলী অভিযোগ তোলেন, খুব সহজেই সে-সব অভিযোগের উত্তর দিয়ে দেওয়া যায়। কিছুকাল আগে অভিযোগ উঠেছিল, একালের কবিরা নাকি জীবনের উলটো-দিকে চোখ ফিরিয়ে বসে আছেন। তার উত্তরে বলা যায় যে, সেই উলটো-দিকটাও জীবনেরই এলাকার মধ্যে পড়ে। অভিযোগ উঠতে দেখি কবিতার শারীরিক নির্মিতি নিয়েও। কিন্তু, এ-কালের কবিরা আঙ্গিকে পটু নন, এই উক্তির উত্তরে বলে দেওয়া যায়, বাজে কথা, শারীরিকভাবে নিখুঁত কবিতার সংখ্যাই একালে বেশী। ঠিক তেমনি, এ-কালের কবিরা আগের যুগকে অস্বীকার করতে চান, এই কাঁদুনির উত্তরে বলা চলে, করাই তো উচিত, বস্তুত সর্বকালের কবিরাই তা করে থাকেন, কেউ নীরবে করেন, কেউ ঢাকঢোল পিটিয়ে, তফাত মাত্র এইটুকুই। উপরন্তু, অস্বীকৃতির যে দরকার নেই, এমনও নয়, নিতান্ত নতজানু হয়ে আগের যুগকে সর্বতোভাবে-অভ্রান্ত বলে স্বীকার করে নিলে নতুন-কিছু করবার তাগিদ আসবে কোত্থেকে ? অভিযোগ আরও অনেক, মামুলী অবান্তর অভিযোগ, কখনও অবাস্তবতা, কখনও দুর্বোধ্যতা, কখনও অশ্লীলতা, উপলক্ষের তো অভাব হয় না, একটা-কিছু তর্ক একবার উঠলেই হল, চতুর্দিকে অমনি প্রশ্নের বান ডেকে যায়। ডাকুক, তা নিয়ে কোনও দুঃখ নেই, দুঃখিত সম্ভবত তরুণ কবিরাও নন, বয়োবৃদ্ধদের উষ্মার, আপত্তির লক্ষ্য হতে তাঁদের সম্ভবত ভালই লাগে, দুঃখ শুধু এইখানে যে, যেটা আসল প্রশ্ন, সেইটাই কাউকে তুলতে দেখি না। ভুলেও কেউ একবার জিজ্ঞেস করেন না

যে, এই যে অসম্পূর্ণতা, দর্শন ও নির্মাণের এই যে খণ্ডতা, কবিতাকে এর কবল থেকে উদ্ধার করবার উপায় কী?

আমি ধরেই নিচ্ছি যে, যদিও উচ্চারিত হয় না, তবু পাঠকদের মনে এই প্রশ্ন ইতিমধ্যে জেগেছে। সুতরাং সেই ট্রেনের উপমাতেই আমি ফিরে যাব, ট্রেনের দু'পাশ দিয়ে ছিট্‌কে ছিট্‌কে যে-সব দৃশ্য পিছনে চলে যাচ্ছে, তার দিকে আঙুল তুলে বলব, আমরা নিজেরাও তো কোনও-কিছুই সমগ্রভাবে, সম্পূর্ণ করে দেখতে পাচ্ছি না।

কোনও-কিছুই না? আমার উত্তরের মধ্যে ফাঁকি আছে, আমি জানি। সবকিছুই যে অস্থির, তা তো নয়। ছুটন্ত এই ট্রেনের থেকেও দেখতে পাচ্ছি, কাছের দৃশ্যগুলি যখন এত অস্থির, দূরের পাহাড় ও গ্রাম, দূরের মানুষগুলি তখনও অচঞ্চল, আমার চোখের সামনে থেকে তারা দ্রুত সরে যাচ্ছে না, দূরের সূর্যও সেই তখন থেকে পাহাড়চূড়ায় লগ্ন হয়ে আছে।

অনেকক্ষণ তো কাছের দৃশ্যে, তাৎক্ষণিকে লিপ্ত ছিলুম, সম্ভবত এখন আর-একটু দূরে আমাদের চোখ রাখতে হবে।

রাজনগর

অমিয়ভূষণ মজুমদার

সুতরাং সর্বরঞ্জন স্থির করলো স্কুলের থেকেই সে দেওয়ানজির সঙ্গে দেখা করতে যাবে। না, না তাকে যেতেই হবে। প্রথমত আসবাবগুলির জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত। উপরন্তু ভাদুড়ীমশায় (যিনি নাকি তার মুরুব্বি এবং দেওয়ানজির বন্ধু) শেষ চিঠিতেও দেওয়ানজির কুশল কামনা করেছেন। সে সংবাদটা তাঁকে দেয়া দরকার। এভাবেই তাকে অগ্রসর হতে হবে, কেননা সে সংবাদটা তাঁকে দেয়া দরকার। এভাবেই তাকে অগ্রসর হতে হবে, কেননা সে তো দেওয়ানজির মতো কেউ নয় যে এই গ্রামে ব্রাহ্মমন্দির হোক বললেই ব্রাহ্মমন্দির হবে।

স্কুলের কাজের অবসরেও নিওগি এ বিষয়েই চিন্তা করলো। ঈশ্বর ব্যতীত তার উপায় কী? তার তো হাকিম হওয়া সম্ভব নয়, কিংবা অ্যাটর্নির আর্টিকেলড্ ক্লার্ক।

দেওয়ানকুঠিতে যখন গিয়ে পৌঁছালো নিওগি তখন হরদয়াল তার লাইব্রেরিতে। নিওগির বেশ একটু অস্বস্তিই বোধ হলো। একটি গৃহ যে এমন নিঃশব্দ হতে পারে তা তার অভিজ্ঞতায় ছিলো না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কুঠির ভিতরে কোন দেয়ালঘড়ির মৃদু টিক্‌টিক্ যেন শুনতে পেলো সে। কি ক'রে বা সে খবর দেবে যে সে দেখা করতে এসেছে। অবশেষে একজন ভৃত্য বেরিয়ে এলো। সে-ই যোগাযোগ ক'রে তাকে দেওয়ানজির কাছে নিয়ে গেলো। এই সময়ে সে একটা বিশেষ অসুবিধা অনুভব করলো। তার জুতোজোড়া যে একরকমের কিম্ভূত শব্দ করে, শান্তির বিঘ্ন ঘটায় তা আগে সে জানতো না।

ডেস্কের সামনের চেয়ারটায় তাকে বসতে ব'লে হরদয়াল মুখ তুললো। তখন একবার মনে হলো নিওগির এমন ক'রে আসাটা তার ভালো হয় নি। সেই লাইব্রেরি ঘরের বইঠাসা সেলফগুলি, কারুকার্যকরা ডেস্ক, চেয়ার, টিপয়, টিপয়ের উপরে রাখা বোতল গ্লাস প্রভৃতি লক্ষ্য করে সে যেন বৃথা সাহস সঞ্চয় করার চেষ্টা করলো।

কিন্তু হঠাৎ হরদয়াল হাসলো। আর সে হাসি যেন কোন রমণীর হতে পারে এমন তা নরম এবং কুণ্ঠিত। হরদয়াল বললো,—আপনার সব কুশল তো? আপনার কথা আমি প্রায়ই ভাবি। সাহিত্যের লোক আপনি। আর এখানে ছাত্রদের তো প্রাইমার মাত্র পড়াতে হয়। একটু অসুবিধাই হচ্ছে আপনার।

সর্বরঞ্জন প্রসাদ বললো,—পরম করুণাময় ঈশ্বরের যদি তাঁর এই কর্মশালায় আমাকে আহ্বান করার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে, সার, এখানে আনন্দিত হওয়াই আমার কর্তব্য।

উত্তর দিতে হরদয়ালের একটু দেরি হলো। একটু ভেবে দেখতে গেলে সর্বরঞ্জন প্রসাদ নিওগির সঙ্গে এটাই তার দ্বিতীয় কথাবার্তা। প্রথমটা হয়েছিলো প্রায় এক বছর আগে চাকরিতে বহাল করার সময়ে সেই ইন্টারভিউ। সে আলাপটা হয়েছিলো ইংরেজিতে। নিওগির ইংরেজিটাকে তার আধুনিক এবং ক্রিস্পই মনে হয়েছিলো। অন্যদিকে অবশ্যই সর্বরঞ্জনের এই বিশেষ ধরনের বাংলা

তাকে পুরোপুরি স্তম্ভিত করতে পারলো না কেন না কলকাতায় তার বন্ধু ভাদুড়ীর কোন কোন পরিচিত লোককে এরকম ভাষায় কথা বলতে সে ইতিমধ্যে দু-একবার শুনেছে।

সে বললো,—তবে তো কথাই নেই। আপনার পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য ভালো থাকছে তো? যে কারণেই হোক এ অঞ্চলটায় ম্যালেরিয়ার উৎপাত কম।

নিওগি আবার বললো,—এ বিষয়েও তাঁরই মঙ্গলময় বিধান আমরা দেখতে পাই।

সে সুন্দর ক'রে হাসলো। অর্থাৎ তার প্রচুর শ্মশ্রুজালে আবদ্ধ হাসি যতটা সুন্দর হতে পারে।

হরদয়াল বললো,—এর আগে করা যায় নি, এবার ভেবেছি আপনার কোয়ার্টারটাকে আর একটু বড় ক'রে দেবো।

কিন্তু আলাপটা গতি নিতে পারছে না তা বোঝা গেলো। হরদয়াল তো শুনতে প্রস্তুতই কিন্তু সর্বরঞ্জন প্রসাদ অনুভব করলো কলকেতায় সমাজের সকলের সঙ্গে যেভাবে আলাপ করা যায় এমন কি এখানে মিস্টার বাগচীর সঙ্গেও যেভাবে কথা বলা যায় এখানে এই ব্যক্তিটির সম্মুখে—যার, চারিদিকে সেল্ফে সেল্ফে বই, যার ডেস্কের উপরে খোলা বই এবং পাশে মদের সরঞ্জাম, যার বড় বড় চোখের দৃষ্টি স্থির অচঞ্চল, তার সম্মুখে—আরও চিন্তা ক'রে কথা বলতে হবে। হঠাৎ তার অনুভব হলো সমাজের বিত্তশালী অংশে কলকেতায় যেভাবে আলাপ করা যায় এখানে বোধ হয় তা যায় না। তার পুত্রের নামকরণের উৎসব সম্বন্ধে কল্পনায় যে সব আয়োজন করেছিলো সেই কাগজের মালা, কাগজের ফুল, সেই জলচৌকির সাহায্যে তৈরি অস্থায়ী প্রার্থনাবেদী সবই যেন তাকে বিদ্রূপ ক'রে উঠলো। অথচ এই নিস্তব্ধ লাইব্রেরিতে ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দে সময়টা দ্রুত চলে যাচ্ছে, অপব্যয় হচ্ছে, এবং সময়টা হরদয়ালের।

সর্বরঞ্জন নিওগি মাথাটা একবার উঁচু নিচু করলো, বললো,—সার, আজ যে আপনার মহামূল্যবান সময়ের খানিকটা এই যে অপব্যয় করতে উদ্যত হয়েছি, এই যে আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিয়ে চলেছি, এ সবেরই একটা উদ্দেশ্য আছে।

—বলুন।

—এখানে নববিধানের নামে একটা উপাসনামন্দির হলে খুব ভালো হতো।

—উপাসনার ব্যাপার, আমার মনে হয়, মিস্টার বাগচী সব চাইতে ভালো বোঝেন।

—আমি নববিধানের কথা বলছিলাম সার।

—সেটা কী ব্যাপার হচ্ছে?

সর্বরঞ্জন প্রসাদ তার চিন্তাগুলিকে গুছিয়ে নিলো। বললো,—বিষয়টা আনন্দজনক নয়, সার, তা আপনাকে বলতেই হবে। না, না, তা না ব'লে উপায় নেই। কিন্তু ঈশ্বর নিরানন্দের মধ্যেও নিজেকে প্রকাশ করেন; এই তাঁর অভিরুচি।

—বলুন।

—বিষয়টা আত্মসমালোচনাও বটে। বিশেষ তা আমাদের সমাজেরই একাংশের নিদারুণ গোঁড়ামির কথা। ব্রাহ্মদের অর্থাৎ যারা কি না পরম ব্রহ্মের উপাসনা করি তাদের কাছে কে ব্রাহ্মণ, কে শূদ্র এ বিচার কি থাকা উচিত? পরম ব্রহ্মের নিকট কি ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণে ভেদ আছে? দেবেন

ঠাকুর মশায় আচার্য হিসাবে অব্রাহ্মণকে গ্রহণ করতে রাজী নন। বলুন, এটা কি উচিত হচ্ছে ?

হরদয়ালের মনে হলো সে বলবে দেবেন ঠাকুর কলকেতার মানুষ, যদিও কলকেতার বাইরে তাঁদের জমিদারি আছে। কিন্তু উপাসনা সম্বন্ধে তাঁর কী মত তা ভাবতে হবে কেন ? কিন্তু সে কথাটাকে ঘুরিয়ে বললো,—এ বিষয়ে আমাদের অর্থাৎ এই অঞ্চলে করণীয় কিছু আছে কি ?

আবেগের প্রাবল্যে নিওগির মাথাটা দুলে উঠলো, গোড়া থেকেই বাঁধ বেঁধে অগ্রসর হওয়া ভালো।—না, না এ কথা আমাকে বলতেই হবে, সার। এই গ্রামে একটা নববিধান ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হোক এই বাসনা করি। সেই সংবিধানে আচার্য হিসাবে যে কোন সম্প্রদায়ের লোকই উপাসনায় নেতৃত্ব দেবেন।

হরদয়াল হেসে বললো,—হলে তো ভালোই হবে হয়তো।

তার হাসির কারণটা একটু সূক্ষ্মই ছিলো, কারণ সে অনুভব করলো এক ব্রাহ্ম-সমাজ যদি আদি, সাধারণ ও নববিধান তিন সম্প্রদায়ে ভাগ হয় তবে তাও এক সাম্প্রদায়িকতাই হয় যা সর্বরঞ্জন লক্ষ্যে আনছে না। তার মনে পড়লো তার বন্ধু একবার এ রকমের কিছু লিখেছিলো। কিন্তু এ ব্যাপারে কৌতূহল না থাকাতে সে ভুলে গিয়েছে। এ ব্যাপারে কেশব সেন মশায় কিভাবে যেন জড়িত, আর তার বন্ধুর ভাষাও উত্তেজিত ছিলো। সে বললো আবার,—কিন্তু এখনো তো আপনি মাত্র একা, এখানে আপনার মতের বিরুদ্ধে কে দাঁড়াচ্ছে আর ? আপনাদের শুনেছি উপনিষদ নিয়ে ব্যাপার। আপনার ব্যাখ্যার সঙ্গে এ অঞ্চলে বিরুদ্ধমত মাত্র একজনেরই হতে পারে। তিনি শিরোমণি। তাঁকে আমরা ধর্তব্য মনে করছি না।

—না, না, সার, একথা আমাকে আবার ক'রে বলতে হবে, সার। মন্দিরটা করা কি ভালো নয় ? আর সে মন্দিরে প্রথম প্রধান ও পরমপূজনীয় আচার্য রূপে আপনাকে পেতে চাই যে, সার ! তা ছাড়া একাই বা কেন। আমার পরিবারের সাত-আটজন আমরা নববিধানকেই স্বাগত জানাবো। একেবারে গোড়া থেকে বেঁধে অগ্রসর হওয়া কি ভালো হচ্ছে না ?

হরদয়ালের আবার হাসি পেলো। সর্বরঞ্জনের পরিবারের সাত-আটজনের মধ্যে দু-তিন বৎসরের শিশুরাও আছে। তাদের ধর্মমত উল্লেখে সে কৌতুক বোধ করলো। কিন্তু বাড়িতে যে দেখা করতে এসেছে সে পরিহাসের বিষয় হয় না। সে বরং আবার শান্ত দৃষ্টিতে সর্বরঞ্জনের দিকে চাইলো। এত বিস্তৃত সে দৃষ্টি যে সর্বরঞ্জন লক্ষ্য করলো তার চোখের কোণগুলি বিশেষ রক্তাভ।

হরদয়াল বললো, মিস্টার নিওগি, আপনি এমন সময়ে এসেছেন যে কী দিয়ে আপনাকে পরিচর্যা করি বুঝে উঠতে পারছি না। তা ছাড়া জানেন তো আমার চাকর-বাবুর্চির সংসার। আপনাকে কি কিছু পানীয় অফার করতে পারি ?

এই ব'লে সে পাশের বোতলের দিকে হাত বাড়ালো।

সর্বরঞ্জন জীবনে এমন বিপন্ন হয়েছে কিনা সন্দেহ। যা উপস্থাপিত হ'লে ডানকান সাগ্রহে গ্রহণ করতো, যা উপস্থাপিত না হ'লে পিয়েত্রো নিজেকে অসম্মানিত অনুভব করতো, সর্বরঞ্জনকে তা একেবারে নির্বাক ক'রে দিলো। বাগচী হলে হয়তো বলতো,—ধন্যবাদ, দেওয়ানজি, এখন নয়।

কিন্তু তার আপত্তিটি বুঝতে পেরে হরদয়ালই বরং অন্যকথায় এলো। সে বললো,—মিস্টার

মিস্টার বাগচী আপনার সাহিত্যজ্ঞানের প্রশংসা ক'রে থাকেন। আপনি যে ইংরেজ কবিদের কয়েকজন সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাও শুনেছি। আপনি কিন্তু গ্রামের বয়স্কদের একটা মহৎ উপকার করতে পারেন।

অন্য আলাপে যেতে পেরে নিঃশ্বাস নিতে পারলো নিওগি। বললো সে,—কিভাবে, সার, বলুন, সাধ্য হলে নিশ্চয় করবো।

—আপনি কি শেক্সপীয়রের 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' অনুবাদ করতে পারেন?

—তা হয়তো করা যায়, কিন্তু—

—হয়তো প্রথমটায় নিছক ভাষান্তরিত ছাড়া কিছু হবে না।

—কিন্তু—

—কী হবে বলছেন? গ্রামের যুবকদের একাংশ হঠাৎ থিয়েটার করতে উদ্যত হয়েছে। কী করবে জানি না। কিন্তু ভালো নাটক কই? ওরা এবার 'বুড়ো শালিখ' করছে। আমার কাছে কুরুচিপূর্ণ লেগেছে। এর চাইতে শেরিডান কিংবা কংগ্রিবের নাটক অনুবাদ ক'রে অভিনয় করাও ভালো হয়।

সর্বরঞ্জন প্রসাদ অনুভব করলো আবার সে এক সমস্যার সামনে এসেছে যেখানে সে কোন্‌দিকে এগোবে তা বুঝতে পারছে না। সে না চাইতেই এই সমস্যাটার কথা উঠে পড়েছে। অংশত তার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে দেওয়ানজির দৃষ্টিভঙ্গি মিলছে। কিন্তু মিলটাই আরও বিপজ্জনক। এই নাটকটা কুরুচিপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু তাঁর কথার এই ব্যাখ্যা হয় যে তারা ভালো ক'রে অভিনয় করলে দেওয়ানজির সমর্থন ও প্রশ্রয়ই পাবে।

সর্বরঞ্জন নিওগি কিছুই বলতে পারলো না। সে অনুভব করলো এই অবস্থায় এই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যাওয়াই তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। কলকেতায় কারো বৈঠকখানা হলে সে তা করতো, কিন্তু এখানে দেওয়ানজি হরদয়ালের ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায় না, কেন না প্রকৃতপক্ষে এই লাইব্রেরি ঘরের বাইরে যে রাজপথ, যে স্কুল, শিক্ষকদের আবাসিক বাড়ি, এবং তারও পরে গ্রামের পরে গ্রাম কতদূর কে জানে, সবই দেওয়ানজির ঘর।

সাক্ষাৎ শেষ হয়েছে অথচ বিদায় নেয়ার ঠিক কথাটা ভেবে উঠতে পারছে না ব'লে ব'সে আছে এমন অবস্থাই যেন। এই সময়ে ঘড়িতে কোন এক আধঘণ্টার সূচনা করলো। পর্দার কাছে হরদয়ালের ভৃত্যের সাড়া পাওয়া গেলো।

নিওগি বললো,—আপনার স্নান-আহারের সময় হলো।

হরদয়াল বললো,—তা হলো। আপনি কিন্তু অনুবাদের কথা ভেবে দেখবেন।

নিওগি যেন কিছু লজ্জিতভাবে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে পড়লো। ভৃত্য এসে জানালো রান্না কিছু আগেই শেষ হয়েছে।

হরদয়াল হাসিমুখে বললো,—চলো তা হলে, আর দেরি নয়।

তখন চিন্তার সময় নয়। হরদয়ালের তা সত্ত্বেও মনে হলো আমাদের এই নতুন মাস্টার মশায়ের মনে ধর্মভাব যত প্রবল সাহিত্যপ্রীতি তত নয়। কলেজে ভালো শিক্ষকের কাছে সাহিত্য-

চর্চার সুযোগ পেলে সেদিকে আকৃষ্ট থাকাই কি স্বাভাবিক হয় না ? কিন্তু ধর্মের ভাবই প্রবল হচ্ছে, এখানে নয় শুধু, কলকেতাতেও। কিংবা একে কি ইংরেজি শিক্ষার সার্থকতা বলবে যে তার ফলে মানুষের মনে ধর্মভাব জেগে উঠছে ?

আর দু-এক পা গোসলখানার দিকে এগিয়ে হরদয়ালের মনে হলো অবশ্যই নিরীশ্বর ধারারও দু-একজন আছেন। আরে র'সো র'সো, সেখানে তো বিদ্যেসাগর আছেন শুনেছি।

দুজনের চিন্তায় কখনও কখনও মিল দেখা যায়। পথে বেরিয়ে সর্বরঞ্জন ভাবলো : তা হলে এতদিন সে যা ভেবে এসেছে তা কি সবই ভুল ? আর ভুল তা হলে তার একার নয়। মেট্রোপলিটানের ভাদুড়ীমশায়ও বন্ধুকে চেনেন না। ভাবো তো দুপুরের স্নানাহারের আগে ওই মদের কথা! না, না, এ কথনোই গোপন করা যায় না যে তিনি নিতান্ত মদ্যাসক্ত। এবং ঈশ্বরেও বিশ্বাস আছে কি ? অথচ ইংরেজিনবিশ সে বিষয়ে সন্দেহ কী ? আহারে-বিহারে পোশাক-পরিচ্ছদে তাঁকে নিতান্ত আধুনিকই মনে হয়। গায়ে যেটা ছিলো ওকে তো নাইটগাউন বলে।

হঠাৎ সে যেন আবিষ্কার করলো, সত্য এভাবেই উদ্ভাসিত হয়। তা হলে দেওয়ানজি সেই ডিরোজিও ধারারই মানুষ ; সেই নিরীশ্বর, দুর্বিনীত, মদ্যপায়ী আধুনিকদের একজনই হবেন।

কিন্তু তাকে, সেই ধারাকে এখন আর কি আধুনিক বলা যায় ? বর্তমানের কেশব সেন মশায় এবং তাঁর সহকর্মীদের দেখো। না, না, একথা আমাকে বলতেই হবে, দেওয়ানজি সেই প্রজন্মের মানুষ যারা ভয়ঙ্কর রকমে আধুনিক ছিলো কিন্তু এখন আর কলকেতার চোখে আধুনিক নয়। না, আধুনিক নয়।

স্কুলে পৌঁছেও সর্বরঞ্জন নিজের এই আবিষ্কার নিয়ে নিতান্ত গম্ভীর হয়ে রইলো। নিজেকে সে নিঃসঙ্গ নিঃসহায় অনুভব করতে লাগলো। যে ক্লাসটা ছিলো স্কুল ভাঙার আগে সে ক্লাসে গিয়ে অন্যদিনের মতো পড়াতে উৎসাহ পেলো না। ক্লাস থেকে বেরিয়ে শিক্ষকদের বসবার ঘরের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ তার চিন্তাটা শব্দকে অবলম্বন ক'রে পরিচ্ছন্ন হলো—হায়, আমি কি শহীদ !

শিক্ষকদের বসবার ঘরে তেমন কাজ ছিলো না। সে একবার মনে করলো পরীক্ষার যে প্রশ্নপত্রগুলো আগামী সপ্তাহে দিতে হবে সেগুলো একবার দেখলে হয়। কিছুক্ষণ তার দু-একটা নাড়াচাড়া করলো সে, কিন্তু উৎসাহটা তেলহীন প্রদীপের মতো। দেরাজ থেকে সে একটা খেরোবাঁধানো লম্বা ধরনের খাতা বার করলো। এটা তার ডায়েরি। ক্লাসে কী পড়ানো হলো, কী পড়ানো উচিত তা যেমন লেখা থাকে, তেমন লেখা থাকে তার নানা সময়ের চিন্তা। এটা অবশ্য তার সে ডায়েরি নয় যা সে বাড়িতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় উপাসনার শেষে লেখে। এই দুই নম্বর ডায়েরিতে যে সব কথা থাকে পরে মার্জিত হয়ে সেই এক নম্বরে স্থান পায়।

দুই নম্বর ডায়েরি লিখতে লিখতে সর্বরঞ্জন নিওগি লক্ষ্য করলো টেবিলের অপর প্রান্তে শিরোমণি এসে বসেছে। তার দিকে কয়েকখানা চেয়ার বাদ দিয়ে চরণদাস একটা বাঁধানো খাতায় রুল টানছে। নতুন বছরের অ্যাটেণ্ডান্স রেজিস্টার। চরণদাসের পরনে কতকটা আচকান জাতীয় পরিহান। তার উপরে পাকানো চাদর। শিরোমণির গায়ে খাটো ঝুলের খাটো হাতার সুতোর

মেরজাই। তার গলার কাছে মোটা পৈতার গোছা চোখে পড়ছে, চোখে পড়ানোটাই উদ্দিষ্ট। মোটা স্থতোর চাদর আলগাভাবে গায়ে জড়ানো। শিরোমণির দিকে চাইলেই সব চাইতে বেশী যা চোখে পড়ে তা তার ধবধবে সাদা কিন্তু অত্যন্ত মোটা টিকির গোছাটাই।

সর্বরঞ্জন বললো,—চরণদাসবাবু কি এখনই আগামী বছরের কাজ করছো? নাকি ওটা তোমাদের থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত কিছু?

চরণদাস মুখ তুললো,—আগেরটাই ঠিক। সে হাসলো। থিয়েটার সম্বন্ধে ইতিপূর্বে নিওগির সঙ্গে তার কিছু তর্ক হয়েছে।

সর্বরঞ্জন বললো,—ভয় নেই তোমাদের। তোমাদের থিয়েটারকে কেউ এখানে নিন্দে করবে না।

থিয়েটার নিয়ে কোন আলোচনা সর্বরঞ্জন ইতিপূর্বে এখানেও করে থাকবে। শিরোমণির কাছে সে জন্য থিয়েটার শব্দ নতুন লাগলো না। সে বললো,—তা কি বলা যায়? ঠিয়াটার বলুন কিংবা অভিনয়, অপরিতোবাদ্ বিদুষাং ন সাধু।

চরণদাস বললো,—উনি সে অর্থে বলছেন না বোধ হয়।

—কথাটা ঠিকই ধরেছো। এই বললো সর্বরঞ্জন, কিন্তু তার পরেরটুকু বলতে গিয়ে সে দ্বিধা করলো। দেওয়ানজি যাঁকে বলা হয় এখনও তিনি যে অভিনয়ের বিরুদ্ধে নন, বরং যেন প্রশ্রয়ের ভাবই আছে তাঁর, এ কথাটা বলার ঔচিত্যে তার সন্দেহ হলো। তার নিজের কাছে এমন প্রশ্রয় দেয়া নিশ্চয়ই নীতিগর্হিত।

মৃদু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো,—মুশকিল কি জানো, চরণদাস বাবু, মানুষকে দেখে যা ধারণা করো আর তার প্রকৃত ব্যবহারে অনেক তফাত।

—যথা?

এবারেও নিওগির মনে দ্বিধা দেখা দিলো। সে কি বলতে পারে আজই হরদয়াল সম্বন্ধে তার ধারণাকে হরদয়ালের ব্যবহার ভীষণ রকমে আঘাত করেছে। সে বললো,—জানো, খিদিরপুরে এক মিত্তিরজা আছেন, যিনি নতুন ধর্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্মকে আলিঙ্গন করেছেন। কিন্তু তা করার আগে নিজেদের গৃহবিগ্রহ গোপীনাথ প্রভৃতিকে গোপনে এক মন্দিরে দিয়ে এসেছেন ; যাতে সেই অবস্থাতেও পূজা হয় সে জন্য আটদশ বিঘা জমি কিনে দিয়েছেন।

—কৌতুকের ব্যাপার তো। শিরোমণি বললো,—বিবেকের সঙ্গে রফা করা।

—আমার কিন্তু মশায় তা নেই। আমি মিথ্যা ব্যবহারে অনভ্যস্ত। আমাদেরও গৃহবিগ্রহ শালগ্রামশিলা ছিলো।

—আপনি বুঝি তা গঙ্গায় দিয়েছেন? চরণদাস আর কয়েকটা লাইন টেনে মুখ তুললো।

—রসো, রসো, চরণদাস, শিরোমণি বললো, ওঁর কথা ওঁকেই বলতে দাও। গঙ্গায় দেয়া তো হিঁদুয়ানিই হলো।

নিওগি বললো,—আপনি যদি দয়া ক'রে আমার বাসায় যান তা হলেই দেখতে পাবেন। আমি, মশায়, আমার সেই শিলাকে টেবলে রেখেছি। তা এখন কাগজ-চাপার কাজ করছে।

আমার ছেলেমেয়েরা সেটাকে নিয়ে খেলা করলেও আমার আপত্তি নেই। বরং তা ক'রেই তারা সংস্কারমুক্ত হবে। এই ব'লে নিওগি হাসলো। বললো আবার,—না, না, আমাকে বলতেই হবে, আজ পর্যন্ত সেই পাথর থেকে নূপুরের শব্দও শুনিনি, বাঁশির শব্দও না, এমনকি কোন কিশোর কেঁদে ফিরছে তাও মনে হয়নি।

শিরোমণি হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে হেসে উঠলো। বললো,—এখানেই আপনার চিন্তার ত্রুটি আছে কিনা দেখুন। যখন তাকে নুড়ি মনে করলেন তখন আর তার থেকে নূপুরের শব্দ আশঙ্কা করছেন কেন?

চরণদাস বললো,—তা হলে উনি যাকে নুড়ি মনে করছেন তা নুড়িই হয়ে যায়?

—তাই তো হ'য়ে থাকে। তোমার কাছে যা একটা রক্তমাখানো ফাঁসি-কাঠ কারো কারো কাছে সেটাই পূজনীয় অবতারের প্রতীক। হয়তো নিওগিমশায় সে রকম একটা কাঠ দেখলে যুক্তকর অন্তত বুক পর্যন্ত ওঠান। তুমি যাকে নুড়ি মনে করেছো তা থেকে কি বাঁশরী শোনা যাবে কিংবা ডমরু?

নিওগি এদিক ওদিক চাইলো। তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো। মনে হলো তার মুখে যে শক্ত শক্ত শব্দগুলো এসেছে সেগুলো আয়ত্তে রাখা কঠিন হচ্ছে। সে বললো,—সত্য গোপন করা আমার অভ্যাস নয়। সেজন্যই স্বীকার করি আপনি যাকে ফাঁসিকাষ্ঠ বলছেন তাকে ক্রশ বলে এবং তা দেখলে যুক্তকর বুক পর্যন্ত উঠে শ্রদ্ধা জানালে লজ্জার কিছু দেখি না। আপনি ইংরেজি জানলে আপনাকে কেশব সেন মশায়ের একটা বক্তৃতা পড়তে দিতুম। দেখতেন বড় বড় ইংরেজরাও তার কত প্রশংসা করেছে। আর তা খ্রীষ্ট সম্বন্ধেই। না, না একথা আমাকে বলতেই হবে আমাদের এই দেশে এমন প্রতীকও পূজা করা হয় যা স্বীকার করতেই হবে যে কোন সৎব্যক্তির মাথা নীচু হয়। তার তুলনায় ক্রশ?

—আপনি কি ওলাবিবি, শীতলা প্রভৃতি ঠাকুরানীর কথা বলছেন? চরণদাস রুল টানা শেষ ক'রে খাতা বন্ধ করলো।

—না। আমি তোমাদের দেবতার দেবতা মহাদেবের কথা বলছি।

কোন কোন কথা একটা আলগা ধরনের আলাপকে হঠাৎ যেন বিদ্যুতের আঘাতে সজীব ক'রে তুলতে পারে। এই ক্লাসটা শেষ হলে ঘণ্টা পড়বে এবং তখনই স্কুলের ছুটি। শিরোমণির তখন গৃহে ফেরার কথাই মনে হচ্ছে। টেবলের উপরে তার হাতের কাছে স্কাইলাইট থেকে আলো এসে পড়েছে। শিরাচিহ্নিত তার হাত দুখানা যেন রোদ পোহানোর ভঙ্গিতে সেদিকে ছিলো। শিরোমণি ডান হাত তুলে তার শিখাটাকে ঝাড়লো যেন।

—সে তো একটুকরো কাদা থেকে তৈরি কিংবা একটুকরো পাথর থেকে। কাদা বা পাথরে কি লজ্জার কিছু আছে।

—কিন্তু আকৃতি? বিশেষ ক'রে এই গ্রামে—। সর্বরঞ্জন প্রসাদ যেন জুগুপ্সিত বোধ ক'রে থেমে গেলো।

শিরোমণি বললো,—অ। তা বিশেষ ক'রে এই গ্রামে কেন?

—নতুন শিবলিঙ্গের গোড়ায় কারো বুকের রক্ত দেয়া হয়।

—যৌনগন্ধী বলছেন ?

—আপনি ব্রাহ্মণ। আপনিও স্বীকার করছেন শিবপূজায় রক্তচন্দনও অবিধেয়। রানীমা সম্বন্ধে আপনি যে কথাটা বললেন তা আমি উচ্চারণ করতে চাই না, বিশেষ স্কুলে ব'সে।

—অর্থাৎ চিন্তা গোপন করছেন। সেটাও কিন্তু সত্য ব্যবহার হয় না। শিরোমণি হাসলো।

—তা হ'লে শুনতেই চান ? ওকে আমি পশুত্বের পূজা বলি।

শিরোমণির কৃশ শরীরে সবগুলি শিরাই প্রকাশমান। কপালের ঠিক মাঝখানে যে শিরা সেটা যেন রক্তের চাপে ফুলে উঠলো। কিন্তু সে হঠাৎ ঠা ঠা ক'রে হেসে উঠলো। সে বললো,—খুব বলেছেন। আমি শুনেছি সাহেবদের শিশুরা রুমালে বাঁধা অবস্থায় সারস দ্বারা নীত হয়। আপনাদেরও তা হয় কি না জানি না। আপনি বাঙালী। ভেবে দেখুন নিজের জন্ম অথবা নিজের সন্তানের জন্ম পশুত্বের স্তরে কিনা। আমরা স্বর্গদ্বার থেকে ভূমিষ্ঠ হই কিন্তু। যদি বলেন এই একবারই জন্মানোর সুযোগ পেয়েছি, এ জন্ম সার্থক, তবে সেই সার্থকতার উৎস, জীবনে সবটুকু আনন্দের উৎস—মাতৃযোনির মতো কী এমন পবিত্র মশাই ?

—ছি-ছি-ছি, এসব আপনি কী বলছেন। নিয়োগী দুহাতের দুই তর্জনী নিজের দুকানে অনেকটা ঢুকিয়ে দিলো।

শিরোমণি বললো,—মস্তিষ্কের সাহায্যে ব্যাপারটা দেখুন। মনের প্রবীণতায় হয়তো পবিত্রতার বোধ বদলাবে। আপনারা রক্তমাখানো কাঠ, যা মৃত্যু ও বেদনার স্মৃতি বহন করে, তা যদি সামনে রাখতে পারেন, তাহলে আমরা যদি আনন্দ ও জন্মের প্রতীককে সামনে রাখি, তাতেই কি দোষ ?

ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজলো। ঘরের বাইরে ক্লাসে ক্লাসে ছুটির ঘণ্টা শুনে ছেলের দলের হৈ-চৈ ফুটে উঠলো। শিরোমণি তার শিখা আন্দোলিত ক'রে উঠে দাঁড়ালো। বললো,—নমস্কার মশায়। বুড়োর কথায় দোষ নেবেন না।

কিন্তু সেদিন ভবিতব্য অন্যপ্রকার ছিলো। বাইরে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিলো যা এরা ভিতরের দিকের ঘরে ব'সে বুঝতে পারে নি। দরজার কাছে গিয়ে শিরোমণি ভিজে বাতাসের তাড়া খেয়ে পিছিয়ে এলো। অন্যান্য শিক্ষকেরাও পিছিয়ে এলো দরজা থেকে। টেবলের কাছে এসে শিরোমণি বললো,—খুব ধমক খেলাম হে, চরণ। জল হচ্ছে।

—তাড়া কী। বসুন না হয়।

শিরোমণি আবার তার চেয়ারে বসলো।

নিওগির বোধ হয় এমন স্পষ্ট (তার কাছে নির্লজ্জ) কথা শোনার অভ্যাস ছিলো না। সে কথা খুঁজে পাচ্ছিলো না। শিরোমণিকে ফিরে চেয়ারে বসতে দেখে সে বেশ তিক্তস্বরে বললো, —আপনার এই অনুভূতিগুলিকে আমি অত্যন্ত নিম্নস্তরের ব'লে মনে করি। একথাটা আপনাকে জানানো দরকার।

—আপনি ঠিকই বলেছেন। এগুলো সেই স্তরের কথা যখন শিবলিঙ্গে মানুষ জগৎপিতরৌকে দেখতে পাচ্ছে না। হ্যাঁ হে চরণ, তুমি কি কালিদাস পড়েছো ?

নিওগি বললো,—আমি পড়েছি, আমাকে বলুন। কালিদাস শৈব ছিলেন এই বলবেন?

—না। কালিদাস ঋতুসংহারের লেখক আবার কুমারসম্ভবেরও লেখক। ঋতুসংহারের আদিরসাত্মক শ্লোকগুলি আজকাল আমরাও পড়াতে ইতস্তত করি। সেই লেখকই আবার কুমারসম্ভব লেখেন। আসল কথা কি জানেন, মানুষকে ঋতুসংহারের স্তর থেকে কুমারসম্ভবের স্তরে পৌছাতে হয়। ঋতুসংহারকে অস্বীকার করা বোকামি।

নিওগি বললো,—এতে কিছুই প্রমাণিত হয় না।

—না, এটা প্রমাণ নয়। তুলনা মাত্র। আপনি হয়তো শকুন্তলাও পড়েছেন। ওটা ভারি মজার। প্রথমে তো শিবকেই প্রণাম। শেষে আবার ভরত যার নামে কিনা ভারতবর্ষ তার প্রতিষ্ঠা। মাঝখানে কামজ মিলন থেকে আর একটি কুমারসম্ভবের পবিত্রতায় পৌছানো। আমার প্রত্যয় ভরতকে সমস্ত ভারতবর্ষের আদিপুরুষ ব'লে জানলে কালিদাসের পরিকল্পনার এই এক ব্যাখ্যা হয় যে তা ইঙ্গিত করছে, মানুষ কামজ অস্তিত্বের স্তর থেকে ক্রমশ শিবত্বে পৌছাতে পারে। আদিরসকে বাদ দিয়ে কাব্য নয়, তার জন্য লজ্জিত হয়ে নয়, তাকে দেবত্বের সার্থকতায় চালিত করেই কাব্য হয়। আমার তো মনে হয় মানুষজাতির ইতিহাসও তাই। মানুষকে দেবতা দিবিশ্চ্যুতা বলাই ভুল যদিও আপনারা ভাবেন ভগবান নাকি আদিম পুরুষকে কোন উদ্যান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। বরং সে পশুত্ব থেকে ক্রমশ উর্ধ্বে যেতে চায়। কিছু উন্নতি হয়েছে।

নিওগি বললো,—থাক, হয়েছে। কিন্তু এতেও আপনার ওই বিশেষ পূজা সমর্থিত হয় না। এই ব'লে সে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো।

—শিরোমণি বললো,—হয়। কারণ লিঙ্গরূপী শিব মানুষের এই উর্ধ্বযাত্রারই প্রতীক। যতক্ষণ না তাকে জগৎপিতা বলে বোধ হচ্ছে, জন্ম ও মৃত্যুর নিয়ামক ব'লে বোধ হচ্ছে, তার মধ্যে যোগীশ্বরকে দেখতে পাচ্ছে, ততক্ষণ না হয় নিজের প্রাণশক্তির উৎস ব'লেই মানুষ তাকে উপাসনা করুক। সেটাও অনেক—যদি তা প্রত্যয়ে আসে।

শিরোমণি অভ্যাসবশে শিখায় হাত রাখলো। যেন সেটাকে বাঁধবে ফুল দিয়ে। কিন্তু আচমকা অন্যদিকে গেলো ঘটনার গতি। কে যেন বললো—আপনি কি শৈব?

পিছন ফিরে সে দেখলো বাগচী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তার দাঁড়ানোর ভাবে মনে হয় কিছু আগেই সে এসেছে। শিরোমণি বিশেষ বিব্রত বোধ করলো, কিছুটা যেন ভীতও।

সে কিছু ইতস্তত ক'রে বললো,—না, মহাশয়, আমরা বৈষ্ণব। বিষ্ণুকে উপাসনা করার চেষ্টা হয়।

—ও, আচ্ছা! কিন্তু আপনি তো বললেন যোগীশ্বর রূপ প্রত্যয়ে এলে তখন কী হয়। এটা আপনার বৈষ্ণবী বিনয়, শিরোমণি মশায়। বৃষ্টি থামে নি। আপনি বলতে পারেন।

শিরোমণি যেন লজ্জায় অধোবদন। কিন্তু সে লক্ষ্য করলো অন্য কয়েকজন তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ কি সে নিজেকে কোণঠাসা ব'লে অনুভব করলো? যেন সে কোন এক পরাজিত পক্ষের প্রতিভূ।

সে বললো,—তারপরেও কল্পনা করি তার অনুভূতিতে যোগীশ্বর সেই রূপ ক্রমশ আনন্দময়

মহাকালস্রোতে মিলিয়ে যায়, সে অনুভব করে সেই মহাকালস্রোতে তারই সমক্ষে সূর্যচন্দ্রতারকাদি জন্মাচ্ছে ও লোপ পাচ্ছে, সে নিজেও সূর্যচন্দ্রাদির মতো সেই মহাকালপ্রসূত এবং তাতেই বিলীন, সেই জগৎপিতা মহাকালকে অনুভব ক'রে তার জন্মের আনন্দ নেই মৃত্যুর ভয় নেই ; তার সুখ নেই, দুঃখ নেই, সে কাউকে বিদ্বেষ করে না, কারো দ্বারা বিদ্বিষ্ট হয় না। সে যদি কখনও বলে আমিই শিব তা হ'লে তা মিথ্যা হয় না।

এই ব'লে শিরোমণি থামলো। তাকে অপ্রতিভ ও বিশীর্ণ দেখলো। সে ভাবতে লাগলো বাগচী কতখানি আলোচনা শুনেছে, না-জানি ভিন্নধর্মীয় তাঁর কাছে কী রকম বা লেগেছে সে আলোচনা। কেউ কেউ কবিৎকর্মা থাকে। কৈলাসপণ্ডিত ইতিমধ্যে দরজা পর্যন্ত গিয়েছিলো। সে বেশ সজোরে ঘোষণা করলো,—বৃষ্টি থেমেছে, সার।

বাগচী হেসে বললো,—পণ্ডিতমশায় দেখছি আলোচনাটা চলে তা চান না। বেশ, চলুন।

পথে বেরিয়ে শিক্ষকেরা এই ক্ষণস্থায়ী বর্ষায় শীত বাড়াবে কিনা, ফসলের পক্ষে ক্ষতিকর হবে কিনা ইত্যাদি আলোচনা নিয়ে ব্যস্ত রইলো।

শিরোমণি পিছনে ছিলো। বাগচী একবার ফিরে তাকে বললো,—এগুলি কি আপনার নিজেরই ব্যাখ্যা কিংবা কোন দর্শন থেকে বলেছেন ?

শিরোমণি যেন নিজের মনের মধ্যে খোঁজ করলো। বললো,—নিশ্চয়ই পূর্বসূরীদের ভাষ্য থেকে পাওয়া, কিন্তু বিশেষ কোন দর্শনের নাম করতে পারছি না।

বাগচী এই কথাগুলি ভাবতে ভাবতে কিছুক্ষণ শিরোমণির পাশে চললো। সার্বভৌম পাড়ার পথে শিরোমণি স'রে গেলো। শীতের এই এক পশলা বৃষ্টি ধুলোকে জব্দ করতে পারেনি। বাতাস সৃষ্টি করে বরং ধুলোর উৎপাত বাড়িয়েছে। সে রকম একটা ঝাপটা ধুলো উড়িয়ে একবার শিরোমণিকে ঢেকে দিলো। চাদর তুলে নাক বাঁচালো সে কিন্তু মাথার সাদা চুলে এবং সর্বাঙ্গে ধুলোর একটা স্তর পড়লো যেন। ধুলোয় ঢাকা, ক্লান্ত এবং শীর্ণ।

কিন্তু নিজের বলা কথা চিন্তার সূচনা করতে পারে। ধুলোয় ঢাকা শীর্ণ শিরোমণি নিজের অজ্ঞাতে রামায়ণের ভাষায় চ'লে গেলো। কিছু বদল ক'রে সেই ভাষায় সে ভাবলো উনষোড়শবর্ষ পৌত্র সে রাজীবলোচন। আজ সন্ধ্যা থেকে তাকে ঋতুসংহার পড়াতে হবে। বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রী গৃহে থাকায় তার প্রতি করুণায় ঋতুসংহার কাব্য; মেঘদূত কাব্য পড়া হ'তো না। এখন আবার তা যায়। বাড়ির কাছাকাছি এসে সে ভাবলো : পৌত্র ও পুত্রে কি তাতে বিবাদ দেখা দেবে! এ-কথা কি সত্য, যা সে কল্পনা করেছে। পৌত্র ও পুত্রের ব্যক্তিত্ব ভিন্নমুখী। তার ছেলে, এবার দিয়ে সাত বছর হলো, কলকেতায় অর্থোপার্জনের জন্য। এবং অনেক বিষয়ে এই সাত বছরে সে কালের সঙ্গে আপোস করেছে। সে হাসতে হাসতে গতবার তার মাকে বলেছিলো সময়ও মুনিদের কাছে বেদের মতোই প্রমাণ। নাকি এটা প্রৌঢ়ত্ব ও যৌবনের তফাত যে প্রৌঢ়ত্বে আদর্শের চাইতে বাস্তবোধ বেশী মূল্যবান হয়। কলকেতায় বাস করলে খানিকটা কলকেতার মতো হতেই হয়। তার পৌত্রের উপরে বাড়ির সাবেকি ভাবটার প্রভাব বেশী। এ কি তার উচিত হচ্ছে ?

সে আবার চিন্তা করলো কিন্তু রাজীবলোচন পৌত্রের বাহুও তো সুবলয়িত পরিঘসদৃশ হওয়া

উচিত। ধনুক এখনও লাঠির চাইতে বেশী কিন্তু বন্দুকের কাছে কিছু না। অর্থাৎ ঋতুসংহার পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানের ধনুর্বিদ্যা অর্থাৎ বন্দুকবাজিতে ওস্তাদ না হ'লে কাব্যপাঠ কেমন যেন বৃথা হয়। ঋতুসংহার যাদের জন্য লেখা তারা ধনুর্ধর ছিলো।

কেন সে নিজে বুঝতে পারলো না তার স্মৃতিপটে রাজকুমারের ছবিটা ফুটে উঠলো। মাংসল স্কন্ধ এবং আজানুলম্বিত না হোক, বাহু দুটি সুবলয়িত। তাই নয়?

বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে নিজের চিন্তাগুলোকে যেন সে লক্ষ্য করলো। আশ্চর্য, এই সব সে কেন ভাবছে। এই যে সে ভাবছে তা কি কেউ কখনও জানবে? না, ভবিষ্যতের জন্য সে তার এই চিন্তাগুলোকে পুঁথির পাতায় অবশ্যই স্থান দেবে না। এবং এখনই এগুলি চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবে।

বাগচীও বাতাসের ঝাপটায় পড়েছিলো। সে পথের ধারের ব্যস্তসমস্ত ডালপালাগুলোকেও দেখতে পেলো। আকাশে যে হাল্কা মেঘ তাতে কি আর বৃষ্টি হবে?

তারপর তার মনে হলো কী যেন ভাবছিলো সে? ও, শিরোমণির কথা। শিরোমণি কি নিজেই জানে না তার কথাগুলোর উৎস কোথায়? কিন্তু এটা তার নিজেরই চিন্তা। এটা নতুন দার্শনিক মত হতে পারে। নতুন দার্শনিক মত অনেক সময়েই তৎকালে প্রচলিত পুরনো দার্শনিক মতের বিবর্তন। কিন্তু এটা আশ্চর্য নয় কি যে এই গ্রামেও নতুন দার্শনিক চিন্তা হয়?

ঠিক এই সময়েই নিওগিকেও চিন্তা করতে হলো। সে মাথা নিচু করে হাঁটছিলো। সে অনুভব করছিলো আজকের আলোচনায় সে যেন পরাজিত হয়েছে। কিন্তু এই অলীক কল্পনা থেকে সে নিজেকে মুক্ত করলো। প্রকৃতপক্ষে ওটা আলোচনাসভা ছিলো না এবং সে কি সত্যই পরাজিত হয়েছে। বাগচীকে ঘরে আসতে দেখে সে থেমে গিয়েছিলো কেননা শিরোমণি তখন যে অরুচিকর যৌনবিষয়ক কথা বলছে তাতে অংশ নেয়া কোন শিক্ষিত লোকেরই উচিত নয়, স্কুলের ঘরে স্কুলের শিক্ষকের তো নয়ই।

কি আশ্চর্য দেওয়ানজি এঁকেই উপনিষদের ব্যাখ্যা করার উপযুক্ত বিবেচনা করেছিলেন! ঋতুসংহার? ঈশ্বর আমাদের পাপকথন থেকে রক্ষা করুন। যখন সে নিজে সংস্কৃত কলেজে কিংবা আসল কলেজে পড়বে এই নিয়ে তার অভিভাবকরা চিন্তা করছে তখন সমবয়সী একজন তাকে সংস্কৃত কলেজের কথায় কালিদাসের কথা বলেছিলো। হে ঈশ্বর, কালিদাসের শ্লোকগুলি কি কোন ভদ্র পরিবারে উচ্চারণ করাও যায়?

একবার তার মনে হলো সে নিজেকে এবং তার নিজের সন্তানদিগকে কুৎসিত কিছু উৎপন্ন মনে করে কিনা। পরমুহূর্তে সে ভাবলো এই যে আজ ঈশ্বরচিন্তায় যৌনতা সংযুক্ত হয়েছে এর জন্য সে-ও কি দায়ী? হে ঈশ্বর, আমাকে এই কোন্ দুর্গন্ধ কূপে নিক্ষেপ করেছো! এ কি কঠিন পরীক্ষা তোমার? হয়তো এই সূচনা মাত্র। অথবা এ কি ঈশ্বরের অঙ্গুলিনির্দেশ যে এ গ্রাম তোমাকে ত্যাগ করতে হবে? বারবার সে কি পরাজিত হচ্ছে না?

আদর্শবাদীদের চিন্তা অনেক সময়ে কবিদের অনুপ্রেরণার মতো অতি সাধারণ কয়েকটি শব্দে গভীর তাৎপর্য ধরতে পারে। হঠাৎ যেন অনুপ্রেরণার মতো তার মনে স্ফুরিত হলো—না, না, এ কথা

আমাকে বলতেই হবে যে আশা আছে। দেওয়ানজি আধুনিক না হতে পারেন, বাগচিমশাই হয়তো প্রকৃত খ্রীষ্টান নন, শিরোমণি হয়তো বাইবেলের শয়তানদের মতো তর্কসিদ্ধ ; স্কুলের পরীক্ষার ব্যাপারে এবং চরণদাসদের নাটক অভিনয়ের বিষয়ে সে হয়তো পরাজিত, কিন্তু এই অন্ধকারে তাকে তো হাতড়ে হাতড়ে চলতে হবে। নতুবা কি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায় না সে? হয়তো কালে দেওয়ানজির চাইতেও প্রবল কাউকে সহায় পাবে তাদের এই নতুন ধর্মের ক্ষেত্রে ?

তা কি হয় ? কেউ কি দেওয়ানজির তুলনায় এই গ্রামে বেশী শক্তিমান হতে পারেন ? রাজকুমার ? রানীমা ?

এই গভীর দুশ্চিন্তায় ঈশ্বর যেন বা তাকে আশ্রয় দিলেন। বিদ্যুত্তাসের মতো তার মনে পড়লো তার ভগ্নী ব্রহ্মময়ীর কথা। সে কি তার চেষ্টায় সার্থক হবে? বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা কি রাজকুমারের বধূরূপে আসতে পারেন? তা যদি হয় (নিওগি মনে মনে স্থির করলো তা হওয়া দরকার), তবে কী না হতে পারে। ক্রিশ্চিয়ান নাকি বৌদ্ধধর্মে এরকম ঘটেছে যে রানী তাঁর পিতৃবংশের ধর্ম এনে প্রথমে রাজাকে পরে রাজার সব প্রজাকে খ্রীষ্টান করতে পেরেছেন। বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার সাহায্যে এখানে নবীন ধর্মের প্রচার হতে পারে।

এই ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে দ্রুত পদক্ষেপে চলতে লাগলো। স্থির করলো ব্রহ্মময়ীকে চিঠি দিয়ে তাকে ঘটকালির ব্যাপারে উৎসাহ দেবে।

[ক্রমশ]

কবিতার জন্মকথা, ব্যক্তিগত

লোকনাথ ভট্টাচার্য

সর্বপ্রথমে আমি বন্দনা করি দশ দিককে।

পূর্বে বন্দনা করি মানুষের দুঃখের রক্তিম দিগন্তকে; পশ্চিমে যাত্রাশেষের গোধূলিকে; উত্তরে মৃত্যুর ঈশ্বর যমরাজকে; দক্ষিণে বসন্ত-ঋতুকে।

উত্তর-পূর্বের ঈশান কোণে বন্দনা করি মাতৃরূপী কল্যাণীর দক্ষিণ স্তনকে; দক্ষিণ-পূর্বের অগ্নি কোণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞের প্রথম পদক্ষেপকে; দক্ষিণ-পশ্চিমের নৈঋর্ত কোণে আমার প্রিয়ার বাম উরুকে; উত্তর-পশ্চিমের বায়ু কোণে মরুভূমির হাওয়াকে।

উর্ধ্বে আমার বন্দনা জগতের চক্ষু সূর্যকে; অধঃতে স্বপ্নের অবিনশ্বরতাকে।

আমি বন্দনা করি এই মহান সভার সকল সভ্যকে; যাজ্ঞা করি তাঁদের পদধূলিকে।

এইভাবে চৌকাঠ উত্তীর্ণ যখন, ধীরে-ধীরে প্রবেশ করি অন্ধকার ঘরে, পাতা আসনে বসে আগে নিশ্বাসটাকে সমান হতে দিই, পরে দেখি বসার ভঙ্গীটি যথাযথ হয়েছে কিনা, হাঁটু ও ঘাড়ের জ্যামিতিতে ভুল আছে কি নেই। তারো পরে, সময় হয়েছে অনুভব করে, নিরুদ্বেগ প্রেম ও প্রত্যয়ে প্রস্তর-মূর্তি পার্বতীর যোনিতে নিজের লিঙ্গটি ঠেকাই, প্রস্তর-মূর্তি আর প্রস্তর-মূর্তি নেই জেনেই। তারো পরে, ঘরের আনাচে-কানাচে ধুলো-ঝাড়া তাকে বা কুলুঙ্গিতে আগে থেকে যা-কিছু ছিল, এখনো রয়েছে, এবং নতুন আরো কিছু যা এসে গেছে, এবার তাদের নামকরণ করতে বসি, ওজন করে নিই কোন্ নাম কার প্রাপ্য, পরে আঙুল তুলে দেখিয়ে-দেখিয়ে একে-একে বলতে থাকি, এই তুমি হচ্ছ দুঃখ, ঐ তুমি গম্বুজ; এই তুমি গোধূলি, ঐ তুমি ময়ূর।

পরে বেরিয়ে আসি ঘর থেকে।

আমার এই খেলা যেন নিজের সঙ্গে বাজি রেখে, পূর্বনির্দিষ্ট অতি-অল্প সময়ের পরিধিতে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এতটুকু ভুল না করে, কোথাও একবারও হোঁচট না খেয়ে, থমকে না দাঁড়িয়ে।

স্যুররেয়ালিস্তরা যাকে স্বয়ংক্রিয় লিখন বলতে চেয়েছেন, জানি না এটা কতখানি তা। অথবা এর সঙ্গে কতখানি সাদৃশ্য আছে না-আছে মহম্মদের বাণীর, বা সেণ্ট জন অব দ্য ক্রস-এর লেখার, বা আমারই দেশের প্রাচীন ঋষিদের উক্তির। তবে দুটো জিনিস জানি। এক, স্যুররেয়ালিস্তরা আমার মতো অনেকেরই তৃষ্ণার্ত চোখের সামনে একটার পর-একটা নিষিদ্ধ দরজা খুলে দিয়েছেন, যার ফলে বিচিত্র আলোর সহস্র জীবাণু আমাদের কামড়ে ধরে কাঁকড়া-বিছার মতো। দুই, যে-মুহূর্ত নিয়ে আমাদের কারবার, তা একদিকে যেমন ম্যাজিক, তেমনি অন্যদিকে অনিবার্যভাবে চিহ্নিত মিষ্টিক উপাদানে, হয়তো মিষ্টিক বলেই ম্যাজিক। এবং এটাও মানব, প্রথমে যখন বসি, আমি আমার মুহূর্তটির সামনে প্রস্তুতি নিয়ে মুখোমুখি, শাশ্বতীর সেই দুটি নায়ক-নায়িকা আমরা দুজন, তখন যদিও নিজের ইচ্ছা ও ক্ষমতা সম্বন্ধে পুরোপুরি সজাগ থাকি, জানি কোন্ মালমশলা নিয়ে কোন্ যজ্ঞ করতে চলেছি, তবু মাঝামাঝি এগিয়েছি কি বেশ দেখতে পাই যে গতি আমার আয়ত্তের মধ্যে আর নেই, পৌঁছে

যাচ্ছি অচেনা এক অন্য জগতে, অন্য এক মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির কবলে। তখন আমার শিরায়-ধমনীতে বাজতে থাকে কোন্ পূজার কাঁসরঘন্টা, আত্মসমর্পণের ভৈরবী রাগিণী।

নিজের এত কথা বলা পাপ, আমার মতো অকৃতার্থের পক্ষে ধৃষ্টতা, তবু যেহেতু আমি ও আমার প্রস্তুতির ক্ষণের প্রসঙ্গ ইতিমধ্যে পেড়েছি, বলেছি এরা দুটি নায়ক-নায়িকা, এটাও তাই বলতে হয় যে আমার সেই ক্ষণটিকে দেখি এক নারীর মতো করে—একটি নারীই বটে, সুন্দরীদের রানী ও নগ্না, সুডৌল স্তনের মহিমা যার ছুয়ো দিতে পারে যে-কোনো রম্ভা-উর্বশীকে ও যাকে ঘরে ঢোকার পর যথার্থ মুহূর্তটি এলে দেখি আরামকেদারায় উপবিষ্টা, আপনাতে আপনি মগ্না, হাঁটু দুটি ফাঁক করে অপেক্ষা তার আমাকে নিয়ে শয্যায় উঠে যেতে। আমি জানি, আমার পক্ষে তাকে সম্পূর্ণ করে পাওয়া মানেই তাকে খুন করা, আমার লুক্কায়িত ছুরিতে হঠাৎ বিদীর্ণ করা তার পুষ্পের মতো শুভ্র বক্ষ, যাতে সময় উত্তীর্ণ হলে জানালা বা দরজা বা ঘরের অন্য কোনো ফাঁক দিয়ে সে বেরিয়ে যেতে না পারে, কোনো ভবিষ্যের দিক্‌-দিগন্তে অন্য কারুর সঙ্গে সঙ্গমে আবার তার হিরণ্ময় বীজ না ছড়ায়, যাতে তার ও আমার লগ্ন চিরকালের জন্য খোদিত হয় নিরুপম ভাস্কর্যে। আমি তাই অতি সন্তর্পণে এগোই, তাকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দিই না আমার ভাবটি, যা কর্তব্য তা করি, পরে খুনের সেই মোক্ষম কার্যটি সমাধা হলেই ফিনকি দিয়ে যে-রক্ত ছোটে, যে-আঙুর-পেষা সেই রস, ও তার সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের কোনায়-কোনায় দেয়ালে-দেয়ালে যে-অজস্র হুলুধ্বনি-ঢাকবাদ্যি বেজে ওঠে, তা-ই হয় সেই প্রার্থিত উচ্চারণ, বা কবিতা, অর্থাৎ নাম যদি দিতেই হয় কোনো।

আমার স্পর্ধার জন্য আগে থেকে ক্ষমা চেয়ে এবার অন্য একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি। কিছুকাল ধরে কেবলি আমার মনে হচ্ছে, আমি বোধহয় আমার সীমিত জীবনের পক্ষে এক ভয়াবহ আবিষ্কারের দিকে ছুটে চলেছি। সে-আবিষ্কার ভাষা নিয়ে মেতে থাকতে-থাকতে একেবারে ভাষারই চৌকাঠ পেরিয়ে যাওয়ার। যেখানে আমার চেনা ভাষা বা আমার ভাষার সমগ্র শব্দভাণ্ডার আর পারছে না, হার মানছে, সেখানেই আমার এই নবজন্ম ঘটছে। মনে হয়, এই সুযোগ বা দুর্যোগটাকে ঘটানোর একটা নিশ্চিত উপায়ও যেন খুঁজে পেতে চলেছি, এবং সেই উপায়টি হল এই। যে-ম্যাজিক মুহূর্ত নিয়ে আমাদের কারবার, যার সঙ্গে আমাদের যোগের স্থিতিকাল অতীব ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য, ধরা যাক আমি সেটার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে চাইলাম, যতটা পারলাম সেটাকে টেনে বাড়াতে শুরু করলাম। যেন একটা অতি-সাধারণ রবারের বেলুন, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যা নিয়ে খেলা করে, ধরা যাক তেমন একটা বেলুনকে ফুঁ দিয়ে ফোলাতে শুরু করলাম, ফোলাচ্ছি ফোলাচ্ছি সমানে ফুলিয়ে চলেছি, শেষে সেটা যখন প্রায় ফাটে-ফাটে, স্পষ্ট দেখছি তার সর্বাঙ্গে আর্ত-স্ফীত-জর্জরিত শিরা-উপশিরার নীল বিদ্যুৎ ককিয়ে কাঁদতে চাইছে, ঠিক সেই মুহূর্তে ক্ষান্ত হলাম, তার মুখটি সযত্নে বাঁধলাম সূক্ষ্ম অথচ দৃঢ় এক সুতো দিয়ে। তারপর সেই অনন্ত দুঃখের আলেখ্যটিকে, সেই ভাষা ও ভাষাহীন ভাষার স্পন্দিত আর্তনাদকে সামনে রেখে ধন্য ভক্তের মতো নতজানু হলাম, নামাজ পড়তে শুরু করলাম।

শেষে আরো একবার সকলকে নমস্কার করে আমার সেই বাংলা ভাষায় কসরতের দুটি-একটি সামান্য নমুনা এখানে দিচ্ছি।

মেঘের বাচ্চা

হাওয়া আজ বইতেই দেব বলে সিদ্ধান্ত নিই, এবং সে-সংকল্পে এখনো অটল আছি, যখন যথারীতি ঘরে ঢুকি, চিন্তামগ্ন, মাথাটা নিচু, হাত-দুটো পাছার একটু উপরে এনে ভাঁজ করা, এ-আঙুলে ও-আঙুল সৌহার্দ্যে বন্দী—আর ঘরে পা দেওয়া মাত্র প্রতিবারেরই মতো বোঁ করে একবার পরখ করে নেওয়া ছবি-টবি ঠিকঠাক টাঙানো আছে কিনা, নাসারন্ধ্রে পাচ্ছি কিনা ধুলোর গন্ধ, না, সব

যথাযথ, শুনেছি আজও আসছে মুহূর্ত ঘোড়ায় চড়ে, আকাশের আঙিনা দপদপ কাঁপে খুরে-খুরের আওয়াজে, অর্থাৎ প্রতীক্ষা ভিন্ন আমার কিছু করার নেই ও তাই তৃপ্ত চোখে তোমার দিকে তাকানো, যে-তুমি শিল্পীর স্বপ্ন হয়ে ফ্রেমে-আঁটা আলেখ্যের মতো পালঙ্কে অর্ধশায়িতা, নগ্না, দেখি তোমারও চোখে আসন্ন অভিজ্ঞতার

শিহরণ ঝিলিমিলি তুলতে শুরু করেছে এখনই, যেন ছায়ানিবিড় বাঁশঝাড়-পাড়ে-ঢাকা গ্রামের পুকুরে হঠাৎ এক-কণা সূর্য যখন

তীর শান্ত বন শান্ত গ্রাম তখনো ঘুমোচ্ছে, স্তন অন্ধকারের পাহাড়, উরু-দুটি জনহীন রাজপথ রুপালি পাতের মতো এগোতে-এগোতে-এগোতে পৌঁছে যায় খোদ মণিকোঠার দরজায় ও যে-দরজার এধারে-ওধারের গুল্মে শিশিরের সৌরভ, শুধু

তোমার অন্তরীক্ষ কাঁপিয়ে ভোরের প্রথম মোরগটিই ডেকে উঠেছে একবার কোঁকর-কোঁ কোঁকর-কোঁ, পরেই মিলিয়ে গেছে স্নায়ুর অলিগলিতে ব্যাপ্ত করে তার তীব্র নিখাদের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি, তারো পরে উদাত্তে মন্ত্রিত-মূর্ছিত হতে-হতে কী করে নীরবতা আপন অসহ্য ঐক্যেরই ভারে চুরমার ভেঙে পড়ে ভূমিকম্পে সাতমহল এক প্রাসাদের মতো, খসে পড়ে একটি একটি করে

ঘর, খিলান হতে খিলান, অলিন্দ থেকে অলিন্দ, তোমার নাড়ীতে হিসহিস করে সাপ এবং তখন কী করে আমাতেও খেলে যায় বিদ্যুৎ এক যুগপৎ সাধের একদিকে হঠাৎ ক্যাঁক করে গলা টিপে মারতে উদ্ভাসিত-ঠোঁটের কোন্ ক্রীড়ারত শিশুকে অন্যদিকে সমানই উন্মাদনায় গর্ভবতী করতে অগণ্য রাত্রির ঈশ্বরীদের, ইত্যাদি-ইত্যাদির আজ এই অনুভূতিগুলির রূপ ও

ক্রমকে আমি সাজাই ও মিলাই অনুরূপ সেই চির-প্রস্ফুটিত অতীতের যমজ স্মৃতিগুলির পাশে রেখে, দাঁড়িপাল্লায় ওজন আজকের পরম্পরার সঙ্গে আগের গুলির, একটি খোপের সঙ্গে আরেকটি

খোপের, কথার মৃত্যুর সঙ্গে অন্য কথার জন্ম-যন্ত্রণার, এক পাল্লায় জ্বলে-যাওয়া গোধূলি অন্য পাল্লায়

ময়ূর-নাচা সূর্যোদয়, একে স্বপ্ন অন্যে উঁচানো বল্লম স্বপ্নহননের, দেখি সর্বত্রই চুলচেরা সামঞ্জস্য নির্ভুল জ্যামিতি, ষড়্জ মেলাচ্ছি নিটোল ষড়্জে, অর্থাৎ প্রস্তুতিতে খাদ কোথাও

নেই-নেই বলেই ভক্ত অনুচরের মতো করযোড়ে অপেক্ষমান তোমার উরু ঘরের দেয়াল ভোরের মোরগ, আসছে-আসছে-আসছে, তাই আমার আরো একটি উদ্যত পদক্ষেপ···ব্যস, যথেষ্ট, ঐ

উদ্যত পদক্ষেপেই আজকের মতো ছেদ টানছি যাত্রার—কারণ যে-পা হাঁটছে সেটা তো আমারই, অন্যের নয়—থামিয়ে দিচ্ছি আমার সেই মুহূর্তের আগুয়ান বেগ যা এখনো ছুটন্ত টাট্টু, আকাশে-আকাশে, পালঙ্কে শায়িতা তোমারই মতন করে তাকেও এই হঠাৎ করছি ভাস্কর্য, তারপর, নিয়মকানুনে

ভুলচুক যেহেতু কখনো করি না, নিজের পেশাটা নখদর্পণে, তাই উনুনকে জ্বলতে দিয়ে, তোমার ইচ্ছাকে চিরজীবী করে রেখে আজ আমি পা টিপে-টিপে বা নাচতে-নাচতে নিজেকে দেখতে-দেখতে দেখাতে-দেখাতে টুক-টাকাম-কাম-ড্যাড্যাং-ড্যাং ড্যাড্যাং-ড্যাং করে ঐ ঠিক যেমনটি ঢুকেছিলাম তেমনটি বেরিয়ে যাব ঘর থেকে যখন

বাইরেও ঘোর ধীরে-ধীরে কাটছে, কোলাহল একটু-একটু জাগছে, চড়ুই-শালিকের কিচিরমিচিরও, আর

শীতের মাটী হতে গ্রামের দুঃখের ভাপ মেঘের বাচ্চার মতো লাল-নীল বাষ্প হয়ে সবে শুরু করছে চেষ্টা শূন্যে ওঠার, উঠছে, থেমে যাচ্ছে, আবার

একটু উঠছে।

গুম্ফা ও জনৈক লোকনাথ

গৌরচন্দ্রিকা নয়, কারণ এ-কীর্তনের হে অধীশ্বর দেবতা কে-কোথায় আছো, তোমরা রক্ষা না করো যদি আমায় মিথ্যা হতে, দুঃখ নয় দুঃখকে নিয়ে আমার বেশ্যাবৃত্তি হতে, স্বপ্ন নয় স্বপ্নের রাংতা হতে—আমায় রক্ষা না করো যদি সারা-গায়ে তুচ্ছতার থুথু-মাখা কাপড় বা কপটতার হোক-না কিংখাবই হতে, যে-আমি আজকালকার সকালে-সন্ধ্যায় সাতচল্লিশ বছরের জনৈক লোকনাথ ভট্টাচার্য বই নই, সব সাধারণ সমবয়সীদের মতোই একদিন দাড়ি না কামালে গাল সাদা বা একই যাত্রায় যার তুবড়ানো-চুপসানো বাক্স-পেটরা অন্যান্যদেরই মতো গ্রামের ধূমায়িত মধ্যাহ্নে তোলে ঠুংঠাং সস্তা আওয়াজ চলমান হাঁটুর ছন্দে, তবু দ্যাখো আস্ফালনের হাত-পা গজানো যার কত দিকে-দিকে, নিশ্বাসে

ঢুন্দুভি, নিজেকে ভাবছি সূর্যাস্তের আস্কারা-পাওয়া নবাব—রক্ষা না করো যদি তো নিশ্চয় জেনো আমিও নই কম বেপরোয়া, মুখগুলো ঠিক রয়েছে কোথায় না দেখতে পেলেও ছুঁড়ে দেব এই নৈবেদ্যের সাজানো থালি তোমাদেরই মুখে, এই তণ্ডুলের সযত্ন বিন্যাস আগ্নেয়গিরির আকারে ও গিরির জ্বালামুখ-চূড়ায় নারকেল-নাড়ু, সজোরে নিক্ষেপ করব ধুলায় যা রূপার রেকাবিতে করে তোমরাই তুলে এনে দিলে—কেন দিলে ?—এই মণি-মাণিক্যে খচিত ক্ষণ। হ্যাঁ-হ্যাঁ ভনিতা নয় বা একটু আগের কী-যেন সেই গাল-ভরা বিশেষ্যপদটা—গৌরচন্দ্রিকা ?—তাও নয়, বরং প্রস্তাব-অভিলাষ-সিদ্ধান্ত যা-ই বলো ও সেই জাতীয় আরো কী-কী কথা আছে বা খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে আমারই রং-চটে-যাওয়া মলাটের অভিধানে, ঐ যেটা এখুনি আবার হাতড়ে বার করে ওল্টানো-পাল্টানোর সাধ বা সাহস নেই কিন্তু কে-না জানে যার পাতায়-পাতায় গন্ধ কত-না ইঁদুরের পেচ্ছাবের, দাঁতের কামড় পোকামাকড়ের ও বিশেষত সংকল্প বলে যে-আরো একটা কথা, হ্যাঁ-হ্যাঁ ঐ অভিধানেরই এবং সেটাই হবে হয়তো সবচেয়ে উপযোগী, সেই সঙ্কল্পটা আমার সরাসরি আরম্ভেরই—তবু সেখানেও, যেমন অন্যত্র, আগে চাই তোমাদের ক্ষমা, কারুণ্যের বৃষ্টির দৃষ্টি, বলে দাও কী-মন্ত্র কেমনভাবে উচ্চারণ করতে হবে, কোন্ স্বর শব্দে-শব্দে, রণন-দ্যোতনা-মূর্ছনা, কোথায় নিশ্বাস নেওয়া-না-নেওয়ার নিয়মকানুন। ব্যস, হল আরম্ভ, ততটা আমার জন্যে নয়—আসলে একেবারেই নয়, সাক্ষী এ-পৃথিবীর আজো-কুমারী সততা—যতটা তোমাদেরই ধাক্কার দরুন বা হে দয়া-ক্ষমা-আশীর্বাদ, ভুলের অবকাশ যেহেতু এখানেও, ভয় মিথ্যা-বাচনের, তাই সম্ভাব্য সকল জানা-অজানা স্থানে যথোচিত গড়ের সঙ্গে স্বীকার যে পিছন হতে এল বলেই দেখিনি ধাক্কাটা কার, কারুরই ভ্রূ-কুঞ্চিত কপাল বা দাঁতে-দাঁত-ঘষা মুখ, শুনিনি শ্লেষের-ব্যঙ্গের কোনো অট্টহাসিও, তবু আমারই পিঠে ও পাছায় দমকা হাওয়ার মতো কিছু একটা লাথি তো বটেই, যার ফলে চৌকাঠের বাইরে ছিলাম, এবার পড়ছি হুড়মুড় করে ঘরে, যখন কোমরটা ভাঙল কিনা বুঝতে চাওয়ারও আগে সশব্দে দরজা বন্ধ—হঠাৎ, সেই অলক্ষ্য হাতে। মানছি পরিচিত ঘর, আগে অনেকবার এসেছিও, চিনি যেন দেয়ালের ভিতরের ইট-সুরকিগুলোকে পর্যন্ত, জানি কোন্ ভাষায় চলে তাদের ইনিবিনি কিসফাসের প্রণয় দিনরাত্রি ধরে বা কোন্ বিস্ফোরণের বিকট আকাঙ্ক্ষায় তারাও ফেটে পড়তে চায় এক কালবৈশাখীতে—খোলা চোখে দেখার মতো যা-কিছু তা তো এতই মুখস্থ যে চোখ বন্ধ করেও ফিরিস্তি শুরু করা যায় পাঠশালায় শেখা নামতার মতো এককে এক দুয়েকে দুই তিনেক্কে তিন, একে চন্দ্র দুয়ে পক্ষ তিনে নেত্র চারি বেদ, অর্থাৎ ঘরের খুঁটিনাটি এই যেমন ঢুকেই বাঁ-হাতে একটু দূরে কোণ ও যেখান থেকে অন্য দেয়াল বা সেই দেয়ালেরও মাঝামাঝি আলমারিটা, তাতে কতগুলো তাক ও কোন্ তাকে কী আছে-না-আছে, যথা দ্বিতীয়টিতে নিশ্চয় রাসের মেলায় কেনা বৌঠাকরুণটি, সাবেকী কপালে-টিপ লালপেড়ে-শাড়ি মাছের-মতো-চোখ, বা কাঠের সে-পুতুলের উপর সকাল কিম্বা দুপুর অথবা বিকালের ঘড়ির কাঁটা বুঝে কীরকম আলো পড়ে-না-পড়ে, বা কবে কখন সেই আলো দেখে দেবদূতোপম কোন্ শিশুর মৃত্যুর স্মৃতি আমাতে জেগেছে-না-জেগেছে ও তখন জ্ঞাত-অজ্ঞাত সকলের জন্য অনন্ত জীবন চেয়ে কী-প্রার্থনা করতে আমি বসেছি নতজানু, ইত্যাদি-ইত্যাদি, মানে অন্য খুঁটিনাটিতে যদি না-ই যাই, এবং যেতে চাইবই বা কেন যেহেতু কী-দরকার আমার সম্পূর্ণ পর কোনো ব্যক্তিকে বা না-হয় হোক-না কোনো আকাশকেও-বাতাসকেও বোঝানো-পড়ানো

যে এটা চিনি আমি ওটা চিনি আমি সেটা চিনি। আসলে কিরিস্তিটা নিজেরই জন্যে, আওড়ে পাই সান্ত্বনা যে ঘর যেহেতু নখদর্পণে, তার ছয় ঋতু চিনি দশ দিক চিনি মৈথুন চিনি মৃত্যুর স্বপ্ন চিনি, তাই ঢুকে যদিও পড়েছি অন্যেরি ধাক্কায়, আশপাশকে আবার আপন করে নিতে কতক্ষণ, কতটুকু ক্ষণ এই হাঁপানোর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে, বুকের বর্তমান ঢুকঢুকটা থামাতে, তারপর প্রস্তুত হতে—প্রস্তুত, প্রস্তুত হতে—এবং সেটা একবার হলেই ভয়টা কোথায়, কারণ দানবীও কেউ যদি থাকে আমায় খাবলে-খাবলে খাওয়ার তো সে-দানবীটাকেও যে হায় আগে থেকে অতি-আগে থেকে চিনি! এবং প্রসঙ্গটা যেহেতু ইতিমধ্যেই উত্থাপিত, বলেই ফেলি দানবী সত্যিই আছে, হ্যাঁ-হ্যাঁ এই ঘরেই এবং আমার এই সাতচল্লিশ বছরেও, আসলে আমার রক্ত-লিঙ্গ-নাসারন্ধ্রের প্রতি লেলিহান রুচি তার ততই বাড়ে যত, আশ্চর্য, আমিও বয়সে বাড়ি, নিজের দুঃখটাকে সম্বিৎ হারাতে দেখি হঠাৎ দিগন্তহীন সকল মানুষের দুঃখের মোহানায়—ও তখন সেই মোহানার বহুদূর অদৃশ্য পারের বনরাজিনীলায় যে-একটি আকুল অপার্থিব অন্ধকার নামে, যার ঠিকানার আভাসে আমার স্নায়ুর অলিগলি চঞ্চল, জানি-জানি ঐ রাক্ষুসী কাজল পরতে চায় সেই অন্ধকারের, সর্বাগ্রেই, পরেই তার যথার্থ যজ্ঞারম্ভ। তবু এখনো দেখছি না তাকে, কারণ দেখতে চাই না, কারণ মন্ত্র বাজেনি, তাই এড়াতে চাওয়ারই কসরৎ আপাতত, অন্তত যতক্ষণ পারা যায়, ও ততক্ষণ ভুলিয়ে রাখার বা সঙ্গ দেওয়ার মতো এ-ঘরের এটা-ওটা-অন্য অনেক কিছু তো আছে, এবং এই তো চোখ পড়ল থালাটার উপর, ঐ যেটা দেয়ালে টাঙানো, তিব্বতীই বটে, গোল চাকতিতে এতটুকু না নড়েও বন্-বন্ নাচায় নিথর নীরন্ধ্র নীরবতার নাড়ী-ভুঁড়ি-পাকস্থলী, আর সঙ্গে-সঙ্গে আমিও মনে-মনে বলি তোফা-তোফা, পাওয়া গেল, কারণ গুমরে-গুমরে-ওঠা রাত্রির কোন্ অবোধ্য গর্জনের মতো ঐ-তো বিলাপ কতদূর থেকে ভেসে-আসা মঠের, লামাদের, যাদের জোব্বায় লুকানো হাহাকার আঁৎকে তুলতে পারে সকল রক্তিম উষাকে, যদিও সে-হাহাকার আমি কেন ভাবতে বসতে যাব আবার যে-মুহূর্তে আমার সবচেয়ে দরকার নয় কি কিছু মনোরম অনুভবেরই, সুখাদ্যের স্মৃতির, রস বা রসনার অতীত অভিজ্ঞতার, যাকে ইচ্ছামতো জাঁইয়ে তুলে আবার চাখা চলতে পারে, চাইলে মধুর কোনো দুধপুলির মতো জিভ দিয়ে কেন চাটা-ই বা চলবে না, তাই প্রসঙ্গে যখন আছিই তখন ঐ লামারই মতো বলা যাক ওঁ মণিপদ্মে হুম্ ও বলেই দৌড় তিব্বতী থালা হতে এ-দেয়ালের আকাশটা চষে বেড়াতে, বার করতে অন্য কোনো সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র, হয়তো ছবিই একটা কি ছবিহীন পেরেক মাত্র—হ্যাঁ-হ্যাঁ এমন একটা পেরেক যেন ছিল, নিশ্চয়ই আছে, ঢোকার মুখে ডান-দিকে হাত-চারেক দূরে—এবং যে-পেরেকে লটকানো চলে হয় এখুনি-এখুনি সাজিয়ে-গুছিয়ে তোলা কোনো গোধূলি, নয় তিনদিন আগের দেখা গম্বুজ, কিম্বা হোক-না দূর শৈশবেরই একটা বাঁদরনাচের ঘটনা, কৌতুকের, হাততালির, অর্থাৎ এমন একটা কিছু যা লাল-নীল রঙ-চঙ মাখিয়ে খাড়া করা চলে, এধারে-ওধারে একটু টক বা তিক্ত হলে আছেই তো চিনির শরবতের রসায়ন, ধার কোথাও মসৃণ না থাকলে আছে ছুতোর মিস্ত্রীর অস্ত্রও। কিন্তু হায় আপাতত দেখছি ঐ লামাটাই হচ্ছে নাছোড়বান্দা, আমি যত ঘুরি, ও ঘোরে আমার পিছনে, তারপর উরিঃ সাবাস দাদা-রে-দাদা কী সাংঘাতিক দৌড়োদৌড়ি যে আরম্ভ হল, আমাদের পায়ের দপ্-দপ্ শব্দে কাঁপে দেয়ালের মেঝে বা মেঝের দেয়াল—ধুম-ধাড়াক্কা-ধাড়া-ধাড়া-ধুম—যদিও খেলা এটা

একেবারেই নয় যেহেতু অন্তত আমার ক্ষেত্রে নিছক প্রাণপণ পলায়ন, আবার বুকের দুরদুর আবার হাঁপানো, এবং ও-হতভাগার চোখ ক্রমশই আরো কটমটে, হাতের মুঠো দুটো আরো শক্ত, অর্থাৎ যখন দুজনে থেমেছি, সামনাসামনি পড়ে গেছি, ও স্থির করছে কী করে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়, ঝাঁপ দিলেই এড়াবো কী করে ভেবে আমি দেখছি চোখে অন্ধকার—অবশেষে ছুটতে-ছুটতে-ছুটতে জানি না কখন হঠাৎই ওর আওতার বাইরে চলে এলাম, বেচারা পারল না ঐ পায়ে-পায়ে কেবলই আটকে যাওয়া ওর পেল্লায় জোব্বাটারই কারণে, হয়তো পড়েই গেছে খালে-নালায় চিৎপটাং এবং আবার উঠতে পারার আগে আমি দে-ছুট দে-ছুট দে-ছুট গোধূলিকে ধাক্কা মেরে গম্বুজের পাশ দিয়ে বাঁদরনাচ টপকে এ-দেয়াল-মেঝের আকাশে-আকাশে তুলে বুনো মোষের মতো ধুলোর সরগরম মেঘ, যখন বলা বাহুল্য এমন আহাম্মক নই যে পিছনে ফিরে দেখতে চাইব ও কী করছে-না-করছে, দম নিচ্ছে না অবশেষে কোঁচা বাঁধছে এবং যদি কোঁচা বাঁধতেই চায় তো জোব্বার আঁটসাঁট মোটা কাপড়টা সে-কাজে কী করে সহায় হবে বা এখনো দেখা একেবারেই যাচ্ছে কিনা লামাকে, না মিলিয়ে গেছে ঘূর্ণিঝড়ে—দূর-দূর-দূর এসব দেখতে চাইছে কে, শুধু ছোটা ছোটা আর ছোটা, ছুটতে-ছুটতে-ছুটতে অবশেষে ফেরা যাত্রার প্রথম বিন্দুটিতে, অর্থাৎ এবারকারেরই, অর্থাৎ তিব্বতী থালায়, এবং সঙ্গে-সঙ্গে আবার ভয় পাছে পূর্বেকার মতোই থালা হতে লামা এসে এই বুঝি হাজির হয়। হল না—হে আশীর্বাদ, ধ্বনিত হোক জয় প্রাণদাতার—এল অন্য এক রাত্রি, ঐ থালারই সূত্র ধরে, এবং রাত্রির সঙ্গে-সঙ্গে পাড়াপড়শি কত বন্ধুজন যারা সারা-গ্রাম উজাড় করে সেদিন এসেছে আমার জানালায়, এবং হ্যাঁ, ঘরটাও তো এইটেই ছিল, এই তো সেই জানালা, একটু এগোলেই পরখও করে নেওয়া চলে, যে-প্রশ্ন অবশ্য ওঠেই না, কারণ এগোতে গেলেই এবার আর লামার নয়, অন্য সেই কবল, একেবারে মোক্ষমটি, যা এখনো এড়াতে চাই—যাক, না এগিয়েই, এমন-কি চোখটাও না খুলেই পরখ করা চলে জানালাটাকে, বা জানালার ঠিক তলা দিয়ে চলে গেছে যে-মেঠো পথটা বা পথেরও ওপারে রয়েছে যে-বটগাছটা, জানালায় জায়গা হয়নি বলেই যার বেদীতে ওদেরই কেউ-কেউ বসেছিল সেদিন, মেনে নেওয়া চলে যে এই সবই যেমনটি ছিল আজো ঠিক-ঠিক আছে। সে-রাত্রের রঙ চুরি করেছিল তিব্বতী থালা বা থালারই গাঢ় বেগনি মাথে বাইরের নিশীথিনী, স্তব্ধতার কাপড় মুড়ি দিয়ে গাছপালা-নিসর্গ হাঁটু ভাঁজ করে বসেছে তেমনি যেমন ঘরে আমিও বসে আসনপিঁড়ি, কোল-বেয়ে-নেমে-আসা আমার হাতটি আলতোভাবে মাটিতে ছোঁওয়ায় নিখুঁত জ্যামিতি, আর সে-কী আকুল নিশ্বাস-রুদ্ধ-করা দৃষ্টির সারি জানালায়, ঐটুকু জায়গায় গাদাগাদি পঁচিশটা কি তিরিশটা মাথা কম করে, একটার উপরে আরেকটা, কেউ-কেউ নিশ্চয় উঁকি মারার মতো ফাঁকটি পাওয়ার জন্য নিজেদের শরীরের থেকে আরো লম্বা হয়েছিল, হয় মাটির তলায় ইট রেখে নয় অন্যের ঘাড়ে বা কোমরে চেপে, গরাদ ভর্তি শুধু আঙুল-আঙুলের সর্পিল বিচিত্র মাধবীলতায়; যদিও সে-সবের আমি কিছুই দেখিনি, না তাদের মাথা না আঙুল, দেখিনি নিশ্চয় হাড়-জিরজিরে বুড়ো বা গালে-টোপ-খাওয়া কিশোরীদের সেই অন্য অনেককেও যারাও জানি ভিড় করেছে কিন্তু যাদের দেখা মিলতে পারে যদি টপকানো চলে জানালার ঐ সারি-সারি মাথা—যেটা বলাবাহুল্য গ্রাহ্যের বাইরে যেহেতু ফাঁক নেই এতটুকু নেই—তারপর জানালা পেরিয়ে পৌছনো চলে পথে বা পথের ওপারে বটের বেদীতে, যেখানেও সর্বত্রই গিজগিজে

লোক ও এত নিশ্বাস এত প্রতীক্ষায় হাওয়ায় আগুন, গমগমে মুহূর্ত, এবং না দেখেও জানি কী-অনন্ত কান্নার কারুশিল্প সেই সব মুখে, বৈশাখী সন্ধ্যায় পুঞ্জীভূত মেঘের মতো কী-উত্তেজনা তখনো শুধু ভাস্কর্যই করে রেখেছে তাদের চোয়াল-চিবুকের ঠেলে-ঠেলে-ওঠা চূড়াগুলো, গালের উপত্যকায় বিষাদের কী-শ্বাপদসংকুল অরণ্য সেই, তাই গিলে-খাওয়া-চোখে আমায় দেখছে যেন আমিই এনে দেব তাদের সাত-রাজার-ধন-এক-মানিক, এবং এনে যেটা আমি দেবই, অন্তত দেওয়ারই প্রতিশ্রুতি নিয়ে বসেছি তো ঘরে। না দেখেও যা দেখছি যদি বললাম তো বলব না কেন নীরবতার সেই গলা-টেপা ক্ষণে না শুনেও যা শুনেছি, কারণ বেশ তো দেখতে পাচ্ছি—পাচ্ছি না?—মুখ বন্ধ করেও চেঁচাচ্ছে ওরা, কেউ-কেউ ঠোঁটের দুদিকে আঙুল ঢুকিয়ে শিস‌ও দিচ্ছে, অনেকটা গ্রাম্য মঞ্চে পুষ্ট দেহের পাছা-দোলানো নর্তকী দেখলে চ্যাংড়াগুলো যেমন করে, আমায় উৎসাহ দিয়ে বলছে কেউ-বা হেঁইও-হো হেঁইও-হো হেঁইও-হো অথবা জোরসে জোরসে জোরসে, হেই-হেই-হেই আরো-জোরে আরো-জোরে আরো-জোরে, সাবাস-সাবাস-সাবাস, লোকনাথ-লোকনাথ-লোকনাথ, এবং তালে-তালে তো নিশ্চয় চলছেই হাততালি, যেন দশ হাজার দর্শকের এক ক্রীড়াঙ্গন যেখানে দুই পক্ষ যুদ্ধ করে মরছে, অথবা দৌড়-প্রতিযোগিতায় গ্রামের হয়ে আমিই নাম লিখিয়েছি ও আমাকে ওরা জেতাবেই, তাই ছুটছি-ছুটছি-ছুটছি, এখনো মনে তো হচ্ছে এগিয়েই রয়েছি তবু কী করে বলি শেষ পর্যন্ত কী হয়-না-হয় কারণ প্রতিদ্বন্দ্বীরাও দাঁতে দাঁত চেপে সমানই ধাবমান পাশে-পিছনে-সর্বত্র, এই বুঝি ধরে ফেলল বলে কেউ, অমনি আমিও আরো একটু জোরে বুকটা আরো একটু সামনে ঠেলে দৌড় দে-দৌড় দে-দৌড়। কিন্তু কেন দৌড়, ছুটছি কোথায়, কাকে হারাতে? মনে হতেই, ঐ চোখ বুজেই, যেই পিছনে তাকানো, দেখি প্রতিযোগিতায় নেমেছে আমার সঙ্গে আমার দুঃখ আমার গোটা গ্রামের দুঃখ আমার-আমাদের সকলের দিনরাত্রির হাহাকার, এক জগদ্দল পাথর এবং সে-ও ছুটছে, এবং এই আমায় ধরে ফেলল বলে, আর ধরে ফেলা মানেই আমায় পিষে ফেলা আমার মুখটা গোবরে থেঁৎলে দেওয়া, আমার ও আমাদের স্বপ্নগুলো নিয়ে তার বাটনা বাটা, পরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে হৈ-হৈ করে তার চলে যাওয়া, ঐ গেল বলে, দিকদিগন্ত-কাঁপানো শব্দে—আরে-আরে ধরল, ঐ ধরে ফেলল যে! এই ছাখো, সর্বনাশ, এ-কী চিন্তা আবার-আবার, কারণ এক ছোটা হতে পালিয়ে তবে কি আরেক ছোটায় আমি পৌঁছলাম আজ, লামা হতে দৌড়-প্রতিযোগিতায়—এক হতে অন্যে কেবলি নিশ্বাস হারানো, প্রশান্তির হনন, শিয়রে মৃত্যুর খড়্গ? ধুত্তেরি-তার-নিকুচি-করেছে, আসলে যত গণ্ডগোল ঐ তিব্বতী থালাটাতেই, মনে রাখব আজ যা নাস্তানাবুদ করল, অতএব এখুনি-এখুনি যদি চোখ না চালাই অন্য দিকে, বার করতে না পারি ছুম করে লাফিয়ে ঢুকে পড়ার আরেকটি মনের মতো খোপ বা পেরেকে টাঙানোর ছবি, তো শ্রেয় কি হবে না দানবীরই কোলে ঢলে পড়া, এবার স্বেচ্ছায় বীরোচিত আত্মসমর্পণ, ঐ যে-নারীকে এড়াতে চেয়েই এই সাত-কাণ্ড রামায়ণ? যেই না মনে হওয়া, অমনি গায়ে বইল মধুবাত, জননেন্দ্রিয়ে চাপ, ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু যা এখনো নেই, তবু এই ছাখো ঘাড় ফেরাচ্ছি আস্তে-আস্তে, সেইক্ষণ মুহূর্তে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি হাঁটুর উপর এসে-বসা গুবরে পোকাটাকে অর্থাৎ লামার ও দৌড়-প্রতিযোগী লোকনাথের ঐ দম বন্ধ-হয়ে আসাটাকে, পেরিয়ে প্রায় গেলাম বলে দেয়ালের গোটা আকাশটাকেই, যেখানে তিব্বতী থালা বা ছবিহীন পেরেকের মতো জানি আরো কত গ্রহ-উপগ্রহ

যে-যার নিজের কক্ষচক্রে ঘোরে, এখনো ঘুরছে, বন্-বন্-বন্-বন্, অপার অন্ধকারে আওয়াজ শোঁ-শোঁ-শোঁ-শোঁ, এবং গায়ে হাওয়া-লাগা আমার এগোনোর এই সময় যাদেরও স্থস্মিত দৃষ্টি চাইতে-চাইতে চলতে হবে, পথের্র-প্রতিটি পাথরের ঢিবিতেই একবারটি করে মাথা নোওয়ানো, পরে ঘাড় বেঁকাতে-বেঁকাতে আরো-একটু দূর, আরো দূর, আরো দূর, অবশেষে ঐ-তো পৌঁছে যাচ্ছি পদ্মের পাপড়ির মতো পায়ের চেটোয়, যদিও জানি সব বিশেষণ ও উপমা এতক্ষণে কাঁধে অনাবশ্যক বোঝা, সব কাপড় অসহ্য বন্ধন, নিংড়ে-নিংড়ে নিঃশেষে মুছতে হবে সকল ভাবও, বর্ণনার প্রতি যত খেলো আসক্তি আমার, এবং পায়ের চেটো তো শুধু ফটকের সান্ত্রী ভিন্ন নয় ও যাকে পেরোলেই যথার্থ পুরীর চৌহদ্দিতে প্রবেশ, আগে ডাইনে-বাঁয়ে বাগান কত ফুল-ফলের গাছের-পাতার, মাঝখান দিয়ে হাঁটু পর্যন্ত সোনালি রাস্তা চলে গেছে মসৃণ তলোয়ার যেখানে এখনো পিছলানো চলবে না রক্ত ঝরাতে, পরেই থাড়াই, সিঁড়ি, আরো পরে দরজা বসবার ঘরে ঢোকার, চোখ তুলে তাকানো ছাদের ঝাড়লণ্ঠনের দিকে, পরে ঘরেরও মধ্যে ঘর, ছবি-টাঙানো একটার-পর-একটা অলিন্দ, অবশেষে খোদ মণিকোঠার গুম্ফা এবং যেখানেই রাক্ষুসীর সেই বিরাট হাঁ—ঐ যে পালঙ্কে শায়িতা এলোচুল, কপালে কালনাগিনীর চুম্বক, সারা দেহখানি আরতির ঘণ্টা বেজে ওঠার আগের ঝিলিমিলি মন্দির, ধূপধুনা-জালানো, থমথমে প্রতীক্ষায়। শুধু মন্ত্র ধ্বনিত নয় যখনো ও পালানোর পথ বন্ধ, আমি স্থাণুবৎ, গলায় রুখে রেখেছি ফিনকে-ওঠা রক্ত, হাত দিয়ে ঠেকাচ্ছি উপড়ে-আসা চোখ, বোঁ করে ঘুরে আসা তখন—এই এখন—নিজেরি বৃত্তে বারবার, আওড়ানো গৌরচন্দ্রিকা-আরম্ভ-লামা-তিব্বতী থালা, কথাকে শুইয়ে দিয়ে তার উপর একই কথা এমন দুমদাম চাপানো যাতে অক্ষরগুলো লেপ্টে যায় একটা-আরেকটায়, চীনে-চ্যাপ্টায়, দাঁতের পাশে কাতরাতে-কাতরাতে এসে জায়গা নেয় লিঙ্গ, কানের পাশে গোড়ালি, অর্থাৎ মৃত্যু-মৃত্যু-মৃত্যু, অথবা ভাইবোন-পাড়াপড়শি-বন্ধুজন যারা ভিড় করেছিল জানালায় কোনো জোনাকি-জলা রাত্রে কি কখনো করেনি কি আবার করতে আসবে একদিন, হে দয়া-আশীর্বাদ-দেবতারা-রাক্ষুসী-গ্রামের দুঃখ, এবং ঐ তুমি যোনির স্বেদসিক্ত হাঁ যার থেকে এখনো আমি জানি-না-ঠিক-কতখানি দূর, আপাতত এই নাও উপহার এক শবের, কবরের, যা আমারই।

অসম্ভবের রাজ্য

কথা যখন ত্বখান হল, রক্ত ছুটল ফিনকি দিয়ে, তার আগের অবস্থার বর্ণনায় ফেরা মানেই ঘরে ঢোকার প্রসঙ্গের উত্থাপন, অর্থাৎ যাত্রার প্রথম সেই পদক্ষেপ, যদিও যার ঐক্যের ইমারত এই নতুন অভিজ্ঞতায় এতক্ষণে ধূলিসাৎ, উড়ে যায় হু-হু হাওয়ায় যা এককালীন মিনারের চূড়াবিশেষ, এখন শুধুই ছিন্নবিচ্ছিন্ন ঠুনকো স্বর সেইসব যাদের চিনেছিলাম নিটোল ঋষভ বা কড়ি-মধ্যম হিসেবে সম্পূর্ণ এক কলির, তবু

দিনশেষের রণক্ষেত্রে লণ্ডভণ্ড মুণ্ডের মাঝে জোড়াতালির চেষ্টায় বিচিত্র দর্জিই যদি আমি, হাতে ছুঁচ-সুতো, তো সেটা রচনা করতে নিজেরি এক পরম্পরার ইতিহাস, এবং যাও ব্যর্থ হতে বাধ্য জেনেই,

কিম্বা সেই কারণেই, যাতে অগণ্য ব্যর্থতাগুলিকেও অন্তত

মেলানো যায় একটি মালায়, ঐ ছুঁচ-সুতোর কারসাজিতেই। অতএব

ফেরা যাক ঘরে, অর্থাৎ তারো আগে ঢোকার মুহূর্তে যখন সবেমাত্র চৌকাঠটি পেরিয়েছি, তখনো কোন্ দুঃখের গোধূলি-চেতনায় রঞ্জিত হৃদয়, পেরিয়েই অভ্যাসবশত প্রার্থনা করেছি এমন একটি দৃষ্টির যার বিশেষণ মানুষের অভিধানে আজো কোথাও নেই, পেয়েছিও দৃষ্টি, ও তাইতে তাকিয়েছি একে-একে পর্দার দিকে, মাটির

পাত্রে চশমার খোপে—একটা থেকে আরেকটায়

লাফিয়ে-চলা গঙ্গাফড়িঙ আর নই, কারণ সব তাড়ার ভাব ততক্ষণে ফেলে দিয়েছি জানালার বাইরে, দূর গম্বুজে মিলিয়ে যায় শেষ কিছু যে-রক্তিম আলো তাতেও দিশেহারা হচ্ছি না, বরং চোখ পড়েছে যদি একটিতে তো সে-চোখ রাখা ঐ একটিতেই, যদি পর্দা তো পর্দাই, অন্তত ততক্ষণ যতক্ষণ লাগে তার ভিতরে ঢুকে সব তন্নতন্ন দেখে নিতে, শুধু দৌড়বাজের মতো চৌহদ্দি পরিক্রমা নয়, তার যত গোপনতম বগল লিঙ্গ গুম্ফাও, হঠাৎ-ই সমুদ্র বা কোনো, যারও অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়ে ডুবুরী আমি খুঁজি ও খুঁজে পাই তলদেশে ছড়ানো-ছিটানো মণি-মাণিক্য মুক্তা শঙ্খের কণা, কোথাও জাহাজডুবির ধ্বংসাবশেষ, যদিও কিছু কুড়ানো নয়, ছুঁতে হাতটিও না বাড়ানো, শুধু দেখে যাওয়া, যেখানে যা-যা আছে যেমন তাকে তেমনি থাকতে দেওয়া, পরেই

বেরিয়ে এসে প্রবেশ ঘরের অন্য সামগ্রীতে, এই যেমন মাটির পাত্রে বা চশমার খোপে বা কুলুঙ্গির উপরে কৌটোয় এবং যেখানেও ফিরে-ফিরে একই প্রণালী পরিক্রমার ও ডুবুরীর ঝাঁপের। এখানেই

থামত যদি থামা এই বর্ণনা তো অনায়াসে টাঙানো চলত দেয়ালে-দেয়ালে কত-না চমৎকার ছবি আমার পরিক্রমার, সাঁতার কাটার, ঐক্যের সুরটিকে বইয়ে-সইয়ে বাজাতাম যখন-খুশি কলেরগানে —কিন্তু কী এমন ঘটে থাকতে পারে ইতিমধ্যে যাতে হঠাৎ ফাটল ধরেছে সর্বত্র, সুষুপ্তিতে আর্তনাদ, চারিদিকে রঙ মানে তাজা প্রাণেরই রক্ত, সহস্র দুঃখের-স্বপ্নের খুন? জানি

না। শুধু দেখছি কৌটো

কী করে হঠাৎ কৌটো নয়, জাহাজ জাহাজ নয়, এবং গণ্ডগোলটা নাম নিয়ে নয়, সত্তা নিয়েই, যেহেতু সকলেই যে-যার দেহ ও সম্ভাবনার সীমানা ছাড়িয়ে তড়াক-তড়াক লাফ মারে শূন্যে, নিজ-নিজ

হাহাকার ও অভীপ্সার একটি অস্ত্র অন্তরীক্ষে—অর্থাৎ কুলুঙ্গিতে থেকেও কৌটো কতটুকু কুলুঙ্গিতে? সোনার মুঠো-মুঠো বাষ্প হয়ে যে সে অনেকখানি কেবলই উড়ে যায়, ছিটকে-ছিটকে-পড়া তার নাসারন্ধ্রে-অন্ত্রে-রন্ধ্রে, আকাশের চোখ বন্ধ করে ধ্বংসের ফুলঝুরি। আমার

জগৎটা হয়ে দাঁড়ালো তাই এই অসম্ভবের রাজ্যই, এই ঘরেও—দেয়ালের নাটমঞ্চে-মঞ্চে যার পরিচিত রাম-শ্যাম-যদু আর নেই, সজীব কোনো পুত্তলীর নাকের নোলকও নয়, কেবল

দাঁত-মুখ-খিঁচানো হাসিতে ফেটে-পড়া একের-পর-এক মুখোশ।

ছন্দ

আবদুল মান্নান সৈয়দ

আমি অনন্তের শাখা-প্রশাখায় আটকে-যাওয়া পৃথিবী-ঘুড়ির মতো
আমি রুমালে বরফ বেঁধে প্রবল হাতুড়ি-ঘায়ে চূর্ণ করেছি
আমি গোলাপ-বাগের সাত-তলা প্রাসাদের সিঁড়ি বেয়ে
ধাপে-ধাপে উঠতে-উঠতে পড়েছি হঠাৎ
আমি সেই বৃষ্টিবিন্দু বহুদূর মেঘেলা আকাশ থেকে নেমে পড়ি
রৌদ্র-পিচ্ছিল শহরের এক কবি-র সম্মুখে
সময়ের লতাপাশ ছিঁড়ে মাথায়-জড়ানো মুকুটের মতো প'রে
বেরিয়ে যায় উন্মাতাল হরিণ আমার
অ্যান্টেনা পুঁতেছি আমি মাথার ভিতরে
স্পন্দিত রাখাল আমি, একটুখানি মুঠো খুলে ছড়াই স্বপ্নের বীজ
আমাকে অগ্রাহ্য ক'রে আমারি উৎসাহী হাত
নেমে যায় থল্‌বল্‌ বৃষ্টিজলে চাঞ্চল্যের মাছ ধরতে
দুরন্ত শিশুর মতো আমি শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতের গালে চাঁটি মেরে
ছিঁড়েছি ফর্ ফর্ ক'রে ব্যাকরণ-বই
শিশুর হাতের পাপড়িরাশি নীল মেঝে ভ'রে ফ্যালে আকাশের
সেই আকাশ-আনন্দে আমি পৃথিবীর দুঃখ ভুলেছি
যাবার আগের দিন শম্পা বলেছে
আমাকে তোমার বিশাল মুক্তির বাহুবন্ধনে বেঁধে রেখো

প্রতীক্ষার অর্ফিয়ুস

সিকদার আমিনুল হক

আরোগ্যের জন্যে আমি আসিনি। যেখানে বিষণ্ন শুশ্রূষার হাত, সেখানে একটি অঙ্কুরের জন্ম হবে, এই আশ্বাস আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল। নারীর রেশমে যে উষ্ণতার, উৎসবের প্রবাহ, সেই স্নিগ্ধ আয়োজন ছিন্ন করার কল্পনার মধ্যে কত উদ্দীপনা ও আকাঙ্ক্ষার চিহ্ন ছিল একদিন।

সাবানে হাত ধুয়ে প্রাঙ্গণে দাঁড়াতে পারতুম। পবিত্রতার দিন আকাশের নীচে যেমন মানুষেরা থাকে। কিন্তু লালসার হাহাকার আছে; আমাকে ধিক্কার জানাতে আসবে ঝড়ো হাওয়ার মতো নারীরা। যেন বন্য জন্তুর পায়ে-পায়ে দলিত হবে প্রস্রবণের কোমলতা।

হে নারী, ভালবাসা ও শুভেচ্ছার মধ্যে কোন নগ্ন কলঙ্কের চিহ্ন ছিল না। কিন্তু যখন তাঁবুর বাইরে এসেছি, উষর মাটির সামনে আমাদের স্তুতির কোন চিহ্ন নেই। উত্তরাধিকার রেখে যাবো যে দ্বীপের মধ্যে, সেখানে নির্দিষ্ট কোন নক্ষত্র নেই। উচ্চাকাঙ্ক্ষার অশুচি আবরণের মধ্যে শুধু বিলাপ ও উদ্ভিদের হতাশা।

প্রপাত যে প্রত্যাশা জাগাবে, সেখানে আমি তোমার মুখ অঙ্কিত করলুম। যে অপেক্ষার মাটিতে ফলের জন্ম হবে, সেখানে আমি নাগাতে পারবো বাতাসের গুচ্ছগুচ্ছ উপহার। অভিভূত সন্তানদের সামনে; হে নারী, বিশুদ্ধ হোক এই নিস্তব্ধতা। মানুষের জন্ম হোক।

শালদা নদী

বেলাল চৌধুরী

গভীর রাতের ঘুম চিরে কালো কড়কড় শব্দে
নেচে ওঠে অর্ধস্ফুট চৈতন্যের প্রচ্ছন্ন অতলে
মেঘের থির বিজুরি—
সুমুখে দেখি খুলে যায় সটান
আঁকাবাঁকা স্মৃতিঘেরা অচেনা স্বর্গসোপান
অলীক শালদা নদী, ঘুঙুর পায়ে নীল ময়ূরী
না কি পাথুরে বালির দেশে অতর্কিত
ফণীমনসার ফুল ?
বাঁকাচোরা খরস্রোতা হাওয়ার ঘূর্ণী সঞ্চারে তীব্র নিখাদ,
থেকে থেকে বহে দমকা ঝড়ের প্রবল জোয়ার,
চন্দ্রাতুর শালদা নদী তখন কী গভীর, কী বিপুল
সাধে মরমিয়া গান মর্মের অধিক ব্যাপ্তি তার—
কাঁখালে জড়ানো পাছাপেড়ে রণরঙ্গিণী
ঘূর্ণিকাভঙ্গে
মৎস্যগন্ধা অভিসারে যেন অনন্ত বাসুকী ;
ধীরে বহে খলখল বালুময় রজত তরঙ্গরাশি।

পেরিয়ে মধ্যরাত দূরগামী স্বপ্নের ভৈরবনিনাদ
উঁকিঝুঁকিমারা ভরা চৈত্রের টালমাটাল শিমূল
বহে যায় ঝুপঝুপ পাড়ভাঙা দুরন্ত হিল্লোলে
সরব-গতির স্পন্দন আলোড়িত সুদূর শালদা নদীর গান।

ফল্‌স্‌টাফ

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

কেন যে এমন ভুল! তোমার আপন রাজ্যপাট
ছেড়েছুড়ে ছুটলে তুমি অকালকুষ্মাণ্ড যুবকের
সংকীর্ণ সত্তায়, ধর্মপরায়ণ বিশুদ্ধ বকের
সফেদ আশ্রমে— সদিচ্ছার সদাচারে জমজমাট।
ভালো কি লাগত ওই পুরুতের ধর্মগ্রন্থপাঠ,
আসত মাথায় ঢালা জর্দানের জল, যাজকের
কম্প্রকণ্ঠঅভিষিক্ত বিবাহিত প্রেম, ঘাতকের
নিপুণ সংহার, দেশ, দেশাচার, কৌটিল্যের হাট?

চলো ফিরে চলো সেই শাশ্বত ভুবন, হে ভুলের
অধীশ্বর, স্ফীতোদর, যৌবনের অজেয় পূজারী—
অনর্গল মিথ্যা দিয়ে গড়ো তুমি সত্যের বাগান।
খ্যাতি নয়, কীর্তি নয়, বিত্ত নয়— অনিরুদ্ধ প্রাণ,
অসতর্ক ভালোবাসা, ভবিতব্যহীন, স্বেচ্ছাচারী,
কড়া মদ, গাঢ় ঘুম, কুরুক্ষেত্রে গান বুলবুলির।

তার আছে

আসাদ চৌধুরী

তার আছে নিজস্ব যৌবন ; শৈশব কৈশোর নেই
ছিল না কখনো। আমরণ দারুণ যৌবন তাকে
জড়িয়ে রেখেছে, তাই যারা শিশু তারা তাকে দেখে
উঁচু-গ্রীবা, যেন এক সম্মানিত প্রধান পুরুষ।
সমানবয়সী যারা পায় তারা মোহন আশ্বাস
নিঃশ্বাসের বিশ্বাসের নিরাপদ নিবিড় বিশ্রাম।
নিজস্ব যৌবন নিয়ে তার না-না ঝক্কি ও ঝামেলা
বিধান, শৃঙ্খলা, রীতি ফুল তোলে তাহার রুমালে
কখনো বা জুতার কাঁটার মত গোপনে খোঁচায়
তবুও দাম্ভিক যুবা হাসিমুখে কবিতা শোনায়।

বৃদ্ধ লোক দেখে তাকে আপনার নিজস্ব অ্যালবামে।
দর্পিত যুবক তাই মুখ তার দর্পণে দেখে না।
মাঝে মাঝে ঝড় এসে তার চুল ঠিক ক'রে দেয়,
পাহাড়ের ঢেউগুলো যেন তার নরম বালিশ॥

অন্তর্ঘাতক

মুহম্মদ নূরুল হুদা

প্রত্যাখ্যাত
তোমার দুয়ার থেকে ফিরে আসি, বন্ধ করি
নিজের দুয়ার ;
আমারো বাড়ির পাশে নদী আছে, হাওয়া দেয়
সকাল-বিকাল, ডেকে বলি : এ বেলা
থামাও খেলা, অন্ত-চিন্তা আছে ;
শব্দময়ী, তা-হলে বিদায়।

আমার আরেক বন্ধু পদার্থবিজ্ঞানী,
তাকে বলি : বিভাজন করে দেখো
আমার শরীর ; আছে,
বেশুমার অণু আছে শরীরে আমার ;
দাও, গড়ে দাও
আমার শরীর থেকে একেকটি অণু তুলে নিয়ে
একেকটি তেজস্ক্রিয় বিস্ফোরকে
আমাকে সাজাও।
দেবো,
আমার শরীর-শুদ্ধ ছুঁড়ে দেবো দুয়ারে তোমার।

তোমার বিরুদ্ধে নই, না, আমি বিরোধ বুঝি না
'সর্বাংশে মানুষ'—শুধু এই ত্রুটি সারাতে পারি না।

ফুলের মতো ভঙ্গুরতা ফুটে আছে

শিহাব সরকার

নারীকে যতবার চিত্রধর্মী করে বানাতে চাই
থাকে না, শতখণ্ডে ভেঙে যায়
যেন ওর স্বভাবের চার দেয়ালে
ফুলের মতো ভঙ্গুরতা ফুটে আছে

কখনো শীতল আশ্রয়ের লোভে ছুটে যাই
নারী গম্ভীর পদ্মের ভেতর থেকে হাসে
কখনো শীর্ণকায়া ভিক্ষুণীর প্রায় দেখে ভাবি
এই তো আমার অসহ্য সুন্দর প্রতিমা!
থাকে না, হীরকচূর্ণের মতো ভেঙে যায়
যেন ওর স্বভাবের চার দেয়ালে
ফুলের মতো ভঙ্গুরতা ফুটে আছে

নারীও শিল্পের কথা বলে
একেক সন্ধ্যায় ওকে বড়ো মধুর বিষণ্ন দেখি
আমি যখন শৃঙ্গারে উদ্যত হই
ও স্বেচ্ছায় নগ্ন ঈশ্বরী হয়ে কাঁপে
তীব্র কবিতার মদে নিজেকে বিস্ময় ভেবে বলি
নারী, তুমি আরেকটু জ্যোৎস্নায়-জারিত হও
ঈষৎ দুঃখিত হও

থাকে না, রঙিন কাঁচের মতো ভেঙে যায়
যেন ওর স্বভাবের চার দেয়ালে
ফুলের মতো ভঙ্গুরতা ফুটে আছে
কেবল দুশ্চরিত্র অপবাদ নিয়ে
খণ্ডকবিতার পাশে পড়ে থাকি আমি

উৎসবপ্রাঙ্গণে প্রার্থনা

জাহিদুল হক

তুমি যেই হও তুমি কারো প্রিয় কিনা উৎসবপ্রাঙ্গণ জুড়ে তুমি কারো
আনন্দের উৎস কিনা, আজ শুধু ক্ষমা করে দাও। ওখানে অনেক দাহ—
ওরা শুধু ভুল করে সাজিয়েছে সমস্ত আঙিনা, বেঁধেছে ধানের গোলা
ঘরে-ঘরে, শস্যের প্রশস্ত ক্ষেত বহুদূরে ফেলে রেখে এসেছে এখানে—
ওরা শুধু জন্মের প্রকৃত কান্না কিন্নর সঙ্গীতগুলো আজ ভুলে গেছে।
ওখানে অনেক ভুল জড়ো হয়ে আছে ওখানে অনেক ব্যথা বিষকাঁটা
ঘৃণা ক্লেদ আর আমি : আমি মানে এ-উৎসবে প্রার্থনার উচ্চারণকারী,
এ-উৎসবে আনন্দের অংশীদার, দীর্ঘ স্থির গাঢ় এক হিম অন্ধকার—

হাত রাখো অপচয়ে আজ এই দুঃখে হাত রাখো, যেই হও তুমি কারো
এ আগুনে জল ঢালো, জল ঢেলে দাও। পুণ্যবান হাত দিয়ে স্পর্শ করো
এই পাপে, যে আমাকে মিথ্যে এক বোধিদ্রুম দেখিয়েছে জন্মের সকালে,
যে আমাকে ভুলিয়েছে বলে অভিমান ভুলে গেছি আমি মৃত্তিকার কাছে :
যেখানে শিশিরে ঘাসে মাখামাখি যেখানে বৃক্ষের মতো বেড়ে ওঠে শুধু
প্রেম, একজন অভিমানী কালো পুরোহিত। তুমি ওকে ডাকো এইখানে—
তুমি যেই হও তুমি কারো প্রিয় কিনা উৎসবপ্রাঙ্গণ জুড়ে তুমি কারো
দুঃখ অভিমান কিনা, আজ শুধু ক্ষমা চাই আজ শুধু ক্ষমা করে দাও।

স্বাভাবিক

মহম্মদ রফিক

আমরা প্রত্যেকে দেখো কেমন সময়ে অযাচিত
কাছাকাছি চলে আসি, প্রজাপতি এই ডাল থেকে
অন্য ডালে উড়ে যেতে পথিমধ্যে ক্রূর মানুষের
গুপ্ত হাতে ধরা পড়ে, অন্য কারো সমৃদ্ধ খাঁচায়
বন্দী পাখি ক্ষীণ স্বরে গান গায় পুচ্ছও নাচায়,
কে কাকে দুষবে বলো, এ-ই ঘটে, এ-ই স্বাভাবিক ;

সবকিছু গুছিয়ে ফেলতে হয়,— যে জাল মাছের খোঁজে খোঁজে
ব্যবহৃত সারাদিন রোদ্দুরে শুকোতে হয় তাকে,
বঁড়শি গুটিয়ে নিয়ে কৃতকার্য হও কি না হও
সন্ধ্যায় পুকুর ছেড়ে ফিরে যেতে হয় ভাঙা-মন
ব্যর্থতায় অন্ধকার এবড়ো-খেবড়ো গেঁয়োপথ,
হতোদ্যম-হুয়ে-পড়া পুরনো বাঁশের জীর্ণ-সাঁকো ;

অলৌকিক বলের পিছনে ক্লান্ত ধাবমান চির-শিশু-দল
বয়স বাড়ে না কারো, তবু চলে দুপুর গড়িয়ে
কখন বিকেল হবে, কতোক্ষণ আর ছোটাছুটি,
হঠাৎ ঝড়ের মেঘ ঈশানে নৈঋতে রুদ্ধশ্বাস ;
আমরা প্রত্যেকে দেখো, কাছাকাছি কেমন সময়ে,
এই ঘটে, ঘ'টে থাকে, সব-কিছু এ তো স্বাভাবিক ॥

মৃত্যু এক পুষ্পিত পথিক

মহাদেব সাহা

কোনো কোনো মুহূর্তে এই মৃত্যুও হয়ে ওঠে জীবনের গূঢ় অভিষেক
আরো গভীর বাঙ্ময়। সে মৃত্যু প্রার্থনা করি, সে মৃত্যু প্রণাম করে যাই
একদিকে তুমি, একদিকে মৃত্যুর মৌনতা যেন বৃক্ষের ছায়ায় আরো শুদ্ধ পুণ্যশীল
আলোর উপরে আরো কোনো অপার্থিব রোদ এসে
করে যায় সবুজ মার্জনা ;
দুধারে পথের পাশে নাম লিখে যাওয়া তো মূর্খতা
মানুষে পথিকে তবু জেনেশুনে রেখে যায় নিজস্ব নিশানা। তারা নিলামে ওঠেনি!
মৃত্যুর পরেও যাহা সুখ যাহা প্রাপ্য যাহা নিশ্চিত ভোগের
আমি হাসিমুখে রেখে যেতে পারি
তাহলে কি নিয়ে যাবো মৃত্যুই মৃত্যুতে ? আমি মূর্খ দৃঢ় শারীরিক
যদি মরি পৃথিবীরই সুখে মরে যাবো।

একদল কেশরফোলানো সিংহ, মহিষের ক্রূর কালো ঝাঁক
কিংবা কোনো তারও চেয়ে অজ্ঞাত অনাম্নী অতিশয়
সূর্যের ভিতরে আরো এক লক্ষ বাদামী অশ্বের ছুটোছুটি, ধুলো অন্ধকার
এভাবে মৃত্যু কি আসে রোগে কি অসুখে
কিংবা মরমী শয্যায়।
এর মধ্যে যেতে হবে কতোদূরে কতো কাছে কতোটা সংজ্ঞায়
আমি জানি সে দূরত্ব শুধু এই স্মৃতির অতীত আরো অশেষ অগাধ,
কখনো কখনো তাই বাস্তবিক ভয় পাই ঘর ছেড়ে তাঁবুতে লুকাই
বলি মৃত্যুতে যাবো না তার চেয়ে এসো খেলা করি
এসো মধ্যরাতে অজ্ঞাত রাস্তায়
নেমে কোলাকুলি করি, সে সময় মাথার উপরে আরো বৃষ্টি হবে
গাঢ় মমতায়
এইভাবে স্নান করে এইভাবে ঋণী হয়ে জন্মের দূরত্বে চলে যাবো।

এইখানে ধুলোস্পর্শী পৃথিবীর মায়া এসে পড়ে
অনন্ত সূর্যাস্ত দেখি কী প্রাচীন কী গভীর কমলালেবুর
মতো মধুর মায়াবী

এভাবে মৃত্যুকে দেখি তার সঙ্গে এভাবেই জানা এভাবেই মৃত্যুও আত্মীয়
আমাদের জানালার ধারে এসে কথা বলে যায়,
করে পরম আদর, অন্য কেউ যাকে ভাবে নিতান্ত অস্পৃশ্য
তাকে মৃত্যু শিশুর মতোই গালে মুখে চুমু খায়, ডাকে।
এমনও মুহূর্ত আসে এমনও তন্ময়
মধ্যরাতে ফুটপাতের অজ্ঞাত কংক্রিট তার চোখে ঝরে জল
ধীরে ধীরে কাছে আসে মৃত্যু এক পুষ্পিত পথিক।

দ্বি-মুখী চিতল ছায়া

হাবীবুল্লাহ সিরাজী

কে তার আপন হয়, নিদ্রাকালে পাশাপাশি রাত ?
কে তার আপন বলো, হরিদ্রাভ মেঘচূড় নারী ?
কে তার আপন থাকে, জ্যোৎস্নায় বেজে ওঠা বাঁশি ?
না, কেউ যেন কারো নয়,
রাত নয়
নারী নয়
বাঁশিও তো নয়—
মুগ্ধ এক স্মৃতিভূমি
আমাদের মগ্নলোকে
প্রবেশের পথ খুঁজে ছায়—
আর এই বুঝি রাত-নারী-বাঁশি মিলে
জীবনের চরম বিস্ময় !

কী এমন সুখ-পাখি, যার পাখা জানে না উড়াল !
কী এমন স্বপ্ন-ছায়া, যার মাপে নগরীর ছাদ !
কী এমন শব্দ-স্রোত, যার ফেনা রাখে শুদ্ধ-কাল !
না, কেউ কিছু নয়,
পাখি নয়
ছায়া নয়
স্রোত নয়—
মৌন নীল এক জলাশয়
খণ্ড খণ্ড ক'রে ফ্যালে জীবের হৃদয় ।

চন্দ্রের গ্রহণ থেকে যেই ছায়া আজো
উলোট-পালোট হয়ে জন ও জনকে
বর্ষণের শান্তিমত নামে পৃথিবীতে—
তার কিছু রশ্মি নয়,
নয় স্নিগ্ধ ঋবি-ঋদ্ধ সূর্যের সম্পাত ;
এক মুখে অন্য মুখ— জলে কাঁচ, কাঁচে কাঁচে জল
এপিঠ ঘুরিয়ে দিলে যেই আলো, ছায়া তার প্রগাঢ় চিতল ॥

ফিরে আসে যত্নে, অধঃপতনে, মৃত্যুতে আর মহিমায়

সানাউল হক খান

একজনের গড়পড়তা আয়ু তো ছাড়িয়ে এলাম।
পেছনপানে
তবু কেন ফেলে-আসা অধঃপতনের
আধ-ক্রোশ মাটিতে
এরকম অর্থহীন চেয়ে থাকা ?
যেটুকু মাড়ানো ভূমি জুড়ে জন্মেনি তৃণের মুখ,
ঠিক সেইখানে, মাটির অতল থেকে
অমরত্বের শিকড় ছোঁয়ার কেন অত সাধ ?
একজনের গড়পড়তা আয়ু তো ছাড়িয়েই এলাম !

এক-একবার মানুষের কাছে খুব, মৃত্যুময়, গিয়েছি পশু হয়ে
এক-একবার পশুর কাছে কোনো ধোয়া-মোছা পবিত্র মানুষ—
তবু কারো বরণভঙ্গি আমাকে দেয়নি তো কোনোদিন
মন-পোষা আনন্দের চেয়ে এতটুকু অধিক রহস্যময়তা :
যোজন যোজন চোখের ছায়া থেকে পেলাম না তো
নিজের জন্যে আলাদা রাখা সেই আদরের জলমণি—
যে আমাকে কাঁদাবে খুব শীতল মুখের যত্নে ! . . .

বহু দিবাভাগ কেটে গেছে আমার শুভরাশির দর্পে
বহুবার রাত্রিতে ফের, নিদ্রার ভেতর, লক্ষ মিথুনের নরম মমত্ববোধ,
অথচ শরীরের ভেতর আজো এক অমর শিহরণ
যৌবনের শ্রেষ্ঠ জাগরণ খোঁজে !

বহুদিন স্বেচ্ছায় কোনো কিছু না-পাওয়ার দীনতা নিয়েছি বুকে
বহুদিন স্বেচ্ছায় ছিলো অধিক প্রাপ্তির আকণ্ঠ আনন্দ
অথচ বয়স—কতোটুকু ইস্পাতের অহঙ্কার পেলো,
কে জানে প্রাণে তার কতটুকু প্রসন্নতা ?
অনেক বাস্তবতার সারকারামার মধ্যে
নিজেকে লেগেছে কোনো রশ্মিময় পতঙ্গের শোভা

আবার অনেক অবাস্তব নাটকের মানুষ আমাকে বলেছে
— চলো না বরং তার চে’ কজন মিলে
কুরু-পাণ্ডবের পাশা খেলি আরেকবার . . .
তবুও জীবনের কোনো পরম ভগ্নাংশ
আমার তাড়িত ক্ষয়ক্ষতির ভেতর দেয়নি তো অমর সৃজন
কেবলই চরিত্রের ভেতর কোনো বিশাল সিদ্ধ পুরুষ
বারবার ফিরে আসে যত্নে, অধঃপতনে, মৃত্যুতে আর মহিমায় . . .

পাবো তাকে

আবুল হাসান

চারা রুইয়ে দাও উজ্জ্বল শ্যামল চারা
হলুদ কপির শিশু, শীতকালে কোল দাও
ঘন কুয়াশার ভোর, চারা তোর বাড়ুক শোভায়।

জল বইয়ে দাও, ছায়া বর্ণময় ঘন জল
খরার কবলে হও সুশীতল মাটি মৌন মুরতি মঞ্জুষা
বীজ বাঁধো, মৃত্তিকায় সুন্দরের অতল যাত্রায়!

খনি খুলে যদি পাও গুচ্ছের গভীর সোনা, সূর্যের প্রসূন
তবে কেন খুলবে না খরা, জল, পাথুরে সম্বল?

যাও রুইয়ে দাও চারা, শিশুঘাস, বোধি, বুনো ফল
আমি প্রার্থী বসে আছি, পাই যদি শুভার্থী সফল!

যাবেন নাকি

আবু কায়সার

উপশহরের আড়ালে-আবডালেও ছিলো ফানুস
বানাতে জানা কারিগরের বাড়ি, খেলার বাগান
জাদুকরের তীক্ষ্ণ তাঁবু, কিউরিও শপ, এন্টিলোপের মাথা
মহিলা মর্দানার জন্যে ভিন্ন গোসলখানা—
সত্যি বলবো সুঠাম শয্যা, ছাপোষা ছারপোকা
আরশোলা ঝুলকালির চিহ্ন ছিলো না আশপাশে।

সে ছিলো এক নির্মীয়মান খেলামেলার শহর
ভাঁজখোলা মানচিত্র যেমন কাঠের খণ্ডে র‍্যাঁদা—
দুর্দশা শুওরের খোঁয়াড় দেখতে দেখতে পচা
চোখের জন্যে খুব জরুরি—অ্যাসিড ও চন্দনে
অমন সমন্বয় দেখিনি বানিয়ে বলবো না।
মারণউচাটনের শিল্প? মরা ঘোড়ার নিলাম?
সত্যি বলবো নেই সেখানে, প্রাতর্ভোজনকালীন
দেখিনি দুর্ভিক্ষে-পোড়া উদলা ও চোখবোজা
জেনানাদের
খবরকাগজজোড়া ছবি।—লক্ষ্মীমন্ত শহর।

উপশহরের ভিতরে থাকে ছোটমাপের মানুষ
ঘুড়ি ও লাটাইয়ের ব্যবসা ঝুটঝামেলা নাই
সেখানে আমি বেড়াতে গেলেই ইকেবানার কুশলী কন্যারা
হাসতে হাসতে শিকলবাঁধা কুকুরসহ গতর ঘেঁষে দাঁড়ায়।

উপশহরে যাবেন নাকি অপশহরের মানুষ!

আবহমানকাল

অসীম রায়

এক দীর্ঘস্থায়ী ঘুম বা এক দীর্ঘস্থায়ী স্বপ্নের মধ্য দিয়ে অনিন্দ্য হেঁটে চলেছে। মাঝে মাঝে এই স্বপ্নের অবাস্তবতায় অস্থিরতা বোধ করেনি এমন নয়। কিন্তু জাগ্রত জগতে প্রবেশ করবে কিভাবে? মেদিনীপুরের এ. ডি. এম হয়ে অথবা তার ছোড়দার মতো খবরের কাগজের চালিয়াৎ চন্দর হয়ে ডানা মেলবে? তাছাড়া জীবনবোধ আর জীবিকাবোধ—এ দুটো কথা হরদম মন্ত্রের মতো এমনভাবে সে আওড়াতে শুনেছে চারপাশে গত দু-তিন বছর যে বিপ্লবীর একটা নির্দিষ্ট জীবনের ছক তার চোখের সামনে সবসময় ভাসছে। সে ছকের বাইরে যাওয়া মানে শুধু বিপ্লব থেকে সরে যাওয়া নয়, তার মানে আত্মিক মৃত্যু। সে ছকের বাইরে যে জীবন সে সম্পর্কে টুটুলের কোন উৎসাহ নেই।

এমতাবস্থায় টুটুলকে যেতে হল কালনায় সারা পশ্চিমবাংলায় ছাত্র-শিক্ষক ধর্মঘট সংগঠনের অন্যতম নেতারূপে। স্টেশন থেকেই টিকটিকি পেছন নিল। একে টুটুলের পথঘাট অচেনা, তারপর নীল বুশশার্ট আর সানগ্লাস-পরা ঢেঙা টিকটিকিটার নজর এড়াতে গিয়ে একেবারে পথ হারিয়ে ফেলে। একটা মিষ্টির দোকানের সামনে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে খেয়াল হয় খিদে পেয়েছে। কোন চিন্তা না করে ঢুকে পড়ে। ঢুকতেই দেখলে তাদের কনট্যাক্টম্যান মদনবাবু সিঙাড়া খাচ্ছেন।

—আসুন আসুন, সারা সকাল বসে আছি।

বছর পঞ্চাশেক বয়স লোকটার, আগেও দু-একবার দেখেছে কলকাতায়। আশ্চর্য সজীব কিন্তু পিচুটিপড়া একজোড়া চোখে অনিন্দ্যর আপাদমস্তক পরীক্ষা করে লোকটা বললে,—স্ট্রাইক হচ্ছে?

—নিশ্চয়।

—এখানে অবস্থা ভাল নয়। একেবারে টেম্পো নেই।

—টেম্পো তুলতে হবে। নেই বলে থামলে চলে? টুটুল তার নতুন দায়িত্বে গম্‌গম্‌ করে।

বিকেলে স্কুল শেষ হওয়ার পর স্কুলেই টুটুল বক্তৃতা দেয়। একেবারে ঝড়ের মতো বলে। শুনতে বেশ লাগে। তার কচি দাড়ি, ঝাঁকড়া চুল, বড় বড় চোখ, হাত নাচানো—সমস্ত কিছু এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যে শ্রোতাদের ঠেলে দেয়। মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ, ব্যঙ্গ, শাণিত ফলার মতো ঝকমক করে। আর বাংলার ওপর চমৎকার দখল থাকায় টুটুল যেন কথার হাওয়ায় উড়তে থাকে।

এ সাফল্য খুব হালের। সাত-আট মাস আগেও সে বক্তৃতায় ছিল একেবারে আনাড়ি। বক্তৃতা দেওয়া ছিল তার কাছে কবিতা লেখার মতো, বেশ ভাবনা-চিন্তার ব্যাপার। তাতে তার জিভ জড়িয়ে যেত। তোতলামি বাড়তো, এমনকি বাক্যগুলো কোথায় শেষ হবে কি হবে না ভেবে বক্তৃতায় মাঝখানে তার আতঙ্ক উপস্থিত হত।

—তুই একেবারে টিপিক্যাল! তার রাজনৈতিক সহকর্মী ও এককালীন ছাত্রনেতা তপন প্রায়ই বলত তার বক্তৃতা শুনে।

—টিপিকাল মানে?

—টিপিকাল মানে টিপিকাল। মানে তুই একটা হোপলেস।

তপন ব্যাখ্যা করেনি কিন্তু টুটুলের বুঝে নিতে বেগ পেতে হয়নি। ঠেকে সে শিখেছে যে আত্মসচেতনতা নামক বস্তুটি একেবারে বিসর্জন দিতে না পারলে ভালো বক্তৃতা দেওয়া যায় না। বক্তৃতার মূল লক্ষ্য ভাবের আদানপ্রদান নয়; সেরকম আদানপ্রদান হতে পারে আলোচনায়, যদিও সেখানে পরস্পরের মধ্যে সেতুবন্ধন অনেক সময় ঘটে না। আসল বক্তৃতা মানে সম্মোহন সৃষ্টি, আত্মসচেতন হলে তা কখনও করা যায় না। তার নিজের সাম্প্রতিক বক্তৃতা, যা প্রচণ্ড তারিফ পেয়েছে, তা লোকপ্রমুখাৎ আক্ষরিক ভাবে তার কাছে হাজির হওয়ায় সে অবাক হয়েছিল। তাতে ভাষাভাবের যে ছিরিছিরি নেই এমন নয়, কিন্তু যে সমস্ত অসুবিধে সামনে আছে, যেগুলো না মিটলে একেবারেই এগোনো যাবে না, তার কোন নামগন্ধ নেই।

সন্ধেবেলা যে দোতলা বাড়ির পশ্চিমদিকের ঘরখানায় তার আস্তানা হয়েছিল সেখানে ছাত্রেরা এল দেখা করতে। ছ-সাতটি স্কুলের ছাত্র। সারা প্রদেশব্যাপী আসন্ন ধর্মঘট কিভাবে সকল করতে হবে, কিরকমভাবে গ্রুপ মিটিং-এর মাধ্যমে ধাপে ধাপে টেম্পো তুলতে হবে, তার প্রায় তারিখব্যাপী গ্রাফ তুলে ধরে ছাত্রদের চোখের সামনে।

—মিনমিন্ করে বললে চলবে না। যা বলবে জোর দিয়ে বলবে। সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের মুখে। তার বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন। সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত জোট বেঁধেছে কলে-কারখানায়, ক্ষেতেখামারে, কলেজ-স্কুল কমিটিতে। এরা আমাদের কী শেখাবে? কী পড়াবে? এদের কোনো আইডিয়াই নেই লেখাপড়া কাকে বলে।

ছেলেগুলি মন্ত্রমুগ্ধের মতো কথাগুলো শোনে। কারুর কারুর চোখ উৎসাহে জ্বলজ্বল করে। রুনু বলে ক্লাস টেনের ছেলেটি দলের নেতা। সে এতক্ষণ উসখুস করছিল কথা বলার জন্যে। টুটুলের শেষ কথায় সে লাফিয়ে উঠল।

—ঠিক বলেছেন কম্‌রেড। আমিও তো ঐ কথাই বলছি অঞ্জনকে। ও বুঝছে না।

নেড়ামাথা রোগা ছেলেটা বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে ছিল। তাকে দেখিয়ে রুনু বলে,—আমি অঞ্জনকে বলছি এ সমস্ত লেখাপড়ার কোন মানে নেই। কিন্তু ও বুঝবে না। ওর বাবা মারা গেছে কিনা। ও বলছে যে করেই হোক স্কুলের শেষ পরীক্ষাটা ওকে পাশ করতেই হবে, নইলে ওর ভাইবোনগুলো নাকি ভেসে যাবে। দেখুন দেখি!

রাগতভাবে তাকালে টুটুল ছেলেটির দিকে। ছেলেটি কুঁচকে যায়। সদ্য শোকের ছাপ মুখ থেকে এখনও মেলায় নি। টুটুলের দিকে চেয়ে তার চোখ ছলছল করে।

—ও কেমন ছেলে?

টুটুলের প্রশ্নে রুনু এক মুহূর্ত থমকায়। বলে,—ও ক্লাসে ফার্স্ট বয়। কিন্তু কম্‌রেড, আমাদের তো বেশী ক্যাডার নেই। ফার্স্ট বয় বলেই তো ওকে আমাদের আরও দরকার। এই শিক্ষা-ব্যবস্থার ভাঁওতামিটা আরও তুলে ধরবার পক্ষে···

হঠাৎ টুটুলের স্থিরদৃষ্টির দিকে চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে নেয় রুনু। বলে,—আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন।

—এ আর বুঝিয়ে বলবার কী আছে? যখন পার্টির ডাক আসে তখন ফার্স্ট বয় লাস্ট বয় বলে কিছু থাকে না, সব একাকার হয়ে যায়। তুমি তোমার মন শক্ত করো।

—আমাকে স্যার পরীক্ষাটা দিতে দিন, কাতর ভাবে ছেলেটি বললে।

আর তার গলায় আওয়াজে টুটুলের হঠাৎ মনে হল তার স্বপ্ন কিংবা ঘুমের জগৎ থেকে সে বেরিয়ে আসছে। অথবা তার জগৎটা নড়েচড়ে উঠল। তার সেই দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী ঘুমের দেয়ালে একটা বোমা ছুঁড়ে মারলে ছেলেটি।

—না না, পরীক্ষা দেবে না কেন? পরীক্ষা দেবে, কিন্তু তার মানে তো এ নয় যে পার্টি ছাড়তে হবে। পার্টিও করবে, পরীক্ষাও দেবে।

—হাতে সময় বড্ড কম।

—কার হাতে সময় বেশী? এরই মধ্যে সময় করে নিতে হবে।

—আপনি ওকে বলে দিন ষ্ট্রাইক পর্যন্ত পড়াশোনায় না ঢুকতে। রুনু যেন অঞ্জনের জবানবন্দী টুটুলের সামনেই মোসাবিদা করে ফেলতে চায়।

—সে তো নিশ্চয়! আগে ষ্ট্রাইক, তারপর পরীক্ষা।

সে রাত্তিরে অনেকক্ষণ টুটুলের ঘুম আসে না। এই ঘুমের আগের সময়টা তার নিজস্ব। তখন সে নিজের সাথে সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসে, ঠিক প্ল্যান করে কথা বলতে কিংবা ভাবতে চায় না। চোঙার সেই চালিয়াৎ মন্তব্যটা—জিভে কোন হাড় নেই—মাথার মধ্যে নড়েচড়ে ওঠে। কিন্তু নিজের কেরিয়ারের জন্যে সুবিধেমতো মনোরঞ্জনের চেষ্টা আর এই সারাদেশের জীবনমরণের সমস্যায় কিছু ধরতাই বুলির আশ্রয় গ্রহণ কি এক? দুটো আলাদা নিশ্চয়, কিন্তু একেবারে অমিল? কোথাও ভুল হচ্ছে তার নিজের জীবনে সেটা সে আঁচ করতে পারে কিন্তু ঘটনার প্রচণ্ড স্রোতে টুটুল ভেসে চলে। মাঝে মাঝে সে নিজেকে প্রশ্ন করে, চোঙার চাকরির মতো তার কাজও কি এক বিপ্লবের চাকরি যার কতগুলো ধারা আছে, পরিণতি আছে। দু বছর আগে একথা মনে হয় নি যখন জেলের তালা তারা ভাঙতে গিয়েছিল। এমন এক পবিত্র শিখার মতো বিপ্লব জলজল করে জ্বলে উঠেছিল যার জন্যে সব কিছু করা যায়। সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া চলে। কারণ দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল অন্ধকারে কুয়াশায় চাকার ধ্বনি; লাল নীল বাল্বে মোড়া বিপ্লবের ট্রাম এখনই এসে যাবে, তার শিস কানে আসছে। সেজন্যে তার মতো আরও কিছু তরুণ তরুণী প্রতীক্ষা করছে ট্রামস্টপে। কিন্তু এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গেছে, ঘাড় উঁচু করে চেয়ে থাকতে থাকতে ঘাড় টাটাচ্ছে। পরদিন সকালে আর-এক গ্রামে মিটিং করে মাঠ ভেঙে টুটুল দৌড়াচ্ছিল দূর স্টেশনে ট্রেন ধরবার জন্যে। সঙ্গে মদনবাবু তাঁর পিচুটিপড়া বড় বড় চোখ মেলে বললেন,—অতো ছুটবেন না, অতো ছুটবেন না। ঠিক পৌঁছে যাব।

কথাটা অদ্ভুতভাবে বাজতে থাকে টুটুলের কানে। সকালে শিশিরেভেজা আলুর ক্ষেতের ধার দিয়ে যখন সে ছুটছিল তখন চারপাশে মন্থর অথচ গতিময় জীবনযাত্রার সঙ্গে তার নিজের জীবনযাত্রার তুলনা করে তার জীবন একটু আজগুবি ঠেকে বৈ কি। মদনবাবু পেছন থেকে আবার চেঁচান,—অতো তাড়া কি কমরেড? এটা না হয় পরেরটা ধরিয়ে দেব। আর দুঘণ্টা পরে।

কিন্তু দূরে শীতের আকাশ জুড়ে ইঞ্জিনের হুইসিল বেজে ওঠে। দৌড়তে দৌড়তে নিজেকে জিজ্ঞাসা করে, সে কি পারবে না, তার বাল্যকাল যৌবন সঙ্গে নিয়ে আগামী কালে দৌড়ে যেতে, আরও চারপাশের জগতে প্রোথিত হয়ে অথচ তাতেই সীমাবদ্ধ না হয়ে?

মদনবাবুর আন্দাজ ঠিক। ট্রেনে ওঠার পরও ট্রেন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

—দেখলেন তো, টেম্‌পো উঠছে। চালিয়ে যান। কোন বাধাকেই গ্রাহ্য করবেন না। টুটুল তার মাথার চুল ঝাঁকিয়ে বললে।

দুই

তিন দিন পর কাটিয়াহাট বা কেটে। বসিরহাটে তপনের সঙ্গে বাস থেকে নেমে গরম সিঙাড়া খেয়ে ঘাটে এসে দাঁড়ায় টুটুল। শীতের রোদ্দুরে ঝকমক করে ইছামতীর জল, ওপারে আকাশের নীচে আখের খেত। খেয়ায় উঠে গলুইতে ছলছল জলের আওয়াজ শুনতে শুনতে টুটুলের মুন্সীগঞ্জের কথা মনে আসে।

—কী রে, কবিতাগুলো আবার মাথায় চাড়া দিচ্ছে বুঝি? তপন তার হলদেটে চ্যাপ্টা চোয়াল আর মোঙ্গোলীয় চোখ দুটোর ওপরে হাত রেখে বললে।

—হ্যাঁ, কবিতাগুলো আবার মাথা চাড়া দিচ্ছে।

ওপারে প্রায় মাইল পাঁচেক রাস্তা। হাঁটতে হাঁটতে গা ঘেমে ওঠে। ঝোলায় কম্বল থাকায় আরও ভারী লাগে। তপনের শরীরটা পাতলা, ছোটখাটো। কিন্তু সেও শ্যাওড়া গাছের ঘন ছায়া আসতেই দাঁড়িয়ে পড়ে। দুজনে থলি রেখে মাটিতে বসে। পাশ দিয়ে দুটো কাঁচাবাঁশভর্তি গরুর গাড়ি আওয়াজ করতে করতে বাঁক নিয়ে মিলিয়ে যায়। দুটো লোক গুড়ের নাগরী মাথায় এদিকে আসছিল। তারাও জিরোয় টুটুলদের পাশে বসে। বিড়ি খেতে খেতে নীচু গলায় আলাপ করে। টুটুল অনেকক্ষণ কান পেতে তাদের কথা বুঝতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। বোধহয় কোন অপঘাতে মৃত্যুর কথা তারা আলোচনা করছিল, কিন্তু তা সাপে কাটাও হতে পারে, বাঘে চাপাও হতে পারে। তপন হঠাৎ বলে উঠল,—কিগো, এখানে কিসান সভা আছে? তোমরা কিসান সভার লোক?

যেটা বেশী ঢ্যাঙা সে লোকটা দাঁড়িয়ে ওঠে। মাথায় টেড়ি ঠিকমতো পাততে পাততে বলে, —কী বলছো বাবু বুঝি না। আমরা গরিব লোক। লম্বা লম্বা পা ফেলে লোক দুটো মিলিয়ে যায়।

টুটুল সিগারেট ধরায়। সামনের ধানকাটা মাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে বলে,—আমার খুব লিখতে ইচ্ছে করে।

—তা লেখ, কে বারণ করছে? তুই এখন লিখলে নিশ্চয় রোম্যান্টিক কবিতা লিখবি না। আমাদের স্ট্রাগলের কথা যদি ভাল করে বলতে পারিস লোকে ঠিক অ্যাকসেপ্ট করবে।

টুটুল আত্মগত ভাবে বললে,—আমি ঠিক ঐ ধরনের কবিতার কথা বলছি না। ঐ রকম আগুনের-ফুলকি-ছিটানো কবিতা, ওগুলোর খুব দাম আছে। কিন্তু আমি চাই অন্যরকম লিখতে। এই আমার চার পাশের মানুষ পাল্টে যাচ্ছে। আমি চাই আমার সময়ের চেহারাটা তুলে ধরতে।

—তুই একেবারে টিপিকাল্‌। নে, তোর হেঁয়ালি রাখ। আরও দুমাইল যেতে হবে।

এক গা ঘেসে বাঁশঝাড়, বট আর কলাবাগানে ঘেরা গ্রামটায় তারা ঢুকল দুপুরে।

মাথাভর্তি চকচকে টাক আর প্রায় চোখের নীচ থেকে ঠাসাকালো দাড়িতে মুখ, হাঁটু অবধি হড়হড়ে কাদা, হাতে জাল—তায়েব আলি তাদের দিকে মুখ ফেরাতেই তার গন্নাকাটা ঠোঁটের ভেতর থেকে দুটো ঝকঝকে দাঁত তাদের সম্ভাষণ জানায়।

—জাল দিলাম আপনাদের জন্যি। শালারা এমন সেয়ান হয়েছেন। ঐ কয়েকটা ছোট মাছ। কতগুলো খলসে, ল্যাঠা, কুচো চিংড়ি, গুলে একটা ডালায়, এখনও কয়েকটা আঁকপাঁক করছে।

—খুব চলবে, খুব চলবে, টুটুল উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠল।

বাড়ির পেছনে ঘন আমবাগানে ঢাকা পুকুর, তিন ভাগ দামে ভরা। তপন চমৎকার কের্দানি দেখালে। ঝোলা থেকে চট করে গামছাখানা পরে নিয়ে চেটোয় সর্ষের তেল নিয়ে নাকের ফুটোয় মাথায় মেখে বুকেপিঠে চাপড়ে ঝপাং করে ঝাঁপ খেলে। একটু ইতস্তত করে টুটুলও তাকে অনুসরণ করলে। কনকনে ঠাণ্ডা স্থির জল যেন চাবুক মারল টুটুলকে। বিকেলে আবার স্থানীয় ইস্কুলে খড়ো চালের হলঘরে বক্তৃতা। আবার বক্তৃতার কল ছেড়ে দেয় টুটুল আর সেই বেগার্ত বাক্যের তোড়ে চারপাশের অন্যায়-অত্যাচার-তাড়িত মাস্টার মশাইরা ওলোট পালোট হন। অর্থনীতি থেকে রাজনীতি, এই পরীক্ষিত রাস্তায় টুটুলের অগ্রগতির সঙ্গে সবাই যে ঠিক তাল রাখতে পারে তা নয়। বিশেষ করে স্কুল-বোর্ডের টালবাহানা, দুর্নীতি, এগুলো যতোখানি বোধগম্য হয় ততোখানি এই সমস্ত ব্যাপারটা বর্তমান ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে কেন অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত সে কথাগুলো ততো পরিষ্কার হয় না। এবং এই রাজনৈতিক কাঠামটাকে যখন অবিলম্বে ভেঙে চুরমার করার জন্যে টুটুল আহ্বান জানায় তখন কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, নিজেদের মধ্যে নীচু গলায় আলাপের স্বরও আসে। টুটুল বুঝতে পারে না, বোধহয় তার জ্বর আসছে। কিন্তু বোধহয় সেজন্যও তার ভাষা আরও তীব্রতা পায়। মফঃস্বল কোর্টে যেমন দিগ্বিজয়ী ব্যারিস্টার বক্তৃতা করে হাকিমকে সুদ্ধ সমস্ত আদালতকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে তেমনি টুটুল রাজনৈতিকভাবে বিরোধী মাস্টারমশাইদের প্রবলভাবে আচ্ছন্ন করে। দারুণ উত্তেজনার মধ্যে মিটিং শেষ হয়। 'ইনক্লাব জিন্দাবাদে'র ধ্বনিতে বিকেলের বাতাস ভারী হয়ে ওঠে।

সন্ধের পর গ্রুপ মিটিং। সেখানেও বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ভারতবর্ষের শাসকশ্রেণীর চরিত্র এবং পার্টি-কর্মীদের কর্তব্য ইত্যাদি প্রশ্নে কথাবার্তা শেষ করে। এসব ক্ষেত্রে টুটুল একটা পদ্ধতি নেয় যেটা সে দেখেছে বেশ কার্যকরী। কোন জটিল প্রশ্নকে সে পাত্তা দেয় না। এমনকি প্রশ্নকর্তার বোধশক্তি সম্পর্কে সে সন্দেহ প্রকাশ করে। এ ব্যাপারটা সে তপনের কাছ থেকেই শিখেছে। কিন্তু এই গুরুমারা বিদ্যেয় সে এখন অনেক অগ্রসর। কারণ এসব বাদানুবাদ, সে লক্ষ করেছে, কোনো সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করে না শুধু ব্যাপারগুলো আরও ঘোলাটে করে তোলে। 'অতো বেশী বুঝবেন না, বেশী বোঝার অনেক বিপদ'—এই ধরনের কথার ঝাপটায় সে প্রতিপক্ষের আক্রমণ সামলাতে অভ্যস্ত। এবং দেখা যায় এভাবে মিটিং পরিচালনা করলে নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্যে আসতে সুবিধে হয়। সে সন্ধেবেলাও এক বয়স্ক এবং বিচক্ষণ মাস্টারমশাইকে বললে,—অতো বুঝতে চাইবেন না স্যর। দেশে আরও লোক আছে। বোঝার ব্যাপারটা তাদের উপরেও একটু ছেড়ে দিন।

টুটুলের এ ধরনের ইদানীং ব্যবহারে কেউ কেউ যে আহত হন নি তা নয়। এমন কি তপনও রাস্তায় নেমে তাকে সমঝিয়ে দিতে চেষ্টা করে।—তুই একটু বাড়াবাড়ি করছিস টুটুল। বোঝানোর দায়িত্বটাও তো আমাদের।

টুটুল জবাব দেয় না। অস্পষ্ট শীতের জ্যোৎস্নায় তারা পথ হাঁটে। তায়েব আলির বাড়ির প্রান্তদেশে কলার বনে চাঁদিনী ঝলমল করে। ঢুকতেই গোয়ালের সামনে তায়েব আলির মোষদুটোর পিঠ আলোয় চকচক করে। একসঙ্গে গোবর-চোনার আর গোয়ালের গায়েই ফুটন্ত শিউলিগাছটা থেকে গন্ধ আসে। ম্লান চাঁদনিতেও দেখা যায় শূন্য দাওয়ায় পাটের ফেঁসো উড়ে এসেছে। দাওয়ার নীচেই শুকনো ঝন্‌ঝনে পাটের গাঁট সাজানো আছে, লরির অপেক্ষায়। জ্যোৎস্নায় কাক ডাকে।

একটু লক্ষ করলে নজরে পড়ে চারপাঁচটা ছেলে দাওয়ায় এদিক ওদিক মুড়িঝুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। লণ্ঠন হাতে গোয়াল থেকে বেরিয়ে আসে তায়েব আলি। পা ধুয়েমুছে দাওয়ার কোনা থেকে কতগুলো ছালা এনে বিছিয়ে দেয়। নিজেও বসে।

—আপনাদের কাজ মিটল? কাল চলি যাবেন? তার কথায় খুলনার টান।

—হ্যাঁ, আর থেকে কী লাভ? টুটুল অন্ধকারে সিগারেট ধরায়।

—আপনাদের মনে হয় না কমরেড। আমরা যে জলকাদায় পড়ি আছি সারা বছর······কথাটা জড়িয়ে যায় তায়েব আলির। সমাজব্যবস্থার বিরাট ফারাকে তায়েব আলি আর অনিন্দ্য যে আলাদা, দুজনেই একই রাজনৈতিক পার্টির অংশ হলেও—তা তার আরও বেশী করে মনে পড়ে।

—তাতে কী! গাঁয়ে থাকতে গেলেই জলকাদায় থাকতে হয়। সারাদেশের লোকই থাকছে।

গন্নাকাটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সামনের দাঁত দুটো ঝলসায় তায়েব আলির।—সেই কথাটাই বলছি কমরেড। আমরা গাই গরু ক্ষেত খামার নিয়ে থাকি। আপনারা লালঝাণ্ডা নিয়ে এলেন আমাদের মধ্যি, তারপর চলি গেলেন। এই কথাই বলে গাঁয়ের লোক। বলে, ওরা কেউ থাকে না।

—থাকার দরকার হলে থাকবে। শহরে বসে তো আমরা ফুর্তি লুটছি না। সেখানেও অনেক কাজ।

—হ্যাঁ, তাই। দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনায় তায়েব আলির গলা।

—পাটের দর কেমন এবার? তপন ফস করে প্রশ্ন করে।

—গতবার কতো ছিল জানেন কমরেড? ঠিক কথার পিঠে তায়েব প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়।

—পাট তো এবার ভালই হয়েছে এদিকে? কথার মোড় ফেরাতে সচেষ্ট হয় টুটুল।

—ভাল হয়েই তো সর্বনাশ।

—সরকার থেকে দর বাঁধে নি?

—সে বাঁধলে কী হবে? আমরা তো সব দাদন খেয়ে বসি আছি। ঐ মোষ দুটোই কমরেড বাঁচালি আমাদের। ভাইডা মরল দুবছর আগে। ভাইয়ের বউডারে সাদি করলাম। ঐ শুয়ে আছে, ঐ দুটো ভাইয়ের ছেলে। ওরা দুধ দেয় বাড়ি-বাড়ি।

তায়েব আলি হঠাৎ চুপ করে যায়। চারদিকে নৈঃশব্দ্য তাকে যেন আঁকড়ে ধরছে মনে হয় টুটুলের। গোয়াল থেকে মোষ দুটোর নিঃশ্বাসের আওয়াজ আসে। এতক্ষণে পূর্ণিমার চাঁদ তায়েব

আলির নারকেলগাছটায় মাথায় এসে আটকে থাকে। ঠাণ্ডা বাড়ছে।

তায়েব আলির কথা বলতে ইচ্ছে করে—যেমন গাঁয়ের মানুষরা কথা বলে। কিন্তু এই সুদক্ষ তরুণ সহচর দুটির কাছে ঠিকমতো মুখ খুলতে না পেরে আঁকপাঁক করে। অন্ধকারে চাঁদনিতে যেমন জলের আওয়াজ আসে তেমনি গলগল ছলছল করে তায়েব বলতে থাকে,—কাকদ্বীপে ছিলাম কমরেড, কাকদ্বীপে। রহমত আলির বাড়ি, রহমত আমার চাচা। কী কাটাকাটি চলল কমরেড। জোতদাররা ভয়ে কাঁটা। বলে, ধান চাল আপনারা নিয়ে যান। কী জোশ কমরেড! হাজার লোক সড়কি নিয়ে ঝাণ্ডা নিয়ে চলছি আমরা। তেমনটি আর হবে না কমরেড।

—আবার হবে। আরও বড় করে হবে সারা দেশে। ঘুমে জড়ানো গলায় বলে টুটুল।

—নাঃ, সেটি আর হচ্ছি না। আপনারা বললেন, ধান পুড়াও। গোলাকে গোলা ধান দাউ দাউ করি জলল। আমার ভয় হল। আমরা গাঁয়ের লোক, জলকাদায় মানুষ। ধান আমাদের পেটের ছেলের মতো। আমি বারণ করলাম, চাচা বারণ করল। কে কথা শোনে। গোলাকে গোলা জলল। তারপর গাঁয়ের লোকরা বেঁকি বসল। যখন পুলিশ এল পুলিশের সঙ্গে ভিড়ল। আপনাদের ভয় করি কমরেড। আপনারা অনেক বুঝেন। আমাদের গাঁয়ের মানুষের কথাডা বুঝলেন না। আমরা ধানের জন্যি পেটাপিটি করি। রহমত চাচা মারলে পাঁচু মণ্ডলকে। শালা খুনীডারে শেষ করলি। কিন্তু সে রহমত চাচারে তোমরা জানো না। সে লড়াই করে আবার সবাইকে নিয়ে বাঁচে। রহমত চাচা খুব দিলদার লোক। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সে খবর নেয়। তোমরা রহমত চাচাকে বুঝলে না। সে এককালে লড়াই করেছে, এখন করে না······

—এখন গেঁজে গেছে, টুটুলের গলায় ঘুমের বদলে প্রবল অসহিষ্ণুতা।

—গেঁজি গেছে! গেঁজি গেছে! হঠাৎ হাত দুটো টুটুলের সামনে তুলে ভেঙায় তায়েব আলি। —আর তোমরা? তোমরা রাজপুত্তুররা?

—এটা কী হচ্ছে কমরেড? কিছু থাবারটাবার থাকে তো দিন। ঘুম পেয়ে গেছে।

তিন

টুটুল কিন্তু খেল না। পাহাড়ের-মতো-চুড়ো-করা মোটা-চালের ভাত আর রকমারি ছোট মাছের আকর্ষণীয় ঝাল পাতেই পড়ে থাকল। লণ্ঠনের আলোয় তার টসটসে লাল মুখচোখ দেখে তপন চমকে ওঠে—তোর যে জ্বর রে।

সে রাত্তিরে হেলে কেঁপে টুটুলের জ্বর এল। তায়েব আলি বিপদে পড়ল। বাড়িতে পুরনো ছেড়া কাঁথা কম্বল যা ছিল তা দিয়েও টুটুলের কাঁপা থামল না। তপন আন্দাজে টের পায়, বোধহয় ১০৫ ডিগ্রী জ্বর। তায়েব আলি সে রাত্তিরেই কলাপাতা কেটে টুটুলের মাথার রেখে জলের ঝারি দিতে থাকে। কিন্তু জ্বরের সঙ্গে ভুল বকা আর মাথাঝাঁকানো সমানে চলতে থাকে। তপন অবাক হয়ে শুনতে থাকে টুটুলের প্রলাপ; জিভে হাড় নেই শালা—জিভে হাড় নেই শালা···ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, ক্ষুদ্র প্রাণকে তুচ্ছ করবেন না ডাক্তারবাবু।

ভোরে তায়েব আলির সঙ্গে তপন পরামর্শ করে। টুটুল জ্বরে প্রায় অচৈতন্য। ভোর

থাকতেই তায়েব আলি তার মোষের গাড়িতে খড় বিছিয়ে বাখারির ওপর ছালা চাপিয়ে ছই বানায়। তারপর দুজনে পাঁজাকোলা করে তুলে টুটুলকে শুইয়ে দেয়। ইছামতীর ওপর নৌকায় বোধহয় নদীর হাওয়ায় টুটুলের জ্ঞান আসে। তায়েব সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। ওপারে বাসে কোণের সীটে টুটুলকে কোনরকমে বসিয়ে বাস ছাড়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকেছে। যাত্রীদের গুঞ্জনের মধ্যে তার হাত তুলে 'আবার আসবেন' চীৎকারে টুটুল তার লাল চোখ মেলে তাকিয়েই আবার চোখ বোঁজে।

শ্যামবাজারে পৌঁছে বাসের মধ্যেই বেহুঁশ টুটুলকে রেখে অনেক ছুটোছুটির পর কিভাবে ট্যাক্সি জোগাড় করে দুপুরে তাদের বালীগঞ্জের বাড়িতে তার সহকর্মীকে তপন এনে তুলল সে এক ইতিহাস।

নীচের তলা থেকে দক্ষিণ-ভারতীয় সঙ্গীতের আওয়াজ ভেসে আসে। কোনরকমে ধস্তাধস্তি করে আধো-অচেতন টুটুলকে দোতলায় তুলে হাঁফাতে হাঁফাতে তপন দেখে বুড়ীকে। বুড়ীর স্কুল আজ ছুটি। ম্যাটিনিতে এলিট সিনেমায় তার প্রিয় নায়ক রবার্ট টেলারের একখানা যুদ্ধের ছবি দেখবার তাল করছিল তার বন্ধু ডলুর সঙ্গে, ঠিক এমন-সময়ে এরকম দৃশ্যে সে হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে ওঠে। ভবনাথ শুয়ে ছিলেন। স্বর্ণসুন্দরীর চীৎকারে তিনিও বেরিয়ে এলেন। গত কয়েক বছরে চাঁদির টাক আরও বেড়েছে আর কানের পাশে কয়েকগাছি চুলে পাক ধরেছে। তাছাড়া বিশেষ টোল খায় নি তাঁর চেহারা।

—কী হয়েছে? তপনের দিকে অপ্রসন্নভাবে চেয়ে বললেন।

তপনের ছোটখাটো শরীর। পরিশ্রমে সে হাঁফাচ্ছিল। আস্তে আস্তে বললে,—আমাকে আগে এক গেলাস জল খাওয়ান।

ঢক ঢক করে সমস্ত জলটা খেয়ে তপন দাঁড়িয়ে উঠল। অপরিসীম ক্লান্তিতে হাই তুলে বললে, —কিছু না, জর। কাল সন্ধেবেলা জর এসেছে।

স্বর্ণসুন্দরী কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, তাঁর ছেলেকে সবাই মিলে মেরে ফেলল, বাপেও শাসন করল না, ইত্যাদি।

—ওকে শুইয়ে দাও, আমি ডাক্তার মুখার্জিকে ডাকছি। ভবনাথ নিজেই বেরিয়ে গেলেন।

তপনের অবস্থাটা অনেকটা সেইরকম অভিনেতার মতো যে তাল বুঝে রঙ্গমঞ্চ থেকে বেরিয়ে যাবার কায়দা রপ্ত করেনি। তাছাড়া সে নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। ভবানীপুরে প্রায় আদিগঙ্গার গায়ে যে জীর্ণ বাড়ির একতলায় সে তার ভাইবোন মা রেলের কেরানী বাবা অধিবাসী, তার সঙ্গে এই ঝকঝকে ছিমছাম মার্বেল মোজেইকের বাড়ির সামান্য সাদৃশ্য নেই। সবচেয়ে তার মেজাজ খারাপ হয় যখন প্রায় নাক চোখ লোমে ঢাকা রেশমী ধূসর বুড়ীর ছোট কুকুরটা এসে তার পা শুঁকতে থাকে। গলাটা যথাসম্ভব বিকট করে সে চেঁচিয়ে ওঠে,—আচ্ছা, আমি চলি। তারপর তড়বড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়।

মাঝখান থেকে বুড়ীর ম্যাটিনি শো ফেঁসে গেল।

যে দীর্ঘস্থায়ী স্বপ্নের মধ্যে টুটুল গত দু-তিন বছর ঘুরে বেড়িয়েছে সেই নতুন স্বপ্নের ভারতবর্ষে

অজন্তা ইলোরা তাজমহলের বিশেষ স্থান ছিল না, ছিল এক তীব্র উপলব্ধি আগামীকালের ঐশ্বর্যের, যে কালের নায়ক তায়েব আলি, কলকাতার শহরতলীর বস্তিতে কেরোসিন আর চালের জন্যে রেশান দোকানের সামনে দাঁড়ানো কাতার-দেওয়া মানুষ। এমনকি সে জগতে তার শৈশবে রানাঘাটের মাঠ, মুন্সীগঞ্জে ষ্টিমারের গলুইয়ে জলের তুবড়ি, সদ্য কলকাতায় আসা নির্জন ঢাকুরিয়া লেকের দুপুরে "গল্পগুচ্ছের" জগৎ—এগুলো সমস্তই অনুপস্থিত। এর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষার তীব্র ব্যঞ্জনা যা তার কৈশোরশেষে ঝলমল করে উঠেছিল কয়েকটা কবিতায় তাও নিভন্ত। অন্ধকার থেকে তায়েব আলিরা উঠে আসছে, মাটি কাঁপছে, পদধ্বনি প্রতিধ্বনিত আর সেই চরম লগ্ন ত্বরান্বিত করার জন্যে সে সমস্ত আত্মবিস্মৃতির ঝুঁকি নিয়ে পার্টিতে এসেছে, পার্টি তাকে পুনর্জন্ম দিয়েছে। এখানে কোন বিচারের ব্যাপার নেই, ঘটনার বিশ্লেষণ অবান্তর। ঘটনার বিশ্লেষণ করে ক্লীবে পরিণত হওয়ার একচেটিয়া অধিকার তো চোঙাদের। আসলে সব কিছু উল্টেপাল্টে দেবার জন্যে তৈরী হতে হবে। এই বিশাল নৈর্ব্যক্তিক স্বপ্নে বাংলাদেশের আরও অনেক ছেলেমেয়েদের মতো টুটুলও বিভোর হয়েছিল।

ঘুম ভাঙল বিরাট শারীরিক অবসন্নতায়। গত দু-তিন দিন বেহুঁশ অবস্থায় কেটেছে। বসিরহাট থেকে ফেরার পর জ্বর ছেড়ে গিয়েছিল কিন্তু তলপেটে কব্জিতে মুসুরির ডালের মতো লালচে ঘামাচি দেখা দিল। জ্বর ছাড়বার পর চলন্ত বাসে পা তুলতে গিয়ে কাদায় পড়ল দ্বিতীয় পা-টা ঠিক সময় না ওঠায়। কণ্ডাক্টরের দোষ নেই, টুটুল টলমল করে হাঁটছে। সেইভাবে হাঁটতে হাঁটতে বাজারের পাশে ডাক্তার মুখার্জির ডিসপেন্সারিতে গিয়ে উঠল।

ডাক্তারবাবুর বাইরের ঘরে অনেক রুগী। বছর পঞ্চাশেকের এক কালোকুচকুচে ভদ্রলোক তাঁকে বলছিলেন,—মনে করবেন না স্যর, বিনে পয়সায় চিকিৎসে করাচ্ছি। আই হেট্ ইট। শরীরের খাঁচাখানা বিশাল কিন্তু এখন কেমন চামড়া কুঁচকে ঢলঢলে দেখাচ্ছে। আপনাকে আমি খুশি করে দেব। খালি এই পেটের ব্যথাটা।

ডাক্তার মুখার্জীর তাঁর হিটলারি সাদা গোঁফ আর মায়াবী চোখ মেলে একমুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন। আস্তে আস্তে বললেন,—পয়সা দিলেই সব রোগ সারে?

—কেন সারবে না? মেডিকেল সায়েন্স এত অ্যাডভান্সড হয়েছে এতদিকে। আমাদের দেশ কি সব ব্যাপারে ব্যাকওয়ার্ড হয়ে থাকবে?

—মানুষের শরীরের মতো এমন অদ্ভুত জিনিস কিছু নেই। এই আছি…এই নাই। প্রেসক্রিপশান লিখতে লিখতে ডাক্তার মুখার্জী বললেন।

ভদ্রলোক অসোয়াস্তিতে ছলবল করে উঠলেন,—আপনি তো মশাই বড্ড ডিপ্রেস্ করে দিতে পারেন। ডাক্তারের আসল কাজ রোগীদের উৎসাহ দেওয়া।

—মিথ্যে কথা বলা নয়, ডাক্তারবাবু কঠিনভাবে বললেন।

তারপর হঠাৎ মুখ ঘুরাতেই টুটুলের দিকে তাঁর নজর পড়ল। টুটুল তার টলমলে শরীরটা কোনরকমে চেয়ারের সঙ্গে আঁকড়ে দাঁড়িয়ে।

—কী, বিপ্লব শেষ হল? বলে ভাল করে তাকিয়েই চোখ কুঁচকালেন ডাক্তারবাবু।—কী

হল ? আবার জ্বর এল নাকি ! আমাকে বললেই তো আমি যেতাম।

—ডাক্তারবাবু উঠে টুটুলকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দেন। হাত ছাড়তেই কব্জি চোখে পড়ে। কব্জির ঠিক ওপরেই তিন-চারটে মুসুরির দানা। টুটুলকে শুইয়ে দিয়ে টর্চ ফেলেন তলপেটে। খুব বেশী নয়, সেখানেও কয়েকটা রক্তাভ মুসুরির দানা। গায়ে জ্বর নেই।

—আমার মাড়িটা একবার দেখুন তো ডাক্তারবাবু, বোধহয় দাঁতে ব্যথা। টুটুল হাঁ করে। আবার আলো ফেলেন ডাক্তারবাবু, দুপাটি মাড়ি ফুলে ঢোল। ঠোঁট টানতেই দেখা যায় সরু সরু লাল সুতোর মতো রক্তের ধারা।

—থুতু ফেলো।

টুটুল টলমল করতে করতে উঠে থুতু ফেলে। সাদা ধবধবে বেসিনে রক্তের বাহারে বৈপরীত্য চোখ ধাঁধায়। বয়স্ক ভদ্রলোকটির চীৎকার কানে আসে টুটুলের।

—এ যে গ্যালপিং টি বি মশাই ! কী কাণ্ড !

—থামুন ! টিবি মানে কী জানেন ? রক্ত পড়লেই টিবি, না ? চাপা রাগে থমথমে ডাক্তার মুখার্জীর গলা ভেসে আসে।

—আমরা কী জানি মশাই। আমরা লেম্যান।

—এই লেম্যানদের নিয়েই তো মুশকিল। আপনার নিজের সম্পর্কেই তো কিছু জানেন না। কিছু জানেন ?

—আপনি মশাই বড্ড ডিপ্রেস্‌ড্ করে দিচ্ছেন। আই হ্যাভ মানি। আপনাকে হয়তো বলিনি, আসানসোলে দুটো সিনেমা হলের প্রোপ্রাইটার আমি।

—তাতে কী ?

ভদ্রলোক হঠাৎ করুণ ভাবে হাসেন। মানে, আমি কী বলতে চাচ্ছি জানেন, আমি ঠিক নক্‌রাছকরা নই। বাবা ছিলেন হেডপণ্ডিত, প্রাইমারি স্কুলের মশাই। নেংটাপোঁদে মানুষ হয়েছি। এখন দুটো সিনেমা হল। তাছাড়া চারটে লরি চালাই। বাসের পারমিট পেয়েছি। সব ব্যাপার শুর মানেজ করেছি। এই খালি পেটের ব্যথাটা। বছর দেড়েক হল ট্রাবল দিচ্ছে।…আপনি যা চান আমি তাই দেব।

ভদ্রলোকের কথা শুনতে শুনতে ডাক্তার মুখার্জীর চোখ আরও আয়ত কোমল দেখায়। তিনি যেন আরও কিছু শুনতে পাচ্ছেন যা তাঁর গত তিরিশ বছরের জীবননাট্যে বারবার শুনতে পেয়েছেন। বাস্তবিক মৃত্যু মানুষের এত কাছাকাছি, এত অঙ্গাঙ্গী এবং এত সহজে বিস্মৃত এই সত্য যে মাঝে মাঝে তাঁর নিজের অধীত বিদ্যাটা ঝাঁকি দিয়ে তার অস্তিত্ব প্রমাণ করবার ইচ্ছে হয় তাঁর।

—কিছু ব্যাপার না, একটু অক্ষিদে, একটু ব্যথা…

—বুঝেছি।

—এখন সায়েন্স তো অনেক অ্যাডভান্স করেছে। যদি বিদেশ থেকে ওষুধ আনতে বলেন তাতেও রাজী আছি। ডাক্তারবাবু ক্লান্তভাবে আঁচড় কাটতে থাকেন। তারপর কাগজটা সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে বলেন,—এখানে একবার দেখান।

টুটুল আগেও আর্তনাদ শুনেছে কিন্তু এমন প্রবল জান্তব আর্তনাদ শোনে নি। 'এ কী এ কী!' এদুটো কথা যেন ভদ্রলোকের পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে।—ক্যান্সার ইন্সটিটিউট! আপনি ভুল করছেন ডাক্তারবাবু। গ্রেট ব্লাণ্ডার, গ্রেট ব্লাণ্ডার! এই জন্যেই আমাদের দেশে কিছু হয় না।

শান্ত ধীর গলায় ডাক্তারবাবু বলেন,—আপনি ওখানে গিয়ে একবার চেক করুন। আর আমি তো কিছু বলছি না।

—আমি তো বললাম, আই ক্যান সে। বিলিভ মি, আপনাকে আমি বিশ্বাস করি। ওসব ঝামেলায় কেন পাঠাচ্ছেন? যদি ফরেন থেকে ওষুধ আনতে হয়...

আবার হিটলারী গোঁফের ওপর আয়ত কোমল বিপদেভরা চোখ দুটো মেলে চেয়ে থাকেন ডাক্তারবাবু।—ঠিক আছে, আমিই চিকিৎসা করব, কিন্তু একবার চেক্ করিয়ে আসুন।

ভদ্রলোক মোটা মোটা আঙুল দিয়ে একখাবলা নোট বার করেন। সেগুলো থেকে আটটা একটাকার নোট বার করতে গুলিয়ে ফেলেন। আবার গোনেন। টাকাটা টেবিলের ওপর রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। আধ-ঘুমন্ত টুটুলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন,—কেস্‌টা কী ডাক্তারবাবু? অবশ্য আমরা লেম্যান্, আমরা কী বুঝি!

—এর কেস্‌টা মনে হচ্ছে জটিল। টিবিফিবি নয়। ব্লাডের অসুখ।

—লিউকোমিয়া?

—আপনি যান তো মশাই! আমার সময়ের দাম আছে। যান, যা বলেছি তাই করুন।

ভদ্রলোক আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,—আমরা কী জানি মশাই, আমরা তো লেম্যান্।

বোধহয় আসানসোলের এই বয়স্ক ভদ্রলোকটি ডাক্তারবাবুটির সঙ্গে এক নতুন বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চান যে মৈত্রী শুধু পয়সায় লভ্য নয়। সেইজন্যেই বেচারী আর একটুক্ষণ থাকতে চাইছিলেন। আর এক বেজারভাবও তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল প্রথম ভয়ের ধাক্কাটা কাটার পর। যেমন সিনেমা-মাদকদের কিংবা ক্রীড়ামাদকদের হয়ে থাকে। অর্থাৎ ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদে জলে লাইনে দাঁড়িয়ে ঠিক যখন টিকিট কাউণ্টার মুখোমুখী, যখন সমস্ত পৃথিবী পায়ের তলায়, সব কেল্লা ফতে, ঠিক সেই সময় নিঃশেষিত টিকিটের দরুন ঝাঁপি বন্ধ। হঠাৎ চোখের সামনে তাঁর জীবনটা বন্ধ হয়ে গেল যখন সবেমাত্র আরও দুটো বাসের পারমিট পাওয়া গেছে।

ভদ্রলোক চৌকাঠ পেরোতেই ডাক্তার মুখার্জী চাপা গলায় বলেন,—পুওর ফেলো, হি উইল লাস্ট অ্যানাদার মান্থ। তারপর স্বগতোক্তি করে চলেন,—আই হেট্ দিজ পিপল্—দিজ সবজান্তাস্! এরা কী মনে করে কী? পয়সা আছে বলে, ক্ষমতা আছে বলে, সব উল্টেপাল্টে দেবে? আর এই সায়েন্স, সায়েন্স! সায়েন্স মানে তো বিনয়, ধৈর্য, সাহস! ফিসিওলজিতে রেকর্ড মার্ক ছিল, বুঝলে টুটুল। পেট খুললেই আমি বিস্ময়ে অভিভূত হতাম—লাইক এ চাইল্ড। মানুষের এই শরীর আর আকাশের এই গ্রহতারকা! একেবারে এক, জানো টুটুল, একেবারে এক! আমরা কতটুকু জানি? অ্যান্টিবায়টিকস্, আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং? কোয়াইট রাইট্। বিজ্ঞানের মস্ত পদক্ষেপ। কিন্তু তার মানে কী? আমরা ভাবব কেল্লা ফতে? অসম্ভব। সোজা রাস্তায় চলেছে, ঠিক হ্যায়। একটু বেঁকেছো কি মরেছো! তখন ব্লাড টেস্ট, ইঞ্জেক্‌শান, এক্সরে, ঘন ঘন ওষুধ পাল্টানো।

টুটুলের দিকে চোখ পড়তেই তাঁর বক্তৃতা বন্ধ হয়ে যায়। নাড়া দিয়ে জাগাতে হয়।—আমার কথা বুঝতে পারছো ? দুটো ইঞ্জেকশান দেব।

—দিন, ঘুমের মধ্যে থেকে টুটুলের জবাব আসে।

একটা ভিটামিন সি আর একটা লিভার এক্সট্রাক্ট ইঞ্জেকশান দেন ডাক্তারবাবু। দিতে দিতে বিড়বিড় করেন,—হেমারেজ স্টার্ট করেছে। থি্রডেজ অ্যাণ্ড দেন ?

ডাক্তারবাবু চাকরকে ডেকে গাড়ি বার করলেন। আপত্তি সত্ত্বেও টলন্ত টুটুলকে গাড়ি তুলে বাড়ি নিয়ে এলেন। বাড়ি এলে টুটুলকে নিয়ে একটা কনফারেন্স বসে গেল। স্বর্ণসুন্দরী ফোন করে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি তাঁর এই সর্বনাশের কথা জানালেন। তাঁকে সমবেদনা জানাবার জন্যে দলে দঙ্গলে আসতে আরম্ভ করলে সবাই। লুচির গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠল।

—দুধ খাওয়ান, ছেলেকে যদি বাঁচাতে চান, খাঁটি দুধ খাওয়ান বেশী করে। ডাক্তারবাবু বলে গেছিলেন।

স্বর্ণসুন্দরী সমস্ত পাড়ায় জাল ফেলে দুধ ধরলেন অতিরিক্ত দরে। তাঁর সমস্ত কর্মক্ষমতা টুটুলের অসুখকে কেন্দ্র করে আবার গমগমিয়ে উঠল। অনেক বছর পরেও অনেক চেষ্টা করেও এই সময়ের স্মৃতি ফিরে পায়নি টুটুল। শুধু কাটাকাটা কথা, খাটের বাজুতে পারিবারিক মুখ, হঠাৎ বিকেল আর সন্ধের মাঝামাঝি যখন বারান্দায় ফাঁক দিয়ে অনেক দূরে রক্তাভ আকাশের পটে তেতালা বাড়ির জলের ট্যাঙ্ক আর একটি নিঃসঙ্গ বাঁশের ডগায় লটকানো ঘুড়ির দৃশ্যের ওপর চোখ খুলতেই দৃষ্টি পড়ে টুটুলের ঠিক সেই সময় সে আবিষ্কার করে ভবনাথ খাটের বাজু ধরে কাঁদছেন নিঃশব্দে। টুটুল সান্ত্বনা দেবার চেষ্টায় বুঝতে পারে তার মুখ আটকানো, দুদিন ধরে অসাড়ে রক্ত পড়েছে, দাঁতের গোড়া দিয়ে, সকাল থেকে নাক দিয়েও পড়ছে। টুটুল পরে জেনেছিল, সকালে আবার ব্লাড টেস্ট হয়েছে, ব্লাড ট্রান্সমিউশ্যানের কথা চলছে। আটচল্লিশ ঘণ্টা পরেও রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়নি। এসব কথা সে অনেক পরে জেনেছিল, প্রায় তিন সপ্তাহ পরে যখন সে অনেকটা সুস্থ। কিন্তু তার মাড়ি মুখ অসম্ভব ফোলা। আর বুড়ী সবসময় তার মুখের ওপর। ফিডিং কাপের নল থেকে তরল দুধ গলায় যাবার স্মৃতিটা তার প্রবল। কিন্তু কথা বলার কোনো উপায় ছিল না। রক্তের চাপড়ায় দাঁত মাড়ি ঢাকা পড়েছে। সন্ধেবেলায় চৌষট্টি টাকার ডাক্তার এলেন—সেইরকম ঝকঝকে ব্যক্তিত্ব যাঁদের গা থেকে করকরে নোটের আওয়াজ ওঠে, আত্মবিশ্বাসের সুরবাহার গলায়। সবে পঞ্চাশ পেরোনো ছোকরা—প্রৌঢ় পাতলা গড়নের ভদ্রলোকটি দুদিকে হাত ছড়ানো টুটুলের দিকে চেয়ে বললেন,—কী হে, একেবারে যীশুখ্রীষ্ট হয়ে গেছো। কোনো ভয় নেই। ঠিক আছে। মাস্টারমশাই আছেন, ভয় কী ?

ডাক্তার মুখার্জীর চিকিৎসাই পুরোপুরি বজায় রেখে কয়েকটা ওষুধ এদিক ওদিক করে দিলেন। পরের দিন রক্তক্ষরণের বেগ ক্রমশ কমে এল। টুটুলের পাশে রাখা প্যান অপেক্ষাকৃত কম রক্তাভ। ডাক্তারবাবু প্রথম দিন থেকেই যা বলে এসেছেন তাই দাঁড়াল ব্লাড রিপোর্টে। রক্তের এক বিশেষ কণিকা দুলাখের বদলে পঞ্চাশ হাজারে দাঁড়িয়েছে। আর চব্বিশ ঘণ্টা রক্তক্ষরণ হলে টুটুলের পরলোকপ্রাপ্তি আশ্চর্য ছিল না।

খুব ধীরে ধীরে আরোগ্যের পথে যাত্রা। আর এ যাত্রায় তার সর্বক্ষণ সঙ্গী ছিল বুড়ী।

সমস্ত ব্যাপারে থাকলেও কোন এক বিশেষ ব্যাপারের খুঁটিনাটির সঙ্গে একনাগাড়ে লেগে থাকার ধৈর্য স্বর্ণসুন্দরীর নেই। বিশেষ করে যেসব ব্যাপারে হাঁকডাক নেই উত্তেজনা নেই, সেই নিস্তরঙ্গ রুটিনে সময়ের জল কেটে কেটে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। বুড়ী কিন্তু এ ব্যাপারে মায়ের উল্টো। হাঁকডাকের মধ্যে সে নেই, উত্তেজনা তাকে সিঁটোয়। টুটুলের পার্টির ব্যাপার চেঁচামেচি হট্টগোল, পুলিসের লাঠির বাড়ি তাকে খুব অভিভূত করেনি। এ যেন চারপাশের কোরাসের অঙ্গ, তার ভাইও এ কোরাসে যোগ দিয়েছে। কিন্তু তার রক্তের এই গুণগত পরিবর্তন, এই নিঃশব্দ অন্তর্লীন বিপ্লব, তাকে আকর্ষণ করে। এই জীবনমৃত্যুর দোলায় সে শুধু টুটুলকেই দেখে নি, টুটুলের সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের বাল্যকাল, জলপাইগুড়িতে প্রাইভেট টিউটারের সঙ্গে প্রথম প্রেম, বলতে গেলে গত দশ-পনেরোটা বছর উথলে উঠেছে। ঘড়ি ধরে প্রত্যেক ওষুধ খাওয়ানো, ফিডিং কাপে ঘন ঘন দুধ, স্প্রে করে পেনিসিলিনের ধারায় মুখের ভেতর সাফ, গা মোছানো, জামা পাল্টানো, সবকিছু সে প্রায় একাই করেছে। কারণ যখন ফাঁড়া কেটেছে, যখন হাড়ের আঙুলে মৃত্যু আর কড়া নাড়ছে না, তখন স্বর্ণসুন্দরী তাঁর স্বাভাবিক হাঁকডাকের সংসারে ফিরে গেছেন।

একুশ দিন পর বিশাল দাড়ি ফেলতেই একেবারে অন্যমুখ বেরিয়ে এল টুটুলের। ছোট তীক্ষ্ণ তরুণ মুখখানা আয়নায় দেখে নিজেই অবাক হল।

—একেবারে চিনতে পারছি না, বুড়ীকে বললে।

—হ্যাঁ, তুই একেবারে নতুন। নতুন করে ভাব।

—বুঝেছি। ডলুকে ছেড়ে এখন বুঝি···

বুড়ী জবাব দেয় না, তার ঠোঁটের দুপাশে চাপা কৌতুকের রেখা।

—আন্দাজে ঢিল মারছিস ?

—আন্দাজ প্রায় সময় লেগে যায়। যেমন ধর ডলু। তোর ওকে বেশ খানিকটা পছন্দ, কিন্তু ডলুর মা, ওর বাড়ি, তোর অপছন্দ। ঠিক কিনা ?

—বেশ জ্যেঠামশাইয়ের মতো কথা বলছিস টুটুল। অবশ্য তুই ছেলেবেলা থেকেই জ্যাঠা। রানাঘাটে তোর চীৎকার এখনও ভুলিনি—ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, ক্ষুদ্রপ্রাণকে তুচ্ছ করবেন না।

চুপ করে থেকে বলে একটু সতর্কভাবে—জানিস টুটুল তোকে বুঝি না, চোঙাকে অনেকটা বুঝি। চোঙা রিয়ালিস্ট। ও যা চায় সে সম্পর্কে স্পষ্ট একটা ধারণা আছে। কিন্তু তোর কমিউনিজম, তোর কবিতা, সত্যি বলছি, আমার কাছে বড্ড ধোঁয়াটে লাগে। চোঙা আর তুই একেবারে আলাদা। চোঙা ভাবছে যাকে বিয়ে করবে তাকে ভালবাসার জন্যে নয়, এটা আমি জানি। চোঙা বিয়ে করছে তার কেরিয়ারের জন্যে। চোঙা আরও উঠতে চায়, ও আরও উঠবে। কিন্তু তোকে একদম বুঝি না। তুই যে কখনও বিয়েথাওয়া করবি, সংসার করবি, চাকরিবাকরি করবি, আর পাঁচটা মানুষের মতো ঘুরে বেড়াবি—মনেই হয় না।

—দিদি, তুই বড্ড পিসীমাদের মতো কথা বলছিস।

—আমি জানি, তুই এইরকম বলবি। কিন্তু সবাই তো ঠেকে শেখে। বাবার দেখছিস তো ?

—এই দেখলি। একেবারে পিসীমাদের মতো। ওসব বাবা মা আমাকে কেন বলছিস ?

ওরকম বলা একটা রেওয়াজ। আসলে ব্যাপারটা মোটেই ইকনমিক নয়। আমাদের সংসার মোটামুটি সচ্ছল। আমি বড় চাকরি করি না-করি, তাতে কিছু আসবে না। বাবার পেনশানের টাকা আর বাড়িভাড়া···

—টুটুল, তুই আরও একটু অন্যরকম হলে পারিস। এই একধরনের মেকানিকাল কথা আমাকে শোনাস না। সত্যি করে বল তো কী চাস? তুই যে একটা কট্টর নেতা হবি, অ্যাসেমব্লি পার্লামেণ্টে চেঁচামেচি করবি সেরকম তো মনে হয় না।···আর তাছাড়া তোদের তো শুনছি সব আবার ওলোটপালোট হয়ে গেল। সশস্ত্র সংগ্রামটা মুলতুবি থাকল শুনছি?

—তুই তো সব খবরই রাখিস। আমি এটুকু বলতে পারি, যেরকম চলছি সেরকমই চলব। নেতা হব না।

—তুই বিলেত চলে যা টুটুল। আবার নতুন করে একটা জীবন শুরু কর।

টুটুল হেসে বললে,—সেটা এই কলকাতায় বসে হয় না? আমি তো তাই চাই। আবার নতুন করে শুরু। কিন্তু বিলেত আমেরিকা গিয়ে নয়, কোনো বাঁকাপথে সটকানো নয়।···আমি এখানেই থাকব। এই স্লোগান চেঁচামেচি ধুলো ধোঁয়া পুলিশের সঙ্গে লাঠালাঠি, এই ট্রামে বাসে অবিশ্রাম ঝগড়া—এখান থেকে নড়ব না। এই দেশ, এই মানুষ—এখানেই খাড়া দাঁড়িয়ে থাকব।

—কী জানি! বুড়ী দীর্ঘশ্বাস ফেলে,—তোর বোধহয় খুব সাহস। কিন্তু আসলে হয়তো তুই বোকা।

—হয়তো! টুটুলের অস্ফুট জবাব আসে।

[ক্রমশঃ]

অসীম ধারার কূলে

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে তিনটি উক্তি স্মরণ করে এই আলোচনার মুখপাত করা যাক। একটি হল বুদ্ধদেব বসুর অ্যান্ একর অব্ গ্রীন্ গ্র্যাসের মন্তব্য : মূলে ছিল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছন্দবিন্যাস, সুইনবার্নকে ছাড়িয়ে যাওয়া মিলের ঝঙ্কার, কিন্তু এইসব কারুকর্ম থেকে রিক্ত বলে কবিতাগুলিকে ইংরেজিতে আরো শান্ত মনে হয়, আরো অনুগত যেন, একেবারে পরম সমর্পণে বিনম্র। বাংলাতে যেন গীতের অংশ বেশি পাচ্ছি, আর ইংরেজিতে অঞ্জলিটাই প্রায় সর্বস্ব।...এমন মুহূর্ত বিরল নয়, যখন অনুবাদ মূলকে অতিক্রম করে যাচ্ছে।[১] আমি স্মরণ করি টমসনের অভিমতটি : ইংরাজি গীতাঞ্জলি প্রকৃত প্রস্তাবে একটি নতুন কাব্য। আর স্মরণ করি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের দুটি প্রবন্ধের দুটি মন্তব্য। 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে তিনি বলেন, " 'গীতাঞ্জলি'তে ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণা চুকিয়ে 'বলাকা'য় তিনি ছন্দের স্বরূপ-সন্ধানে নামলেন' "। এবং 'সূর্যাবর্ত' প্রবন্ধে তিনি বলেন, "বাংলার ইতিহাসে 'মানসী'-ই অপূর্ব নয়, 'গীতাঞ্জলি'-তে মধ্যযুগীয় ভক্তিসাধকদের প্রতিধ্বনিও অনুরূপ অনুভূতির আবশ্যিক অভিব্যক্তি।" সুধীন্দ্রনাথের কথা দিয়েই শুরু করা ভালো। কেননা, তাহলেই বোঝা যাবে গীতাঞ্জলি-র কবি কী অর্থে এক সুমহৎ আধুনিক কবি। 'ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণা' নিশ্চয় মধ্যযুগীয় ভক্তিসাধকদের সাধ্য বিষয় ছিল না। প্রকাশকে 'বিশেষের আততিতে' বাঁধতে চাওয়া, বা 'কাব্যশরীরের সজ্ঞান নির্দিষ্টতা' (বিষ্ণু দে / একালের কবিতার ভূমিকা) যদি আধুনিক কবিতার লক্ষণ হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথের গান কবিতা-অর্থেই আধুনিক কবিতা। সেও এক কথ্য-স্রোতের সম্প্রসারণ অথবা গভীরগমন। বহুক্ষেত্রে পুনর্লিখনেই তার প্রতিষ্ঠা ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের গানের কবিতায় গীতাঞ্জলির আগে এবং পরে, জীবনের শেষ প্রান্ত অবধি।

বিষয়টি স্পষ্ট হয় রবীন্দ্রনাথের এই উজ্জ্বল কবিতাটিকে ধরলে, 'মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ আসিতে তোমার দ্বারে'। ১৩৪২এর শ্রাবণে লেখা যে কবিতাটির এটি পাঠান্তর সেটি হল, 'মনে হল পেরিয়ে এলেম অসীম পথ আসিতে তোমার দ্বারে'। উপাদানের দিক থেকে দুটি কবিতাকে এক কবিতা বলা গেলেও, শিল্পের বিচারে এরা সম্পূর্ণ আলাদা। শেষোক্ত কবিতার শেষ পংক্তিটি হল, 'আমার আঁখি ব্যাকুল পাখি ঝড়ের অন্ধকারে', কেবলমাত্র একটি কবি-সম্ভব উক্তি। কিন্তু প্রথম উদ্ধৃত কবিতাটির শেষ পংক্তি একটি অসংশয়ী কবিতার শেষ গূঢ় পদক্ষেপ, 'আমার এ আঁখি উৎসুক পাখি ঝড়ের অন্ধকারে'। এই অসামান্য চিত্রকল্পটির চরণে পৌছতে পৌছতে কবিতাটিও যেন হয়ে ওঠে 'অন্তবিহীন'। 'অসীম' 'অন্তবিহীন' হলে কী হয়, এ যিনি জানিয়ে দেন আমাদের, তিনি কবিতাই লিখছেন—আধুনিক কবিতা। 'সুধাশ্যামল' বড্ড বেশি কবিতা, 'সুধাশ্যামলিম' বর্ণের দিক থেকে সংযত, শব্দের দিক থেকে, দুটি 'ম'-এর সাহায্যে, কোমলতাসঞ্চারী। মূল কবিতায় 'তোমার প্রদীপ' পাঠান্তরে 'নিভৃতে প্রদীপ'।

---

১ "কবি রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা সমীচীন মনে করি এই প্রসঙ্গে তাঁর আর একটি মন্তব্য : আমার ধারণার কিছু পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু এই মন্তব্যের সঙ্গে এখনো আমি অংশত একমত।

'পথহারার বেদন বাজে সমীরণে' কবিতার রভসে এলিয়ে পড়ছে। পক্ষান্তরে 'পথহারানোর বাজিছে বেদনা সমীরণে' অনেক বেশি বিশেষিত। এরকম ব্যাপার আরো ঘটেছে। সানাই কাব্যগ্রন্থের 'বাণীহারা' কবিতাটির কথা ধরা যাক। গীতবিতানের 'প্রেম' অধ্যায়ের ২২৬ সংখ্যক গান। এখানেও উপাদান একই, কিন্তু প্রথমটিকে যদি বলি কথার শেষ সীমা, দ্বিতীয়টি তবে নীরবতার প্রারম্ভ। প্রথমটির কবিতা-স্বরূপে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে সব প্রশ্নই বিস্মৃত হতে হয়। 'ওগো মোর নাহি যে বাণী',--- 'বাণীহারা' কবিতার এই প্রথম চরণ গানটিতে হল 'বাণী মোর নাহি'। 'ওগো' এবং 'যে' সরে গেল। 'বাণী' আগে চলে আসায় 'নাহি' দিল চরণান্তিক এক বিষণ্ণ প্রতীক্ষা। সানাইয়ে দ্বিতীয় চরণটিতে একটি 'আকাশে'-র মতো দীর্ঘস্বরবিশিষ্ট শব্দ। গীতবিতানে 'স্তব্ধ' কথাটি বসিয়ে ব্যাপারটিকে আরো সচেতনতা দেওয়া হল। সানাইয়ে কবিতাটির তৃতীয় চরণে 'আমি অমাবিভাবরী আলোকহারা' গীতবিতানে প্রায় একই আছে, 'আমি অমাবিভাবরী আলোহারা'। কিম্বা, এক নেই। 'আলোকহারা' কেন-জানি না একটা সাময়িক অবস্থাকে বোঝায়—'আলোহারা' একটা একান্ত মন্ময় অনুভূতিকে ধরে দিচ্ছে। সানাইয়ে 'মেলিয়া তারা' গীতবিতানে হয়েছে 'মেলিয়া অগণ্য তারা'। 'অগণ্য' প্রয়াসের অন্তহীনতার সাক্ষ্য। গুরু পরিবর্তন হয়েছে পরের দুই পংক্তিতে। 'চাহি নিঃশেষ পথ-পানে / নিষ্ফল আশা নিয়ে প্রাণে'— সানাইয়ের 'বাণীহারা' কবিতার এই দুই পংক্তি গীতবিতানে সংহত হয়েছে একটি পংক্তিতে, 'নিষ্ফল আশায় নিঃশেষ পথ চাহি'। বলে দিতে হয় না, এই সংহতিই সমস্ত বেদনাকে দিয়েছে ঘনতা। 'বাণীহারা' কবিতায় শেষ পাঁচ পংক্তি গীতবিতানে ২২৬ সংখ্যক প্রেম অধ্যায়ে তিন পংক্তিতে পরিণত। সন্দেহ নেই সংহতিতে, কিন্তু আমার আজো ধারণা কবিতার বিচারে 'বাণীহারা'র সমাপ্তি আরো ব্যঞ্জনাবহ। গীতবিতানের কবিতাটিতে আভোগ অংশে শেষ তিন পংক্তিতে পাই—তোমারি সুরের প্রতিধ্বনি তোমারে দিই ফিরায়ে / কে জানে সে কি পশে তব স্বপ্নের তীরে / বিপুল অন্ধকার বাহি॥ অথচ 'বাণীহারাতে' ছিল, তোমারি সুরের প্রতিধ্বনি / দিই. যে ফিরায়ে / সে কি তব স্বপ্নের তীরে / ভাঁটার স্রোতের মতো / লাগে ধীরে, অতি ধীরে। শেষোক্ত উদ্ধৃতিটি যা বলবার নিজেই বলেছে। সে কবিতার মতোই. স্বয়ংভাষ। প্রথম উদ্ধৃতিটি অত কথা বলেনি। বুঝি অন্য কারো কাছে তার কোনো ভরসা আছে।

হয়তো আমার এত কথা বলার দরকারই ছিল না, অভিজ্ঞ রবীন্দ্রপাঠক মাত্রেই জানেন যে, এক ফর্ম থেকে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর কোনো উপাদানকে নিয়ে যেতেন অন্য এক ফর্মে, তখন এমন ব্যাপার, এমন রদবদল, নেওয়া-ছাড়া, যোগবিয়োগ বহুভাবে ঘটেছে। 'পরিশোধ' কবিতা এমন ভাবেই হয়েছে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য, চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্য রূপ পাল্টেছে নৃত্যনাট্যে, রাজা ও রাণী গদ্য সংলাপের তপতী-তে ভিন্নতা পেল। আরো স্মরণ করতে পারি চণ্ডালিকা-র রূপ-ফের। এ শুধু নিখুঁত হবার প্রচেষ্টাই নয়, এভাবে ফর্মের রূপান্তর যিনি ঘটান, তিনি জানেন ফর্মটাই কন্‌টেন্ট। ফর্ম পাল্টালে বিষয়ার্থও নতুন আলোক পায়। এই কথা মনে রাখলে কিন্তু বাংলা গীতাঞ্জলি এবং ইংরাজি গীতাঞ্জলি-র প্রভেদকে আর মূল ও অনুবাদের সমস্যা বলে ভাবাটা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে না। সেও ছিল আসলে এক উপাদানকে এক ফর্ম থেকে অন্য ফর্মে সঞ্চারণের সমস্যা। এই ফর্ম বা রূপ সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা, আসলে তাঁর একধরনের আত্মসচেতনতাই।

এবং বাংলা গীতাঞ্জলি-র ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর যে-অন্বেষা তা কীভাবে তাঁর আত্মসম্বিতের অবৈকল্য সন্ধান, ইংরাজি গীতাঞ্জলিতেই সেই অন্বেষা পুনরায় কোন্ রূপান্বয়ী, তার উপলব্ধিও বিশেষ করে উপভোগ্য। মধ্যযুগীয় ভক্তিসাধকদের সঙ্গে গীতাঞ্জলির লেখকের পার্থক্য গীতাঞ্জলির ভাষার মধ্যেই মূর্ত। এ ভাষা একান্তভাবেই ব্যক্তিক শুধু এই কারণেই একথা বলা নয়, এ ভাষা বিংশশতাব্দীর আধুনিক মানুষের অস্তিত্বগত বিরোধে-মিলনে সকল সময়েই দুই ছায়া-বিশিষ্ট, অর্থন্যাস এখানে সোপান-পরম্পরায় গভীরগামী। রোথেনস্টাইন যতই এতে অতীন্দ্রিয়তার আভাস পান, এজরা পাউণ্ড দেখুন 'প্রাচীন গ্রীস,' আমাদের কাছে এ আধুনিক ভারতবর্ষ। 'কান্না-সাগর', 'বুকের পাথর', 'অরূপতন', 'সোনার থালায় সাজার আজ দুখের অশ্রুধার', 'নিশার মতো নীরব', 'তিমির অবগুণ্ঠন', 'বিরামহীন বিজুলিঘাতে' প্রভৃতি সংখ্যাগণনার অতীত শব্দগুচ্ছের surface structure-এর ফাঁকে ফাঁকে ধ্বনিত হয় এক ব্যক্তির যন্ত্রণার বাণী। এই গূঢ়-গঠনের সেটাই বৈশিষ্ট্য। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কথ্যরীতিতে যে টান, সেই টানেই অব্যয়ের বিচিত্র প্রয়োগ 'কি' 'যেন' 'যে' ইত্যাদি ; 'করে' এই ক্রিয়ার ব্যবহার (আঁধার করে আসে), নেতিবাচক বাক্যের কৌশল, বিরোধ অলঙ্কারের হরণ পূরণ—সবই এক বিশেষ প্রকাশরীতি। শাব্দ-অবয়বে এবং আর্থ-অবয়বে সাযুজ্য বৈষ্ণবপদেও লভ্য—'হামার দুখের নাহি ওর' পদটি স্মরণ করি। কিন্তু 'গীতাঞ্জলি'-কবিতার, রবীন্দ্রনাথের অনেক সেরা গানের কবিতার, কবিতা হিশাবেই, ফোনেটিক স্ট্রাক্‌চার ও ধ্বনি-বর্ণের প্রয়োগ পৃথক আলোচনার দাবি রাখে। 'জীবন যখন শুকায়ে যায়' এই বিখ্যাত কবিতাটি এবিষয়ে অন্যতম সাক্ষ্য দিতে পারে। 'এসো' এই কবিতায় পাঁচবার ধ্বনিত হয়েছে। 'করুণাধারায় এসো', 'গীতসুধারসে এসো', 'শান্তচরণে এসো', 'রাজ-সমারোহে এসো' এবং 'রুদ্র আলোকে এসো'। প্রথম চরণের দ্বি-দল, ত্রিদল শব্দগুলির পরে 'করুণাধারায়' সহসা নেমে আসে আষাঢ়ের প্রত্যাশা পুরিয়ে তৃষিত মৃত্তিকায়। অভিভূত হয়ে যেতে হয়। একটু অবকাশ দিয়েই 'গীতসুধারসে' আরো গুরু, আরো ঘন—'ত' নিশ্চয় স্বরান্ত-উচ্চারণেই পড়তে হবে।[২] অথচ 'হৃদয়-প্রান্তে হে নীরব নাথ' মহাপ্রাণ বর্ণগুলিতে ধৃত রইল একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস—তারপরই 'শান্তচরণে' মাত্রাগুণে ছয় পেলেও 'গীতসুধারসে'র মতো সেখানে বিলম্বিত লয়ের, দীর্ঘস্থায়িত্বের প্রয়োজন হবে না[৩]। তৃতীয়াংশে চতুর্থ আহ্বানের উপস্থাপনাটি আরো উপভোগ্য। 'দুয়ার খুলিয়া হে উদার নাথ' দীর্ঘস্বরধ্বনিগুলি যেন উদাত্ত আহ্বানের সূচক, তারপরেই 'রাজ-সমারোহে এসো', আর একটি দীর্ঘ-লয়ের শব্দ। শেষ আহ্বানটিতে[৪] 'ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র' দুটি যুক্তব্যঞ্জনই চূড়ান্ত আবির্ভাবের ভূমি প্রস্তুত করল, তার পরেই 'রুদ্র'-এর মতো কঠিন ব্যঞ্জন ও যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ। ভাবের অখণ্ডতা, শব্দের নাটকের মাধ্যমে এক গভীর বিস্ময়বোধ সৃষ্টি করে এই কবিতায়। এটা মধ্যযুগীয় অন্বিষ্ট ছিল না।

এমন ভাবসংহতি, এমন পিনদ্ধতা সর্বত্র রক্ষিত হয়েছে, এমন কথা বলতে পারলে ভাল হত,

---

২ ও ৩ ইংরাজি গীতাঞ্জলিতে 'when the heart is hard', মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি এই দীর্ঘশ্বাসকে কবিতাটির প্রথমেই নিয়ে আসে। 'নীরব নাথ' আর lord of silence কিন্তু দুটো আলাদা কথা। lord of silence অন্তত ইংরাজ পাঠকের কাছে ডেভিডের Psalms-এর অনুষঙ্গেই অনর্থক হয়ে উঠবে—O Lord, my rock, be not silent to me : lest, if thou be silent to me, I become like them that go down into the pit.

৪ ইংরাজিতে thy light and thy thunder পুনরায় বাইবেলীয় ঈশ্বরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

কিন্তু তা বলা যায় না। বিখ্যাত কবিতা—'আর নাইরে বেলা নামল ছায়া ধরণীতে।' অনবদ্য এর প্রথম স্তবকটি। রণিত ব্যঞ্জনধ্বনির অব্যর্থ সমাবেশে জলের শব্দই যেন উছলে উঠেছে। সংবৃত স্বরধ্বনি ঐ রমণীর ত্বরাকে ফুটিয়ে তুলেছে নিমেষে। কিন্তু সঞ্চারী অংশে হঠাৎ কবিতাটি তার কাব্যিক বাস্তবতা, যথাযথতা হারিয়ে ফেলেছে। 'প্রেমনদীতে উঠেছে ঢেউ' একথা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে উড়ে যায় ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে দেখা প্রত্যক্ষের নদীটি। 'জানি নে আর ফিরব কিনা' এই উক্তিটির সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিল কবিতা। তারপর 'সেই অজানা বাজায় বীণা'-র রেশ ধরে কবিতাটি একেবারে হারিয়েই গেছে। উল্টো ব্যাপারটা ঘটেছে 'আজি শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে' কবিতাটিতে। কবিতাটি সুরেশ সমাজপতিকে ধরা দেয়নি, মুগ্ধ করেছে বুদ্ধদেব বসুকে। এ শুধু শতাব্দীর দুই প্রান্তের রুচি-বলয়ের পার্থক্যই নয়, দুই বোদ্ধা ও বোধভূমির পার্থক্যও বটে। বুদ্ধদেব বসু কবিতাটির প্রশংসায় যা বলেন তা অবশ্যই বহুমান্য। কিন্তু আর-একটা বিপরীত বক্তব্যের বিষয়ও বিবেচ্য। কবিতাটির প্রথম অংশে কবি তাঁর অন্য দু-একটি কবিতার মতোই নিজের তৈরি শব্দের প্রেমে পড়ে পথ হারিয়েছেন। প্রথমাংশে কবিতাটি তিনবার লক্ষ্যভ্রষ্ট, খঞ্জ হয়েছে। দ্বিতীয় পংক্তিতে 'গোপন' শুধু নিরর্থক নয়, ব্যর্থ। যাঁকে উদ্দেশ্য করে কবিতাটি বলা, রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠকেরা, তাঁর কার্য-কলাপের ধারার সঙ্গে পরিচিত বলেই জানি, কোনো 'মোহে'-র উপর তিনি যদি চরণ ফেলেন তবে তাতে কোনো গোপনীয়তা রাখার পক্ষপাত তাঁর থাকে না। মোহকে তিনি জ্বালিয়ে দেন, বা চূর্ণ করেন। 'নিশার মতো নীরব' যদি হয় তাঁর পদসঞ্চার, তাহলে আর 'বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি' বলার দরকার করে না। নবজাতক বইয়ের রাতের গাড়ি কবিতার চতুর্থ পংক্তিতে 'রজনী নিঝুম'-এ 'নিঝুম' শব্দটি এই কারণেই আমার কাছে ব্যর্থ। রেলগাড়ি যেখানে চলিষ্ণু, 'নিঝুম' সেখানে কিছু হতে পারে না। এখানে 'শ্রাবণ-ঘন' কবিতায় তবু পংক্তিটি বেঁচে যায় 'প্রভাত আজি মুদেছে আঁখি' এই পূর্বপংক্তিটির জন্য। কিন্তু কিছুতেই বাঁচে না 'নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে' এই বাক্যের 'নিলাজ নীল' বিশেষণ-চিত্রটি। নিবিড় মেঘে যে-আকাশ প্রথম থেকেই ঢাকা, তার জন্য 'নীল'-বিশেষণটিই বাহুল্য, 'নিলাজ নীল' বাহুল্যেরও বাড়াবাড়ি। তবে 'নিলাজ নীল' -এর ইংরাজিতে 'ইম্‌্যডেস্ট ব্লু' হলে যে একই ভুল হয়ে যায়, অন্তত কবি তা ঠিকই বুঝেছিলেন। তাই তিনি ইংরাজি গীতাঞ্জলিতে নিলাজ নীলকে বাদ দিয়ে ever wakeful blue skyকে ডেকেছেন। তাতে কবিতা আরো ক্ষতিগ্রস্ত হল। ever wakeful অতন্দ্র প্রতীক্ষার ছবি হয়ে উঠতে চায় গীতাঞ্জলির নিজস্ব লজিকে, তাহলে তাকে আর thick veil-এ ঢেকে দেওয়া কেন? তুবার খুঁড়িয়ে হেঁটেও কবিতাটি কিন্তু সঞ্চারী আভোগ অংশে আশ্চর্য গতি পেল। মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে উঠল কবিতাটির বক্তা। যে-কোনো ঈশ্বর-নিবেদনেই স্পষ্ট হবে ভক্ত। এজাতীয় কবিতার রহস্যই তো এই। এখানেও 'দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে' এবং 'রয়েছে খোলা এ ঘর মম' এই দুই উক্তির সমাহারে চির-প্রতীক্ষার একাকিত্ব ধ্বনিত হল। তারপরে 'কবি রবীন্দ্রনাথ'-লেখকের রসগ্রাহী ব্যাখ্যা তো আমাদের মনেই আছে। সে ব্যাখ্যায় সানন্দ সায় দেওয়ায় রসিকেরই তৃপ্ত দায়িত্বমোচন।

গীতাঞ্জলির মূল সুর প্রতীক্ষা, একথা তো আমাদের জানাই। তাই কবিতাগুলি অন্তরে বাইরে একটা যোগসূত্র পেল কী করে এ উত্তর খুঁজতে বেশি বেগ পেতে হয় না। যেমন ধরা যাক পাঁচটি

কবিতা: ১৬ (মেঘের পরে মেঘ জমেছে), ১৭ (কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো), ১৮ (আজি শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে) ১৯ (আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল) এবং ২০ (আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার) একই অনুভূতি ও আবেগের মূর্তি। পাঁচটি কবিতাতেই গাঢ় হয়ে আছে মেঘল আঁধার। একটিতে প্রভাতের উল্লেখ আছে, আর একটিতেও দিনের দীর্ঘতার কথা বলা হয়েছে—'কেমন করে কাটে আমার এমন বাদল বেলা'। কিন্তু উপরিতলের গঠনে যাই হোক, গভীরের গঠনে পাঁচটি কবিতাই রাত্রির নিঃসঙ্গতার বার্তা বহন করছে। ১৬ সংখ্যকে যার শুরু, ২০ সংখ্যকে তা চূড়ান্ত কাব্যসীমা পেরিয়ে গেল। 'বাতাস' পাঁচটি কবিতাতেই হাজির। যাঁরা বলেন রবীন্দ্রনাথ একধরনের উপাদান বা প্রসঙ্গ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন, তাঁরাও নিশ্চয় জানেন গুটি কয়েক উপাদানই প্রয়োগের বৈচিত্র্য পেয়ে সহস্রবিধ হয়ে ওঠে। 'পরান আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে' বা 'ডাকিছে মেঘ হাঁকিছে হাওয়া' অথবা 'বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি' কি, 'সজল হাওয়া যূথীর বনে' কিম্বা, 'আকাশ কাঁদে হতাশ সম' কবিতার দিক থেকেই, ছন্দোগত ধ্বনি হিশাবে, metrical sound হিশাবেই এরা পৃথক পৃথক ব্যঞ্জনা ছড়ায়। 'পরান আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে' প্রতীক্ষা এখানে অধৈর্যে কম্পমান। 'ডাকিছে মেঘ, হাঁকিছে হাওয়া' প্রতীক্ষার অধীর অবসান। 'বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি' প্রতীক্ষার প্রার্থী-মূর্তি। 'সজল হাওয়া যূথীর বনে' শুধুই আবেদনময়। কিন্তু 'আকাশ কাঁদে হতাশসম' এখানে প্রতীক্ষা অসীমে ছড়িয়ে গেল। ১৬, ১৮, ১৯, ২০-সংখ্যক কবিতার প্রথম পংক্তিগুলির ধ্বনি-বর্ণও অনুভবের যোগ্য। 'ঝ' 'ধ' 'ঢ়' 'ভ' 'ঘ' এক ধূসরতাকে ঘনিয়ে তোলে। প্রতীক্ষার সেই ধূসর সান্ধ্য বা নৈশ নিঃসঙ্গতার পটে, তারপরে, বর্ণলেপ শুরু হয়। ব্যক্ত হয় ব্যক্তির যন্ত্রণা। এবং, এই প্রতীক্ষার মূল সূত্রটি তাৎপর্য পায় ঐ ব্যক্তির যন্ত্রণার রূপকে আমাদের সকলের যন্ত্রণাকেই মূর্ত করে বলে। যারা এ যন্ত্রণাকে চিনত না, তাদের কাছেই কবিতাগুলি ছিল দুর্বোধ্য। যাঁরা জেনেছিলেন, আজও জানেন, তাঁদের কাছে এরা বহু-আলোক-সম্পাতী। 'কে রবে এ পরবাসে' এ গানটির কাব্যভাষ্য বিষ্ণু দে করেন এই ভাবে,—'পরবাসে রবে কে এ পরবাসে / আজীবন দীর্ঘ পরবাস। / সেদিন দেশের সত্তা রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘশ্বাসে / সুরের সত্যের নিঃসংশয় উদার অক্ষরে / চিরতরে মূর্তি পেল থেকে থেকে একা ভীড়ে / আবৃত্তির বাণী / রবীন্দ্রনাথের গান হয়ে গেল দেশ সারা দেশ / বিস্তৃত যন্ত্রণা নিজবাসভূমি এই পরবাস দেশ।' গীতাঞ্জলি বা তাঁর গানের কবিতার প্রতীক্ষা সর্বদাই প্রায় এই যন্ত্রণাকে স্পর্শ করে থাকে, অথচ একথাও তো শোনা যায় যে, কনিষ্ঠপুত্রের মৃত্যুর অভিঘাতেই এদের একের পর এক উদ্‌গমন। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের কবিতার 'আমি'-চরিত্রটির কথা একটু ভেবে নেওয়া যায়। এও এক আধুনিক 'আমি'—বিংশশতাব্দীর 'আমি'। তিনি রোমান্টিক কবি, কিন্তু শেলী, বায়রন বা কোনো হুগোর মতো তাঁর 'আমি' কদাচ প্রমীথিয়ুসের ভূমিকায় অগ্নিগ্রাহী নয়, নয় জঞ্জাল অপসারণকারী হারকিউলিস। এই ভাঙাচোরা, কিম্ভূতকিমাকার ঔপনিবেশিক পরিবেশে বুঝি তা সম্ভবও ছিল না। যে-অন্ধকারের কথা ঐ 'আমি' বারে বারে বলেছে, সে-অন্ধকার তার অস্তিত্বের অংশ—প্রত্যক্ষ বাস্তব-ভাষ্য হিশাবে, প্রাকৃতিক অর্থে এবং আলংকারিক অর্থে। ভিত্তিভূমিতে এই বাস্তবতা ছিল বলেই সেই 'আমি'র অচরিতার্থতা ও অকৃতার্থতার আর্তি এক জর্জর ব্যক্তিস্বরূপের আত্মস্বরূপের আত্মসচেতনতাপ্রসূত আকূতি। আকাশে নক্ষত্রের দীপালি

সার্থক হবে 'আমার এই আঁধারটুকু ঘুচলে পরে'। এখানে ঐ ভিত্তিতেই দাঁড়িয়ে গেল এক বিশ্বনাগরিকের চেতনার সুপারস্ট্রাক্চার। 'আমার এই আঁধার' ব্যক্তিগত জটিলতার আঁধার, এক ঔপনিবেশিক যন্ত্রণা-জর্জর ব্যক্তি, যিনি বিশ্বের বৃহৎ নগরীর আলোকসজ্জা দেখেছেন, তাঁরও 'আঁধার', আবার সেটা সভ্যতার অন্তহীন প্রয়াস ও ব্যর্থতার মধ্যবর্তী অন্ধকারও বটে। বলাকার সবুজের অভিযান, 'সর্বনেশে' কবিতায় ছায়া ফেলছে ঔপনিবেশিক জীবনের নিঃস্রোত পঙ্করুদ্ধতার বিরুদ্ধে যুবকদের সাগ্নিক প্রয়াসের 'ডানা ঝাপটানি'। 'আমরা চলি সমুখপানে' কবিতাও তা হতে বাধা নেই। কিন্তু ঐ কবিতা যেদিন লিখেছেন তিনি, সেদিনই রাত্রিবেলা লিখেছেন এক 'আঁধার'-চেতনা-সমন্বিত গান—সন্ধ্যা হল গো—ওমা সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো। সমস্ত গানটিতে যে ক্লান্তির সুর ধ্বনিত, তা ব্যক্তির নিশ্চয়, সামাজিকেরও বটে।[৫] সব সময়ে যে, এমনভাবে বলা যায় না, তা জানি। 'এরে ভিখারী সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে' এই গানটি যেদিন লেখা, সেদিনই লেখা, 'এবার ঐ এল সর্বনেশে গো।' তবু ভুলতে পারি না দুটোরই প্রধান চিত্রকল্পে রয়েছে এক বিরাট দুর্জ্ঞেয়কে বধূর মতো বরণ করার ইঙ্গিত।

এবং, এই বিশেষ জীবনের অভিঘাতটি একেবারে মিলিয়ে যায় না বলেই, প্রলোভন সত্ত্বেও, বাইবেলের কচিৎ কোনো অংশের সঙ্গে গীতাঞ্জলির কোনো কোনো অংশের ভাবগত আপতিক সাদৃশ্য খুঁজতে ইচ্ছে করে না। 'আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে তিনি যেন ফিরে না যান'—এই ভাব ফুটে উঠেছে 'সে যে পাশে এসে বসে ছিল তবু জাগি নি', 'উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে' এই জাতীয় আরো কবিতায়; 'তিনি আসছেন'—এই বার্তা ব্যক্ত হয়েছে 'তোরা শুনিসনি কি শুনিসনি তার পায়ের ধ্বনি' এই কবিতায়। জানি বাইবেলের সেণ্ট ম্যাথুকথিত গস্‌পেলের সেই বিখ্যাত প্যারাবল, কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়েছিল, বর যখন অর্ধরাত্রে পৌঁছেছিলেন, তার আগেই—And at midnight there was a cry made, Behold the bridegroom cometh; সন্ত ম্যাথ্যুর প্রভু তাই বারবার বলছেন, Watch ye therefore: for ye know not what hour your Lord doth come. জানি, দুর্যোগের অর্ধরাত্রে দ্বার ভেঙে পড়ার মুহূর্তে তাঁর অতর্কিত আবির্ভাব 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে'। জানি, বাইবেলের ডেভিডের Psalms-এর (৫১ সংখ্যক) have mercy upon me...wash me thoroughly from mine iniquity and cleanse me from my sin—এই প্রার্থনাগীতির কথা মনে পড়লেও পড়তে পারে গীতাঞ্জলির 'দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে' কবিতাটিতে ডেভিডের Psalmsগুলিতে যে 'শত্রু' বা রিপু বা enemy-চেতনা কখনো কখনো খর হয়েছে, গীতাঞ্জলিতে ৮০ এবং ৮১ সংখ্যক গানের মতো রচনায় 'ওরা'-প্রসঙ্গে তার কথা ভেসে উঠতে পারে[৬]। যদিও তা সবই মিলিয়ে যাবে, দেশ কাল

৫ কবিতাটি এবং গানটির রচনার দিনাঙ্ক ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ সাল। শুধু গানটির বেলায় স্পষ্ট করে বলা আছে 'রাত্রি'।

৬ ১০২-সংখ্যক Psalms-এ Hide not thy face from me...My heart is smitten and withered like grass...I am like a pelican of the wilderness—ইত্যাদিকে আমি মেলাতে চাইছি না গীতাঞ্জলির 'অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না' কবিতার 'জানি আমার কঠিন হৃদয়' 'দেশ বিদেশে কতই ঘুরি' প্রভৃতি অংশের সঙ্গে। 'ব্যর্থ তৃণ' এবং 'না-ফোটা' ফুলের কথা দুজায়গাতেই থাকলেও চাইব না।

ব্যক্তিপাত্রের স্বতন্ত্র বিন্যাসের জন্যই। ডেভিডের Psalmsএ থাকল sin বা পাপের কথা। রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, গানে বারে বারে গ্লানি, মলিনতা এবং অন্ধকারের কথা। ঔপনিবেশিক জীবনের গ্লানিই এসব ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিকে পীড়িত করেছে। যদি কারো মনে হয় এই সুদূর সম্পর্ক কষ্টকল্পিত, তাহলে কবিজীবন থেকে আমি একটি উদাহরণ উপস্থিত করি। তাঁর সামাজিক সত্তাই যে তাঁর কবিতার চরিত্রকল্পনার বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করে, অন্তত কতকাংশে তার পরিচয় পাই 'কাঙালিনী' কবিতার রবীন্দ্রকৃত ব্যাখ্যায় 'এ তো আমার নিজেরই কথা। যে-সব সমাজে ঐশ্বর্যশালী স্বাধীন জীবনের উৎসব সেখানে সানাই বাজিয়া উঠিয়াছে, সেখানে আনাগোনা কলরবের অন্ত নাই; আমরা বাহির-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি মাত্র—সাজ করিয়া আসিয়া যোগ দিতে পারিলাম কই[৭]। যে-প্রতীক্ষার কথা আমরা রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির গানের কবিতার মূলভাব বলে ব্যাখ্যা করছি সে প্রতীক্ষাও তাৎপর্য পায় এই আমাদেরই ভারতবর্ষীয় বিশশতকীয় জীবনপটে। আমি এতক্ষণ যা বলতে চেষ্টা করছি, তিনি অব্যর্থ ভাষায় সংক্ষেপে সেটা বলে দিলেন :

> মানুষের বৃহৎজীবনকে বিচিত্রভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিবার ব্যথিত আকাঙ্ক্ষা, এ যে সেই দেশেই সম্ভব যেখানে সমস্তই বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম সীমায় আবদ্ধ। আমি আমার সেই ভৃত্যের আঁকা খড়ির গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া মনে মনে উদার পৃথিবীর উন্মুক্ত খেলাঘরটিকে যেমন করিয়া কামনা করিয়াছি, যৌবনের দিনেও আমার নিভৃত হৃদয় তেমনি বেদনার সঙ্গে মানুষের বিরাট হৃদয়লোকের দিকে হাত বাড়াইয়াছে। সে যে দুর্লভ, সে যে দুর্গম দূরবর্তী।[৮]

এরই জন্য পথে নামা, এরই জন্য অপেক্ষা। গীতাঞ্জলি এবং অন্যত্রও যেসব গানের কবিতায় প্রতীক্ষাই প্রধান ভাবনা, সেসব কবিতার গঠনেও এক বৈশিষ্ট্য এসেছে। গানের দিক থেকে চার ভাগ, কিন্তু কবিতার দিক থেকে দুই অংশে সম্পূর্ণ, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিরিকগুলিতে সনেটের সঙ্গে তুলনীয় সংহতি ও বিস্তৃতি, ছড়িয়ে দেওয়া ও গুটিয়ে নেওয়া, সংবৃতি ও বিবৃতি রূপবন্ত হয়ে উঠেছে। কোনো কোনো কবিতায় বাইরে থেকে ভিতরে আসা; কোনো কোনো কবিতায় ভিতর থেকে বাইরে যাওয়া। 'আর নাইরে বেলা নামল ছায়া ধরণীতে' কবিতাটিতে প্রথমাংশে আত্মকথা, দ্বিতীয়াংশে আত্মমুক্তি। 'শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে' কবিতাটিতে প্রথমে ভাবের বিস্তার, পরে তাকে সংবৃত করে আনা। 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' কবিতায় প্রথমে সংবৃতি, পরে বিস্তার। তিনবার 'এ' অন্ত্যমিলগুলি পর পর ব্যবহৃত হয়ে ব্যবধান বা দূরত্ব-কল্পনাকে অসীমে পৌঁছে দিয়েছে।[৯]

---

৭ জীবনস্মৃতি / কড়ি ও কোমল

৮ ঐ / ঐ

৯ আমি মানতে পারি না কবিতাটি সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুর আর-একটি মন্তব্য, 'কবিতাটির প্রথম স্তবকে 'যে' অব্যয়ের পুনরুক্তি প্রীতিকর নয়'। এরকম ক্ষেত্রে 'যে' অব্যয়, বাংলা কথ্য ভাষার নিজস্ব চালে এক অনুযোগের সুরকে আভাষিত করে, তার মাধুর্য বুদ্ধদেব বসুর কান এড়িয়ে যাওয়া উচিত হয়নি। আর একটি কথা, frowning forest বা mazy depth of gloom অনুবাদ হিশাবে 'গহন কোন্ বনের ধারে / গভীর কোন্ অন্ধকারে'-কে প্রতিবিম্বিত করতে পারছে কিনা তর্কের বিষয় —কিন্তু ইংরাজিতে যে ছবি দুটি আমরা পাই তা কি রবীন্দ্রনাথের ছবির জগতের পূর্ব-ইঙ্গিত নয়?

আরো উদাহরণ শুধু সংখ্যাই বাড়াবে। এই কাঠামো যে-সব ক্ষেত্রে রক্ষিত হয়নি, সেখানে কবিতাটি প্রথম উচ্চারণ থেকে শেষ শব্দটি পর্যন্ত হয়ে উঠেছে একটি ভাববৃত্তের চারপাশে একই রঙের কয়েকটি পাপড়ি। প্রসঙ্গত 'ঘুমের ঘন গহন হতে' কবিতাটি আমরা স্মরণ করতে পারি। আবার এই দুই কাঠামো যে-চিত্রকল্প-রীতিকে উৎসাহিত করেছে তাও অনুধাবনীয়। কোনো কোনো কবিতায় প্রধান চিত্রকল্পটি প্রথম চরণে বা প্রথম দু-এক পংক্তির মধ্যেই ফুটে উঠেছে, বাকি কবিতাটি চিত্রকল্পটির ধারক। এর নিদর্শন বহু—'আজ আলোকের এই ঝর্নাধারায়' দিয়ে শুরু করা যায়, সহজে শেষ হবে না তালিকা। আবার কতকগুলি কবিতায় অন্ত্য-চিত্রকল্পটিই প্রধান, সারা কবিতাটি ছিল এরই বাহক। স্মরণ করতে পারি 'আমার এ আঁখি উৎসুক পাখি ঝড়ের অন্ধকারে।' এখানে সমস্ত কবিতাটিই ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে ঐ চিত্রকল্প। স্মরণ করতে পারি সহসা নবীন উষা আসে হাতে আলোকের ঝারি / দেয় সাড়া ঘন অন্ধকারে।' এবং এমন আরো কত।

এ এক অনিবার্য অনুভূতির জগৎ। এখানে এক অভিনব আধ্যাত্মিক বিপরীত-বিহারের পুলক ধ্বনিত 'অসীম ধন তো আছে তোমার' কবিতায়; বিপরীত অভিসার যা কোথাও প্রশ্রয় পায়নি, ধ্বনিত হল 'আমার মিলন লাগি' ও 'ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' কবিতায়। এই 'নীরব' এমন এক অন্তর্যর্থক 'নীরবে'র প্রসঙ্গও অবার্য হয়ে উঠল এখানেই। শব্দবিরল বাক্যগুলি সেখানে নীরবতার কোল ঘেঁষে চলে যায়। নীরবতা সেখানে নিশীথিনীর মতো ছায়াশরীরিণী—'নিশায় নীরব দেবালয়' সেখানে প্রায় ব্যক্তিপ্রতীক (৩১), 'নীল আকাশের নীরব কথা' (৩৮) সেখানে সাধারণ ব্যাপার, সেখানে নীরবতাই প্রার্থিত হল কথায় (৫৯)। 'ধুলায় লুটানো নীরব বীণা' অনাহত কী আঘাতে বেজে উঠবে—এই প্রতীক্ষা। এক মহানীরবের উদ্দেশ্যে ধ্বনিত অনুযোগ 'ওগো মৌন না যদি কও না কইলে কথা' মনে রাখি। 'ঢেউয়ের মতো ভাষা-বাঁধন-হারা' রাগিণী যাকে শোনানো হবে, তিনিও নীরব হেসে তা তুলে নেবেন শ্রবণে। এবং কী আশ্চর্য, কবি যখন বলেন 'নীরব যিনি তাহার পায়ে নীরব বীণা দিব ধরি', তখন দুই 'নীরব'-এর দুই প্রকারের অসীম ব্যঞ্জনা আমাদেরও টেনে নিয়ে যায় সেখানে, 'সেই অতলের সভামাঝে'। আর সবই, সব কথাই, যেন বিরলে কথনের উপযুক্ত কথাস্রোতে প্রাণবন্ত, হ্রস্ব অথচ উচ্ছ্রিত বাক্য। কিন্তু শুধু গেয় স্বরেই নয়, কথাতেও সে-অতলকে মূর্ত করতে পেরেছেন বলেই সেগুলি কবিতা। এমন কবিতার কথা আমাদের মনে আছে যেখানে কোনো প্রসাধিত বাক্যই নেই, নেই কোনো সচেতন চিত্রকল্প, কিন্তু যা বিশুদ্ধ আবেগের মূর্তি হতে পেরেছে কেবল পরিমিতির জন্য। হয়তো এমন কবিতার উদাহরণ 'অনেক কথা বলেছিলাম কবে তোমার কানে কানে'। উল্টো উদাহরণও আছে, যেখানে বুঝি পরিসরের স্বল্পতার জন্য জটিল চিত্রকল্প কবিতাটিকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে, স্মরণ করতে পারি—'আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায় মনের কথার কুসুমকোরক খোঁজে'। গানের দিক থেকে চিত্রকল্পের ঋদ্ধ সমাবেশ আমাদের মনোযোগকে খণ্ডিত করে ফেলার আয়োজন ঘটালে সেটাও হয়ে ওঠে সমালোচনার যোগ্য। 'আরো কিছুখন না হয় বসিয়ো পাশে' কবিতাটির প্রথমাংশে—গানের দিক থেকে প্রথম দুই ভাগেই, দুটো রূপান্তরণী চিত্রকল্পের ব্যবহার ঘটেছে—(১) 'শরৎ আকাশ হেরো ম্লান হয়ে আসে / বাষ্প আভাসে দিগন্ত ছলোছলো' এবং (২) 'সে মোর অগম অন্তর পারাবারে/রক্তকমল তরঙ্গে টলোমলো'। তৃতীয়টি

এসেছে আবার শেষকালে, 'সে বাণী আপন গোপন প্রদীপ জেলে / রক্ত আগুনে প্রাণে মোর জ্বলো জ্বলো'। তিনটি চিত্রকল্পের প্রথমটি প্রাকৃতিক পরিবেশের ছলে আত্মকথা হলেও ছবিটা প্রকৃতির। দ্বিতীয়টি প্রেমের, যে প্রেমের স্বরূপব্যাখ্যা হিসাবে ঐ চিত্রকল্পের উদয়। তৃতীয়টি সব শেষে এসেছে অনুক্ত বাণীর উপমারূপে। এর আলোচনার উপযুক্ত ক্ষেত্রে কাব্যের আসর। সেখানে কিন্তু দেখতে দেখতে কবিতাটি শরীর পায়। প্রথম চিত্রকল্পটি গাঢ় করে তোলে সন্ধ্যার ঘনিয়ে আসা ছায়া। 'রক্তকমল' পারাবারের সংযোগে সন্ধ্যার রক্তিম আলো ছড়ায়। শেষ চিত্রকল্পটি সন্ধ্যাকে গাঢ় করে, অন্ধকার জমিয়ে, জ্বালিয়ে দিল প্রদীপ। সেই প্রদীপটিই কবিতার শেষ কথা।

গানের কবিতার বিশিষ্ট কুহক উপলব্ধির উপযুক্ত উপাদান খুঁজে পাই সেই সব কবিতায় অনুভূতি যেখানে শব্দ-সংযোগের রহস্যেই আনন্দের উৎস। 'খোলো খোলো দ্বার রাখিয়ো না আর' গান-কবিতাটি কবিতা হিশাবেও পাঠ্য। কবিতা হিশাবে প্রথমাংশের দীর্ঘ স্বর-সমাবেশ আকুল আহ্বানেরই ধ্বনি-প্রতীক। দ্বিতীয়াংশে সে স্বরধ্বনি অনেকটা সংবৃত। প্রতীক্ষা সেখানে প্রায় প্রাপ্তির কাছাকাছি। এবং সমগ্র গান-কবিতাটিকে ধরে রেখেছে, উজ্জ্বল করে তুলেছে, অর্থকে গূঢ়তা ও ব্যাপ্তি দিয়েছে একই সঙ্গে, এই কেন্দ্রীয় চিত্রকল্প—'আলোকের খেয়া হয়ে গেল দেয়া অস্তসাগর পারায়ে'। এই কুহক অকাট্য হয়ে ওঠে 'বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা'র মতো রচনায়। পেয়ালার রূপক নয়—যেমন পেয়েছি 'আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া' কবিতায়। পেয়ালাটাই এখানে বিষয়। সে এখানে রূপকের প্রসাধিত পরিসরকে না-ছুঁয়ে একেবারে বাস্তবের পেয়ালাই থেকে গেছে। থেকে গিয়েও অসামান্য হয়েছে সে শেষের আকিঞ্চনে—'এ রসে মিশাক তব নিঃশ্বাস / নবীন উষার পুষ্প-সুবাস।—এরই 'পরে তব আঁখির আভাস দিয়ো হে দিয়ো'। 'আঁখির আভাস' অর্থন্তর সৃজনে আধুনিক কবিতা। এমনি কবিতা 'কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে'। একটা নাতিস্ফুট বেদনা এই কবিতায় বুঝি দেহ পেয়েছে সব শেষে প্রথম চিত্রেই। 'এসে ফিরে গেল বিরহের ধারে ধারে' যেন ভাষারও ভাষাতীতের দ্বারে এসে করাঘাত। এমনি, 'আমি যখন তাঁর দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই' কবিতার শেষ ভাগ। এমনই স্মরণীয় 'চাঁদ জোয়ার' 'সেতু : নৌকা পারাপার' কি, 'ছিন্ন বীণা বা গানের আসরের চিত্রকল্প, 'আলো অন্ধকারের' 'চিত্রকল্প খেলা-খেলাভাঙার ছবি। এবং শুধু আলোর পিপাসা নয়, এক অনন্তভাষী অন্ধকারের পিপাসাও ছিল তাঁর আধুনিকের মতোই। আলোও যে একটা আড়াল, একথাও তিনিই প্রথম বলেছেন—'আঁখি হতে অস্তরবির আলোর আড়াল তোলো'।

কাব্যশৈলী ও অনুবাদ প্রসঙ্গ

পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী

সকলেই জানেন, কবিতা-অনুবাদ একরকম অসম্ভব। মূল ভাষার ছন্দ ও স্পন্দবিন্যাস অনুবাদে রক্ষা করতে গেলে প্রায়শই কৃত্রিমতার আশ্রয় নিতে হয়। প্রতিভাবান কবিরা এ-জাতীয় পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন—যেমন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মন্দাক্রান্তা-ছন্দে রচিত যক্ষের নিবেদন কবিতাটি। কিন্তু মূল ভাষার শৈলীকে অনুবাদে অটুট রাখা ভাবাই যায় না। এই প্রসঙ্গে ছন্দশাস্ত্র আর শৈলীশাস্ত্র[১]র পার্থক্যটি বুঝতে হবে। ছন্দ প্রধানত কানের ব্যাপার, আর শৈলী প্রধানত মননের ব্যাপার। কোনোটিকেই বাগর্থের পরিধির মধ্যে আনা ঠিক হবে না। ভাষাবাক্যের স্পন্দবিন্যাস ও ধ্বনিতরঙ্গের সুমিত যতিভঙ্গের উপর হলো ছন্দের ভিত্তি ; অনুপ্রাস স্তবকগঠনসজ্জা ইত্যাদিও এর আওতায় পড়ে। কিন্তু ভাষাবাক্য রচনাকালে রচয়িতার মনে একঝাঁক বিকল্প শব্দ, বাগ্‌বিধি এবং অন্যান্য উপাদান এসে হাজির হয়। বাক্যের গঠনপ্রক্রিয়ার দিকে দৃষ্টি দিলে এটা সহজেই প্রতীয়মান হবে যে একটি শব্দের উচ্চারণ শেষ হলে তবেই অন্য একটি শব্দ-উচ্চারণ সম্ভব হয়, এবং উচ্চারণকালে একই সঙ্গে দুটি শব্দ বাক্‌যন্ত্রের দ্বারা কোনোপ্রকারেই পরিস্ফুট করা যায় না। অনেকগুলি বিকল্পশব্দের মধ্যে মাত্র একটিকে বেছে নিতে হয়। এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ। অর্থপরিস্ফুটনার তাগিদ, রচয়িতার বিশেষ মননভঙ্গী এবং ভাষাব্যবহারের অভিজ্ঞতাজাত বিশেষ অভ্যাসধারার জন্যে এই বিকল্পশব্দাবলীর সংখ্যা খুব বেশি হতে পারে না। বাক্যের প্রথম দিকে একটু বেশি হলেও, বাক্যের শেষের দিকে বিকল্পের সংখ্যা কমে আসে। অর্থের দিক দিয়ে দেখলে এই বিকল্পগুলিকে প্রতিশব্দ বলা যায়। পদ্যবাক্যরচনায় বিকল্প-শব্দচয়নের স্বাধীনতা কম, কেননা ছন্দের তাগিদে একটি বিশেষ পরিসরের বা মাত্রার বিকল্প শব্দই চয়িত হয়। যদি এমন একটি বিশেষ শব্দ কবি বেছে নেন যা বাক্যের নির্দিষ্ট পরিসরে ঠিক মানানসই হচ্ছে না, অথচ শব্দটি অবর্জনীয়, তাহলে কবি সেই বিশেষ শব্দটি রেখে তার আগের বা পরের অংশগুলিকে পরিবর্তন করে ছন্দের মূল কাঠামোটিকে বজায় রাখেন। ছন্দ-রূপদক্ষ কবির বিকল্প শব্দ চয়নে মূল লক্ষ্য থাকে যাতে সমগ্র ধ্বনিতরঙ্গের সুমিত যতিভঙ্গের ধর্মটি নষ্ট না হয়। কিন্তু সৃজনশীল রচনায়, বিশেষ করে পদ্যরচনায়, ছন্দের এই সুমিত যতিভঙ্গের কাঠামোর কঠোর সীমাবদ্ধতা বজায় রেখেও ধ্বনিভিত্তিক ও মননভিত্তিক অন্যান্য উপাদানের নিপুণ প্রয়োগে রচয়িতা কিছু বাড়তি সৌকর্য এনে থাকেন। এই উপাদানগুলিকে ঠিক ছন্দের আওতায় আনা ঠিক হবে না। কেননা এই উপাদানগুলি ধ্বনিতরঙ্গের সুমিত যতিভঙ্গের সুসমঞ্জস সৌন্দর্যবর্ধনে কোনো সাহায্য করে না, বরং অন্য এক ধরনের সৌন্দর্যবোধ এনে দেয়—বা বলা যায়, সৌন্দর্যের একটি দ্বিতীয় ডাইমেনশন বা মাত্রা সৃষ্টি করে। সৌন্দর্যের এই মাত্রাটিকে শুধু ছন্দের ধ্বনিভিত্তিক পরিমিতিবোধের দ্বারা সম্যক বোঝা যাবে না। বাক্যের সঙ্গে অন্য বাক্যের সম্পর্কজাত চেহারা, অর্থাৎ রচনার সমগ্র মূর্তির পরিপ্রেক্ষিতেই এই ধ্বনি-অতিরিক্ত অন্তঃকলাগুলিকে বোঝা যাবে। বাক্যপরিসরভুক্ত নানা যতিভেদ, ছন্দস্পন্দের বিন্যাসভেদ, অনুপ্রাসের প্রকারভেদ, ছত্রের আকারভেদ, স্তবকের সজ্জাভেদ, এমনকি স্তবকাতিরিক্ত

সমগ্র কবিতাধৃত অন্যান্য ছন্দ-তাৎপর্যাবলী ধরলেও—বাক্যাংশের বা ছত্রাংশের পারস্পরিক অন্বয়মূলক সম্পর্কে নতুন মূল্যারোপ, এমন কি অন্বয় সৃজনকৌশলের মুনশীআনা, বাক্‌প্রতিমার প্রয়োগভেদ, এমনকি আপাত তুচ্ছ শব্দাবলীর সামান্য অদলবদলে, সমগ্র বাক্যে বা বাক্যাংশে নতুন দ্যোতনা বা লক্ষণাপ্রদান, পুনরাবৃত্তিকলার বিচিত্র ব্যবহারভেদ ইত্যাদি দেখিয়ে কী করে সৃজনশীল রচনায় রচয়িতা সৌন্দর্যের এই দ্বিতীয় মাত্রাটি সৃষ্টি করেন—ছন্দঃশাস্ত্র এই জিজ্ঞাসার ঠিক সমাধান করতে পারে না। ছন্দ-অতিরিক্ত প্রধানত মননজাত এই সব অন্তঃকলাই শৈলীশাস্ত্রের মুখ্য আলোচ্য বস্তু।

পাপুয়া নিউগিনির মুখবাহিত সাহিত্য-ঐতিহ্য থেকে উদাহরণযোগে কাব্যশৈলীকলার বৈশিষ্ট্য-গুলি দেখানো যেতে পারে। দক্ষিণ পাপুয়ার 'য়েকিও'[২]-দের মধ্যে সুপরিচিত এই ইতিবাহিত কবিতাটি লক্ষ্য করা যাক :

(১) আনু মাইনা লা মাইনা
আনু তাইনা লা তাইনা
মিআ মাইনা লা মাইনা
মিআ তাইনা লা তাইনা ॥

মূল ভাষা যে না জানবে, তার পক্ষেও উপরের শব্দসমষ্টি বা ধ্বনিতরঙ্গকে পদ্যবন্ধ বলে স্বীকার করতে অসুবিধে হবে না। এমন কি এই শব্দগুলিকে উপরের মতো না সাজিয়ে যদি একটানা গদ্যের মতো লিখে সাজিয়ে দিই, তাহলেও যেকোনো শ্রোতা 'মাইনা তাইনা-র অনুপ্রাস লক্ষ্য করে ঐ ঐ শব্দ কানে লাগা মাত্রই সতর্ক হবেন। এবং সমগ্র রচনাটি শুনবার পর নিশ্চিত ধারণা হবে যে 'আনু মাইনা' 'লা মাইনা' ইত্যাদি অংশগুলির প্রত্যেকটি সমগ্র রচনার গুরুত্বপূর্ণ বা স্মরণযোগ্য অংশ। যাঁদের চিন্তাধারা বিজ্ঞানপরিশীলিত, তাঁরা এই স্মরণযোগ্য অংশকে বলবেন য়ুনিট বা একক। পদ্যবন্ধ বা ছন্দ সম্বন্ধে যাঁদের প্রাথমিক জ্ঞান আছে, তাঁরা এই অংশকে 'পর্ব' বলে সহজেই শনাক্ত করবেন। গদ্যের মতো করে লেখা থাকলেও ছান্দসিক মাত্রই সমগ্র রচনাটি শুনে পর পর দুটি পর্ব মিলে যে ছত্রবন্ধ সৃষ্টি হচ্ছে তা চিনে নেবেন, কেননা 'আনু মাইনা / লা মাইনা' শোনার পর যখন তিনি আবার 'আনু…' ইত্যাদি শুনবেন তখন তিনি এই দ্বিতীয় ধরনের অনুপ্রাসে সতর্ক হবেন এবং এটাকে একটা বৃহত্তর য়ুনিটের সূচনা হিসেবে মেনে নিয়ে 'আনু…' ইত্যাদি দুইপর্বযুক্ত রচনাংশটিকে ছত্র বলে চিনে নেবেন। ঠিক এই ভাবেই 'মিআ মাইনা / লা মাইনা এবং 'মিআ তাইনা / লা তাইনা' তাঁর কাছে দুটি ছত্র বলে ধরা পড়বে। এবং খুব সম্ভব, ছান্দসিক, আমি উপরে যেভাবে সাজিয়ে দিয়েছি ঐভাবে, সমগ্র রচনাটিকে চার ছত্রে এবং দুই প্রস্থে বা স্তবকে উপস্থাপিত করবেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শুধুমাত্র কানের পরিশীলন দিয়েই, ক্রম-উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টির স্পন্দবিন্যাস ও যতিপাতনজনিত তরঙ্গভঙ্গ ছান্দসিক সহজেই চিনে নেন। এবং কোন্‌টি পর্ব, কোন্‌টি ছত্র, কোন্‌টি স্তবক, ইত্যাদি সম্পর্কেও তিনি নিশ্চিত হতে পারেন।

মনে রাখতে হবে যে, যে-রচনাটি উপরে উল্লেখ করেছি, সেটি হলো একটি মুখবাহিত[৩] কবিতা, যা আগে কেউ লিখে রাখেননি। যে-সংস্কৃতিতে লিপিব্যবহার নেই, সেই সংস্কৃতিতে লোকের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, সত্য সম্পর্কে ধারণা, গালগল্প, কিংবদন্তী ইত্যাদি সবই মুখে মুখে প্রচলিত ও প্রবাহিত

হয়ে থাকে। উদ্ধৃত কবিতাটি 'অতিকথা'[৪]-জাতীয় একটি আখ্যানের অংশ। গ্রামের জ্ঞানবৃদ্ধরা এই জাতীয় রচনাকে পবিত্র ও চিরসত্য বলে মনে করেন। কাজেই এই জাতীয় কবিতা যখন তাঁরা আবৃত্তি বা সম্প্রচার করেন, তখন তাঁরা এর মূল কাঠামো বা চিরায়ত রূপটিকে নিখুঁত ভাবে বজায় রাখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কী ভাবে করবেন? যদি না স্মৃতিতে ধরে রাখবার মতো কোনো বিশেষ বিধিপদ্ধতি এই সংস্কৃতিতে না থাকে? বৈদিক পদপাঠ, ক্রমপাঠ, জটাপাঠ ইত্যাদি পাঠপদ্ধতিগুলি হলো এক ধরনের স্মরণকলা[৫]। এই জাতীয় জটিল উন্নত পাঠপদ্ধতি বা বিধিপদ্ধতি না থাকুক, সমস্ত সংস্কৃতিতে ইতিশ্রুত[৬] বা ইতিবাহিত[৭] সাহিত্যে বিশেষ করে পদ্যবন্ধে ছন্দ-অতিরিক্ত এক জাতের কাব্যিক অন্তঃকলা[৮] থাকে। কোনো কোনো ঐতিহ্যে এর ব্যবহার ও বৈচিত্র্য বেশি, কোনো কোনো ঐতিহ্যে বা কম।

এই অন্তঃকলাগুলি শুধুমাত্র ধ্বনির জ্ঞান বা ছন্দের কান দিয়ে বোঝা যাবে না। ভাষার ধ্বনিভূমি ছাড়া যে অন্য এক ভূমি আছে, যাকে দ্যোতনা বা অর্থের ভূমি বলা যেতে পারে, তার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে এই অন্তঃকলাগুলিকে সম্যক উপলব্ধি করতে হলে। মেকিওরা উপরের কবিতাটি শোনামাত্রই তার ছন্দটি বুঝবে, অর্থটিও বুঝবে, এবং সাধারণ অর্থ ছাড়া যদি অন্য কোনো ইঙ্গিত, বা সঙ্কেত থাকে তাও হয়তো বুঝবে। কাজেই উপরের কবিতাটির একটী সাদামাটা অর্থ করা যাক:

(২) আন্থ মাইনা লা[৯] মাইনা
(=বসি আসি আসি)
আন্থ তাইনা লা তাইনা
(=বসি অপেক্ষা করি অপেক্ষা করি)
মিঅা মাইনা লা মাইনা
(=বাঁচি আসি আসি)
মিঅা তাইনা লা তাইনা
(=বাঁচি অপেক্ষা করি অপেক্ষা করি)

মূল কবিতাটিতে আসা যাক। ছন্দের দিক দিয়ে প্রতিটি ছত্রকে 'আন্থ মাইনা / লা মাইনা' এইভাবে পর্বভাগে ভেঙে পড়লেও, মেকিওরা যখন এই কবিতাটি বলবে বা শুনবে তখন তারা ছত্রগুলিকে হৃদয়ঙ্গম করবে কিন্তু 'আন্থ / মাইনা লা মাইনা' এই ভাবে ভেঙে। আসলে চারটি ছত্রই এইভাবে ভাঙা যাবে:

(৩) আন্থ / মাইনা লা মাইনা
আন্থ / তাইনা লা তাইনা।
মিঅা / মাইনা লা মাইনা
মিঅা / তাইনা লা তাইনা॥

তাহলে দ্যোতনার দিক দিয়ে দেখলে আমরা পাবো এই চারটি মাত্র অংশ: ১ 'আন্থ', ২ 'মাইনা লা

মাইনা', ৩ তাইনা লা তাইনা', ৪ 'মিআ'। দ্যোতনাবোধক সংখ্যাচিহ্ন দিয়ে কবিতাটিকে এই ভাবে উপস্থাপিত করা যায় :

(৪)　১　২
　　১　৩
　　৪　২
　　৪　৩

লক্ষ্য করবো প্রতিটি অংশ দুবার করে পুনর্বৃত্ত বা পুনরুক্ত হয়েছে। তাই মূলে চারটি মাত্র অংশ থাকলেও, সমগ্র কবিতাটিতে গুনতিতে পাচ্ছি আটটি অংশ। এই কবিতাটির গড়নে পুনর্বৃত্তি-কলাটি[১০] ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু পুনর্বৃত্তির ধরন সব অংশের এক নয়। ১-সংখ্যক অংশটি মাত্র প্রথম স্তবকেই ব্যবহৃত হয়েছে। এবং দুক্ষেত্রেই ছত্রের আদিতে। ৪-সংখ্যক অংশটি মাত্র দ্বিতীয় স্তবকে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানেও আবার দুক্ষেত্রেই ছত্রের আদিতে। ২-সংখ্যক অংশটি স্তবক-অভ্যন্তরে পুনর্বৃত্ত হয়নি। ৩-সংখ্যক অংশটির বেলায়ও তাই হয়েছে। এরা বরং স্তবকান্তরে পুনর্বৃত্ত হয়েছে : ২-সংখ্যক বসেছে প্রতিটি স্তবকের প্রথম ছত্রের অন্তে, ৩-সংখ্যক বসেছে প্রতিটি স্তবকের দ্বিতীয় ছত্রের অন্তে। উপরের বিশ্লেষণবিবৃতিগুলিকে সংক্ষেপে এইভাবেও বলা যায় : ১- ও ৪-সংখ্যক অংশ দুটি ছত্রাদিক ও স্তবকাভ্যন্তরিক, আর ২- ও ৩-সংখ্যক অংশ দুটি ছত্রান্তিক ও স্তবকান্তরিক।

উপরের সংখ্যাচিহ্নে রূপান্তরের চেহারাটি দেখলে কিন্তু একটি গলদ চোখে পড়বে। সেটি হলো, ২- আর ৩-সংখ্যক অংশ দুটি যে অনুপ্রাসসূত্রে আবদ্ধ সেটি দেখানো হয় নি। ১- আর ৪-সংখ্যক অংশ দুটির মধ্যে কিন্তু এই মিলটি নেই। তাহলে অনুপ্রাসের গুণটিকে দেখিয়ে সংখ্যাচিহ্নে রূপান্তরিত কবিতাটিকে এই ভাবে লেখা চলে :

(৫)　১　২-ক
　　১　৩-ক
　　৪　২-ক
　　৪　৩-ক

এই পুনর্লিখিত সংখ্যাচিহ্নরূপান্তরটির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখবো যে সমগ্র কবিতাটি একটিমাত্র অন্ত্যানুপ্রাস দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আছে, আর স্তবক দুটির পার্থক্য ধরা পড়ছে আদ্যানুপ্রাসের অভাব দিয়ে। (স্তবক-অভ্যন্তরে ছত্রের আদ্যংশের পুনর্বৃত্তিকে আদ্যনুপ্রাস না বলাই ভালো। আদ্যনুপ্রাস ও ছত্রের আদ্যংশের পুনর্বৃত্তি আমাদের দেশের প্রাচীন তামিল কবিতায় আছে।)

মূল কবিতাটি যদি ভালো করে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখবো—পুনর্বৃত্তিকে একটি কৌশল হিসেবে ছত্রাংশের অভ্যন্তরেও ব্যবহার করা হয়েছে। ২-সংখ্যক অংশে 'মাইনা' শব্দটি, ৩-সংখ্যক অংশে 'তাইনা' শব্দটি দুবার করে পুনর্বৃত্ত হয়েছে—এবং দুক্ষেত্রেই পুনর্বৃত্ত শব্দদুটির মাঝখানে 'লা' শব্দটি নাক উঁচিয়ে আছে। শব্দকে ভিত্তি করে পুনর্বৃত্তিকৌশলটি কী করে এই কবিতায় কাজ করছে তা এবার দেখবো : ১ 'আনু', ২ 'মাইনা', ৩ 'লা', ৪ 'তাইনা', ৫ 'মিআ'—সবশুদ্ধ এই পাঁচটি শব্দের

প্রথম ও পঞ্চমটি দুবার, আর দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থটি চারবার করে পুনর্বৃত্ত হয়েছে। এবং এখানে পুনর্বৃত্তির ধরনটা একটু স্বতন্ত্র :

(৬) ১ম ২য়-ক ৩য় ২য়-ক
১ম ৪র্থ-ক ৩য় ৪র্থ-ক
৫ম ২য়-ক ৩য় ২য়-ক
৫ম ৪র্থ-ক ৩য় ৪র্থ-ক

(৫)-এর ছকে ছত্রাংশভিত্তিক পুনর্বৃত্তির ধরনটা ছিলো লম্বমান[১১]। (৬)-এর ছকের ধরনে লক্ষ্য করা যাবে—শব্দভিত্তিক পুনর্বৃত্তি লম্বমানও বটে, আবার দিক্‌শায়ীও[১২] বটে। লম্বমান রেখায়—অর্থাৎ উপর থেকে নিচে—১ম শব্দটি ও ৫ম শব্দটি স্তবকাভ্যন্তরে সরাসরি পুনর্বৃত্ত হয়েছে কিন্তু ২য় ও ৪র্থ শব্দদুটি সমগ্র কবিতায় পর্যাবৃত্ত[১৩] হয়েছে। এছাড়া ৩য় শব্দটি আর- ক অনুপ্রাসটি সবকটি ছত্রেই পুনর্বৃত্ত হয়েছে, যথাক্রমে একবার ও দুবার করে।

(৭)

১ম	২য়-ক	৩য়	২য়-ক
↓	↓	↓	↓
১ম	৪র্থ-ক	৩য়	৪র্থ-ক
	↓	↓	↓
৫ম	২য়-ক	৩য়	২য়-ক
↓	↓	↓	↓
৫ম	৪র্থ-ক	৩য়	৪র্থ-ক

দিকশায়ী রেখায় পুনর্বৃত্তির ধরনটা কিন্তু আলাদা। অর্থাৎ বাম থেকে ডানদিক দিয়ে ছত্ররেখা ধরে দেখলে লক্ষ্য করবো যে ১ম ও ৫ম শব্দদুটি মোটেই পুনর্বৃত্ত হয়নি, আবার ২য় আর ৪র্থ শব্দদুটি নিজের নিজের ছত্রে দুবার করে পুনর্বৃত্ত হয়েছে ৩য় শব্দকে টপকে—অনেকটা অশ্বগতির ঢঙে। পুনর্বৃত্তির এই ধরনটিকে অশ্বাবৃত্তি[১৪] বলা যেতে পারে :

(৮) ১ম ২য়-ক ৩য় ২য়-ক
১ম ৪র্থ-ক ৩য় ৪র্থ-ক
৫ম ২য়-ক ৩য় ২য়-ক
৫ম ৪র্থ-ক ৪য় ৪র্থ-ক

(৫)-এর ছকে পুনর্বৃত্তিকলার ছত্রশায়ী এই স্বরূপটি ধরা পড়েনি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পুনর্বৃত্তিকলার বিচিত্র প্রয়োগে দিকশায়িরেখাধৃত ও লম্বমানরেখাধৃত সম্পর্কগুলির ঘাত-প্রতিঘাতে মুখে মুখে রচিত এই ছোট্ট কবিতাটি একটি সুঠাম সৌকর্য লাভ করেছে। এই সৌকর্য শুধুমাত্র কাব্যছত্রে সুমিত যতিপাতনজনিত ধ্বনিতরঙ্গভঙ্গ দ্বারা সম্ভব হয়নি —ছন্দ-অতিরিক্ত, অন্তত আলোচ্য কবিতাটির ক্ষেত্রে, পুনর্বৃত্তিকলার জটিল প্রয়োগেই কাব্যসৌন্দর্যের দ্বিতীয় মাত্রাটিকে উপলব্ধি করা যাচ্ছে।

মূল কবিতাটি সম্পর্কে এই পর্যন্তই যথেষ্ট। এইবার দেখবো অনুবাদে কী ভাবে এই সব কাব্যশৈলীকলা[১৫] রক্ষা করা যাবে। সকলেই বলবেন— (২)-এর ছকে যে বাংলা আক্ষরিক প্রতিশব্দ-গুলি বসিয়েছি—সেগুলিকে ঐ ভাবে সাজালে যা দাঁড়ায়—তাকে পদ্য বা গদ্য কিছুই বলা যাবে না। এখানে বিকল্প প্রতিশব্দাবলীর সুযোগ নিতে হবে, দরকার হলে বাক্‌রীতিও পাল্টাতে হবে :

(৯) বসলাম এলাম এলাম।
বসলাম দাঁড়াই দাঁড়াই॥
বাঁচলাম এলাম এলাম।
বাঁচলাম দাঁড়াই দাঁড়াই॥

এও কেউ মেনে নেবে না। কালবাচক তফাৎটাকে ('আম' / 'আই' ক্রিয়াবিভক্তি) বাদ দিলেও, বসার পাশে দাঁড়াই শব্দ বসালে দাঁড়ানোর বাগ্‌বিধিগত অর্থটা খোয়া যায়, বরং এক্ষেত্রে পাঠকের উঠবস করার কথাটাই হয়তো মনে আসবে। শব্দের অনেক হেরফের করে, অন্য প্রতিশব্দের সুযোগ নিয়ে যদিবা অনুপ্রাস—পূর্ণত বা অংশত—রক্ষা করা যায়, মূল কবিতার পুনর্বৃত্তিকলার জটিল সজ্জাকে বাংলা রূপান্তরে আনা অসম্ভব মনে হয়েছে আমার।

(১০) এলাম বসলাম এলাম।
এলাম থাকলাম বসলাম॥
এলাম বসলাম এলাম
এলাম বাঁচলাম বসলাম॥

এও কেউ মেনে নেবে বলে মনে করি না। যদিও এই রূপান্তরে অনুপ্রাস ও পুনর্বৃত্তিকলার আংশিক গুণগুলিকে রক্ষা করা হয়েছে। এখানে অনুপ্রাসের অতিরিক্ত ব্যবহার বা একঘেয়েমির কথা বাদ দিলেও—সবটা মিলে কোনো ভাববস্তু ফুটে উঠছে না, কবিত্ব বা পদ্যত্বরও কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তাই আমি এই সমস্যার সমাধান করতে চাই অন্যভাবে :

(১১) এলাম বসলাম অপেক্ষায়
অপেক্ষায় থাকা অপেক্ষায়।
এলাম বসলাম নিলাম ডেরা
অপেক্ষায় তাও অপেক্ষায়॥

এই বাংলারূপান্তরটির দোষগুণ বিচারের আগে, মূল কবিতাটি যিনি সংগ্রহ করেছেন, তাঁর[১৬] কৃত ইংরেজি রূপান্তরটি দেখা যাক :

(১২) I come. I come and sit.
I wait. I wait and sit.
I come. I come and live.
I wait. I wait and live.

মূল কবিতার ছত্র ছিলো দ্বিপর্বিক : আমু মাইনা / লা মাইনা। ইংরেজি অনুবাদে ছত্র হয়েছে ত্রিপর্বিক—আয়াম্বিক ছন্দে। ছত্রান্তিক মিল অনুবাদে ত্যক্ত হয়েছে—তার জায়গা নিয়েছে অন্ত্যপর্বের

পুনর্বৃত্তি। আসলে পুনর্বৃত্তিকলাকেই অনুবাদে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের (৬)-এর ছকটিকে একটু সরলীকৃত করে নিয়ে তার সঙ্গে এই ইংরেজি অনুবাদের পুনর্বৃত্তিকলাসজ্জা তুলনা ক'রে দেখবো এবার :

(১৩) আমু (১) মাইনা (২) লা মাইন (২)
(I) sit/ (I) come/ (I) come

আমু (১) তাইনা (৩) লা তাইনা (৩)
(I) sit/ (I) wait/ (I) wait

মিআ (৪) মাইনা (২) লা মাইনা (২)
(I) live/ (I) come/ (I) come

মিআ (৪) তাইনা (৩) লা তাইনা (৩)
(I) live/ (I) wait/ (I) wait

মূলের ছন্দোগত প্রথম ছত্রার্ধকে ভেঙে অনুবাদে দুটি পর্বে রূপান্তরিত করা হয়েছে, দ্বিতীয় ছত্রার্ধ অনুবাদে পুরো একটি পর্বের সম্মান পেয়েছে। এই পরিবর্তনে অনুবাদক ভিত্তি হিসেবে নিয়েছেন মূলের অর্থদ্যোতক য়ুনিটগুলিকে, ছন্দোভাগকে নয়। মূল রচনাটির সজ্জা ছিলো

(১৪)	১	২	২
	১	৩	৩
	৪	২	২
	৪	৩	৩

মূলের অর্থদ্যোতনাময় পুনর্বৃত্তিকলাকে ভিত্তি করার জন্য অনূদিত রচনাটির অবয়বে পুনর্বৃত্তির রেখাশায়ী ও লম্বমান স্বভাব দুটি পরিস্ফুট হতে পেরেছে। কিন্তু অনুবাদটিতে য়ুনিটগুলিকে প্রতিছত্রে বিপরীতমুখী করে দেওয়া হয়েছে :

(১৫)	২	২	১
	৩	৩	১
	২	২	৪
	৩	৩	৪

এর ফলে যে ছোটখাটো পরিবর্তনগুলি ঘটেছে, তার খুঁটিনাটিতে যাবো না। শুধু এটুকু উল্লেখ করবো যে আয়াম্বিক পর্বের আদ্যংশ নির্বল বা অপ্রস্বরিত হলেও অন্তত 'and' অংশটি লম্বমান পুনর্বৃত্তির ফলে যে-স্তম্ভটির সৃষ্টি হয়েছে, তা মূল কবিতার 'লা' (অন্ত্যপর্বের আদ্যংশ)-সৃষ্ট স্তম্ভের সমান মর্যাদা পেয়েছে। মোটামুটি ইংরেজি অনুবাদের মূলের ভাববস্তু ও অবয়ব—দুইই রক্ষিত হয়েছে।

এবার দেখবো আমার প্রস্তাবিত অনুবাদটিতে (১১-এর ছক) কী ধরনের পরিবর্তন স্থান পেয়েছে। ছন্দের দিক দিয়ে আমি সাত-মাত্রার চালে অনুবাদটিকে উপস্থাপিত করেছি। মিলের দিকে দৃষ্টি দিইনি। আমিও পুনর্বৃত্তিকলাকে ভিত্তি করে নিয়েছি। প্রস্তাবিত বাংলা রূপান্তরের

দিকে ভালো করে দৃষ্টি দিলে এই কয়টি পরিবর্তন ও বৈশিষ্ট্য সকলেরই গোচরীভূত হবে :

১ ॥ ছন্দের দিক দিয়ে মূলের ছত্র দ্বিপর্বিক, ইংরেজির ছত্র দ্বিপর্বিক—কিন্তু পর্বদুটি অসমান—প্রথমটি সাত-মাত্রার, দ্বিতীয়টি পাঁচ-মাত্রার।

২ ॥ প্রতি স্তবকের দ্বিতীয় ছত্রের একটি য়ুনিটকে প্রথম ছত্রে নিয়ে আসা হয়েছে, যেমন 'তাইনা' (I wait, এখানে 'অপেক্ষায়')।

৩ ॥ অন্তঃকলা বা পুনর্বৃত্তিকলাগত ভাগের দিক দিয়ে মূলের ছত্র ত্রিভাগিক (১৪)-এর ছক), ইংরেজির ছত্রও (১৫)-এর ছক) ত্রিভাগিক, কিন্তু বাংলা রূপান্তরের ক্ষেত্রে স্তবকের প্রথম ছত্র ত্রিভাগিক (এলাম / বসলাম / অপেক্ষায়), দ্বিতীয় ছত্র দ্বিভাগিক (অপেক্ষায় থাকা / অপেক্ষায়)। তাই গুনতিতে মূলে ও ইংরেজিতে ভাগগুলির মোট সংখ্যা যেখানে বারো, বাংলায় সেখানে দশ।

৪ ॥ মূলে এবং ইংরেজিতে পুনর্বত্তি-য়ুনিট ছিলো দুজাতের : এক জাত (আনু 'and sit', 'মিআ' 'I live') মাত্র দুবার করে পুনর্বৃত্তি হয়েছে লম্বমান রেখায়, অন্য জাতটি ('মাইনা' 'I come' ইত্যাদি) চারবার করে পুনর্বৃত্ত হয়েছে, এবং পুনর্বৃত্তি লম্বমান ও দিকশায়ী– উভয় রেখা ধরেই হয়েছে। 'লা'টিকে ধরলে এটিই একমাত্র লম্বমান রেখায় পুনর্বৃত্ত হয়ে একটি স্তম্ভের সৃষ্টি করেছে। ইংরেজিতে 'and' পর্বাংশটি, পূর্বেই দেখিয়েছি, এই জাতীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কিন্তু বাংলা রূপান্তরে পুনর্বৃত্তি-য়ুনিট হলো তিন জাতের : প্রথম জাতটি ('এলাম' 'মাইনা', 'বসলাম' 'আনু') মাত্র দুবার পুনর্বৃত্ত হয়েছে ; মূলে ও ইংরেজিতে এই জাতের য়ুনিট স্তবক-অভ্যন্তরে পুনর্বৃত্ত হয়েছে, কিন্তু বাংলায় স্তবকান্তরে পর্যাবৃত্ত হয়েছে। দ্বিতীয় জাতটি (মাত্র একটি য়ুনিট 'অপেক্ষায়' 'তাইনা' 'I wait') পাঁচবার পুনর্বৃত্ত হয়েছে—দিকশায়ী রেখা ধরে, আবার ছত্রান্তরে অর্থাৎ লম্বমান রেখা ধরেও (লক্ষ্য করবো, দিকশায়ী রেখায় হুবহু পুনর্বৃত্ত হয়নি—ছত্রের আন্ত্যংশে ('অপেক্ষায় থাকা' 'অপেক্ষায় তাও') বাড়তি শব্দের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে)। তৃতীয় জাতটি (মাত্র একটি য়ুনিট 'নিলাম ডেরা' 'মিআ' 'and live') মাত্র একবার উক্ত হয়েছে—অর্থাৎ এর পুনর্বৃত্তিই ঘটেনি। সব মিলিয়ে মূলে ও ইংরেজিতে যে-য়ুনিটগুলির মধ্যে একটা দ্বিভাজ্যতা[১৭] ছিলো, বাংলায় তার জায়গা নিয়েছে ত্রিভাজ্যতা।[১৮]

৫ ॥ দ্বিভাজ্যতা থেকে ত্রিভাজ্যতায় য়ুনিটগুলিকে আনার জন্যে দুটি ক্ষেত্রে পুনর্বৃত্তি-য়ুনিটে ('অপেক্ষায় থাকা', 'অপেক্ষায় তাও') অন্তর্ভুক্তি[১৯] বা নিহিতি-র[২০] ধর্ম দেখা দিয়েছে। 'আনু' ('and sit' 'বসলাম') য়ুনিটটি মূলে ও ইংরেজিতে দ্বিতীয় ছত্রে পুনর্বৃত্ত হয়েছে, কিন্তু বাংলা রূপান্তরে তৃতীয় ছত্রে পুনর্বৃত্ত হয়েছে—শুধু তাই নয়, স্তবকাভ্যন্তরে দ্বিতীয় ছত্রে 'অপেক্ষায় থাকা' এই য়ুনিটে থাকা শব্দটির দ্বারা 'বসলাম' য়ুনিটের দ্যোতনাটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'বসলাম' ('আনু' 'and sit') য়ুনিটের পুনর্বৃত্তি বাংলা দ্বিতীয় ছত্রে ঘটেনি বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হলেও, 'অন্তর্ভুক্তি' বা 'নিহিতি'-র গুণটিকে মানলে বলতে হয় যে 'বসলাম' য়ুনিটের প্রচ্ছন্ন পুনর্বৃত্তি ঘটেছে থাকা শব্দটির মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় স্তবকে 'নিলাম ডেরা' ('মিআ' 'and live') এই ভাবে 'অপেক্ষায় তাও'-এর তাও-এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত রয়েছে কিনা সে-বিষয়ে আমি খুব নিশ্চিত নই। যদি ধরে নিই

যে এখানে "নিহিত" ঘটেনি, তাহলে এটাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। বলতে হবে যে এই শব্দটি একেবারে নতুন আমদানি—এটির ইঙ্গিতও মূল মেকিও কবিতাটিতে ছিলো না। কিন্তু ভাষান্তরে এটুকু স্বাধীনতা অনুবাদককে দিতে হবে।

৬॥ আর একটি ছোট্ট প্রসঙ্গের উল্লেখ করবো। সেটি হলো বাংলা রূপান্তরে লম্বমান রেখাধৃত পুনর্বৃত্তিদ্বারা কোনো রকম স্তম্ভসৃষ্টি সম্ভব হয়নি।

বাংলা রূপান্তরে তাহলে কিছু বাড়তি উপাদান এসেছে, মূলের কোনো কোনো উপাদানের অভাব ঘটেছে, আর কাব্যিক অন্তঃকলার ভিত্তিস্বরূপ মূলের পুনর্বৃত্তিকলাটিকে একটু পরিবর্তিত করে নেওয়া হয়েছে—এই তিনটি দিক মনে রাখলে মেকিও কবিতা ছয়টির যে ভাষান্তরমূর্তি নিচে উপস্থাপিত করছি, তার স্বরূপ ও তাৎপর্য বোঝা সহজতর হবে।

বাংলায় রূপান্তরিত মেকিও কবিতাবলী

এক : ডেরা

এলাম বসলাম অপেক্ষায়
অপেক্ষায় থাকা অপেক্ষায়।

এলাম বসলাম নিলাম ডেরা
অপেক্ষায় তাও অপেক্ষায়॥

দুই : রাঙাপাতা

ঘোরাই রাঙাপাতা নড়াই ফুরফুর
তাকিয়ে ত্যাখ রাঙা পাতার রং।

এই নে রাঙা পাতা, এবার আয়
এই নে সবজেটি, এবার আয়।
আমার পাতা তুই সবুজ বোঁটা তুই সবুজ বোঁটা।
আমার গেরি-রাঙা পাতার মুখ তুই পাতার মুখ॥

তিন : আইআ[২১]

আইআ হাঁটেন রাস্তায়
আইআ উদোম আইআ
হাঁটছেন তিনি হাঁটছেন।

খুঁজলে আমার হাতে দোষ কিছু পাবে না

আইআ উদোম আইআ
আমার নিখুঁত হাতে দোষ কিছু পাবে না।

আইআ নাচান বর্শা
আইআ উদোম আইনা
নাচান ঘোরান বর্শা।

আইআ করেন রণ প্রসাধন
আইআ উদোম আইআ
আইআ চড়ান যুদ্ধের সাজ গায়ে॥

চার : কামতন্ত্র[২২]

এসেই পড়বো ঢুকে
কামিনী, তোমার বুকে।
'কাপোক' পাতার জাদুতে লটকে মজে
কাঁদুনে পাতার ঝাঁজে গুজরাবে সুখে॥

পাঁচ : ঘুমপাড়ানি ছড়া[২৩]

গেছেন বাপ তোর
    শিকার সন্ধানে—
        ঘুমো রে, বাপধন, ঘুমো।
মা তোর ছুটেছেন
    মাছের সন্ধানে—
        ঘুমো রে, মা-মণি, ঘুমো॥

ছয় : ঘুমপাড়ানি গান

"পোপেলেবা" পাহাড়চুড়োয়
দোলে আমার খোকা
দোলে আমার খুকু॥

টীকা

[টীকাধৃত পারিভাষিক শব্দগুলিকে নক্ষত্রচিহ্নে ভূষিত করা হলো]

১ Stylistics অর্থে শৈলীশাস্ত্র* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

২ পাপুয়া—নিউগিনির সেন্ট্রাল-ডিস্ট্রিক্টের পশ্চিমাঞ্চলে Mekeo-দের বাস। এদের জাত্যভিমানপুষ্ট সংস্কৃতি গুরুত্বের দাবী রাখে।

৩ Oral অর্থে মুখবাহিত* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

৪ Myth অর্থে অতিকথা* শব্দটির উদ্ভাবক রাজশেখর বসু।

৫ Memorization device—স্মরণকলা*।

৬-৭ Traditional—ইতিশ্রুত*, ইতিবাহিত*।

৮ Internal (Poetic / stylistic) device—অন্তঃকলা*।

৯ "লা" হ'লো মেকিও ভাষার একটি আশ্রিত বা অব্যয়বাচক শব্দ (bound morph, grammatical particle)।

১০ Repetative device—পুনর্বৃত্তিকলা*।

১১ Vertical—লম্বমান*।

১২ Horizontal—দ্বিকশায়ী*।

১৩ Alternate (repetation)—পর্যাবৃত্ত*।

১৪ Galloping repetation—অশ্বাবৃত্তি*।

১৫ Stylistic device—শৈলীকলা*।

১৬ মোটরগ্যারাজকর্মী কবিযশঃপ্রার্থী Allan Natachee নিজে মেকিও এবং স্বসংস্কৃতিরক্ষণে উৎসাহী। মুখবাহিত কবিতা ও লোকাখ্যান প্রচুর সংগ্রহ করেছেন ইনি। এঁর সংগৃহীত কিছু মুখবাহিত কবিতার সংকলন AIA নামে প্রকাশিত হয়েছে Papua Pocket Poets গ্রন্থমালার সপ্তম খণ্ড হিসেবে ১৯৬৮ সালে।

১৭ Binary—দ্বিভাজ্যতা*।

১৮ Trinary—ত্রিভাজ্যতা*।

১৯ Incorporation—অন্তর্ভুক্তি*।

২০ Embedding—নিহিতি*।

২১ 'আইআ' এক দেবপুরুষ বা কালচার-হিরো। মেকিও অতিকথামূলক আখ্যানাবলীতে আইআ চরিত্র খুবই মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ।

২২ 'কামতন্ত্র' নামধেয় রূপান্তরটি একজাতীয় জাদুজালছড়া বা magical spell। 'কাপোক' গাছের পাতা এই জাদুজালক্রিয়ায় ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে।

২৩ শিকারসন্ধান আর মাছের সন্ধান—এই দুটি বিপরীতধর্মী জীবিকা নিউগিনির সাধারণ সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে। এখানে ছোটবড় জন্তুশিকার পুরুষের জীবিকাধর্ম, আর মাছ শিকার মেয়েদের জীবিকাকর্ম। নিউগিনির তটভূমির এলাকাগুলিতে মাছ শিকার জন্তু শিকার দুইই একরকম পুরুষের অধীনে; বাগানচাষ মেয়েদের অধীনে। মেকিওরা তটভূমির উপজাতি নয়, এরা ভূখণ্ডের অভ্যন্তরভাগের অধিবাসী তাই, বাগানচাষ ছাড়াও নদীতে মাছশিকারও মেকিও রমণীদের অধীনে।

সমালোচনা

কবিতার শত্রু ও মিত্র—বুদ্ধদেব বসু। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ। কলিকাতা ১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

"কবিতার শত্রু ও মিত্র" বইটি বাংলা সাহিত্যের একজন সার্থক কবির এবং গদ্যলেখকের শেষ রচনা-সংকলন—যেখানে তিনি মূলত ভাবিত হয়েছিলেন কবিতা বিষয়েই। কবিতা কী, কেন ; কবিতাকে কেমন করে তার এলাকা থেকে ভ্রষ্ট করার আয়োজন হয় ; শেষ অবধি কবিতা আমাদের কী দেয় —এসব আলোচনায় লেখক মসগুল হয়েছেন। এর সঙ্গেই রয়েছে একটি প্রবন্ধ 'কবিতা ও আমার জীবন'। এটি বুদ্ধদেব বসুর কবিতা আলোচনার জন্য একটি প্রয়োজনীয় দলিল। সে কারণেই এই গ্রন্থের প্রতিটি পংক্তি বিশেষ করে মনে পড়িয়ে দেয় সেই সতত সক্রিয়, অক্লান্ত ভাবুককে।

'কবিতার শত্রু ও মিত্র' প্রবন্ধটি এবং 'চরম চিকিৎসা' প্রহসনকল্প রচনাটি আকারে প্রকারে পৃথক হলেও দুটি লেখাই পরোক্ষে একই ভাবানুষঙ্গ বহন করছে। সেই সময়ে এই বাংলাদেশে প্রতিটি মুহূর্ত হয়ে উঠেছিল হননের রক্তে ক্লেদে সমাপ্লুত—দুই অর্থে 'হনন' কথাটি গ্রাহ্য, চরিত্রহনন ও ব্যক্তি-হনন। ওদিকে সেই সময়েই বাংলা সাহিত্যে "প্রজাপতি", "পাতক" এবং "রাতভোর বৃষ্টি" এক উত্তেজনা এবং আলোড়নের সৃষ্টি করে। সে উত্তেজনার জের আদালত অবধি গড়ায়। আদালতী রায় কোনোদিন সাহিত্য-সমালোচনায় নজির হিসাবে গৃহীত হবার সম্ভাবনা না থাকলেও অনেক সময় দেখা যায় যে, সংবেদনশীল লেখক সেই আদালতী অভিঘাত থেকে চিন্তার নতুন খোরাক খুঁজে পান। মনে করি না—কেউই করেন না—যে আদালত সাহিত্য বিচার করতে পারে। আদালত আইনভঙ্গ হয়েছে কিনা তার বিচার করে মাত্র, সাহিত্যগুণ-বিচার তার জুরিস্‌ডিক্‌শনের বাইরে। অমুক বইটা রাজদ্রোহমূলক হয়েছে, এই আদালতী রায়ের ফলে একদা সেই বইয়ের বিক্রয়সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। সাহিত্য-বিচারের প্রশ্ন ঢাকা পড়েছে। তেমনি শিল্প সমাজের শান্তিভঙ্গ করছে কিনা আদালত এ বিচার যখন করে, তখন সে এক অসাহিত্যিক প্রশ্নের বিচার করে। আমাদের সঙ্গে এ প্রশ্নের কোনো প্রকার আবেগগত যোগ নেই। কিন্তু একজন চিন্তাশীল লেখক যে-কোনো বহির্জাগতিক ঘটনার আঘাতেই চিন্তার ক্ষেত্রে সক্রিয় হতে পারেন। সেইরকমই একটি নিদর্শন আলোচ্য বইয়ের কবিতার শত্রু-মিত্র-ভাবনা এবং আর একটি 'চরম চিকিৎসা'। হয়তো তাই 'কবিতার শত্রু ও মিত্র' প্রবন্ধে 'দেবীকে জিতিয়ে দিতে পেরেছিলাম', 'বিশাল বিতর্কময় সেই মামলা', 'আমি যাদের প্রধান ফরিয়াদী বলে উল্লেখ করেছি', 'কেননা আমরা জামিনে খালাশ আছি অন্তত'—ইত্যাকার উক্তিপুঞ্জ সেই জাগতিক ঘটনার দান বলেই মেনে নিতে হয়। লেখক যেভাবে এই প্রবন্ধে ফরিয়াদি-পক্ষ সাজিয়েছেন তা রীতিমতো কৌশলী সমাবেশ। আসামী যেক্ষেত্রে সুন্দরী দেবী, সেক্ষেত্রে ফরিয়াদি যত অকাট্য হয়, দেবীর অসহায়তাই তত জুরর মহোদয়গণকে দেবীর অনুকূল

করে তোলে—এই মামলা-বুদ্ধির চমৎকার প্রয়োগ ঘটেছে প্রথম প্রবন্ধটিতে। সব থেকে জোরালো ফরিয়াদ টলস্টয়ের—সেই ছিন্নমস্ত ঋষির। সব থেকে জোরালো আসামী পক্ষীয় সাক্ষী সক্রেটিস। সব মিলিয়ে প্রবন্ধটির উপভোগ্যতা সন্দেহাতীত। যদিও মনে করি, তর্কের মূল ভিত্তি একটু ধসে যায়, যখন আমাদের জানা থাকে যে, প্রাচীনতম অ্যারিস্টট্‌ল ও প্রাচীনতর অভিনবগুপ্ত কেউই নীতি দুর্নীতি ইত্যাদির সঙ্গে শিল্পসাহিত্যকে জড়িয়ে নেননি। এরকম ক্ষেত্রে মামলার মধ্যে না গিয়ে যেকোনো পক্ষকে নিজ নিজ আদালতে 'এক্‌স্ পার্টি' জিতে যেতে দেওয়াই ভাল। তা না হলে ব্যাপারটা হয়ে যায় দুই দেশের শান্তি আলোচনা—এ আলোচনায় সিদ্ধান্তে পৌছতে গেলে দুই পক্ষকেই কিছু কিছু ছাড়তে হয়। 'একান্তভাবে শিল্পকলার কাছে যা প্রাপণীয়, সেটা কী'?—এই প্রশ্নটা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক। এর উত্তরে লেখক যখন বলেন: সভ্যতার একটি লক্ষ্য হলো সামঞ্জস্য স্থাপন, যখন বলেন: যা এই বহুবাঞ্ছিত অতিদুর্লভ সামঞ্জস্যরই প্রতিমূর্তি তা হল শিল্পকলা, তখন আমরা বুঝি যে, চুয়াল্লিশ পাতা ধরে সওয়াল জবাবের পর মামলাটিকে তাঁকে চিরকালের জন্য মুলতুবি রাখতে হচ্ছে। বিনিময়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে অন্য একটি সিদ্ধান্ত—'শিল্পকলা অবিকল ভাবে সুসমঞ্জস'। জীবনের জন্যই শিল্প—বুদ্ধদেব বসু অনুমোদিত এই পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত-তত্ত্ব এই সামঞ্জস্য-তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত। 'সামঞ্জস্য' কথাটি অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের 'ঐক্য' তত্ত্ব থেকে খুব দূরে নয়। 'কেকাধ্বনি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেও মানসিক আনন্দ প্রসঙ্গে সামঞ্জস্য সংস্থাপনের কথা বলেছেন। তথাপি বুদ্ধদেব বসু বিষয়টিকে একটি নতুন মাত্রা দিয়েছেন। 'অপ্রয়োজনের আনন্দ' থেকে শিল্পলক্ষ্যকে সরিয়ে তিনি এই মাত্রার সাহায্যেই বলেন 'শিল্পকলা কোন্ বিশেষ অর্থে প্রয়োজনীয়'। 'শৃঙ্খলা—তা সংসারজীবনে কোথাও যদি নাও থাকে, তবু আছে ছন্দোবদ্ধ কোনো চরণে, কোনো সুগঠিত গদ্য বাক্যে, সুর অথবা রেখার কোনো বিন্যাসে—আছে এবং থাকতেই হবে'—এই হলো জীবনে সেই দেবীর ভূমিকা। এমন কথা এমন করে তিনি যখন বলেন, তখন মামলার কথা আর মনে থাকে না, ভুলে যাই অপঘাত-সমাকীর্ণ ক্ষণকালের ইতিহাস। মনে থাকে শুধু সেই অবিচল কবিতাপ্রেমিককে।[১]

'চরম চিকিৎসা' রচনাটিকে প্রহসন বলে গ্রহণ করলে উপভোগে কোনো বাধা থাকে না। কিন্তু যদি 'প্রবীণ লেখকের' ইশতেহারটিকে লেখক বুদ্ধদেব বসুর আত্মপক্ষসমর্থনের সমার্থক বলে দেখি, তা হলে একটা কথা বলার আছে। 'প্রবীণ লেখক' বলছেন, 'জগৎ ভরে কে না দেখেছে কুক্কুট, পারাবত ও চটক পক্ষীর তৃপ্তিহীন লাম্পট্যের দৃশ্য, জোনাকির যৌন আলোকবিন্দু, ময়ূরের

১ এই আলোচনার সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, তবু বলি শ্রী বসুর একটি পত্রাংশে যখন দেখি, তিনি বলছেন, 'আমি আশীর্বাদ করি আমার দুই দৌহিত্র চাঁদে যাক, বা আন্দামানের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হোক, বা হিমালয়ে আলুর ফসল ফলাক…কিন্তু কবিতার 'ক' অক্ষর কখনো যেন তারা না'জানে' (কলকাতা/বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা), তখন তার সঙ্গে খুঁজে পাই রুশোর আত্মজদের সম্বন্ধে কথিত এই উক্তির মিল—'বেছে নিতে পারলেও আমি তাদের লেখক অথবা কেরানি ক'রে তুলতাম না, আমি চাইতাম তারা লাঙল হাতে নিক, বা ছুতোর মিস্ত্রি হোক'। অথচ তিনি তো রুসোপক্ষীয় নন, তিনি তো দেবীপক্ষীয়। তিনি আজ অগুনতি বাঙালী কবির কাব্যস্রোতকে বৃক্ষ থেকে নির্গত অনর্গল মূত্রের সঙ্গে তুলনা করলেন। এ যেন কতকটা সেই দেবতার আক্ষেপ—যিনি শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়ে ফেলেন। তাঁর অবস্থা তো তা ছিল না। যাকে তিনি অনিয়ন্ত্রিত অনর্গলতা বলছেন, তার মধ্যে যদি একটা—একটাও ঠিকমতো সনেট থেকে যায় তাহলে তাকে তো কোনো মহাকবিও বাদ দিতে বলতে পারেন না। কথাটা নিশ্চয় তাঁর পরিচিত।

যৌননৃত্য, কে না শুনেছে বসন্তকালে পুংস্কোকিলের কামাতুর চিৎকার ? ফুল, যা বৃক্ষের যৌনাঙ্গ, এক অগুপ্ত উভলিঙ্গ উচ্ছ্বাস—তার মতো অশ্লীল আর কী আছে ?' ঈস্থেটিকস-এর সাবজেক্‌ট অবজেক্‌ট বিষয়-বিষয়ীর তর্ক এখানে বাদ দিলেও, একটা কথা না বলে পারি না। বিশ্বরচয়িতা লেখকের উদ্ধৃত ঐ সমস্ত ব্যাপারকে বিরাট বিশ্বকাব্যের পটে পরিবেশে এমনভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন যে, তিনিও হয়েছেন এক 'নমস্য শিল্পী', যিনি উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে গেছেন, উপকরণকে করেছেন আত্মসাৎ। তাই বিশ্বশিল্প সম্বন্ধে কখনো রসের ক্ষেত্রে অন্তত, অশ্লীলতার অভিযোগ ওঠে না—আদালতের কথা বলতে পারি না। আমাদের কি বিষয়টি এই ভাবেই দেখা উচিত ? রুবেন্‌স্ বা বতিচেল্লি, কালিদাস বা খাজুরাহোর শিল্পী এভাবেই অতিক্রান্ত হয়েছেন উপকরণকে। আমাদের নিশ্চয় মনে আছে জয়দেবের সঙ্গে কালিদাসের তারতম্য নির্ণয়ে 'আবর্জিত কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং' অংশের রবীন্দ্রভাষ্য। নিশ্চয় জানি আমরা সেখান থেকেই, এবং আরো অনুরূপ নানাপ্রসঙ্গ থেকে, কেমন করে অংশ মিলে যায় সমগ্রে। আর সমগ্র ? সে শ্লীলও নয়, অশ্লীলও নয়, সে শুধুই সমগ্র।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

মধুসূদন ও নবজাগৃতি— মোবাশ্বের আলী। মুক্তধারা। ঢাকা। মূল্য বারো টাকা।

রাজনৈতিক কারণে যখন বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ল, তখন অনেকেরই মনে হয়েছিল, বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতি বুঝি তার অনুসরণ করবে। এ ধারণা তখনকার দিনে যে একেবারে অমূলক ছিল, তা হয়তো বলা যাবে না। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী কয়েক বছরে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত, তিক্ত-মধুর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, অন্ততপক্ষে সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রায় অখণ্ডিত থেকে গেছি।

বস্তুত, একথা নতুন করে মনে পড়ল মোবাশ্বের আলীর "মধুসূদন ও নবজাগৃতি" পড়ে। নতুন ক'রে, কেননা আগেকার সেই শান্তিনিকেতনের সাহিত্যমেলা থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক নানা সাহিত্যসভার আয়োজনের দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও বলতে হয়, আমাদের পারস্পরিক সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র এখনো সুপ্রসারিত নয়। সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে অত্যুৎসাহী স্বল্পসংখ্যক লেখক ও পাঠক ছাড়া সাধারণভাবে এখনো আমরা বহুলপরিমাণে এ বিষয়ে নীরব বা উদাসীন, কারণ যাই হোক। এমন অবস্থায় মোবাশ্বের আলীর বইটি যখন হাতে এল, এখন মনে হল—বাংলার পূর্বপ্রান্তে এমন কিছুসংখ্যক সাহিত্যের পাঠক ও লেখক রয়েছেন, যাঁরা নিরলস অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার সঙ্গে সব কিছু সংকীর্ণতার উপরে উঠে সাহিত্যচর্চায় ব্রত। সাতচল্লিশ-পরবর্তী আমাদের এখানে মধুসূদনচর্চার ক্ষেত্রে যেমন নানা দিগন্ত উন্মুক্ত হয়েছে, ওখানেও তেমনি নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে মধুসূদনের নবমূল্যায়নের চেষ্টা হয়েছে।

গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে। বর্তমান সংস্করণটি শুধু কলেবরে নয়, অন্যদিক থেকেও নতুনই বলা চলে। প্রথম সংস্করণে ছিল দশটি অধ্যায়, বর্তমান সংস্করণে আরো ছ'টি অধ্যায়

সংযোজিত। অনুমান করা যায়, প্রথম প্রকাশের পর লেখক মধুসূদনকে আরো গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন, তাঁর চিন্তার ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হয়েছে। এই কারণে, দ্বিতীয় সংস্করণের সংযোজন শুধুমাত্র বাহ্যিক পরিপূরণ নয়, বলা যায়, গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয় ও পরিকল্পনাকে ব্যাপকতা দিয়েছে।

বইটির নামকরণের দিকে লক্ষ্য রাখলেই লেখকের অন্বিষ্ট সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। উনিশ শতকের বাংলায় য়ুরোপীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের স্পর্শে যে নবজাগরণ ঘটেছিল, তারই যোগ্য প্রতিনিধি মধুসূদন এবং তার মূর্ত প্রকাশ তাঁর সাহিত্যে। মোবাশ্বের আলী এই ধারণার উপর ভিত্তি করে পর্যায়ক্রমে মধুসূদনের কবিপ্রতিভা, তাঁর ব্যক্তিমানস ও সর্বোপরি তাঁর কাব্যের মূল্যায়ন করেছেন। তার আগে তিনি নবজাগরণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। যেন, লেখক চারদিক থেকে আলো ফেলে মধুসূদন ও তাঁর সাহিত্যকৃতিকে দেখতে চেয়েছেন। খণ্ডিত রূপে নয়, তাঁর গ্রন্থে মধুসূদনের একটি সার্বিক পরিচয় দেবার প্রয়াস স্পষ্ট। মধুসূদনের সমগ্র সত্তাকে তুলে ধরবার জন্য তিনি মূলত নির্ভর করেছেন মেঘনাদবধকাব্যের উপর। মোহিতলালও তাই করেছেন। এদিক থেকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী যুক্তিহীন নয়, কিন্তু তবু, তিনি যদি মধুসূদনের সৃষ্টির অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিচরণ করতেন তাহলে তা তাঁর উদ্দেশ্যকে আরো সার্থক করতো। এটা ঠিক, উনিশ শতকের নবজাগরণ ও মেঘনাদবধকাব্য গভীর ভাবে সম্পৃক্ত। কিন্তু বীরাঙ্গনাকাব্যকেও কি অনুরূপ গুরুত্ব দেওয়া চলে না? অথবা মধুসূদনের অন্যান্য রচনায় গৌণভাবে কি নবজাগৃতির প্রভাব পড়েনি?

আমরা জানি, গোড়া থেকেই মধুসূদন-সমালোচনার তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। এক, যাঁরা নিছক প্রশংসা করেছেন; দুই, যাঁরা নিছক নিন্দা করেছেন। তৃতীয় আর-একটি গোষ্ঠী—যাঁরা মধ্যপথ অবলম্বন করেছেন। এই গ্রন্থের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য লেখক সম্পূর্ণভাবে একটি বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। আবেগের বশে নয়, যুক্তিনিষ্ঠ বলেই 'মধুসূদনের অসংগতি'-র মতো একটি আলোচনা সম্ভব হয়েছে। অসঙ্গতির আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। বাস্তবিক পক্ষে একালের মধুসূদন-চর্চায় মোবাশ্বের আলীর "মধুসূদন ও নবজাগৃতি" উল্লেখযোগ্য সংযোজন, সন্দেহ নেই। লেখক সাম্প্রতিক সাহিত্যপাঠ ও সমালোচনার সূত্র অবলম্বনে মধুসূদনের মূল্যায়নে, মধুচর্চার ক্ষেত্র আরো প্রসারিত করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ একটি বিষয় উল্লেখ করছি। মাঝে মাঝে যেসব উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেগুলির যথোচিত সূত্র-সংকেত উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া, তিনি আলোচনার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এমন কি ডস্টয়ভস্কি, হেমিংওয়ের উপন্যাসের প্রসঙ্গ তুলেছেন। এইসব প্রসঙ্গ উত্থাপনের সার্থকতা কোথায়? অথবা মধুসূদনের কবিচিত্ত বা কাব্যকৃতির সঙ্গে এর সার্থক যোগ কোথায়?

প্রণয়কুমার কুণ্ডু

Keshoram Industries & Cotton Mills Limited

9/1, R. N. Mukherjee Road,
Calcutta, 1

Manufacturers of Cotton Textiles & Piece Goods, Rayon Yarn, Transparent Cellulose-Film, Sulphuric Acid, Carbon-di-Sulphide, Cast Iron Spun Pipes and Fitttings, Cement, Refractories etc, ctc.

Unit :	*Mills :*
Textile Unit	42, Garden Reach Road, Calcutta, 24
Rayon & T. P. Units	Tribeni, Dist. Hooghly
Spun Pipe Unit	Bansberia, Dist. Hooghly
Cement Unit	Basantnagar, Dist. Karimnagar (A. P.)
India Refractories	Kulti, Dist. Burdwan

Registered with the Registrar
of Newspaper for India under

R. N. No. 5480/57

সকলের সাহায্যে ইউকো ব্যাঙ্ক

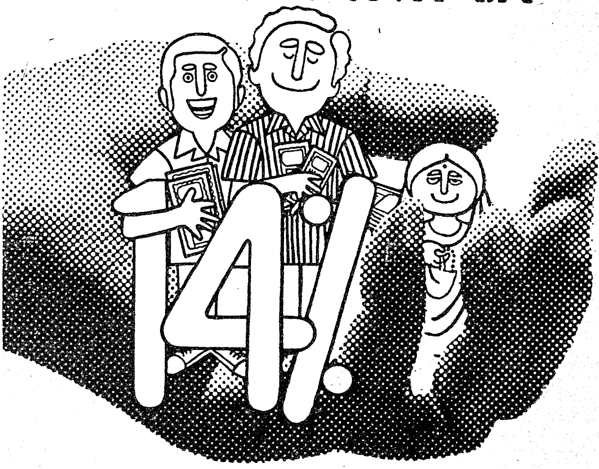

আমাদের কাছে আপনার জমা টাকা এখন শতকরা ১৪ ভাগেরও বেশি কার্যকরী সুদ পাবে

আপনি যদি আপনার জমা টাকার বাড়-বৃদ্ধি চান, তাহলে এখুনি ইউকো ব্যাঙ্কে চলে আসুন। ফিক্সড ডিপোজিটের সুদের টাকা রেকারিং ডিপোজিট প্রকল্পে জমা করে দিয়ে আপনি স্বচ্ছন্দেই শতকরা ১৪ ভাগেরও বেশি সুদ পেতে পারেন। অথবা ১৫ বছরের জন্যে আমাদের ক্যাশ ডিপোজিট সার্টিফিকেট স্কীমে টাকা জমা দিয়ে মেয়াদের শেষে আপনার টাকা ৪ গুণেরও বেশি বাড়িয়ে নিতে পারেন; কাজেই এতে সুদের পরিমাণ দাঁড়াবে শতকরা ২৩ ভাগ।

এছাড়াও, ইউকো ব্যাঙ্কের প্রতিটি শাখাতে সেভিংস, ফিক্সড ডিপোজিট এবং রেকারিং ডিপোজিট স্কীম তো আছেই, উপরন্তু আছে প্রত্যেককে সমান গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত সেবার ব্যবস্থা।

বিশদ বিবরণের জন্যে আপনার কাছাকাছি ইউকো ব্যাঙ্কের শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

জনগণকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করছে

UCOC-74 BEN

চতুরঙ্গ

হুমায়ুন কবির প্রতিষ্ঠিত

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

মাঘ-চৈত্র ১৩৮১

OUR CHEMICALS FOR INDUSTRY & AGRICULTURE

CAUSTIC SODA LYE, SOLID & FLAKES (Rayon Grade), LIQUID CHLORINE, HYDROCHLORIC ACID (Commercial), STABLE BLEACHING POWDER, BENZENE HEXA CHLORIDE (Technical), QUICK & SLAKED LIME

Enquiries to

Kanoria Chemicals & Industries Limited

Head Office : 16A, BRABOURNE ROAD, CALCUTTA, 1
PHONE : 22-2507 · TELEX : 021-3312 · GRAM : KANORCHEM

WORKS : P.O. RENUKOOT : DIST, MURZAPUR, U.P.
PHONE : PIPRI 75, 88 & 95 · GRAM : KANORIA, RENUKOOT

নিবেদন

চতুরঙ্গের ছত্রিশ বৎসর পূর্ণ হল। সপ্তত্রিংশৎ বর্ষের প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৮২) পুজোর আগে অবশ্যই প্রকাশিত হবে। গ্রাহকদের কাছে বিনীত অনুরোধ তাঁরা যেন আগষ্ট মাসের মধ্যে আগামী বর্ষের বার্ষিক চাঁদা ৮·০০ (আট টাকা) আমাদের কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেন। যাঁরা গ্রাহক থাকতে অনিচ্ছুক তাঁরাও যেন ঐ সময়ের মধ্যে অনুগ্রহ করে জানিয়ে দেন। ভি. পি.তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। এতে গ্রাহকদের অহেতুক বেশী খরচ পড়ে। আমরা আশা করবো অতীতের মতো এবারও গ্রাহক এবং অনুগ্রাহকদের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি আমাদের সমভাবে অনুপ্রাণিত করবে।

চতুরঙ্গ ॥ ৫৪, গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা ১৩

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

গম বিপ্লব ! সবুজ বিপ্লব !! কৃষি বিপ্লব !!!

১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে এরাজ্যে গম বিপ্লব সুরু। পশ্চিমবাংলায় গমের একর প্রতি ফলন সারা ভারতের গড় ফলনের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ বেশি।

॥ গম বিপ্লবের জোয়ার ক্রমেই বেগবতী হয়ে চলেছে এ রাজ্যে ॥

সাল	জমির পরিমাণ (হাজার একর)	উৎপাদন (হাজার টন)
১। ১৯৪৭-৪৮	৯১	২১.৭
২। ১৯৫৬-৫৭ থেকে ১৯৬০-৬১ (বাৎসরিক গড়)	১১৬	২৫.৪
৩। ১৯৬১-৬২ থেকে ১৯৬৫-৬৬ (বাৎসরিক গড়)	১১৫	৩১.৯
৪। ১৯৬৭-৬৮	১৯৫	৭১.১
৫। ১৯৬৯-৭০	৫১১	৪৮১.৯
৬। ১৯৭১-৭২	১০৪৪	৯২১.২
৭। ১৯৭৪-৭৫	১০৪৫	৯০০.০ (অনুমিত)

গম বিপ্লব পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতার দিশারী।

॥ পশ্চিমবঙ্গ কৃষি তথ্য সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত ॥

যে কোনও দিনই সঞ্চয়ের দিন যদি.........

আপনি সঞ্চয় করবেন বলে মনস্থির করেন। আর সেটা মাস পয়লায় মাইনে হাতে পেলে শুরু করা যায়। তবে মনস্থির করতে না পারলে মাইনের টাকা হাতে আসলেই খরচ হয়ে যায়।

সঞ্চয় করতে যখন মনস্থ্ করবেন (সেটা এখনই করা সব চাইতে ভালো নয় কি ?) তখন ডাকঘরের রেকারিং ডিপজিট অ্যাকাউন্টের কথাটা ভেবে দেখবেন। মাসে মাসে মাত্র দশ টাকা করে জমালে, তা পাঁচ বছরে বেড়ে 750 টাকায় দাঁড়াবে। তাতে চক্রবৃদ্ধি সুদের হার দাঁড়াচ্ছে 9.25%।

আর আপনি একটানা দু'বছর যদি নিয়মিত সঞ্চয় করে যান তাহলে আপনার টাকা বীমার মত সুরক্ষিত থাকতে পারে এমন ব্যবস্থা আমরা রেখেছি। তা হ'ল. অ্যাকাউন্ট হোলডার রা জমার খাতার মালিকের অসময়ে মৃত্যু ঘটলে বাকী কিস্তির টাকা আর জমা না পড়লেও 750 টাকা অক্ষত থাকবে।

বিশদ জানতে হলে ঃ

নিকটতম
ডাকঘরে খোঁজ নিন

কিংবা

ন্যাশনাল সেভিংস
অর্গ্যানাইজেশান
পোস্ট বক্স নং 96
নাগপুর

davp 74/309

What is the secret of success of Indo-German partnership?

The combination of talents of the Indian and the German people. Who share a dedication to democratic freedom, social justice and human welfare.

Over the past 25 years the people of India and the Federal Republic of Germany have worked closely together with evident success.

INDO-GERMAN ECONOMIC RELATIONS AT A GLANCE :

Economic assistance to India up to April 1. 1974 :

One third of the total official German bilateral loans and ten percent of the total German technical assistance amounting to — **6.1 billion DM or Rs. 1,900 crores**

Total German development Aid to India in 1974/75 : — **725 Million DM or Rs. 217.5 crores**

consisting of:

—Rs. 108 crores bilateral capital assistance (loans of concessional rates of interest, and of special conditions)

—Rs. 18.3 crores technical assistance (grant)

—Rs. 91.2 crores multilateral and other assistance (loans through IDA, World Bank etc.)

Total volume of trade between India and the Federal Republic of Germany in 1974 :

Rs. 394 crores

The Federal Republic of Germany
—a dependable Partner

ISSUED BY THE PRESS & INFORMATION SECTION OF THE CONSULATE GENERAL OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1, HASTING PARK ROAD, CALCUTTA-27

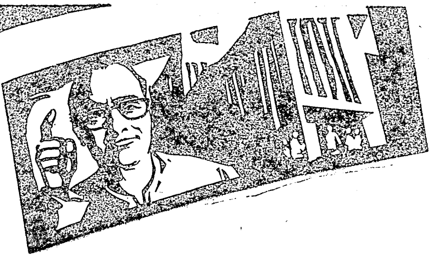

ই ঈ

ইউবিআই-তে ব্যাঙ্ক বোঝায়
ঈশানবাবু টাকা জমায়।

SSDG-BEN-72

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

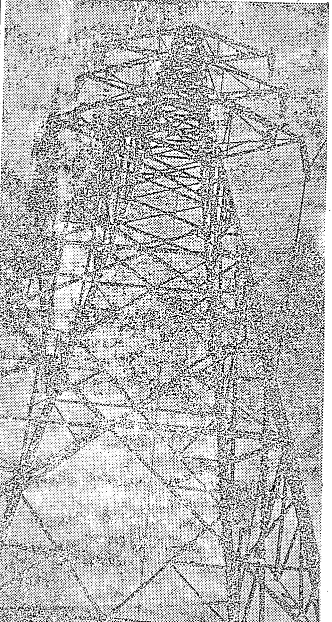

প্রগতির পথে ২০ বছর

আমাদের কুড়ি বছরের জীবনে অনেক কিছু ঘটে গেছে। ১৯৫৫ সালে প্রায় শূন্য হাতেই আমরা কাজ শুরু করেছি এবং ব্যাণ্ডেলে আমাদের প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে তার এক দশক বাদে। এরপর ১৯৭৪ সালে সাঁওতালডিহি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করেছে। গতমাস থেকে ২৫০ কি.মি. দীর্ঘ ২২০ কেভি ট্র্যানস্‌মিশন লাইন দিয়ে সাঁওতালডিহির বিদ্যুৎ সরাসরি কলকাতায় আসতে শুরু করেছে। এই সময়ের মধ্যে, জলঢাকা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রও চালু হয়ে গেছে। এছাড়া, আগামী দু' মাসের মধ্যে সাঁওতালডিহির ১২০ মেগাওয়াটের দ্বিতীয় ইউনিটও তৈরি হয়ে যাবে।

মাত্র ৪.০১ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতা নিয়ে কাজ শুরু করে পর্ষতের বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা বেড়েছে ৫৪২.১৭ মেগাওয়াট পরিমাণ। পর্ষতের বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১১,০০০ থেকে বেড়ে ৩,০০,০০০ এর বেশী দাঁড়িয়েছে এবং কর্মীসংখ্যা ৭০০ থেকে এখন ৬০,০০০ ছাড়িয়ে গেছে।

সাঁওতালডিহি এবং ব্যাণ্ডেল—দুটি বিদ্যুৎকেন্দ্রেই বর্তমানে সম্প্রসারণের কাজ চলছে। কোলাঘাটে ২০০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন তিনটি ইউনিট স্থাপনের কাজও শুরু হয়েছে। উপরন্তু উত্তরবঙ্গে জলঢাকা ও কার্শিয়াঙের দুটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্প্রসারণের কাজও ভালোভাবেই এগোচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষতের আরেকটি উল্লেখজনক অগ্রগতি গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের ক্ষেত্রে। তিনবছরের কম সময়ের মধ্যে পর্ষৎ ৭০০০টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে, ফলে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১০,০০০টি গ্রামে এ পর্যন্ত বিদ্যুৎ গিয়ে পৌঁছেছে।

আর্থিক অনটন প্রায়ই পর্ষতের কাজকর্ম জোরকদমে এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। তাসত্ত্বেও, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও কর্মনিষ্ঠা নিয়ে পর্ষৎ এ রাজ্যের বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

TCP/WBSEB 323A2/75

পূর্ব রেলওয়ে

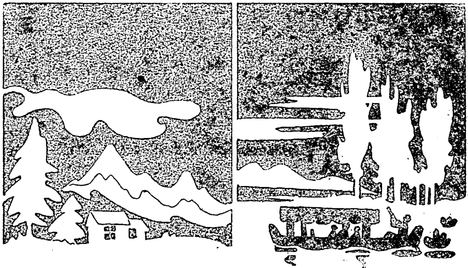

হিল কনসেশন রিটার্ন টিকিট এবং শ্রীনগরের জন্য রেল-বাস রিটার্ন টিকিট

দেশের বিভিন্ন শৈলনগরীতে ভ্রমণের জন্য কেবলমাত্র রেলপথের অংশটুকুর জন্য দেড়াভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধাজনক প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট বিক্রি গত পয়লা এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে। টিকিটের মেয়াদ তিনমাস পর্যন্ত বহাল থাকবে। যে কোন যাত্রাশুরুর স্টেশন থেকে শৈলনগরীর দূরত্ব কমপক্ষে ৮০০ কিলোমিটার হতে হবে। এই ধরনের টিকিট ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ পর্যন্ত পাওয়া যাবে :

শ্রীনগরের জন্য এই সুবিধাজনক ভাড়ার যাতায়াতের টিকিট হাওড়া, শিয়ালদহ এবং কলিকাতা ও হাওড়ার সিটি বুকিং অফিসগুলি হ'তে পাওয়া যাবে। তাছাড়া পূর্ব রেলওয়ের পাটনা, ধানবাদ, গয়া, ভাগলপুর ও আসানসোল স্টেশন থেকেও পাওয়া যাবে। রেলভাড়া ছাড়াও জম্মু তাওয়াই ও শ্রীনগরের মধ্যবর্তী অংশটুকুর জন্য ৪০ টাকা হারে যাতায়াতের বাসভাড়া একই সঙ্গে নেওয়া হবে, তবে ভ্রমণের সময়ে চালু বাসভাড়া অনুযায়ী এই হারের পরিবর্তন ঘটতে পারে। তিন-বছরের উপর এবং বারো বছরের কম বয়স্ক শিশুদের জন্যও একই হারে বাসভাড়া লাগবে।

তবে কোনক্রমেই ১৯৭৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যরাত্রির পরে শৈলনগরী অভিমুখে যাত্রা করা যাবে না।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করতে হবে কলিকাতা ফেয়ারলি প্লেসে পূর্ব রেলওয়ের ইনফরমেশন ব্যুরোর সুপারভাইজারের সঙ্গে, অথবা বিভিন্ন স্টেশনে।

চীফ কমার্শিয়াল সুপারিনটেনডেনট
পূর্ব রেলওয়ে
কলিকাতা

TCP/ER 280/75 R2 BEN

With the compliments of

TATA STEEL

HIGHEST EVER INTEREST

31.25%

UNDER OUR NEW SCHEME

DOUBLE DEPOSIT PLAN

FOR DETAILS PLEASE CONTACT
ANY OF OUR BRANCHES

ALLAHABAD BANK

YOUR OWN BANK

Head Office :

14 INDIA EXCHANGE PLACE

CALCUTTA 700 001

শীতল
আরাম
কিশোর ০৩
সাইজ ৫-১০
ভারতী ৩৬
সাইজ ৩-৭
টপার্স ৫০
সাইজ ৫-১০
পিণ্ট, ৫৬
সাইজ ৩-৬,
৭-১০, ১১-১
লীডার ৫৭
সাইজ ৫-১০
Bata

কলকাতা কালে কালে

কলকাতা একদিনে হয়নি

কলকাতা একদিনে হয়নি। কালে কালে বদলেছে। মহানগরী হয়ে ওঠার পথে তাকে পেরিয়ে আসতে হয়েছে অনেক ক্ষয়-ক্ষতি, অনেক দুর্বিপাক। ১৭০০ সালের কথাই ধরা যাক। সেদিনের কলকাতায় না ছিল কলের জল, না গ্যাসের বাতি, না পাকা বাড়ি, না রাজপথ। যানবাহন বলতে একটিই। পাল্কি। বিদ্যুতের আলো কিংবা কলে-চলা গাড়ি কলকাতাবাসীর কাছে ছিল স্বপ্নেরও অতীত।

আজকের কলকাতায় ভূগর্ভ-রেল কিন্তু আর স্বপ্ন নয়। একটি বাস্তব পরিকল্পনা। কলকাতার বিপুল জনসংখ্যা, সীমিত আয়তন, অপরিসর পথ এবং যানবাহনের সংখ্যাল্পতার পরিপ্রেক্ষিতে ভূগর্ভ-রেলের প্রয়োজনীয়তা আজ একান্তভাবেই জরুরী। কিন্তু এই বিশাল পরিকল্পনাকে কাজে রূপ দেবার পথে সবার আগে প্রয়োজন কলকাতার মানুষের সহৃদয় সহযোগিতা।

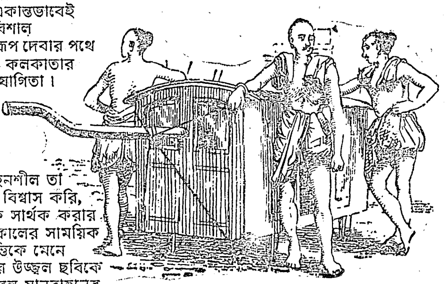

কলকাতার মানুষ সহনশীল তা আমরা জানি। এবং বিশ্বাস করি, এই বিপুল কর্মযজ্ঞকে সার্থক করার প্রচেষ্টায় তাঁরা কিছুকালের সাময়িক দুর্ভোগ ও বাধা-বিপত্তিকে মেনে নেবেন আগামীকালের উজ্জ্বল ছবিকে মনে রেখে। ভূগর্ভ-রেল যানবাহনের তালিকায় শুধু একটা নতুন নাম নয়, কলকাতার নতুন মানচিত্র গড়ে তোলার এক সুবৃহৎ উদ্যোগ।

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ-রেল

MTP মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

medium

'প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি'

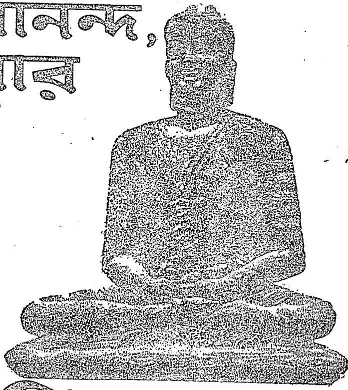

—শান্তিনিকেতন

কোলাহলের অসহ্য পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে চলুন সব পেয়েছির দেশ শান্তিনিকেতনে, যেখানে মানুষ আর প্রকৃতি কাছাকাছি, যেখানে পরিবেশ সুমধুর, বাতাস স্নিগ্ধ, গন্ধমদির। জগৎ এসে যেথায় মেশে সেই শান্তিনিকেতনে এলে মনে হবে এলেম নতুন দেশে।

রবিতীর্থ এই আশ্রমে এসে পরম নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিন, ফিরিয়ে আনুন মনের প্রশান্তি। দেখুন মুক্তাঙ্গন অধ্যয়ন, বিচিত্র দেয়ালচিত্র, নন্দলাল, রামকিংকর, বিনোদবিহারীর শিল্পকর্ম, কলাভবন ও বিচিত্রার অমূল্য সংগ্রহশালা, রবীন্দ্ররচনার পাণ্ডুলিপি আর তাঁর চিত্রকলার নিদর্শন। আসুন উত্তরায়ণের আঙ্গিনায়—দেখুন সেখানকার অপূর্ব গৃহশৈলী, উদয়ন, কোনার্ক, পুনশ্চ, উদীচি আর শেষ বেলাকার ঘরখানি শ্যামলী।

আসুন শান্তিনিকেতনে, যেখানে আকাশে গান, বাতাসে গান, ঋতুতে ঋতুতে উৎসব। আপনার আনন্দ আর আরামের জন্য প্রস্তুত ট্যুরিস্ট লজ।

বিবরণীর জন্য খোঁজ নিন :

ট্যুরিস্ট ব্যুরো

৩/২ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ
(ডালহৌসি স্কোয়ার) ঈস্ট কলিকাতা-১
ফোন : ২৩-৮২৭১ গ্রাম : TRAVELTIPS

স্বরাষ্ট্র (পর্যটন) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

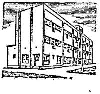

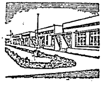

TCP/TB 265

The Jay Shree Chemicals and Fertilisers

Prop. Jay Shree Tea & Industries Ltd.

Manufacturers of : Superphosphate, Fertiliser Mixtures, Sulphuric Acid, Cryolite, Sodium Selico Fluoride, Precipitated Silica etc.

Factory & Office :

Nanda Bose Road
Khardah, 743155
24 Parganas
West Bengal

Telephones : 58-1064
58-1399
58-2945

Regd. & Sales Office :

Industry House
10, Camac Street, (15th floor)
Calcutta, 700 017

Phones : 44-9825
44-9827

Telegram : JAYSUPER Calcutta/Khardah

INDIAN TUBE

THE INDIAN TUBE
COMPANY LIMITED

A TATA-STEWARTS AND LLOYDS ENTERPRISE

Manufacturers of
Quality Steel Tubes and Strip in India

ITC-150

বিশেষ সুযোগ

বাংলা সাহিত্যের ও রবীন্দ্র-অনুরাগী পাঠকের সাহিত্যরসপিপাসা চরিতার্থ করবার সুযোগ সম্প্রসারিত হয় এই উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থে পাঠক ও পুস্তকবিক্রেতাদের বিশেষ কমিশন দেওয়া হচ্ছে। ১৯৭৬ সালের রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের পূর্ব পর্যন্ত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে এই সুবিধা পাওয়া যাবে।

১. **পূর্ব-বাংলার গল্প** ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাংলা দেশের পল্লী অঞ্চলের জীবনযাত্রার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয় তা ঐ সময়ে রচিত তাঁর কোনো কোনো গল্পের উৎস। সেই রকম কয়েকটি গল্পের সংকলন। মূল্য ৭·০০ টাকা।

২. **রূপান্তর** ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত তথা ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা থেকে অনূদিত বা রূপান্তরিত রবীন্দ্রনাথের প্রকীর্ণ কবিতাবলী নানা মুদ্রিত গ্রন্থ, সাময়িক-পত্র ও পাণ্ডুলিপি থেকে মূল-সহ এই গ্রন্থে একত্র সমাহৃত। মূল্য ৭·০০ টাকা।

৩. **পল্লী-প্রকৃতি** ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
এ-দেশের পল্লীসমস্যা ও পল্লীসংগঠন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী— শ্রীনিকেতনের আশা ও উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা। মূল্য ৪·৫০ টাকা।

৪. **রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা** ॥ রবীন্দ্রচর্চামূলক পত্রিকা
প্রথম খণ্ড ১৫·০০, দ্বিতীয় খণ্ড ২০·০০ টাকা।

৫. **যা দেখেছি যা পেয়েছি** ॥ শ্রীসুধীরঞ্জন দাস
বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য তথা ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির সুদীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময় জীবনের মনোরম বিবরণী। মূল্য ১৪·০০ টাকা।

৬. **চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ডরুজ** ॥ শ্রীমলিনা রায়
ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একনিষ্ঠ সেবক, রবীন্দ্রনাথের একান্ত সহকারী বন্ধু চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ডরুজের বহুবিচিত্র জীবনের আলেখ্য। অবনীন্দ্রনাথ ও এণ্ডরুজ-অঙ্কিত চিত্র, পাণ্ডুলিপি-চিত্র এবং সুদৃশ্য প্রচ্ছদপটে অলংকৃত। মূল্য ১০·০০ টাকা।

কমিশনের হার

সাধারণ ক্রেতা শতকরা ২০·০০ টাকা, পুস্তকবিক্রেতা শতকরা ৩০·০০ টাকা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কার্যালয় : ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা ১৬
বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার / ২১০ বিধান সরণী

HINDU MYTHOLOGY

by W. J. Wilkins

The reader can conveniently gain a good general idea of the names, character and principal deities of Hinduism. Classified and Illustrated.

A Rupa Paperback : *Rs 18*

Rupa & Co

15 Bankim Chatterjee Street
CALCUTTA 700 012

Also at

ALLAHABAD • BOMBAY • DELHI

ত্রৈমাসিক চতুরঙ্গ পত্রিকার মালিকানা ও
অন্যান্য বিবরণী

৪নং ফর্ম

[রুল ৮]

১। প্রকাশ স্থান : ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩
২। প্রকাশের সময় : প্রতি তিন মাসে
৩। মুদ্রাকর : আতাউর রহমান
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩
৪। প্রকাশক : আতাউর রহমান
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩
৫। সম্পাদক : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য
জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ৯।১।১এ, লক্ষ্মী দত্ত লেন, কলিকাতা ৩
৬। স্বত্বাধিকারীদের নাম ও ঠিকানা : শ্রীমতী এন. রহমান, ৮এ শ্যামসুল হুদা রোড, কলিকাতা ১৭ ; এ. রহমান, ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩; শ্রীনীহাররঞ্জন চক্রবর্তী, ৫৪ গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা ১৩

আমি, আতাউর রহমান, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিলিখিত বিবরণী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

আতাউর রহমান
তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫ প্রকাশক

MODERN WRITERS

W. H. Auden

Thank You, Fog : Last Poems	£ 1.75
Collected Shorter Poems 1927-57	£ 1.75
Collected Longer Poems	£ 2.75
Forewords and Afterwords	£ 3.95

Lawrence Durrell

Monsieur or the Prince of Darkness	£ 2.75
The Revolt of Aphrodite	£ 2.95
The Best of Antrobus	£ 2.00
The Black Book	£ 2.00

NEW BOOKS

After Babel

GEORGE STEINER

Surveys the history and theory of translation, the first attempt since the eighteenth century at a systematic investigation of the phenomenology and processes of translation inside language and between languages. £ 8.00

Wilfred Owen

JOHN STALLWORTHY

The standard biography illustrating, with poems never before published, the ten-year apprenticeship. £ 6.00

The Strange Case of Alfred Hitchcock

RAYMOND DURGNAT

Detailed analyses of the films, in the now well-known Durgnat manner; a radically new and creative mode of film criticism. £ 5.50

OXFORD
UNIVERSITY PRESS

শুধু আঙ্গিকের প্যাঁচ কি চলতি ফ্যাশানের নকলনবিশী নয় আজকের
যন্ত্রণা-জটিল জীবনকে মুখোমুখি প্রত্যক্ষ দেখবার সততা ও সাহস

মিশ্র সাহানা

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

যে উপন্যাস সুরু করলে শেষ করতে হয়,
শেষ করলে মনের ছাপ সহজে মোছে না।

দাম : দশ টাকা

এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা, ৭০০ ০১২

চতুরঙ্গ

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

নিয়মাবলী : বৈশাখ হইতে বর্ষ শুরু করিয়া প্রতি তিন মাসে অর্থাৎ আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ এবং চৈত্র মাসে "চতুরঙ্গ" বাহির হয়। সডাক বার্ষিক মূল্য ৮·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা। বৈদেশিক : এক পাউণ্ড স্টারলিং এবং পঁচিশ পেন্স (রেজেষ্ট্রী খরচ সহ)। আমেরিকা, চার ডলার রেজেষ্ট্রী খামে।

"চতুরঙ্গে" প্রকাশের জন্য রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠান দরকার। প্রাপ্ত রচনা মনোনীত হইলেও কোন বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করিবার জন্য বাধ্যতা থাকিবে না। ঠিকানা লেখা ডাকটিকিটওয়ালা লেপাফা না থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

প্রতি সংখ্যায় বিজ্ঞাপনের মূল্য :

সাধারণ পৃষ্ঠা ৩২৫·০০ টাকা। অর্দ্ধপৃষ্ঠা ২০০·০০ টাকা। কভার পৃষ্ঠা ৪০০·০০ টাকা ও ৫০০·০০ টাকা
পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ ২৫ দিন পূর্বে বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি ও ব্লক আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

প্রবন্ধাদি বিনিময় পত্রিকাদি চিঠিপত্র টাকাকড়ি চেক ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি
পাঠাইবার একমাত্র ঠিকানা :

৫৪ গণেশচন্দ্র এ্যাভিনিউ, কলিকাতা, ১৩ ফোন : ২৪-৬১২৭

[O]nly Chloride could beat Chloride's 'long-life' record!

Chloride India's advanced technology presents

Exide supreme

Tomorrow's battery here today!

ide 'Supreme' is the end
ult of years of intensive
earch and development.
'unique high-
de polypropylene
ntainer and special
wer-packed cons-
ction makes Exide
preme' the sturdiest,
st advanced
tery for your car.
of of its superiority is
instant acceptance in
histicated international
kets. And Exide
preme' is manufactured
Chloride India—so
got to be the best!

*e Supreme has already been accepted
riginal equipment fitment in Ambassador,
nier and Standard cars. Also being used
e State Transport undertakings.*

*battery is available for replacement
mbassador, Premier and Standard cars.*

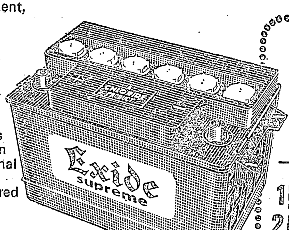

A CHLORIDE PRODUCT

Longer life! More power!

—and here's why:

1 LONGER LIFE
because of improved plate and battery design.

2 MORE POWER
because it has special through-partition inter-cell connectors and shorter plate pitch resulting in instant starting even in extreme weather conditions.

3 PEAK EFFICIENCY
because special lid construction minimises surface leakage and terminal corrosion.

CIC-42/RI

When the objective is power and more power

Bráin-power and man-power at DEVELOPMENT CONSULTANTS are the driving forces

Power projects all over India have the unmistakable stamp of DCPL's comprehensive advisory, planning and implementing efficiency. Services range from survey, site selection, feasibility reports and studies to detailed designs and specifications, estimating, procurement assistance, shop inspection and site supervision, training of personnel, commissioning and initial operation of the plant.

And DCPL believes that the most important qualities needed to meet these objectives are technical know-how, experience and expertise.

Qualities that have led to the successful completion of many giant power projects in the country like Bokaro, Dhuvaran, Satpura, Namrup, Barauni, Obra— the largest being Santaldih. DCPL engineers are now working closely with the Indian Atomic Energy Commission on a number of Nuclear Projects like Tarapur, Madras and India's Fast Breeder Test Reactor.

A pioneer in the field for years, today DCPL is leading the country's rapid progress towards self-reliance in power engineering.

DEVELOPMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
Consulting Engineers to Indian Industry
24-B Park Street, Calcutta-700 016
Phone: 24-8153, Cable: ASKDEVCONS
Telex: 7401 KULCIA CA
Branches: BOMBAY . NEW DELHI
MADRAS . DAMASCUS

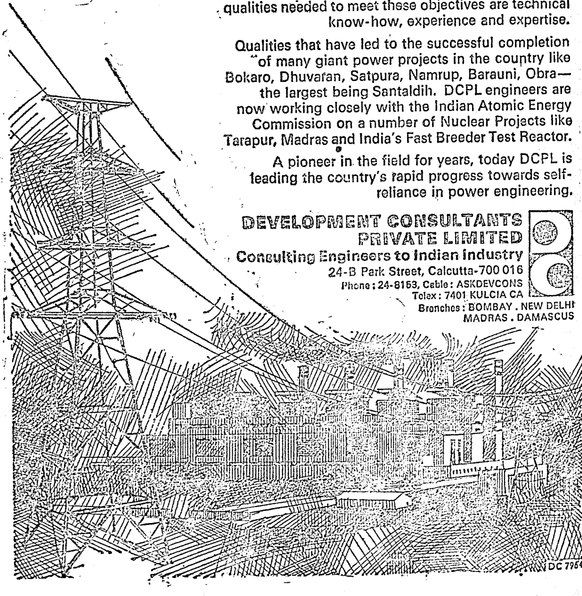

DC 795

বর্ষ ৩৬ মাঘ-চৈত্র ১৩৮১

সূচিপত্র

শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় । বিবাহপ্রথা ও শরৎ-চেতনা ১৯১

আবহমানকাল । অসীম রায় ২০৪

শ্রীঅরবিন্দ । সাবিত্রী । অনুবাদ : সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় ২২৬

দেবেশ রায় । মফঃস্বলি বৃত্তান্ত ২৩৪

হিতেশরঞ্জন সান্যাল । বাংলার শিখর মন্দির : স্থাপত্যরূপের বহিরঙ্গ ২৫২

অমিয়ভূষণ মজুমদার । রাজনগর ২৫৯

সমালোচনা । লোকনাথ ভট্টাচার্য, জয়ন্ত বসু, নির্মল ঘোষ ২৭৫

সম্পাদক : বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

আতাউর রহমান কর্তৃক নাভানা প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩ থেকে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত।

বোরোলীন

স্থরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

যার সহায়

গ্রীষ্মে তার ভয় কি?

যদিও নানা কাজে আপনাকে সারাদিন এই অকৃপণ সূর্যের নিচেই চলতে ফিরতে হবে। শরীরের উন্মুক্ত অংশগুলো সূর্য তাপে ঝলসে যাবে। দেখা দেবে ফোড়া, ফুসকুড়ি ও ত্বকের অন্যান্য অস্বাচ্ছন্দ্য। অনেক সময় এই সব ক্ষতগুলো দূষিত হ'য়ে ওঠে বাইরের ধুলো-ধোঁয়া বা রোদ-জলে। বোরোলীন স্থরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম আপনার ত্বকের গভীরে প্রবেশ ক'রে কাটা-ছেঁড়া-ফাটা অংশগুলোকে নিরাপদ রাখে।

জি, ডি, ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাঃ লিমিটেড বোরোলীন হাউস, ১ গিরীশ এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০ ০০৩.

বর্ষ ৩৬ মাঘ-চৈত্র ১৩৮১

বিবাহপ্রথা ও শরৎ-চেতনা

শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

সমাজজীবনে বিবাহ আদিমতম না হলেও বহু-পুরাতন প্রথা। সমাজের শৃঙ্খলারক্ষায় সহায়তা করবে, সমাজকে সমৃদ্ধ করবে, এই আশাতেই বিবাহপ্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল। মোটামুটি বলা যেতে পারে, সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে অনেক ভাঙা-গড়ার মধ্যেও বিবাহপ্রথা এই মৌলিক উদ্দেশ্য পূরণ করে এসেছে। সমকালীন সামাজিক বিধিবিধানে অভ্যস্ত মানুষের কাছে বিবাহপ্রথা শুধু স্বীকৃতিই পায়নি, সংস্কার হিসাবে মনে জায়গা পেয়েছে।

বিবাহ নরনারীর মিলন, এই মিলনের পিছনে সমাজের অনুমোদন থাকে। সমাজ চায় বিবাহিত নরনারী পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হোক, তাদের যৌথ জীবনের ভিতর দিয়ে পরিবার প্রতিষ্ঠিত ও সম্প্রসারিত হয়ে সমাজদেহে বলসঞ্চার করুক।

দাম্পত্যজীবন বিবাহিত নরনারীর পারস্পরিক ভালবাসায় মাধুর্যমণ্ডিত হবে, এও সমাজের কামনা। এই প্রত্যাশার অনুপূরক হিসাবে অধিকাংশ দেশেই সমাজ বিবাহ-অনুষ্ঠানে ধর্মীয় অনুশাসন প্রয়োগের সুযোগ নিয়েছে। সমাজ চেয়েছে বলে এই সমাজবিধান সহজেই রাষ্ট্রের অনুমোদন লাভ করেছে। এইভাবে ধর্মের ও রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের জন্য বিবাহ-অনুষ্ঠানের গুরুত্ব নিঃসন্দেহে নিহিত মূল্যকে ছাপিয়ে গেছে এবং বাস্তব অসুবিধার ক্ষেত্রেও সমাজের অনুমোদিত বিবাহ-ব্যবস্থাকে বিবাহিত নরনারী মান্য করতে অভ্যস্ত হয়েছে। ঘরের বাইরে পুরুষের জীবনের বিস্তৃতির জন্য একথা পুরুষের চেয়ে মেয়ের ক্ষেত্রে আরও বেশি সত্য। বিবাহপ্রথাকে মান্য করা কালপ্রবাহে সংস্কারে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং বিবাহের পর নরনারী যেখানে নানাকারণে পরস্পরকে ভালবাসতে পারেনি, সেখানেও মানিয়ে চলার অভ্যাস বা বিবাহ-সংস্কার বিবাহিতদের বিচ্ছিন্ন হতে দেয়নি। পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জীবন প্রাচ্যদেশের তুলনায় আগেই শুরু হয়েছে, সেখানে মেয়েদের আত্মস্বাতন্ত্র্যের কঠিন প্রশ্ন আগেই সমাজ-চিন্তায় চিহ্নিত হয়েছে। বাংলাদেশের মত প্রাচ্যদেশে এ পরিবর্তন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে একরকম অনুভূতই হয়নি, আরও পরে দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বা শরৎচন্দ্রের জীবিতকাল পর্যন্ত এদিক থেকে মেয়েদের অধিকারবোধ বা অধিকারলাভ বড় করে বলবার মত এগোয়নি। শরৎচন্দ্র জীবনধর্মী সামাজিক কথাসাহিত্যিক, আপন কালের সমাজরূপকে বা সমাজবদ্ধ নরনারীকে বাস্তব দৃষ্টিতে তিনি ফুটিয়েছেন, কাজেই তাঁর লেখায় বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের, বিশেষ করে মেয়েদের বিবাহসংস্কার-প্রভাবিত-সমাজবোধ দৃঢ়ভিত্তিক দেখা যায়।

বিবাহপ্রথাটা মূলতঃ পুরুষ-প্রধান সমাজব্যবস্থার অবদান ব'লে এবং সমাজের কর্তৃত্ব বরাবর পুরুষের হাতেই থেকে গিয়েছে বলে দাম্পত্য-জীবনে পুরুষের প্রাধান্য স্বতঃই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বলতে গেলে 'হরণ থেকে বরণ' নানা প্রক্রিয়ায় পুরুষরাই মেয়েদের বিবাহ অথবা সমাজ-অনুমোদিত-ভাবে আয়ত্ত করেছে। বিবাহ-ব্যবস্থায় মেয়েদের ভূমিকা বরাবরই গৌণ। শারীরিক অসম গঠনের জন্যই হোক বা মানসিকতার হিসাবে ধর্ম-অনুমোদিত সমাজবিহিত প্রথার প্রতি অভ্যাসগত অনুরক্তির জন্যই হোক, মেয়েরা পুরুষকেন্দ্রিক বিবাহ-কর্মকাণ্ডে সহায়িকার ভূমিকা নিয়েছে। বিবাহের পরও ব্যবস্থা একইভাবে চলেছে। বিবাহ-অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের সঙ্গে মেয়েদের যে ধর্মচেতনা জাগ্রত হয়েছে তা সমাজ-সংস্কার দৃঢ়মূল করে সুখদুঃখ-নিরপেক্ষভাবেই বিবাহিত জীবনকে সহজে মেনে নিতে মেয়েদের প্রেরণা দিয়েছে। সুখ বা দুঃখ তাদের নিকট কর্মফল না হয়ে অদৃষ্টফলরূপে গৃহীত হয়েছে। পুরুষদের মানসগঠন ভিন্নরূপ, বিবাহ স্বীকৃতি আর বিবাহ-সংশ্লিষ্ট কর্তব্য স্বীকৃতি তাদের কাছে এক হয়নি। এইজন্য বিবাহিত জীবনে স্ত্রীকে স্বীকার করে তাকে অনায়াসে অবহেলা করার বা বঞ্চিত করার ইতিহাস পুরুষের ক্ষেত্রে যত্রতত্র দেখা গেছে এবং বিবাহের 'এক সঙ্গে চলা, বলা, চিন্তা করা'র মত মিলিত জীবনযাপনের প্রতিশ্রুতিবাচক মন্ত্রোচ্চারণের বিপরীতে পুরুষ স্ত্রীকে বঞ্চনা-লাঞ্ছনা করে ব্যভিচারী হলেও মেয়েদের বুদ্ধি-নিরপেক্ষ ধর্ম-সংস্কার ও সমাজ-সংস্কারজনিত পাপবোধ তার মধ্যে না থাকায় এই ভ্রষ্টাচারে পুরুষ নিজের মনের কাছ থেকে বিশেষ বাধা পায়নি। শরৎচন্দ্র কিছুটা আধুনিক কালের সাহিত্যিক হলেও এবং তাঁর সমুন্নত সমাজ ও ধর্ম চেতনায় ন্যায় অন্যায় স্বরূপে প্রতিফলিত হলেও গল্প-উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর মানসিকতা সৃষ্টিতে তিনি বিবাহ-সংশ্লিষ্ট সংস্কার থেকে তাদের সরাতে পারেন নি। এ সম্পর্কে তাঁর আপন মনের দ্বন্দ্ব বা তাঁর ভাবদৃষ্টির ছাপ শরৎচন্দ্রের লেখায় লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু লেখক-মানসের সেই প্রতিফলের জন্য কথাসাহিত্যের নায়কনায়িকারা নিজেদের যুগকে অতিক্রম করেনি। এইজন্যই শরৎচন্দ্রের "দত্তা" উপন্যাসে যে ধনী ও ব্রাহ্মকন্যা বিজয়া মনের দাবিতে প্রবল ও প্রচণ্ড রাসবিহারীর পক্ষপুটে আশ্রিত ব্রাহ্মসমাজের নিষ্ঠাবান কর্মী বিলাসবিহারীর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব বাগ্‌দানের পর ভেঙে দিয়েছে, সে কিন্তু স্বামীরূপে হিন্দু নরেনকে বিবাহ করবার সময় নরেনদের কুল-পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ করতেই বিবাহের পিঁড়িতে বসেছে। নরেন বিলাতফেরত এবং তজ্জন্য সমাজে একরকম একঘরে। সে উচ্চশিক্ষিত ডাক্তার। হিন্দুর আচার-বিচার নরেন যে নিষ্ঠার সঙ্গে মানে, উপন্যাসে এমন প্রমাণ তো নেই-ই, অধিকন্তু এসব ব্যাপারে তার সংস্কারহীন মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে; কিন্তু ব্রাহ্মকন্যাকে বিবাহে বসবার সময় হিন্দু প্রথার আয়োজনে তার কোন ইতস্ততঃভাব পরিলক্ষিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার মত কোন ভাবভঙ্গী নরেনের মধ্যে দেখা যায়নি।

বিবাহসংস্কার তথা স্বামি-সংস্কারের দৃষ্টান্ত শরৎ-সাহিত্যে অনেক। স্বামী হীন হলেও স্ত্রী প্রাণপণে সেই স্বামীকে পাবার, তাকে সেবা করবার চেষ্টা করছে, শরৎ-সাহিত্যে এ ছবির অভাব নেই। অল্প বয়সে লেখা "শুভদা" থেকে পরিণত বয়সে লেখা "দেনাপাওনা," অনেক লেখাতেই একথা প্রমাণিত হবে। "শুভদা" উপন্যাসে স্বামী হারাণ দুশ্চরিত্র, নেশাখোর, মনিবের টাকা চুরি করে সে জেলে যেতে বসেছে, শুভদা কুলমহিলা হয়েও স্বামীকে বাঁচাবার জন্য মনিব জমিদারের হাতেপায়ে ধরতে তাঁর বাড়ি গিয়েছে। পরে অকৃতজ্ঞ হারাণ যখন তাকে নিদ্রিতা মনে করে ছদ্মবেশে শুভদার সামান্য সঞ্চয় চুরি করতে তার ঘরে ঢুকেছে, চিনতে পেরে কোন অভিযোগ না করে শুভদা তার হাতে বাক্সের চাবি তুলে দিয়েছে। "শ্রীকান্ত" প্রথম পর্বের অন্নদা এবং দ্বিতীয় পর্বের অভয়া দুজনের স্থানই শরৎসাহিত্যের নারী-চরিত্রগুলির পুরোভাগে। দুজনকেই শরৎচন্দ্র বিশেষ যত্ন করে ফুটিয়েছেন। অভয়াকে শেষদিকে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে বিদ্রোহিনী রূপে শরৎচন্দ্র তাকে যুগবৃত্তের বাইরে ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়েছেন; কিন্তু এই বিদ্রোহ করবার আগে হীন স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য বধূ অভয়া যে কঠিন চেষ্টা করেছে, সেখানে অন্নদার সঙ্গে তার মিল আছে। অন্নদার স্বামী দুশ্চরিত্র ও কাপুরুষ, সে শ্বশুরালয়ে বিধবা শ্যালিকার ধর্মনষ্ট করে তাকে হত্যার পর ফেরার হয়ে মুসলমান হয় এবং সেই বিধর্মী অমানুষ স্বামীর সেবাযত্নে মহীয়সী হিন্দু বধূ অন্নদা দুঃসহ সীমাহীন দুঃখের বোঝা মাথায় তুলে নেয়। অভয়ার প্রতি গ্রাম সম্পর্কে রোহিণীদাদার বোধ হয় আগে থেকেই দুর্বলতা ছিল, অভয়া বুদ্ধিমতী, সম্ভবতঃ রোহিণীর সেই দুর্বলতার কিছুটা সুযোগ নিয়ে তার সঙ্গে অভয়া বাংলাদেশের এক গণ্ডগ্রাম থেকে অপরিচিত সুদূর ব্রহ্মদেশে পাড়ি দিয়েছে। যে স্বামী তাকে ফেলে চলে গেছে, তার খাওয়া-পরা, বেঁচে থাকার কোন দায় নেয়নি, যে স্বামী ব্রহ্মদেশে বর্মীরমণী বিবাহ ক'রে পুত্রকন্যার জনক হয়ে সংসার করছে, সেই স্বামীকে ফিরে পাওয়া ছিল অভয়ার কঠিন দুঃসাহসী অভিযানের একমাত্র লক্ষ। অভয়া যখন রেঙ্গুনে অসহায় রোহিণীকে একা ফেলে পাষণ্ড স্বামীর সঙ্গে প্রোমে চলে গেল, তখন রোহিণী নয়, তার মনে বিরাজ করেছে তার স্বামী পুঙ্গব। বর্মী স্ত্রী ও সন্তান থাকা সত্ত্বেও স্বামী যদি অভয়াকে পৈশাচিক শারীরিক নির্যাতন না করে একটু স্বস্তিকর আশ্রয় দিত, অভয়া সম্ভবতঃ রেঙ্গুনে রোহিণীর কাছে আর ফিরে আসতো না। "দেনাপাওনা" উপন্যাসে চণ্ডীগড়ের জাগ্রতা দেবী চণ্ডীর জপ-তপ-কৃচ্ছ্রসাধন-পরায়ণা ভৈরবী ষোড়শী তার বহু পূর্বে ফেলে আসা বালিকা জীবনে বরমাল্য দেওয়া স্বামীকে শান্তিকুঞ্জের ভয়ঙ্কর পরিবেশে দুশ্চরিত্র, মদ্যপ, অত্যাচারী জমিদার জীবানন্দের মধ্যে হঠাৎ খুঁজে পেল; সেই মুহূর্তেই ষোড়শীর গৈরিক বসনান্তরালে শুষ্কপ্রায় হৃদয়নদীতে বন্যা বয়ে গেল, সময়ের সমুদ্র পার হ'য়ে ধূসর বিস্মৃতির যবনিকা ঠেলে বালিকা অলকা অপরাজেয় নারীজীবনের মহিমায় আবির্ভূত হয়ে ষোড়শীকে তপঃক্লিষ্ট শরীরের সীমায় কোণঠাসা করে ফেলল। "বিরাজ বৌ"এ বিরাজ বা 'স্বামী' গল্পে সৌদামিনী স্বামীর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে স্বামীগৃহ ত্যাগ করেছে, বহু দুঃখ সহ্য করে শেষ পর্যন্ত তারা স্বামীর পায়ে ফিরে এসেই কৃতার্থ হয়েছে। 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে অভাগীর স্বামী রসিক বাঘ দীর্ঘকাল গ্রামান্তরে অন্য বাঘিনী নিয়ে আনন্দে বাসা বেঁধেছিল, অসহায় স্ত্রী-পুত্রের অন্ন-বস্ত্রের ভাবনার দায়টুকুও তার ছিল না, মৃত্যুর সময় সেই স্বামী রসিকের পায়ের ধুলো পেয়েই অভাগী ধন্য হয়ে গেছে, অসহায় কিশোর পুত্র কাঙালীকে কঠিন সংসারে একা ফেলে যাবার গভীর বেদনা

ছাপিয়ে স্বামীর পদধূলি লাভের তৃপ্তি তার মুমূর্ষু চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে।

স্ত্রী-পুরুষের বিহিত মিলনে সমাজ ক্রমেই সংবদ্ধ ও সমৃদ্ধ হয়েছে। সমাজের প্রায় অর্ধেক নারী, সমাজের বনিয়াদ বিবাহসূত্রে মিলিত নরনারীর উপর ভর করে দাঁড়িয়েছে, অথচ এই ব্যবস্থায় মেয়েদের মৌলিক মানবিক অধিকার সংরক্ষিত হচ্ছে কি না, সমাজ সেকথা কদাচিৎ ভেবেছে। তাদের সংখ্যার জন্য অথবা ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগব্যবস্থার হারাহারি অর্থনৈতিক সুবিধা-অসুবিধার জন্য বিবাহ-ব্যাপারে মেয়েদের সংখ্যাগত প্রয়োজন স্থানীয়ভাবে কখনও কখনও কম-বেশি হয়েছে,— কিন্তু মৌলিক মানবিক অধিকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত প্রশ্ন এসব ক্ষেত্রে মোটামুটি উপেক্ষিত হয়েছে। বাংলার কুলীন ব্রাহ্মণেরা যত খুশি বিবাহ করতেন। স্ত্রীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দূরে থাক, পরিচয়ও তাঁদের মনে বা স্মরণে না থেকে খাতায় লেখা তালিকায় স্থান পেত। কিন্তু যারা এইরকম স্ত্রী হবার জন্যই কুমারী অবস্থায় অপেক্ষা করেছে, সেই সব অবহেলিতা মেয়েদের বিবাহ-ব্যাপারে তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা পছন্দ-অপছন্দের প্রশ্ন, কিংবা মানুষ হিসাবে তাদের মর্যাদা বা ভবিষ্যতের প্রশ্ন সমাজের বিবেচনায় কখনও বড় হয়ে ওঠেনি। শুধু বিবাহ-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে নয়, সারা জীবনের হিসাবে মেয়েদের সম্পর্কে সমাজের এই অবহেলার ভাব চলে আসছিল। মেয়েরা ছিল শৈশবে পিতার, যৌবনে স্বামীর ও বার্ধক্যে পুত্রের অধীন। তবু আপনজনের অধীনতায় কিছু সুখশান্তির সম্ভাবনা ছিল, এই রকম আপনজনের অভাবে প্রচলিত ব্যবস্থায় তারা দূর সম্পর্কের আত্মীয়, এমন কি অনাত্মীয় পুরুষ অভিভাবকের অধীন হয়ে জীবন কাটাতে বাধ্য হত। তাদের এই বাধ্যতামূলক পুরুষের বশ্যতা ক্রমে অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল এবং নিজের প্রতি মমতা অনুকূল আশ্রয় পায়নি বলে তারা আত্মস্বাতন্ত্র্যের বা আত্মসম্মানের বিবেচনাবোধে জড়তা লাভ করে ক্রমে স্বামী, সন্তান, পরিজন বা কাছের মানুষ যাদের পেত তাদের দিকেই স্বাভাবিকের অতিরিক্ত ভালবাসা ছড়িয়ে দিত। সমাজ একরকম আশ্বস্ত হয়েই 'নারী দেবী', 'নারী যেখানে পূজা পায় দেবতারা সেখানে প্রসন্ন হন', এই রকম দু-চারটি গালভরা স্তুতিবাক্য আউড়ে নারীর ভালবাসার উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণ করেছে। অধিকারবোধের জড়তার জন্য মেয়েরা অপমান, অবহেলা বা স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার দুর্বহ বেদনা ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য বলে মেনে নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে স্বামীপূজা চালিয়ে গেছে এবং যে স্ত্রী জীবনে কদাচিৎ বহুবিবাহিত স্বামীর সাক্ষাৎমাত্র পেয়েছে, সেও স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ আসা মাত্র অক্ষয় স্বর্গলাভের সোপান হিসাবে স্বামীর সঙ্গে একশয্যায় সহমরণে 'সতী' হতে চেয়েছে। সাধারণভাবে এতদিন যে মেয়েরা স্বামীর ঘর করতে পেয়ে কৃতার্থ হয়েছে, তাদের অধিকাংশকেই কার্যত এক ধরনের বন্দীজীবন যাপন করতে হয়েছে। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতে এই রকম মেয়েরা গৃহস্থের ঘরের লাভজনক পশুর সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত।* উচ্চবিত্তদের ঘরে তবু এরা বন্দীত্ব বা মানসিক দুঃখ সত্ত্বেও অন্নবস্ত্রের স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছে, তাদের পরিশ্রমও কম করতে হয়েছে, কিন্তু নিম্নবিত্ত বা চাষী মজুরদের ঘরে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যহীনতার কথা বাদ দিলেও এদের কঠোর পরিশ্রমের এবং পরাধীন জীবনযাপনের দুর্দশার অবধি ছিল না। প্রকৃতপক্ষে মানুষ হয়ে জন্মেও এরা এই অসম্মানের জীবন বহন করে এসেছিল এইজন্য যে,

* Thus the primary function of a wife comes to be that of a lucrative domestic animal. Bertrand Russel—*Marriage and Morals.*

জীবনযাপনের রীতিগত অভ্যাস এদের মনে নিশ্চল ঔদাসীন্য সৃষ্টি করেছিল, আর যেক্ষেত্রে সামান্য মানসিক চাঞ্চল্য জেগেছিল, সেখানেও প্রবল অন্তর্নিহিত হীনতাবোধে মনের আলোড়ন দ্রুত স্তিমিত হয়ে গিয়ে নিজের অবস্থা মেনে নিয়ে এদের সহজ হবার ক্ষমতা বা প্রবণতা গড়ে উঠেছিল। মেয়েদের গতানুগতিক, গতিহীন, ম্লান জীবনের বিপরীতে সমাজের যা-কিছু উজ্জ্বলতা পুরুষের জীবনচর্যাতেই প্রতিফলিত হয়েছে। পুরুষই প্রধানত মানুষের ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। পুরুষই মেয়েদের ভরণপোষণ করেছে, মেয়েদের নিয়ন্ত্রণ করেছে, মেয়েদের অসহায় অবস্থার বিপরীতে এই পুরুষরাই আপন প্রাধান্যবোধ তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করেছে। মাঝে মাঝে এই অন্যায় অবিচার সম্পর্কে যেটুকু প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে, সে প্রতিবাদ প্রায় ক্ষেত্রেই এসেছে হৃদয়বান মানবপ্রেমিক স্বল্পসংখ্যক পুরুষদের কাছ থেকে, বিপুল স্বার্থপরতন্ত্র-প্রভাবিত সমাজ ন্যায়-অন্যায় বিচার-বিবেচনায় মাথা না ঘামিয়ে প্রচলিত ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য আন্দোলন প্রতিহত করেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নারীকল্যাণের চেষ্টা পারিপার্শ্বিকের আনুকূল্য লাভ করলে হয়তো নারীমুক্তির প্রবল আন্দোলনে পরিণত হত, কিন্তু সমাজের এই বাধাদানের জন্যই বিধবা-বিবাহ আন্দোলন সরকারী আইন সত্ত্বেও কার্যত ব্যর্থ হওয়ায় বৃহত্তর মুক্তি-আন্দোলনের বিপুল সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছে। শরৎচন্দ্র ২৭ বছর বয়সে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ ত্যাগ ক'রে ব্রহ্মদেশে চলে গিয়েছিলেন, অল্পদিনের জন্য মাঝে মাঝে দেশে এলেও ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের আগেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে এবং জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে পৃথিবীব্যাপী মানুষের মূল্যবোধের পুনর্নির্ধারণের প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা না দিলেও প্রচলিত সমাজ ও ধর্মচিন্তায় বড় রকমের ফাটল ইতিমধ্যেই সূচিত হয়েছে। বলতে গেলে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে, এই সময় তাঁর 'বাগান খাতা' নামে বিখ্যাত খাতা হাতে লেখা "বড়দিদি" প্রভৃতি কয়েকটি লেখায় পূর্ণ হয়। কাজেই বাঙালী মেয়েদের, বিশেষ করে গ্রাম বাংলার মেয়েদের অবস্থা আগের হিসাবে কিছুটা ভাল হলেও তখনও পর্যন্ত শোচনীয়ই ছিল এবং সে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতা ছিল প্রত্যক্ষ। সংবেদনশীল, মানবদরদী কথাসাহিত্যিক হিসাবে আপন ভাবদৃষ্টিসিঞ্চনে এই অসহায় জীবন-আলেখ্য নির্মাণ করে সহৃদয় পাঠকের অন্তর স্পর্শ করবার তথা এই অন্যায় বিদূরণে বলিষ্ঠ গণচেতনা জাগ্রত করবার প্রয়াস শরৎচন্দ্র সাধ্যমত করেছেন। মেয়েরা প্রায় সকলেই অসহায়, পরনির্ভর ; আত্মদীপ হবার সাধনা বা সামর্থ্য তাদের ছিল না। এদের সকলের দুঃখ-কঠিন জীবনরূপ মোটামুটি বিবাহরূপ সুতোর উপর ঝুলেছে। বিবাহপ্রথা মেয়েদের স্বাভাবিক মানস-উন্নয়ন বা জীবনের স্বাভাবিক অগ্রগতির আনুকূল্য করলে মেয়েদের জীবনে দুঃখের অবসান ঘটার সম্ভাবনা তো হতোই, স্বাধিকারবোধের আলোতে মেয়েরা আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে নিশ্চয়ই এগিয়ে যেতে পারতো, শরৎচন্দ্র একথা বিশ্বাস করেছেন। নারীর পশ্চাৎপদতা, নারী-মানসের অনুন্নতি সামাজিক শক্তির অপচয়, এই অনগ্রসরতা বিদূরণে বিবাহপ্রথার পরিবর্তন যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে, জীবনশিল্পী জর্জ বার্নার্ড শ'র মত শরৎচন্দ্রের এরূপ ধারণা ছিল। মেয়েদের অসহায় দুঃখময় জীবনের জন্য দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে, মেয়েদের হীনতার বদ্ধজলে ডুবিয়ে রাখবার স্বার্থবাদী চক্রান্তের মুখোস উন্মোচিত করে প্রবল মানবতাবোধে জাগ্রত শরৎচন্দ্র "নারীর মূল্য" রচনা করেছিলেন। "নারীর মূল্যে" তথ্যসন্নিবেশে কিছুটা পল্লবগ্রাহিতার পরিচয় থাকতে পারে, গ্রন্থখানিতে বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় পটুত্বের কিছু অভাব লক্ষ্য

করা যেতে পারে, কিন্তু নাট্যকার বার্নার্ড শ তাঁর কঠিন সামাজিক সমস্যাকেন্দ্রিক নাটকগুলির বক্তব্য ব্যাখ্যা করে যেমন মুখবন্ধগুলি (prefaces) লিখেছেন, শরৎচন্দ্রও বলতে গেলে তেমনি গল্প-উপন্যাস-গুলির নারীচরিত্রসমূহের মূলে তাঁর যে ভাবদৃষ্টি ক্রিয়াশীল, "নারীর মূল্য" গ্রন্থে সেই মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। স্বামীর সঙ্গে মেয়েদের পারস্পরিক সম্পর্ক মধুর হোক, এই আন্তরিক কামনা শরৎ-সাহিত্যে ও শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্রে বারবার দেখা যায়, কিন্তু প্রচলিত ব্যবস্থা অনুযায়ী স্ত্রী নিজেকে বিবাহের ভিতর দিয়ে স্বামীর দাসীত্বে প্রতিষ্ঠিত মনে করবে, শরৎচন্দ্র এই সংস্কারের প্রতিবাদ করেছেন। বাজে শিবপুর থেকে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই তাঁর স্নেহধন্যা শ্রীমতী লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে শরৎচন্দ্র স্পষ্টই লিখেছেন: 'এইখানে তোমাকে আর একটা উপদেশ দিয়ে রাখি। নারীর স্বামী পরম পূজনীয় ব্যক্তি, সকলের বড় গুরুজন। কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীও দাসী নয়। এই সংস্কার নারীকে যত ছোট, যত ক্ষুদ্র, যত তুচ্ছ করে এমন আর কিছু নয়।' বিবাহ সমাজের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রথা, কিন্তু বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে স্বামী স্ত্রীকে সম্পত্তি হিসাবে মুঠোর মধ্যে পেয়ে যাবে, শরৎচন্দ্র এ চিন্তা অত্যন্ত আপত্তিকর মনে করেছেন। বিধবার ভালবাসা বা বিবাহের অধিকার আছে, এই মত প্রকাশ করে শরৎচন্দ্র শ্রীমতী লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে উপরোক্ত ২৯।৭।১৯১৯ তারিখের চিঠিতে তাই লিখেছিলেন: 'যে (বিধবা) একবার (স্বামীকে) জানিয়াছে, চিনিয়াছে—অর্থাৎ যে ষোল সতের বছর বয়সে বিধবা হইয়াছে, তাহার সুদীর্ঘ জীবনে আর কাহাকেও ভালবাসিবার বা বিবাহ করিবার অধিকার নাই? নাই কিসের জন্য? একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইব, ইহার মধ্যে শুধু এই সংস্কারই গোপন আছে যে, স্ত্রী স্বামীর জিনিস। স্ত্রীর নারী বলিয়া আর কোন স্বাধীন সত্তা নাই।' পুরুষের চোখে পুরুষের হিসাবে নারীর অমর্যাদা শরৎচন্দ্রকে ক্ষুব্ধ করেছে।* তিনি এই অসম্মানজনক অবস্থা থেকে সম্ভাবনাময় নারীচিত্তের মুক্তি চেয়েছেন। নারীর অসহায় অবস্থা বর্ণনা করে তিনি 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে পুরুষের মালিকানাসূচক মনোভাবকে ধিক্কার জানিয়ে বলেছেন, 'সুতরাং লড়াই করিয়া নিজেরা মরিলে বা কন্যা হত্যা করিলে নারীর অনুপাত বাড়ে না, কমেও না, অনুপাতের উপর নারীর সম্মান বা অসম্মান নির্ভর করে না। করে, পুরুষের এই ধারণার উপর—নারী সম্পত্তি, নারী শুধু ভোগের বস্তু! তাই নিজের কন্যা বধ, তাই পরের কন্যা হরণ করিয়া আনিবার প্রথা! নিজের কন্যা পরে লইয়া গেলে মহা অপমান, পরের মেয়ে কাড়িয়া আনিতে পারিলে মহাগৌরব! এইজন্য এক পুরুষের বহু স্ত্রী সম্মান ও বলের চিহ্ন।'

সমগ্র সাহিত্যকেই জীবনের সমালোচনা বলা হয়, কিন্তু এই সংজ্ঞালাভের অগ্রাধিকার

---

* সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের এই ক্ষুব্ধতা 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধে নিম্নোক্ত ব্যঙ্গাত্মক উক্তিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, 'ভগবান শঙ্করাচার্য স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন, নরকের দ্বার নারী। বাইবেল বলিয়াছেন, root of all evils, অর্থাৎ সমস্ত অহিতের মূল। ইউরোপপ্রসিদ্ধ লাটিন ধর্মযাজক টারটুলিয়ান নারীর সম্পর্কে লিখিয়াছেন, Thou art the devil's gate, the betrayer of the true, the first deserter of the divine law. ধর্মযাজক সেন্ট অগাস্টিন, যিনি সেন্ট পদবী পাইয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে শিখাইতেছেন, What does it matter whether it is in the person of mother or sister; we have to be beware of the Eve in every woman. সেন্ট আমব্রোস, ইনিও সেন্ট, তর্ক করিয়া গিয়াছেন, Remember that God took a rib out of Adam's body, not a part of his soul to make her.'

কথাসাহিত্যের। সমাজ ও সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ কথাসাহিত্যের মূল কাজ। কাজেই একথা আলোচনার অপেক্ষা রাখে না যে, সমাজের এক বৃহৎ অংশ নারীদের জীবনরূপের বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় দানের সাফল্য কথাসাহিত্যের সাফল্যের বড় মাপকাঠি। তরুণী পর্যায়ের যে প্রধান স্ত্রী-চরিত্রগুলি শরৎচন্দ্র এঁকেছেন, তাদের অনেকেরই জীবনে বিবাহের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহ উপলক্ষ করে তাদের অনেকেরই হৃদয় প্রবলভাবে আলোড়িত হয়েছে, বিচিত্র ভাবতরঙ্গ চিত্তলোক প্লাবিত করেছে এবং পরবর্তী জীবন এই আলোড়নে বা প্লাবনে বিশেষ রূপ পেয়েছে। প্রেমের চিত্র যেখানে দেখা যায়, তার প্রায় সব জায়গাতেই বিবাহের প্রশ্ন থেকে যায়। বিবাহের পূর্বে প্রেম সাফল্যকামনা করে বিবাহে পরিসমাপ্তিতে, বিবাহোত্তর দাম্পত্যপ্রেম বিবাহ-অনুষ্ঠানের বনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে থাকে, বিবাহিতার অবৈধ প্রেমের মূল প্রায় ক্ষেত্রেই ব্যক্তিজীবনে বিবাহজাত শূন্যতায় আশ্রয় পায়। শরৎচন্দ্র ভালবাসার যে সব অপরূপ ছবি এঁকেছেন পাঠকচিত্তে সেগুলির স্থায়ী স্থানলাভ বিবাহকেন্দ্রিক ভাব-ভাবনা-নির্ভর সন্দেহ নেই। শরৎচন্দ্র প্রেমের মহিমা-বর্ণনায় কার্পণ্য করেননি, প্রেমকে পবিত্র মনোধর্মরূপেই তিনি চিত্রিত করেছেন, কিন্তু প্রেমের জন্য ব্যর্থতার বেদনায় ও দুঃখবরণে তাঁর নায়িকা বা নায়করা যখন আর্ত হয়ে ওঠে, সেই আর্তির ভিতর দিয়ে প্রায়ই প্রতিফলিত হয় বিবাহ-প্রথা সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মনোভাব। সমাজের ত্রুটিবাচক বিবাহ-প্রথার দৈন্য সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের কটাক্ষ তাঁর বিশাল সাহিত্যে নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে। বানার্ড শ'র মতই শরৎচন্দ্র বিবাহপ্রথার দোষত্রুটি সম্পর্কে সচেতন, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই প্রথা সমাজের পুরানো কাঠামো টিকিয়ে রাখবার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, ব্যাপকভাবে মানুষের সুখশান্তি বা কল্যাণসাধন এর প্রধান লক্ষ্য নয়। বার্নার্ড শ'র মতই তাঁর ধারণা জন্মেছিল পরিস্থিতি বিবেচনা করে যদি বিবাহ-প্রথা প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধিত না হয় তাহলে অবশ্যই হয় বিবাহপ্রথা বাতিল হয়ে যাবে, আর না হয় সমাজবদ্ধ মানুষদের চরম অবক্ষয় ঘটবে।* প্রেম-জীবনের বেদনা রূপায়ণ প্রসঙ্গে শরৎসাহিত্য বিবাহপ্রথার গুরুত্ব এমনি প্রকাশ করেছে, তবে সেই প্রকাশের ফাঁকে ফাঁকেই বেদনাম্লান জীবনের সুস্থ পুনর্বাসনের আবেগ এমনভাবে স্পন্দিত হয়েছে যাতে এর ভিতর আর্তির মূল বিবাহ-ব্যবস্থার উপর লেখকের ভাবদৃষ্টির প্রক্ষেপ ধরা পড়ে।

শরৎসাহিত্যে বিবাহ-প্রথা সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব ধারণা কিছু কিছু স্থান পেয়েছে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের প্রস্তুতিপর্ব ভাল ছিল না, মানস গঠনের হিসাবেও তাঁর মধ্যে স্থায়ী নৈষ্ঠিক দৃঢ়তার অভাব ছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক চেতনা তাঁর মনোধর্ম হলেও এবং পাপ-

* বার্নার্ড শ তাঁর বিখ্যাত নাটক *Getting Married*-এর সুদীর্ঘ ভূমিকায় প্রথমে বিবাহপ্রথার দৈন্য সম্পর্কে বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছেন, 'Our marriage law is inhuman and unreasonable to the point of downright abomination.' কিন্তু এরপর বর্তমান অবস্থার চিন্তায় তিনি স্বীকার করেছেন যে, 'There is, therefore, no question of abolishing marriage ; but there is a very pressing question of improving its conditions.

এরপরই তিনি উচ্চারণ করেছেন সাবধানবাণী, 'There is no shirking it. If marriage cannot be made to produce something better than we are, marriage will have to go or else the nation wlil have to go.'

প্রবঞ্চনা-মিথ্যাচারের সঙ্গে সংগ্রামে তিনি প্রাণের আবেগে অনেক সময় বিনাদ্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়লেও চলতি সামাজিক নিয়ম ও শৃঙ্খলা চূর্ণ করে দেবার মত ভাঙনশিল্পী তিনি ছিলেন না। আসলে তাঁর মধ্যে সমাজসংস্কার ও ধর্মসংস্কার প্রবল ছিল, অথচ অন্যায়ের বেড়াজাল থেকে সত্যকে মুক্ত করবার, সুস্থ সুন্দর জীবনকে পুনর্বাসিত করবার আবেগ তাঁর মধ্যে একই সঙ্গে কাজ করেছে। এইজন্যই দেখা যায় সামাজিক দুর্নীতির উপর আঘাত হানার আন্তরিকতা তাঁর যতখানি ছিল, নিষ্ঠা ছিল তার চেয়ে কম। ফলে কোন কোন সময় শরৎচন্দ্রের লেখায় চেতনার বলিষ্ঠ ঋজু প্রকাশের সঙ্গে মৃদু প্রকাশ, এমনকি প্রকাশ-দ্বিধা লক্ষ্য করা যায়। পূর্বোল্লিখিত "দত্তা" উপন্যাসে নরেন-বিজয়ার বিবাহ এ'হিসাবে একটি ভাল দৃষ্টান্ত। শরৎচন্দ্র নিজে হিন্দু হয়েও হিন্দু-ব্রাহ্মের এই বিরোধের যুগে হিন্দু নরেনের সঙ্গে ব্রাহ্ম-কন্যা বিজয়ার বিবাহ দিয়ে আশ্চর্য সাহস ও ঔদার্য দেখিয়েছেন এবং সংস্কারগত গতানুগতিকতা থেকে সরে এসে ভালবাসাকে বিবাহের ভিত্তিরূপে উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু এই উজ্জ্বল আধুনিকতার সঙ্গেই নরেনদের কুল-পুরোহিতের দ্বারা হিন্দুপ্রথায় বিবাহ সম্পাদিত হয়েছে।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রকে বাস্তব জীবনের রূপকার হিসাবে দেখে সমাজের প্রভাব বা ক্ষমতা পরিমাপ করে সমকালীন জীবনরূপ অঙ্কনের প্রয়োজনবোধের গুরুত্বও স্মরণ রাখতে হবে। বিবাহ-প্রথার মত সার্বজনীন সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ প্রথার উপর অভিমত প্রকাশের সময় শরৎচন্দ্রের ন্যায় জীবনধর্মী কথাসাহিত্যিকের পক্ষে বাঙালীর জীবনরূপের সংকীর্ণ পরিমণ্ডলের ও বাঙালী জীবনের গতিহীনতার কথা ভুলে যাওয়া সম্ভব নয় এবং সেজন্য ব্যক্তিগত অভিমতের স্পষ্ট প্রকাশে তাঁকে হয়তো সাবধান হতে হয়েছে। তবু প্রথাটির সাফল্য সম্পর্কে এবং সমগ্রভাবে প্রথাটির অপরিহার্যতা সম্পর্কে নিশ্চয়ই শরৎচন্দ্রের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, তিনি প্রথাটির পুনর্মূল্যায়ন অবশ্যই চেয়েছিলেন। 'বিলাসী' গল্পের উপসংহারের নিম্নোদ্ধৃত তীক্ষ্ণ মন্তব্য থেকে শরৎচন্দ্রের এই মনোভাবের সম্যক পরিচয় মিলবে, 'আমার মনে হয় দেশের নরনারীর মধ্যে হৃদয় জয় করিবার রীতি নাই, বরঞ্চ তাহা নিন্দার সামগ্রী, যে দেশের নরনারী আশা করিবার সৌভাগ্য, আকাঙ্ক্ষা করিবার ভয়ঙ্কর আনন্দ হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত, যাহাদের জয়ের গর্ব পরাজয়ের ব্যথা কোনটাই জীবনে একটিবারও বহন করিতে হয় না, যাহাদের ভুল করিবার দুঃখ এবং ভুল না করিবার আত্মপ্রসাদ কিছুরই বালাই নাই, যাহাদের প্রাচীন এবং বহুদর্শী বিজ্ঞসমাজ সর্বপ্রকার হাঙ্গামা হইতে অত্যন্ত সাবধানে দেশের লোককে তফাৎ করিয়া, আজীবন যেমন ভালোটি হইয়া থাকিবারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, সেই বিবাহ ব্যাপারটা যাহাদের শুধু নিছক contract তা সে যতই কেন না বৈদিক মন্ত্র দিয়া document পাকা করা হোক, সে দেশের লোকের সাধ্যই নাই মৃত্যুঞ্জয়ের অন্নপাপের কারণ বোঝে।'

ইউরোপে সমাজের একদেশদর্শী বিধানের নাগপাশ হতে নারীর বন্ধনমুক্তি শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে ফরাসী বিপ্লব থেকে। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী এই বিপ্লবের মাধ্যমে ইউরোপীয় জনসমাজকে উদ্বেল করে নারীকে আত্মসম্মানবোধে উদ্দীপ্ত করেছিল এবং তার মনে স্বাধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রামী চেতনার সঞ্চার করেছিল। বাংলাদেশে এই আবেগের সূচনা বিলম্বিত হয়েছে, বলতে গেলে বহুকালের হীনমন্যতা কাটিয়ে সমগ্রভাবে মেয়েদের জাগিয়ে তোলার

মত সক্রিয় বলিষ্ঠ আদর্শবোধ এখনও এদেশে সঞ্চারিত হয়নি। তবু রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের নারীজাতির প্রতি গভীর মমতাবোধ ও নারীকল্যাণের প্রয়াস সূচিত হবার পর মানবমুক্তির আবেগবিজড়িত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চাপেই বাংলাদেশে এই নারীর বন্ধনমুক্তির সত্যকার স্পন্দন অনুভূত হয়েছে এবং প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে নারীর সামাজিক মুক্তি আন্দোলন বাস্তব রূপ পেয়েছে বলা চলে। শরৎচন্দ্র একরকম এই ইতিহাসের গোড়ার দিকের মানুষ, তাঁর জীবনের প্রস্তুতি-পর্বের দুর্বলতার কথা আগেই বলা হয়েছে, কাজেই তাঁর লেখায় নারীমুক্তির দাবি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ধ্বনিত হলেও* এবং নারী জীবনের বনিয়াদ স্বরূপ প্রচলিত ব্যবস্থায় বিবাহপ্রথা সম্পর্কে তাঁর আপত্তি থাকলেও সমকালীন জনমানসের সংগঠনের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রথার প্রশ্নে তিনি আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে বেশীদূর এগিয়ে যেতে পারেননি।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের কীর্তিস্বরূপ তাঁর তিনজন প্রসিদ্ধ স্ত্রী-চরিত্রের জীবন-রূপের তুলনামূলক বিচারে বিবাহ-প্রথা সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মনোভাব বিশ্লেষণ করে এই প্রবন্ধের উপসংহার টানছি। চরিত্র তিনটি হল "শ্রীকান্ত" প্রথম পর্বের অন্নদা, "শ্রীকান্ত" দ্বিতীয় পর্বের অভয়া এবং "শেষপ্রশ্নে"-র কমল। "শ্রীকান্ত" প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব যথাক্রমে ১৯১৭ ও ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং "শেষপ্রশ্ন" ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস "বড়দিদি" ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, এ হিসাবে ১৯১৭ ও ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "শ্রীকান্ত" ১ম ও ২য় পর্ব শরৎচন্দ্রের প্রথম দিকের উপন্যাস এবং ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "শেষপ্রশ্ন" তাঁর শেষদিকের উপন্যাস। ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে অন্নদা এবং অভয়া দুটি চরিত্রই শরৎচন্দ্র সুন্দর করে এঁকেছেন, দুটি চরিত্রই অত্যুজ্জ্বল, কিন্তু জীবনদৃষ্টির হিসাবে চরিত্র দুটিতে গুরুতর পার্থক্য আছে। অন্নদা বিবাহ-সংস্কার বা স্বামী-সংস্কারের উপর পরিকল্পিত হয়েছে। মুসলমান স্বামীর ঘর করলেও অন্নদা নিষ্ঠাবতী হিন্দুবধূরূপ বজায় রেখেছে এবং বিবাহের মন্ত্রপড়া স্বামীকে দুনিয়ার অন্য সব কিছু বিচার-বিবেচনা-নিরপেক্ষভাবে স্বামী হিসাবে দেখেছে। অন্নদা সাধ্বী হিন্দুনারীর আদর্শে স্বামীর সেবায় আত্মনিয়োগ করে অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দীন জীবন যাপন করেছে। অভয়ারও প্রথম দিকে অন্নদার মতই স্বামিসংস্কার ছিল, সেও তাকে ফেলে বার্মায় চলে যাওয়া স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে বহু দুঃখ বরণ করে অনাত্মীয় এক পুরুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সমুদ্রযাত্রা করেছে। অন্নদার সঙ্গে

* "স্বদেশ ও সাহিত্য" গ্রন্থের 'স্বরাজসাধনায় নারী' এ হিসাবে শরৎচন্দ্রের একটি মূল্যবান রচনা। এই প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র লিখেছেন, আমার জীবনের অনেক দিন আমি Sociology-র পাঠক ছিলাম। দেশের প্রায় সকল জাতিগুলিকে আমার ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ হয়েছে—আমার মনে হয় মেয়েদের অধিকার যারা যে পরিমাণে খর্ব করেছে, ঠিক সেই অনুপাতেই তারা, কি সামাজিক, কি আর্থিক, কি নৈতিক সকল দিক দিয়েই ছোট হয়ে গেছে।...

এইখানে একটা বস্তুকে আমি তোমাদের চিরজীবনের পরম সত্য বলে অবলম্বন করতে অনুরোধ করি। এ কেবল পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা। যার যা দাবী তাকে তা পেতে দাও।...আমি বলি মেয়েমানুষ যদি মেয়েমানুষ হয় এবং স্বাধীনতায়, ধর্মে ও জ্ঞানে যদি মানুষের দাবী স্বীকার করি ত এ দাবী আমাদের মঞ্জুর করতেই হবে; তা সে ফল তার যাই হোক। ...আমি বলিনে, বাছা তুমি স্ত্রীলোক, তোমার এ করতে নেই, বলতে নেই, তুমি তোমার ভাল বোঝ না—এসো তোমার হিতের জন্যে মুখে পরদা ও পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখি।"

অভয়ার মিল এই পর্যন্ত। দুজনের স্বামীই দুর্বৃত্ত এবং অত্যাচারী। অন্নদা স্বামীর অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছে, অভয়া কিন্তু স্বামীর অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ হয়ে স্বামীর সঙ্গে মিলনের বহুলালিত আকাঙ্ক্ষা স্বামীর হীনতার পঙ্কে নিক্ষেপ করে বিদ্রোহিণী হয়েছে। সে চিরকালের জন্য অত্যাচারী স্বামীকে ত্যাগ করে পরপুরুষ হলেও যে পুরুষ তাকে সত্যকার ভালবাসে সেই রোহিণীবাবুর সঙ্গে রেঙ্গুন শহরে ঘর বেঁধেছে। শরৎচন্দ্রের নায়ক শ্রীকান্তের মধ্যে শরৎচন্দ্রের নিজের ছায়া আছে এমন কথা অনেকেই বলেন। শ্রীকান্ত এই দুই বিপরীতমুখী স্ত্রী-চরিত্রকেই পৃথক পৃথকভাবে শ্রদ্ধা জানিয়েছে, কিন্তু সেই শ্রদ্ধানিবেদনে মাত্রার তারতম্য আছে। অন্নদাকে শ্রীকান্ত দেবী বলেছে, প্রথম দর্শনেই অন্নদাকে তার মনে হয়েছে, 'যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। যেন যুগযুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া তিনি এইমাত্র আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।' শ্রীকান্তের অন্নদা সম্পর্কে এই মনোভাব শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। অভয়া সম্বন্ধে শ্রীকান্ত উচ্চধারণা পোষণ করেছে, অভয়া প্রোমের স্বামীর ঘর থেকে রেঙ্গুনে রোহিণীর কাছে ফেরার পর শ্রীকান্ত তার সঙ্গে শ্রদ্ধার সম্পর্ক রেখেছে, তার গুণের সামগ্রিক বিচারে মুগ্ধ শ্রীকান্তের চোখে অভয়া বরাবর বড় হয়েই আছে। কিন্তু তবু প্রথম দিকের এই উপন্যাসপর্বে শরৎচন্দ্রের ভাবদৃষ্টিতে বিবাহপ্রথার তথা স্বামী-সংস্কারের উপর আঘাত দেবার মত উজ্জ্বল নারীচরিত্র উদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের অন্তরে কিন্তু অন্নদাদিদিই উচ্চতর স্থান পেয়েছেন, অভয়া সেখানে তুলনায় পিছিয়ে গেছে। এই দুই নারী সম্পর্কে শ্রীকান্তের আপেক্ষিক অনুরক্তি তার নিজের ভাষাতেই নিম্নে বর্ণিত হল, 'তাহার (অভয়ার) চিন্তার স্বাধীনতা, তাহার আচরণের নির্ভীক সততা, তাঁহার অন্তরের অপরূপ ও অসাধারণ স্নেহ আমার বুদ্ধিকে সেইদিকে নিরন্তর আকর্ষণ করিত, কিন্তু তবুও আমার আজন্মের সংস্কার কিছুতেই সেদিকে পা বাড়াইতে চাহিত না। কেবলই মনে হইত, আমার অন্নদাদিদি একাজ করিতেন না। কোথাও দাসীবৃত্তি করিয়া লাঞ্ছনা, অপমান ও দুঃখের ভিতর দিয়া তাঁহার জীবনটা কাটাইয়া দিতেন ; কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সুখের পরিবর্তেও—যাহার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় নাই—তাহার সহিত ঘর করিতে রাজী হইতেন না।'

মনে হয়, অন্নদাকে শ্রীকান্তের তথা শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধা খাঁটি সোনাকে স্বীকার করবার মত অন্তরের স্বতঃউৎসারিত হৃদয়ভাবের প্রকাশ, জটিল তত্ত্বের বিবেচনার প্রয়োজন সেখানে স্থান পায় নি। অভয়ার ক্ষেত্রে এই তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে, সে বিশ্লেষণে জয়ী হয়েছে অভয়া। অভয়া শ্রীকান্তের তথা শরৎচন্দ্রের স্বীকৃতি আদায় করেছে, তার মাধ্যমে নিপীড়িত নারীজাতির ক্ষোভের সার্থক প্রকাশ ঘটেছে এবং বিদ্রোহিণী অভয়ার গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একাজ যিনি করেছেন, তিনি মানবতাবাদী ক্রান্তদর্শী আবেগপ্রবণ শরৎচন্দ্র, অভয়ার বিদ্রোহের মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যাঁর বিদ্রোহী মন আত্মপ্রকাশ করেছে। আবার অন্নদার তুলনায় শ্রীকান্ত যখন অভয়াকে পিছনে ফিরিয়ে দিচ্ছে, তখন প্রাধান্য পাচ্ছে শরৎচন্দ্রের সমাজ-সংস্কারে আবদ্ধ হৃদয় ; এই অনুপমা-নারী-চরিত্রে পবিত্রতাবোধ এবং মানস-সৌন্দর্যের প্রচলিত ধারণার সার্থক অভিব্যক্তিতে শরৎচন্দ্রের এই সমাজমুখী মনের অংশ পায়ের নীচে শক্ত মাটি পাওয়ার আনন্দে যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

এখানে আগের যুগের লেখায় দুই প্রান্ত আপন আপন ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিমান হয়ে ফুটলেও একই

সঙ্গে উভয়ের বিচার করবার মানসিকতায় শরৎচন্দ্রের আধুনিক মন পিছিয়ে গেছে বলা চলে। অন্নদা ও অভয়া "শ্রীকান্ত" উপন্যাসে একসঙ্গে উপস্থিত হয়নি, পৃথক পর্বে এসেছে। লেখক ইচ্ছা করলে বা সতর্ক হলে এই তুলনামূলক বিচারে অন্নদাকে অভয়ার উপরে তুলে দেবার প্রয়োজনই হয়তো হত না। কিন্তু প্রথম দিকে এই তুলনা-সন্নিবেশের সঙ্গে লেখক শরৎচন্দ্রের কঠিন সমাজ-সমস্যা মোকাবিলার উপযুক্ত দৃঢ় মানস-গঠনের প্রশ্নটি বিবেচনা করলে বোঝা যায়, তাঁর মনের দুই পৃথক অংশের মধ্যে দ্বন্দ্ব বর্তমান ছিল, তাই অভয়ার কথা হৃদয়াবেগের সঙ্গে উপস্থাপিত করেও এবং চরিত্রটি উজ্জ্বল করে গড়ে তুলেও অন্নদামুখী তথা সমাজমুখী মনের অংশকে শরৎচন্দ্র জিতিয়ে না দিয়ে পারলেন না।

অভয়া চিত্রণের একযুগ পরে "শেষপ্রশ্নে"-র কমলের সৃষ্টি হল। "শেষপ্রশ্নে"-র নায়িকা কমল বিবাহপ্রথার প্রয়োজনের উপরই প্রশ্ন রেখেছে। শিবনাথের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল, শিবনাথ কমলকে ত্যাগ করে মনোরমার প্রতি আসক্ত হয়। কমল শিবনাথের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। কমল বলে, শিবনাথের ভালবাসাই যখন হারাল, শিবনাথের স্ত্রী হয়ে থাকা তার পক্ষে অর্থহীন। কমল স্পষ্ট বলে, শিবনাথের ভালবাসা না পেয়েও শিবনাথের সঙ্গে বিয়ের উপর যদি সে বাঁচতে চায় তাহলে তার পক্ষে সে বাঁচা মহাদুঃখের, বিয়ের মন্ত্রকে মহাজন খাড়া করে সুদ আদায় হয়তো চলতে পারে, কিন্তু আসল তো ডুববে। এরপর কমল আবার ঘর বাঁধতে এগিয়েছে অজিতের সঙ্গে। এবার কিন্তু কমল নিজেকে আর বিবাহের বন্ধনে জড়ায়নি। অজিত চেয়েছিল বিবাহ হোক, বিবাহ করতে কমলকে সে অনুরোধ করেছিল, কিন্তু কমল বিবাহের মন্ত্রের চেয়ে ভালবাসার পাথেয়ই দাম্পত্যজীবনের কাম্য আশ্রয়, এই সত্যোপলব্ধির উপর জোর দিয়ে অজিতের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে। কমল দরদের সঙ্গে অজিতকে বলেছে, 'তোমার দুর্বলতা দিয়েই আমাকে বেঁধে রেখো। তোমার মত মানুষকে সংসারে ভাসিয়ে দিয়ে যাবো, এত নিষ্ঠুর আমি নই।'

"শ্রীকান্ত" ২য় পর্বের অভয়া এবং "শেষপ্রশ্নে"-র কমল দুজনেই বিবাহ না করে ভালবাসার উপর ঘর বেঁধেছে এবং দুজনেই আশা করেছে, বিবাহিত জীবনের চেয়ে এই ভালবাসার জীবন সুখের হবে। দুজনেরই ব্যর্থ বিবাহিত জীবনের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে।

উপন্যাসে অভয়া এবং কমলের এই ভালবাসা-নির্ভর দাম্পত্য রূপের প্রস্তাবনা-মাত্র ঘটেছে, কঠিন বাস্তবের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে জীবন-রূপ বিবৃত হয়নি। তবু এই প্রস্তাবনার দীপ্তি অনস্বীকার্য। কিন্তু এই বিবাহ-অস্বীকার-করা ভালবাসার ঘর বাঁধায় শরৎচন্দ্রের প্রসন্ন পূর্ণ সম্মতি আছে এমন কথা জোর করে বলা যায় না। অভয়ার চেয়ে অন্নদাকে শরৎচন্দ্র যে অধিক মর্যাদা দিয়েছেন, সেকথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। "শেষপ্রশ্ন" শরৎচন্দ্রের পরিণত বয়সের লেখা, "শেষপ্রশ্ন" শরৎচন্দ্রের প্রিয় বই, একথা জীবনীকারগণ শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বিশেষভাবে জানিয়েছেন। 'শেষপ্রশ্নে' কমল-অজিতের মিলনের প্রস্তাবনাই হয়েছে, সে মিলিত জীবন ফলপ্রসূ হবে কিনা, তাদের বিবাহের চেয়ে বড় জীবন প্রতিষ্ঠিত হবে কিনা, সেকথা উপন্যাসে বলা হয়নি। এইজন্য পরিণতবুদ্ধি শরৎচন্দ্র "শেষপ্রশ্নে" বিবাহকে একেবারে এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটায় সম্পূর্ণ সায় দিয়েছেন, এমন কিছু ধরে নেওয়া ঠিক নয়। তবে একথা ঠিক যে, পার্বতীর বেদনার্ত জীবনের

ছবি এঁকে শরৎচন্দ্র বিবাহ-ব্যবস্থার উপর যে তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন, অভয়া-কমলের প্রেম-নির্ভর দাম্পত্য জীবনের ইঙ্গিতবাহী রচনার সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির একটা কোণ থেকে তার মিল আছে। যে বিবাহপ্রথা নরনারীর সম-অধিকারের ভিত্তিতে চলে না, পুরুষ-প্রধান যে ব্যবস্থা নারীর মনুষ্যত্বের অপমান এবং নারীত্বের প্রতি লাঞ্ছনা বহন করে, সেই প্রথার অন্ততঃ পুনর্বিন্যাস অত্যাবশ্যক—এই অন্যায় ব্যবস্থা কিছুতেই চলতে দেওয়া যেতে পারে না, একথাই শরৎচন্দ্রের এইসব কাহিনী উপস্থাপনের মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে। বিবাহকে শরৎচন্দ্র সরাসরি অস্বীকার করেননি, অস্বীকার করবার সাহসের প্রশ্ন এক্ষেত্রে ঠিক ওঠে না, অস্বীকার করে বিকল্প কিছু উপস্থাপনের শক্তি তাঁর ছিল না, একথাই বড়। "শেষপ্রশ্নে"র কমলের উজ্জলতা যাই থাক, কমলের স্নিগ্ধ জোরালো প্রতিদ্বন্দ্বী আশুবাবুর কথাবার্তার মধ্যে শরৎমানস যেভাবে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে তাতেও কমলের মতামতে শরৎচন্দ্রের পূর্ণ সমর্থনের সম্ভাবনা অনেক কমে গেছে। "শেষ প্রশ্নে"র তিন বৎসর পরে "শ্রীকান্ত" ৪র্থ পর্ব এবং চার বৎসর পরে "বিপ্রদাস" প্রকাশিত হয়েছে। "শ্রীকান্ত" ৪র্থ পর্বেও বিবাহ-সংস্কার তথা সমাজ-সংস্কারে অবদমিত দুটি মিলনকামী প্রেমিক-প্রেমিকা আগের তিন পর্বে যেখানে ছিল, ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে, কমলের প্রভাবে রাজলক্ষ্মী বরাবরের মত কাছাকাছি পেয়ে এই পর্বেও শ্রীকান্তকে নিয়ে ঘর বাঁধবার মত কোন উদ্যমই দেখায়নি। এ পর্বেও তার অন্তরবাসনার প্রতিরোধ ঘটেছে তার নিজেরই মনের দ্বারা, তার সমাজ-সংস্কারে। "বিপ্রদাসে" সতীর উপর আবার অনেকটা "শ্রীকান্ত" প্রথম পর্বের সাধ্বী অন্নদার ছায়া পড়েছে। কমলের পর সতী চরিত্র আঁকার মধ্যেও কমলের বিবাহ অস্বীকৃতির সমর্থনে শরৎচন্দ্রের স্বীকৃতির প্রশ্ন কিছুটা তরল হয়ে গেছে।

মোটের উপর শরৎচন্দ্র বিবাহ-প্রথা একেবারে বর্জন করতে না চাইলেও প্রথাটির সংশোধন চেয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র বার্ট্রাণ্ড রাসেলের ভক্ত ছিলেন, বার্টাণ্ড রাসেল কিন্তু বর্তমান বিবাহ-প্রথার গুরুত্বই অস্বীকার করেছেন। রাসেলের মতবাদ শরৎচন্দ্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকলেও শরৎচন্দ্র এ হিসাবে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মত চরমপন্থী হননি। তিনি ঔপন্যাসিক, তাত্ত্বিক নন। মানবতাবোধ বা হৃদয়াবেগের চাপেই তিনি প্রচলিত বিবাহ-প্রথার দোষক্রটি এবং নারীদের বিবাহ-জনিত দুর্গতির ব্যাপকতায় ব্যথাবোধ করেছেন, পারলে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সতীত্ব-ধারণা বিবাহের বাধ্যতামূলক আদর্শবোধ থেকে জন্মেছে, মোটামুটি সতী সেই যে স্বামীর দোষগুণনিরপেক্ষভাবে স্বামী-সেবায় অভ্যস্ত, শরৎচন্দ্র নারীর এই মনোভাবকে হীনমন্যতার পরিচায়ক বলে মনে করতেন। জৈবিক কামনা-বাসনা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, কেউ কেউ নানা মহৎ গুণ সত্ত্বেও এহিসাবে দুর্বলতা দেখায়, শরৎচন্দ্র বলেছেন এই দুর্বলতা প্রশংসার্হ না হতে পারে, কিন্তু তাই বলে শুধু এই দুর্বলতার জন্যই এইসব গুণ উপেক্ষা করা অন্যায়। মেয়েদের পক্ষে অন্য দুর্বলতা সত্ত্বেও এর বিপরীতে মহৎ গুণের সন্ধান পেলে শরৎচন্দ্র সেই গুণের স্বীকৃতি ও তজ্জন্য প্রশংসা করতে এগিয়ে গেছেন। শ্রীকান্তর গ্রাম-সম্পর্কিত দিদি বিধবা নিরুর* নৈতিক চরিত্র-দুর্বলতার ছবি

* নিরুদিদির কাহিনী উল্লেখ করে পরে শরৎচন্দ্র মেদিনীপুরের এক সভায় বলেছেন, দিদির হয়তো সতীত্ব নেই, কিন্তু তাই বলে তার নারীত্ব থাকবে না কেন?…নারীর দেহটাই কি সব, অন্তরটা কি কিছুই নয়। এই বালবিধবা দুঃসহ

এঁকেও নানা গুণের জন্য তিনি তাকে সম্মান জানিয়েছেন। তিনি অনুরূপ সম্মান জানিয়েছিলেন সতী-পদবাচ্য না হলেও অভয়াকে। বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্রের এই মনোভাব চলতি বিবাহব্যবস্থার উপর অন্ধ-নির্ভরতা-অনুগ নয়। ১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মুন্সীগঞ্জ অধিবেশনে সাহিত্য শাখায় প্রদত্ত ভাষণে এইজন্যই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়।'

যৌবনের তাগিদে তার দেহটাকে যদি পবিত্র রাখতে না পেরে থাকে, তাই বলে তার আর সব গুণ মিথ্যে হবে নাকি? আমাদের কাছে কোন শ্রদ্ধাই সে পাবে না?

এইজন্যই আমি সতীত্ব ও নারীত্ব—দুটোকে আলাদা করে দেখেছি।

আবহমানকাল

অসীম রায়

ভবনাথ যে অঞ্চলে বাড়ি তুলেছেন তা বড্ড ল্যাপাপোঁছা লাগে তাঁর কনিষ্ঠ সন্তানের কাছে। এ অঞ্চলের গা থেকে এখনও কাঁচা রঙের গন্ধ মরেনি। তার থেকে টুটুলের হাঁটতে ভালো লাগে কালীঘাটে, মন্দিরের গা ধরে লোক-উপচানো-গরুর গাড়ি-ঠেলা-লরি-রিক্সা জমজমাট, রিফিউজি আর তীর্থযাত্রীকীর্ণ কালীঘাট রোড। ডাক্তারের সুপারিশে হাঁটা শুরু করেছিল। এখন কলকাতায় রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে বেড়ানো তার এক প্রবল প্যাশানে পরিণত। যখন কাঠের পুলটার মাথায় তামাগলা আকাশে সি আর দাশের সমাধিমন্দিরের গা দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওঠে, নীচে আদিগঙ্গার পাঁকে শুয়োর ঘোরে, দূরে কাদায়-বসা খোড়ো নৌকোটা এক মস্ত সূর্যমুখীর মতো জেগে থাকে, তখন টুটুল নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে, সে ভাবে তার স্বাভাবিক মানুষের জগতে ফিরে এসেছে।

বসন্তের পড়ন্ত বিকেলে হেস্টিংস ব্রিজে ভেড়ার পালের গা দিয়ে টুটুল হাঁটে। মসজিদের মিনারে পতাকা পতপত করে হাওয়ায়, খিদিরপুরের পুলের অদূরেই সমুদ্রবাহী জাহাজের নিঃশব্দ কাতার, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় শিফট সমাপ্তির ভোঁ বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই অগুনতি মাথা আর ঘাড়ের মিছিল। রাস্তার পাশে কলের গানে রামধুনের অব্যবহিত পরেই 'মেরা বুলবুল সো রাহা হ্যায়।' হাওয়ায় এক ঝলক শিক কাবাব।

ছেলেবেলায় দেখা পদ্মা-ধলেশ্বরীর কুলছাপানো যৌবন নেই কলকাতার গঙ্গার। তার যৌবন গিয়েছে কিন্তু মধ্যবয়সী তনুর কর্মদক্ষতা তার সর্বাঙ্গে,অসংখ্য মালটানা ফ্ল্যাটে, বয়াবজরার সান্নিধ্যে, ক্রেন-মাস্তুলের মিছিলে। কলকাতার গঙ্গা যেন চায়ের পেটির গঙ্গা এবং তীর্থযাত্রীর গঙ্গা। এর ঘূর্ণায়মান তরল পলি বয়ে নিয়ে যায় পাটের গাঁট আর বাবুঘাটের ঘোলা জলে পুণ্যলাভ করে চাকরদের কাঁধে চাপা অথর্ব মাড়োয়ারী। ধর্ম ও অর্থ লাভের এই নিঃশব্দ প্রবাহিণীর ধারে বসতেই বাল্য ও যৌবনের যে প্রবল ছেদ ও অনবচ্ছেদ তা একই সঙ্গে টুটুলের মনে আসে। তার ছেলেবেলা আর যৌবন মুন্সীগঞ্জের ধলেশ্বরী আর কলকাতার গঙ্গার মতো সাদৃশ্য বৈপরীত্যের ছবি নয় কি ? মেজাজে চেহারায় একেবারে আলাদা, কিন্তু এক প্রবল মিল নেই কি ? যদি ছেদটাকেই বড় ভাবে ভাবা যায়—যেমন চোঙা ভাবছে কিংবা তার রাজনৈতিক বন্ধু তপনও ভাবছে—তাহলে জীবনযাত্রা বেশ স্পষ্ট ছকে বাঁধা যায়। সেটা বোধ হয় ভালো, কিন্তু টুটুলের ক্রমাগত মনে হতে থাকে বোধহয় সেই ছকে তার জীবনটা বাঁধা যাবে না।

তার মানে কিন্তু এ নয় যে তায়েব আলির দাড়িভর্তি মুখখানা তার মন থেকে সরে গেছে। এখনও ঘুমের মধ্যে তায়েব আলির মুখ হানা দেয়। রোগমুক্তির পর যতবারই তপন এসেছে তাদের বাড়ি ততবারই তপন তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে তাদের যৌবনের স্বপ্ন, সশস্ত্র বিপ্লবের মারফত ভারতবর্ষের মুক্তি, এক অলীক স্বপ্নমাত্র। কিন্তু টুটুল তা মেনে নেয় নি।

—প্রত্যেক বিপ্লবের পেছনেই স্বপ্ন থাকে। স্বপ্ন না থাকলে সেটা একটা ফেরিয়ার। টুটুল বলে তপনকে।

—তুই কবিতার মতন করে কথা বলিস না টুটুল, তপন বললে।

—কোনটা অলীক? ভারতবর্ষের দারিদ্র্য অলীক? বেশীর ভাগ মানুষের কাছে এই আজাদিটা এক প্রহসন নয়?

—এসব কাকে বোঝাচ্ছিস টুটুল? বিপ্লব মানে তো অর্গানাইজেশান। আমাদের সে অর্গানাইজেশান কোথায়?

—এখন আমরা তাহলে কী করব? অ্যাসেমব্লি পলিটিক্স? কর্পোরেশনে ঢুকে রাস্তার ময়লা সাফ করব? টুটুলের গলা উত্তেজনায় তীক্ষ্ণ।

তপন শান্তভাবে বললে,—দরকার হলে তাই করতে হবে। ফাণ্ডামেণ্টাল ব্যাপারটা কী?—ফাণ্ডামেণ্টাল ব্যাপার হল, আমাদের ক্লাস অ্যানালিসিসে ভুল ছিল। ইণ্ডিয়ান বুর্জোয়াজির যে ক্লাস ক্যারেক্টার সেটা কারেক্টলি অ্যাসেস করতে পারি নি।

এরপর বুর্জোয়াজি শব্দের ধ্রুপদী ব্যাখ্যা এবং ভারতীয় বুর্জোয়াজির শ্রেণীচরিত্র নিয়ে আলাপ চলে। বস্তুত শুধু টুটুল ও তপনের মধ্যেই নয়, পার্টির আব্রহ্মস্তম্ব এই ধরনের আলোচনায় নাড়া খায়। এ ধরনের আলোচনার দুটো দিকই আছে। একদিকে যেমন রাজনৈতিক চেতনার তীক্ষ্ণতা অর্জন তেমনি শব্দের আবর্তের পর আবর্ত সৃষ্টি হতে থাকে এবং অনেক তরুণ-তরুণী এই শব্দের আবর্তে ক্রমাগত ঘুরপাক খায়।

মাসখানেক পর তপনকে টুটুল বললে,—আমার মনে হয় আমরা ভুল করিনি।

—তার মানে?

—অন্যের কথা জানি না। কিন্তু আমার বোধহয়, দরকার ছিল এই দক্ষিণ কলকাতার লেপাপোঁছা জীবন থেকে বেরিয়ে আসার।

—আবার হেঁয়ালি করছিস। একটু থেকে তপন তীক্ষ্ণ চোখে টুটুলকে পর্যবেক্ষণ করে বলে,—তোর কি মতলব বল্ তো। ভালো চাকরিবাকরি করবি। তাই বল্ না।

—ভালো কি না জানি না। তবে চাকরিবাকরি তো করতেই হবে।

ঠিক এই সময়ই দমকে দমকে উদ্বাস্তু বমন করে পূর্ববাংলা। বমন ছাড়া আর কিছু কি বলা যায়। কারণ সেই তরল দুর্গন্ধ কলকাতা এবং আশেপাশের শহরতলীর সারা গা মাখামাখি করে তোলে। বস্তুত শেয়ালদা স্টেশনের আশেপাশে ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের নাকে কাপড় দিয়ে যেতে দেখা যায়। কড়া ব্লিচিং পাউডারের গন্ধে বাতাস ভারী। আর সেই জলে ধুলোয় কাদায়, 'বসন্ত মহামারী লেগেছে, অবিলম্বে টিকা নিন' লেখা ডগডগে লাল সালুর নীচেই অমৃতের পুত্র জন্মগ্রহণ করে। প্রায়ই মৃত্যু ঘটে। আর প্রায়ই জন্ম হয়। পাশেই বেগুনের মোলায়েম চকচকে বিশাল ঝাঁকা নিয়ে বাঁই বাঁই করে মুটে দৌড়য় বৈঠকখানা বাজারে। ইলিশের ঝুড়ি ময়লা ছিটানো কর্পোরেশনের লরি আর ফুটপাতে বসা ফেরিওয়ালাদের তপ্ত মামলেট এক অদ্ভুত চাপা গন্ধের রাজত্ব চাপিয়ে দেয় সারাটা অঞ্চল জুড়ে। এক-একটা ট্রেন হুইসিল দিয়ে আসে। গলগল করে লোক উদ্গীরণ করে ধোঁয়া ছাড়তে থাকে। সেই শব্দে গন্ধে চীৎকারে টুটুল দাঁড়িয়ে থাকে।

বিকেল হতে না হতেই এ ব্যাপারটা ঘটে। বিকেল সন্ধে জুড়ে কলকাতার পথ তাকে ডাক দেয়, তার শুধু পাড়া নয়—অসংখ্য পাড়ার অসংখ্য জীবন তাকে ডাকে। আর সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন যুবক সারা কলকাতা চষে বেড়ায়। এরই মাঝখানে রাজনৈতিক ঘরোয়া বৈঠক। ঘন ঘন সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা এবং এক বিশাল শব্দের স্পন্দিত জগতে বারবার আগমন নির্গমন। সেই বিরাট মার্কসীয় শব্দকল্পদ্রুমের চৌহদ্দীতে আরও অনেক তরুণ-তরুণীর মতো টুটুলও ক্রমাগত পাক খায়। কিন্তু তা ক্রমশ চাকরির মতো দাঁড়ায়। সংগঠনের পেছনে যে গভীর বাস্তবতার চেহারা থাকা দরকার তা টুটুলের চোখে ধরা পড়ে না। সেই অবিশ্রান্ত চংক্রমণে পথচলার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ক্রমশ সুদূর হতে হয় মরীচিকা অথবা আর-একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি-রূপে দাঁড়ায়। আরও অনেকের মতই আর-এক তৃতীয় পথের জন্যে টুটুলের প্রাণ কাঁদে। এমন একটা পথ যা বর্তমানেরই পালিশ করা পুনরাবৃত্তি নয় আবার যা বাস্তব, যাকে ধরা যায় ছোঁয়া যায়, বিরাট সংগঠনের মারফত যা চোখ এড়িয়ে যায়।

—হয়ত এমনও হতে পারে, আমরা যা চাইছি আর লোকে যা চাইছে তাতে ফারাক হয়ে যাচ্ছে, টুটুল তপনকে বলে।

—আমার আর কোনো ফেরার রাস্তা নেই টুটুল। তোর জাত আছে, তুই লেখক হবি। বাজারে নাম ডাক হবে। মুড়িমুড়কির মতো কাটবে তোর গল্প। সিনেমা স্ক্রিপ্ট লিখবি। কাল-চারাল ডেলিগেশনে বাইরে যাবি। যা এখন হচ্ছে! অবসাদে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তপন।

—কী জানি লিখতে পারব কি না। আমি লিখলে তোদের কথা লিখব, আমাদের কথা লিখব। এই আমাদের সময়ের বাংলাদেশ, এই কলকাতা। এই সব।

—এসব লিখলে কিছু হবে না। তুই যেমন রাজনীতিতে ফেলিওর, সাহিত্যেও ফেলিওর হবি। আমি বলছি টুটুল। সাহিত্য-ফাহিত্য বিশেষ বুঝি না। কিন্তু এটুকু জানি, তুই যে সব বললি ওগুলো লোকে চায় না।

—কী চায়? টুটুলের আন্তরিক কৌতূহল।

—চায় কী তা তুইও জানিস: বেশ রগরগে গল্প যা খাবলে খাবলে লোকে খাবে। আমার বিশ্বাস হয় না তুই পারবি। তুই এমন একটা ভারী মেজাজের লোক যে তোর বড্ড মুশকিল। আমার মনে হয় তুই এসব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে সাধারণভাবে চাকরিবাকরি কর, সংসারী হও, তার একটা মানে আছে।

—আমি ঠিক উল্টো ভাবছি। এখন যা অবস্থা তাতে ভারী হবারই প্রয়োজন।

—আবার হেঁয়ালি?

টুটুল অসহিষ্ণুভাবে বললে,—যা দরকারী, যে সব চিন্তা আমাকে ধাক্কা দেয় তা হল ভারী হেঁয়ালি? তাহলে আমরা কী নিয়ে থাকব? কী আমাদের ধরে রাখবে?

কলকাতার আনাচে কানাচে ঘুরতে ঘুরতে টুটুলকে সেই সব জায়গাই বেশী টানে যেখানে অনেকদিন ধরে অনেক ধরনের মানুষ বাস করছে, যেখানে বছরের পর বছর রোদ্দুরে বৃষ্টিতে জলে বাড়িগুলোর চেহারা আরও মানবিক যদিও কাঁচা রঙের গন্ধ সেখানে নেই। এমনি একটা বাড়ির গায়ে

পার্কে এসে টুটুল মাঝে মাঝে বসে। এই ছোট্ট পার্কটা যেন চারপাশের বাড়ির সংলগ্ন আঙিনা। ফুলন্ত রাধাচূড়ো গাছটার নীচে পাড়ার পাগলা পানুদা পড়ন্ত সূর্যের দিকে আঙুল মেলে দাঁড়িয়ে থাকে। হাওয়ায় তার মাথার ওপর আর আশেপাশে ফুটবল-দলিত মুমূর্ষু ঘাসে ঝরকে ঝরকে ফুল ঝরে। কালো হাফপ্যান্ট পরা ছোকরা বক্সার শূন্যে ক্রমাগত লাফায়। আর ঢেউয়ের মতো স্কিপিংয়ের দড়ি লাফাতে লাফাতে ফ্রকপরা মেয়েগুলো বেরিয়ে যায়।

এই পাড়ার উঠোনের এক প্রান্তে বসে থাকতে থাকতে টুটুলের সঙ্গে এক ভদ্রলোকের খুব ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়ে যায়। লোকটার বছর চল্লিশ বয়স, লম্বা ফর্সা কিন্তু খুব নরম চেহারা। গেরুয়া খদ্দরের পাঞ্জাবি গায়ে লোকটা এগিয়ে এসে বলে,—এখানে কি করছেন ?

—এই বসে আছি।

—আপনাকে কয়েকদিন আগে বাগবাজারের ঘাটে দেখলাম না ?

টুটুল এবার সন্দিগ্ধভাবে তাকায়। টিকটিকি নয় তো ?

ভদ্রলোক হেসে বললেন,—না না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। আমারও খুব ঘুরতে ভাল লাগে। গান শোনেন ?

—মানে ?

—মানে আর কিছু না। খবরের কাগজে লিখতে হয় পেটের দায়ে। কার্ড আছে একখানা বেশী। যাবেন তো চলুন।

ট্রামে আসতে আসতে লোকটা এক-এক করে টুটুলের পেটের কথা টেনে বার করে। টুটুল বললে,—এত কথা জানতে চাইছেন কেন ?

—এখন আপনার যা অবস্থা দশ বছর আগে ঠিক আমার এই অবস্থা ছিল। আপনারা লাল পতাকার জন্যে লড়ছেন, আমরা লড়েছিলাম তেরাঙ্গার জন্যে। একটু হেসে লাজুক লাজুক ভাবে বললে,—এতদিন থাকলে অন্তত একটা এনিম্যাল হাজবেণ্ড্রির মিনিস্টার হতাম।

—থাকলেন না কেন ?

—থাকতে পারলাম না বলে। আগে যখন জেলে গিয়েছি তখন দেশ বলে একটা বস্তু যেমন মনের মধ্যে ছিল, তারপর সেটা হারিয়ে গেল। যা থাকল তা শুধু খবরের কাগজের জন্যে, এই সূত্রযজ্ঞ, গ্রামোন্নয়ন এগুলোর আগে একটা মানে ছিল। এখন এগুলো শহরের বাবুদের কাণ্ড।

শ্যামবাজারে এক সিনেমা হলে সারারাতব্যাপী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রোগ্রাম। বড়ে গোলাম আলি, রবিশঙ্কর, বিসমিল্লা। মাঝখানে দময়ন্তী যোশীর কথক। এক তীক্ষ্ণ তলোয়ারের শাণিত দৃষ্টি মেলে দময়ন্তী চিত্রার্পিত হলের সামনে মুহূর্তের জন্যে যখন দাঁড়ান, গোলাম আলি তান বিস্তার শুরু করেন, রবিশঙ্করের মীড়ে ভারী গলার আওয়াজ গমগম করে আর সবার শেষে যখন হলের খোলা দরজার মাথার ওপর দিয়ে নীল ভোরের ইঙ্গিত তখন বিসমিল্লার শানাইয়ে অনেক মুগ্ধশ্রোতার সঙ্গে টুটুলও মিশে যায়।

বাইরে এসে যখন তারা ভাঁড়ে চা খায় তখন প্রথম ট্রাম চলতে শুরু করেছে।

হঠাৎ মুখ তুলে রমেন মুখার্জি বললে,—এর মধ্যে আপনাদের রিয়ালিজমটা কোথায় ?

টুটুল এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে,—এইটাই তো দারুণ রিয়ালিজম। যা আমার সমস্ত সত্তা ধরে নাড়া দেয় সেইটাই রিয়ালিজম্।

—তাহলে মশাই আপনাদের কমিউনিজম কোথায় যাবে?

—যাবে না, বলুন আসবে। ঠিকই আসবে যখন আমাদের দেশের লোকদের কমিউনিজম এইরকম গানের মতো টানবে, ধরে রাখবে, তখন কমিউনিজম জীবন্ত রূপ নেবে।

—বাঃ, আপনি তো মশাই সব জিনিষ বেশ তালগোল করে দিতে পারেন।

দুই

—ঘরখানা তো আপনার জাদুঘর বানিয়ে ফেলেছেন, রমেন মুখার্জির বসবার ঘরখানায় ঢুকতে ঢুকতে টুটুল বলে।

—জাদুঘর কেন বলছেন? জাদুঘরে মরা থাকে। আমার ঘরে যা আছে তা চলছে, চলবে।

টুটুল চারপাশে আলমারি-ভর্তি মাটির পুতুল, কাঠের খেলনা, পোড়ামাটির প্যানেল, পাথরের, বাঁশের কাজ, চালচিত্র, ঘট, ঢোকরা কামারের হাতি, রথ, শোলার ময়ূর, কাকাতুয়া, ত্রিপুরার চিত্রিত মাদুর—এ সমস্তর দিকে নিঃশব্দে চেয়ে থাকে।

—এই বাংলাদেশ, এটাই চলছে চলবে।

—এ বাংলাদেশ মরে গেছে। এ দেশ আরও পঞ্চাশ বছর আগের দেশ, যখন দেশবিভাগ ছিল না, রিফিউজি ছিল না।

—এইসব তত্ত্বকথা আমাকে বলবেন না। আজ দশ বছর ঘুরছি গাঁয়ে গাঁয়ে। কোনো জেলা বাকী আছে? বলুন, বলে দিচ্ছি। মরে গেছে মানে? এই সেদিন গড়বেতায় গিয়েছি। নদীর ধারে বিশালাক্ষীর মন্দির, আর কবছরের মধ্যেই নদীগর্ভে যাবে। সারারাত ধরে নদীর ধারে মেলা। বললে বিশ্বেস করবেন না, সারারাত ধরে তিন-চার হাজার লোক, গরুর গাড়ি আর কারবাইডের আলো। এগুলো সব মিথ্যে? আর সত্যি-শুধু ময়দানের মিটিং?

রমেন মুখার্জি হলেন সেই ধরনের যাঁরা সচরাচর চুপ করে থাকেন। কিন্তু যদি মুখ খোলেন তাহলে পাশের কেউ মুখ খুলতে পারবে না, কথার তোড়ে ভেসে যাবে।

—এইটা দেখুন! আসল ব্যাপারটাই আপনি দেখছেন না।

টুটুল একসার পীরের ঘোড়া আর মোহেঞ্জোদড়োর মাদার গডেসের অনুরূপ একসার চকচকে কালো পোড়ামাটির পুতুল, চব্বিশপরগনার দুটো-হাত-সমান ওলাবিবি আর মনসার ঘট যেদিকে উঁকি দিচ্ছে সেদিকে চেয়ে থাকে।

—ঐগুলো না, ঐগুলো না, এইদিকে দেখুন।

এতক্ষণে নজরে পড়ে আকর্ণবিস্তৃতনয়ন দুর্গার সাবেকি বাংলার মুখ।

—এরকম কিছু আছে না আর কিছু হবে? এখন যান পোটোদের কাছে—সব সুচিত্রা সেন। যে ফিল্মস্টার বলবেন অবিকল তাই আঁকবে। আর সেগুলো নিয়ে ছেলেরা লরির ওপরে নাচবে, হৈ হৈ করবে। কিন্তু এমুখ, এ মুখ নিয়ে হৈ হৈ করা যায় না। এর দিকে তাকাতে ভয় লাগে,

ভক্তি আসে। এই হল আর্ট। এই হচ্ছে শিল্পতত্ত্বের গোড়ার কথা।

হলুদ পাঞ্জাবি পরা লোকটা হাত-পা নেড়ে কথা বলে। চুলগুলো ভারী পাওয়ারের চশমার ওপর এসে পড়ে। হাত দিয়ে সরাতে ভুলে যান।

—আপনি এইসব নিয়ে লিখুন না।

—প্লিস্, ঐ কথাটা বলবেন না। যা আপনার সবচেয়ে প্রিয় তা নিয়ে ব্যবসা করা যায় না।

—ব্যবসা কেন বলছেন ?

রমেন মুখার্জি মাথা ঝাঁকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন,—ব্যবসা, ব্যবসা! ব্যবসা ছাড়া আর কি ? এইসব নিয়ে কাগজে লেখা, থিসিস লেখা, এগুলো ব্যবসা ছাড়া কি ? এ সব করে আপনি পারবেন ফোক আর্টকে বাঁচাতে ?

—আপনি যাই বলুন, ওটা আলাদা করে বাঁচানো যায় না। যদি সারা দেশ ডোবে ফোক্ আর্টও ডুববে, আর যদি দেশ জাগে, ফোক আর্টও বাঁচবে।

—ঠিক তার উল্টো, ঠিক উল্টো। ওগুলো বিশ বছর আগে ভাবতাম। এখন দেখছি রেল স্টেশন থেকে গ্রাম যত দূরে থাকে ততই ভাল। ততই আর্টের ধারা টিকে থাকবে। আর স্টেশনের গায়েই তো প্লাষ্টিকের পুতুলের আড়ত। খাকি হাফপ্যাণ্ট পরে ধান রুইছে আর প্লাষ্টিকের প্লেন চালাচ্ছে চাষীর ছেলে—ভাবা যায়!

—যা সত্যি তাই আমার ভাল লাগে, টুটুল আস্তে আস্তে বলে।

রমেন মুখার্জি তার পুরু কাঁচের চশমার ভেতর থেকে টুটুলকে দেখতে থাকে।

—হ্যাঁ, যা সত্যি, যা ঘটনা, তার ওপর তো আমাদের কোনো হাত নেই। আপনার মধ্যে একটা কষ্ট আছে, প্রতিমার যে বিশেষ বাংলার মুখ তা মরে যাচ্ছে, তেমনি ধরুন, এই দেশটা আমাদের চোখের সামনে দুটুকরো হয়ে গেল, তাই নিয়ে কারুর মনে কষ্ট আছে, কিন্তু তারপর ? আমরা কি শুধু এই সব দুঃখের মড়াই বয়ে বয়ে মরব ?

—পরাজয়ের মধ্যে জয়, গ্লানির মধ্যে গৌরব—এই সব বক্তৃতা করবেন ?

—না না, বিশ্বেস করুন, এগুলো আমি নিজেকেই বলছি। যেমন ধরুন মৃত্যু, মৃত্যু আমরা মেনে নিয়েছি, তেমনি আমাদের আরও যে সব দুঃখ তাও মেনে নিতে হয়—তাই না ?

—আপনি কি ইন্টেলেকচ্যুয়াল ? যারা যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে সব বিচার করে চুলচিরে, আমি কিন্তু আপনাদের ভয় করি।

টুটুল দৃঢ়ভাবে বলেন,—এটা কিন্তু আপনি ভুল করছেন রমেনবাবু। বুদ্ধিকে ভয় করবেন না। বুদ্ধি আর হৃদয়ের ফারাক নিয়ে অনেক মাতামাতি হয়েছে আগে। এগুলো পণ্ডশ্রম। ও দুটোর মাঝখানে আসলে কোনো ফারাক নেই, অন্তত আমি তাই বুঝি। বুদ্ধিকে ঠোক্কর দিয়ে আমরা ভাবালুতায় আশ্রয় খুঁজি। নিজেদেরই ঠকাই।

—বাঃ, আপনার সঙ্গে আগে আলাপ হলে ভালো হত!

টুটুল হেসে বললে,—আমি পাত্রী নই। যদি বুঝি আপনি আমাকে পাত্রী ঠাউরেছেন তক্ষুনি পালাব।

বাহিরে শানবাঁধানো চাতালের কোণে একখানা জুড়িগাড়ির জরাজীর্ণ ভগ্নাংশ, আবছা চাঁদের আলোয় আন্দাজ করা যায় পুরু ধুলোয় ভর্তি, মাকড়সার জাল। সেদিকে টুটুলের দৃষ্টি পড়ায় রমেন মুখার্জি বললেন,—পুরনো কলকাতা, এই যা নিয়ে খবরের কাগজে ফিচার করে।

—ও। আপনারা বনেদী ?

—হ্যাঁ ভেস্টেড ইণ্টারেস্ট। তারপর চাতালে দাঁড়িয়ে পড়ে বলতে থাকে,—আসলে এটা আমাদের বাড়ির আস্তাবল। বেশ সিম্বলিক না ? ভাগ হতে হতে আমরা এখন আস্তাবলে এসে দাঁড়িয়েছি।

টুটুল এবার ভাল করে চেয়ে দেখে। লম্বা ছড়ানো গোলাপি বাড়িটার প্রায় বেশীর ভাগ অংশের অসংখ্য দরজা জানালা বন্ধ। খিড়কির দরজা যেটা এখন রমেনদের সদর, ধুলোয় ভরা, ঢালা লোহা পিতলের সুদৃশ্য বাতিদান।

—ওদিকে কেউ থাকে না ?

—ওদিকটা এটর্নির গর্ভে। রমেন মুখার্জি এক নামজাদা দেশসেবী এটর্নির নাম করলে।

খিড়কির গায়েই বস্তি। ঢোল বাজে। হোলির গান করতালের সঙ্গে ঝম্‌ঝমিয়ে উঠে মিলিয়ে যায়। খিড়কির দুধারে দুই জগৎ। তারাও দুজনা কি দুই জগতের বাসিন্দে নয় ? খোলা দরজায় হাত দিয়ে রমেন মুখার্জি বললে,—মেলায় যাওয়া হবে না কি ?

—মেলা ? কেন ? টুটুল অবাক হয়ে বললে।

রমেন হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে বললে,—না না মশাই, আমার ভুল হয়েছে। আপনারা শহুরে লোক। ও সব ধুলোকাদায় কষ্ট হবে। আমার ভুল হয়েছে।

—কবে যাচ্ছেন ? টুটুল হঠাৎ বললে।

—এই শনিবার।

—আচ্ছা চলুন।

তিন

তারকেশ্বরের লাইন। দুদিকের ধানকাটা মাটিতে গাছপালায় রাঢ় অঞ্চলের রুক্ষতা ক্রমশঃ স্পষ্টতর। কামরায় গরম। একদিকে ফেরিওয়ালাদের দাদের মলমের ওপর বক্তৃতা আর অন্যদিকে লোকশিল্পের তত্ত্ব, তার রূপ ও রূপক রমেন মুখার্জির গলায় অবিরত ধ্বনিত। রেলের চাকার আওয়াজে অনেক সময় তা তলিয়ে যায় আবার ভেসে ওঠে। যে জগৎ তাকে রঙে রূপে রেখায় গানে আজীবন মুগ্ধ করে এসেছে তা যেন সমস্ত এই মুহূর্তে রমেন উগলে দেবে। আর এই উত্তাপের সঙ্গে যেহেতু মিশে আছে অনেকাংশে গ্রামের মানুষ, গ্রাম-দেশের নিসর্গ, সে জন্যে টুটুলের মন যেমন প্রভাবিত হয় তেমনি অস্থিরতাও বোধ করে। এত উগলে দেওয়া কেন ? তার চেয়ে ব্যাপারটা থিতোতে দেওয়া যায় না মনের মধ্যে, যাতে তা দানা বাঁধে, কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেয় ?

যেমন রমেন মুখার্জি যখন তার সংগৃহীত মৈমনসিংহের মাটির পুতুলগুলো সম্পর্কে কথা বলছিল তাদের সঙ্গে মোহেঞ্জোদড়োর কালহীন যক্ষীর কেশবিন্যাসের অপরূপ সমতা নির্দেশে কথা বলছিল

তখনও এই একান্ত উদ্দীপনায় টুটুল কিঞ্চিৎ বিমূঢ় বোধ করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধ না হয়েও পারে না।

—প্রত্যেক জেলা আলাদা, মেদিনীপুর আলাদা, বাঁকুড়া আলাদা, চব্বিশ পরগনা আলাদা। আমার কাছে পূর্ববাংলার কিছু আছে যেমন লঙ্গরবন্ধের মেলার পুতুল। লঙ্গরবন্ধের পুতুল আর ধরুন এই আমাদের হুগলীর পুতুল, বিচার করুন, দেখবেন মেজাজে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। লঙ্গরবন্ধের পুতুলের সঙ্গে আবার সাংঘাতিক মিল পূর্ববাংলার দেয়ালজোড়া বিশাল দুর্গাপ্রতিমা। জলে ঢল ঢল সেই বাংলাদেশ। যেখানে তীক্ষ্ণতা নয় বিস্তারেই সৌন্দর্য। কি মশাই? ঘুমিয়ে পড়লেন?

টুটুল ঘুমায়নি। টুটুল তপনের কথাগুলো ভাবছিল। কিছুদিন আগেই তপন বলেছিল, —ওসব সৌখীন সাহিত্য শিল্প, ওগুলো আপাতত মুলতুবি থাক টুটুল। ওসব দরকারি মানছি কিন্তু সব চেয়ে আগে দরকার রাষ্ট্রের ক্ষমতা। পিপলের হাতে যদি রাষ্ট্রের ক্ষমতা আসে তাহলে আর যা বাকী আছে সব হয়ে যাবে। তুই একটা ভুল করছিস টুটুল। বিপ্লব আর শিল্প, ও দুটো একসঙ্গে হয় না।

হয়ত সে ঠিকই বলছে, টুটুল ভাবছিল। কারণ তত্ত্ব যাই থাক, মানুষের সীমিত এনার্জিতে সম্ভাবনার দিগন্ত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ভাবনার জগতে নির্দিষ্ট কারণের সমস্যাও বাড়ে। নইলে আশেপাশে প্রচুর লোকই তো কমিউনিজম শিল্প নিয়ে কথা বলে কিন্তু নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে লক্ষ্য স্থির করার অভাবে তারা তো লক্ষ্যভ্রষ্ট, পথহারা। সেই পথহারাদের দল বাড়িয়ে কি লাভ? কিন্তু এই একই ভাবনার তাগিদ টুটুলকে ঠেলে দেয় পরের ধাপে। তার যে জগৎ, যে জগতে হয়ত তার লক্ষ্য খুঁজে পাবে, তা কি এই দুই জগৎকে একই সঙ্গে নিয়ে নয়? এই রমেন মুখার্জি ও তপন, শিল্পের গভীর উত্তরণ ও সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামো পাল্টানোর জন্যে মরণপণ চেষ্টা, এ দুটোই কি তার জগতে, তার জীবনে জীবন্ত নয়?

আখের ক্ষেতের মাঝখানে ট্রেন থামে। রমেন মুখার্জি তড়বড় করে ওঠে নতুন উদ্যমে, —রিফিউজি কলোনিতে গিয়েছেন? আপনাকে নিয়ে যাব। কলকাতা থেকে একটু দূরে। শয়ে শয়ে লক্ষ্মীর সরা হচ্ছে। মুহূর্তে মুহূর্তে ছবি। একেবারে স্টিলের লাইন। নড়চড় নেই। অব্যর্থ।

—থামুন, চুপ করুন! টুটুল হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে।—অনেক কিছু আছে, অনেক কিছু আছে পৃথিবীতে। কিন্তু যারা কাজ করবে তাদের আরও ছোট্ট সীমাবদ্ধ জগতের দরকার।

—আবার সেই ইন্টেলেকচ্যুয়াল কথা! তাহলে আর যাব না। চলুন এই ট্রেনেই ফিরি।

—না না, ঠাট্টা করছি। চলুন, টুটুল বললে।

স্টেশনে হুড়মুড় করে লোক নামে। অপেক্ষমান বাসের কাছে আসতে না আসতেই দেখা গেল তা ভর্তি। ড্রাইভারের পাশে খালি লম্বা সিটখানায় তেলচিটে লাল চাদরখানা সরাতেই চায়ের ভাঁড় হাতে র‍্যাপার মোড়া একটি লোক হাঁ-হাঁ করে উঠল। ও খালি সিট আসলে খালি নয়। সীটের মালিকরা চাদর বিছিয়ে চা খেয়ে নিচ্ছেন।

প্রায় দশ-বারো মাইল রাস্তা। অর্ধেক পথ রড ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া। অসম্ভব ভিড়, ময়লা জামা বিড়ির গন্ধ। তার মধ্যে প্রবল বচসা। কলকাতার দৈনন্দিন ট্রামবাসে বাদুড়-ঝোলা যাত্রার আর-এক সংস্করণ। জানলার ফাঁকে দাঁড়ানো মানুষগুলো ঘাড় বগলের ফাঁকে ফাঁকে বৃক্ষশূন্য

ধানকাটা মাঠ। টুটুলের শৈশবের তেপান্তরের মাঠ রাণাঘাটের এস. ডি. ও কোয়ার্টারের গায়ের মাঠটার মত ফাঁকা জায়গাও চোখে পড়ে না। মাঝে মাঝে বাস্ স্টপের ধারে শ্যাওড়া গাছের নীচে চায়ের দোকান। গাছগুলোও বেঁটে শুকনো ধুলোয় ভরা, কলকাতা ও আশপাশের মুমূর্ষু তেল-ধুলো মাখা যে গাছগুলো আকণ্ঠ ঘুঁটে গায়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বৃষ্টির অপেক্ষায় তাদেরই সগোত্র। ধান-তোলা মাঠের মাঝখানে কালভার্টের ধারে তারা নামল।

আর যখন হাঁটুভর্তি ধুলোর মধ্যে দিয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে মেলার দিকে এগোয় তখন এই গত বিশ তিরিশ বছরের যে প্রবল পরিবর্তন ইতিহাস ভূগোল এমনকি তার প্রকৃতিও পাল্টে ফেলেছে সেই পরিবর্তনের কথাই টুটুল ভাবে। কালের যাত্রার দ্বৈতরূপ। একদিকে তা বয়ে নিয়ে চলে মানুষের অতীত, তার পরম্পরা, তার স্মৃতি, তার বাঁচবার ইচ্ছে-অনিচ্ছের যোগসূত্র, অন্যদিকে তা হেঁচকায় উপড়ায়, গুণগত পরিবর্তনের পথে বিপ্লব আনে। বাংলাদেশের চেহারায় পরম্পরাটা খুব তাড়াতাড়ি হারিয়ে যাচ্ছে। পরম্পরা নিয়ে যারা আজ মাথা ঘামায় তারা প্রায়শই বাংলাদেশের অতীত নিয়ে, রামমোহন, বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ নিয়ে জাদুঘর বানায়। সে জাদুঘরে রমেন মুখার্জি নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচতে পারে কিন্তু তার পক্ষে থাকা তো অসহ্য। সঙ্গে সঙ্গে কলেজের ছাত্রজীবন থেকেই, বলতে গেলে, সে তো নিজেকে এক অতীতবিরহিত ভবিষ্যতে ছুঁড়ে দিয়েছে তালগোল পাকিয়ে, কলকাতার রাস্তায়, চব্বিশ পরগনার গ্রামে কিন্তু যে গুণগত পরিবর্তনের জন্যে তার এবং আরও অনেক বাংলা-দেশের তরুণতরুণীর প্রাণ কেঁদেছে সে পরিবর্তন আসে নি। এখন আরও অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে। বিপ্লবের জোয়ার চলে গেছে, রেখে গেছে খাওয়াখাওয়ি দলাদলির পাঁক, ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি। বিপ্লবের উত্তরলব্ধি বলতে যা আছে তা এক প্রবল ক্ষয়কর অবসাদ। অবসাদের মড়া যে এত ভারী টুটুল আগে কখনও অনুভব করে নি। এখন এ ভারে তার ঘাড় ভাঙার জোগাড়।

হঠাৎ গাঁয়ের পথের মোড় নিতেই দূর থেকে মানুষের গলার আওয়াজ আসে। সেদিকে যত এগোতে থাকে ততো তা জলের শব্দের মতো এগিয়ে আসে। মানুষ দেখা যায় না। শুধু নিষ্পত্র কতগুলো গাছ আলের ওপর। তার পেছন থেকে শব্দ, যেন জঙ্গলের মাঝখানে জলপ্রপাতের আওয়াজ। এবার একটা বটগাছের নীচে চায়ের দোকান পেরোতেই চোখ পড়ে বিস্তীর্ণ উঁচু ঢালু জমির ওপর অসংখ্য মানুষ, কাপড়ের নীচে নীচে দোকান পাট। আসলে এক বিরাট মজা দীঘির চার ঢালের ওপর মেলা বসেছে। একদিকে অনেকখানি জমি জুড়ে আছে মাছ ধরার পোলো। সেই বাদামি পোলোর পাহাড়ের পাশেই খুন্তি কড়াই বেড়ি, একটা ঢাল খালি মুড়ি আর চিড়ের ছালায় ভর্তি। প্রায় আধ মাইল লম্বা দীঘিটা প্রদক্ষিণ করতে করতে অনেকখানি সময় লেগে গেল। এই মেলার পেছনে কিংবদন্তীটা ট্রেনে আসতে আসতেও রমেন বলেছে। আবার বলতে শুরু করে। মোগল যুগের শেষের দিকে এক হিন্দু রাজার কাহিনী। দেবী লাল-পেড়ে শাড়িপরা ছোট্ট মেয়ের বেশে দরবারে হাজির। রাজা তখন ব্যস্ত, মেয়েটির ডাকে সাড়া না দিতে সে বেরিয়ে গেল সভা থেকে, তারপর টনক নড়া, খোঁজ খোঁজ, শেষ পর্যন্ত দীঘির পারে এসে দেখেন সলিলগর্ভ থেকে উত্তোলিত দেবীর শাঁখাপরা হাত। শুনতে শুনতে পরিশ্রমে খিদে তেষ্টায় টুটুলের হাঁটতে কষ্ট হয়। এরই মধ্যে বিমলেশ চশমা পরা ক্যামেরার ঝোলাঝুলি কাঁধে এক আমেরিকান তরুণের সঙ্গে দেখা।

রমেনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তরুণটির কথা। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনে কাজ করতে এসেছে বাংলাদেশের লোকশিল্পের ওপর। বেলা বাড়ে। গলার আওয়াজগুলো কমে আসতে থাকে। তরুণটি চলে গেলে আবার কিংবদন্তীর কথা পাড়ে রমেন। আশেপাশে ঢালু জমির ওপর ঝোলাগুড় আর মুড়ি নিয়ে লোকেরা খেতে বসেছে।

—এটা রিভাইভেলিজমের কথা নয়। সেই পুরনো বাংলাদেশকে, সেই গ্রামকে ফিরিয়ে আনতে হবে। আসলে গান্ধীজীও সেই কথা বলেছিলেন, রমেন বলে।

—একটু মুড়ি খেলে হয় না? টুটুল প্রস্তাব করে।

গাছের তলায় ঢালু জমিতে ঘাসজলা ধুলোয় বসে মুড়ি ঝোলাগুড় খেতে খেতে আবার শরীরে বল পায় টুটুল। যে গ্রাম চুরমার হয়ে গেছে সেই গ্রাম ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিংবদন্তী ভেসে গেছে। নতুন কিংবদন্তীর প্রয়োজন যা খেত খামারে বনে বাদাড়ে মানুষকে ধরে রাখতে পারে, নতুন আশ্রয় তারা চাইছে একথা স্পষ্ট। রাজনৈতিক পার্টি কি সেই আশ্রয় দিতে পারবে সাধারণ মানুষকে?

এক গাছতলায় খুব ভিড়। শহরের কাট পিস্ বিক্রি হচ্ছে। বেশীর ভাগ বম্বের মাল। রঙদার চিত্রবিচিত্র ঝুটো সিল্ক। সেই ভিড়ের শেষে মানুষের অরণ্যের মাঝখানে এক বুড়ি আর বোধ হয় তার নাতি দু ঝুড়ি পুতুল নিয়ে বসেছে। এখানে দাঁড়িয়ে পড়ার জন্য রমেন মুখার্জির লোকশিল্প যাচাই করা চোখের ইশারার প্রয়োজন ছিল না। টুটুল এমনিতে দাঁড়িয়ে পড়ে। সবুজ হলুদ লালে কালোর ছড়ায় অপরূপ বর্ণাঢ্য মাত্র দু সারি কাঠের পুতুল।

—আর নেই, আর নেই? উচ্ছ্বসিত প্রশ্ন করে রমেন।

ন্থুয়েপড়া বুড়ীটা এতক্ষণ হাঁটুর মধ্য থেকে মুখ তোলে। টুটুলের মুখের দিকে এক নজর চেয়ে বলে,—ছিল, সব ফোকবাবুরা নিয়ে গেছে।

—ফোকবাবুরা? টুটুলের প্রশ্নের জবাবে জাবর কাটার মতো মুখের মধ্যে অনির্দিষ্ট বস্তু চিবোতে চিবোতে বুড়ী বললে,—হ্যাঁ গো, ফোকবাবু। বললে আমেরিকা না কোন দেশ আছে সেখানে যাবে জাহাজ ভর্তি করে। তা আমরা কি আর অতো গড়তে পারি, বাপু। আর দুদিন পর তো গায়ে খড়ি চাপাবে। মোটে নাতিটা আছে।

কালো হলুদ আর লালের জলজলে কাঠের পুতুলগুলো বাছতে বাছতে বুড়ী বলে,—ওগুলো সব উঠে যাবে বাবু। আমরা চোখ বুঁজব আর এই পুতুল টুতুল সব উঠে যাবে।

রমেন মুখার্জি সেই ঢালের ওপর বসে পড়ে বলে,—সব উঠে যাবে বুড়ীমা? কেন, তোমার নাতি করবে।

—দূর, ও তো ব্যবসা করে! এই মেলার জন্যে এসেছে। আমি একলা মানুষ।

—ব্যবসা? কিসের ব্যবসা? টুটুলের কৌতূহল জাগে।

—দাঁড়িয়ে রইলে কেন গো। বোসো। বুড়ী হাত বাড়িয়ে সেই পায়ের অরণ্যের মাঝখানে তার ঝুড়ির পাশের স্থান দেখায়। টুটুল বসতেই বলে,—এখন আর কি কলামোচা বেচে চলে বাবু? কলার বাগান সব গেছে। আমাদের হুগলী জেলার লোক জানো তো? না? সকালে উঠবে।

গামছাটি পরবে আর দাখানা হাতে নিয়ে বাগানে যাবে। দু-তিনবার ঘুচঘাচ করবে। তারপর সেই মোচাকলা নিয়ে হাটে যাবে। ব্যস, সারা দিনের কাজ হল।

—এখন ?

—এখন সব বনগাঁর লাইনে চলে গেছে। দু-তিন দিন পর ফেরে। চাল সুপুরির ব্যবসা। হ্যাঁ গো। পাকিস্তান থেকে সব জিনিসপত্র আনে। চাল আসে সুপুরি আসে পাট আসে, আমাদের এখান থেকে কত জিনিস যায়।

—পুলিশে কিছু বলে না ?

বুড়ীর জাবর কাটা অকস্মাৎ বেড়ে যায়। প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে,—ঠেঙ্গানি দেয় খুব। ওর বাবাটা তো ঠ্যাঙানি খেয়ে সাতদিন বাড়িতে। তবে পয়সা আছে বাপু। ব্যবসায় পয়সা আছে।

খবরের কাগজে দুটো মোড়কে করে পুতুল নেওয়া হয়। বুড়ী টুটুলকে প্রশ্ন করে,—এতগুলো পুতুল নিলে, বাড়িতে অনেক ছেলেমেয়ে বুঝি। তোমার কটি গো ?

—আমি ? আমি বিয়ে করি নি, টুটুল অপ্রস্তুত ভাবে বলে।

—সে কি গো ? কেন ?

—কেন ওসব ঝামেলা।

বুড়ী চোখ গোল গোল করে বলে,—ঝামেলা! সে কি গো! একটা লোকও তো ঝামেলা।

—ওসব তুমি বুঝবে না বুড়ীমা!

—তা পুতুলগুলো নিয়ে কি করবে ? খেলবে ? তোমরা ধাড়ি লোকগুলো খেলবে ? ফিক ফিক করে হাসে বুড়ীটা।

রমেন বললে—তোমরা তো চোখ বুঁজলেই সব শেষ। আমাদের কাছে থাকল। লোকে জানবে বাংলাদেশ কেমন ছিল আগে।

—ওর বাবা আমায় একবার নিয়ে গেছিল গো কলকেতায়। সেখানে কতো মরা দেখলাম চিড়িয়াখানায়, তিমি মাছ দেখলাম।

—ওটা জাদুঘর বুড়ীমা, রমেন বললে।

—ঐ হল, জাদুঘর চিড়িয়াখানা। আমার কি অত মনে থাকে রে বাবা! একটা হাতি দেখলাম। অমনটি আর দেখিনি। কত হাজার বছর আগে অমন হাতি ছিল।

—দেখলেন, দেখলেন, কি পাজি বুড়ীটা! আমাদের হাতি দেখিয়ে দিল। ফাঁকায় এসে রমেন বলে।

—ঠিকই বলেছে।

—আপনার তত্ত্বের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। না ?

—তত্ত্ব আবার কী ? যা সত্যি তাই। যা ঘটেছে তাই কি আবার ঘটবে ? তার নামই কি মানুষের ইতিহাস ?' টুটুল কিঞ্চিৎ উষ্ণ হয়ে বললে।

—তা হবে কেন ? ইতিহাসের নামে যত ভূতের নেত্য! আগে আমাদের পূজোর একটা মানে ছিল। ঠাকুরের গড়ন ছিল, মুখে ভাব ছিল। দেখলে ভয় হত, ভক্তি হত। আর এখন ?

কুমোরটুলিতে গিয়ে ফিল্মস্টারের মতো ঠাকুর গড়বার বায়না। তারপর লরিতে চেপে চোঙা প্যান্ট পরে নাচ! এইটা তো ইতিহাসের ধারা আপনাদের ভাষায়?

—চেঁচিয়ে কোন লাভ আছে? মানুষ পাল্টাচ্ছে, সমাজ পাল্টাচ্ছে? রাশিয়ার কথা ছেড়ে দিন, ইংল্যাণ্ড পাল্টায়নি?

—কোন ইংল্যাণ্ড? সেই হ্যাটবুট আঁটা ভিক্টোরীয় ইংল্যাণ্ড? তাতে তো খুব ভাল হয়েছে, মানুষ হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে? তার সঙ্গে তুলনা করছেন আমাদের অতীতের ভাবনা চিন্তা, যা আঁকড়ে সাধারণ মানুষ বাঁচতো সেই সব অপূর্ব শিল্পভাবনা। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে টুটুল। রমেন মুখার্জি তুমিতে নেমে আসে।

—তোমারও হয়েছে, আমি কখনও তা বলছি না। আমি বলছি বাংলাদেশটা পাল্টাচ্ছে, আর তা নিয়ে প্যান্‌প্যান কোরো না। ব্যস্।

যখন তারা দুজনে মাটির ঢালের ওপর দাঁড়িয়ে চেঁচায় তখন পাশেই দাঁড়িয়ে রুক্ষ চুলে দুটো ফ্রকপরা মেয়ে লাল রিবন কেনে, কয়েকটি সাঁওতাল তরুণী ঝকমকে ছিটের ব্লাউস নেবার জন্যে ভিড় করে, একটা করে পোলো পিঠে ঝুলিয়ে চার-পাঁচজন গাঁয়ের লোক বাড়ির দিকে এগোয়, পড়ন্ত বেলায় ফুলুরির গন্ধে বাতাস ম ম করে, আর তারই মাঝে সারাদিনের তাতে বিশাল মজা দীঘিটার পাঁক থেকে গন্ধ উঠে।

ফেরার সময় বাসে সীট পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু দুজনেই গুম্ হয়ে ফেরে। ভিড়ের মধ্যে পাশাপাশি দুটো লোক চেপ্টাচেপ্টি হয়ে থাকলেও তারা যেন একেবারে দুটি স্বতন্ত্র জগৎ।

স্টেশনে এসে দেখলে ট্রেন ছাড়তে দেরি। কাজেই রমেনের প্রস্তাবে মন্দিরের পথে তারা অগ্রসর হয়। টিনের বাড়ি, বারান্দায় তক্তাপোশ ফেলে রাখা হোটেল, 'স্ত্রীলোকদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা' অনেকগুলো পিতল কাঁসা হাঁড়ি কড়াই আর মাটির সরা, খুরির দোকান। সেখানে গাঁজার কলকের মাঝখানে এক হিন্দুস্থানী রমণীর দিকে চেয়ে রমেন আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। 'লুক, লুক অ্যাট হার আইব্রাউজ,' টুটুলও দাঁড়ায় তবে ভুরুর জন্যে নয়, কিঞ্চিৎ স্থূলাঙ্গী কিন্তু মৃদু হাস্যদীপ্ত ময়লাকাপড় পরা সেই আয়তনয়না মহিলাটির মুখে সারা শরীরে এমন তৃপ্তির ছবি যা চোখে না পড়ে যায় না। শুধু গাঁজার কলকেই নয়, কতগুলো মাটির অ্যাবস্ট্রাক্ট পুতুলও আছে ঝুড়িতে।

—পুতুল লিবে বাবু? মুগ্ধ যুবকটির দৃষ্টিকে যেন ঠাট্টা করে স্ত্রীলোকটি।

—ঠিক মা যশোদা, না? ইয়োরোপ থেকে একেবারে মেজাজে আলাদা, রমেন মহিলাটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলে। তারপর একটার পর একটা পুতুল হাতে নিয়ে টুটুলের দিকে চেয়ে নীচু গলায় বলে, এগুলো এখানেই ভাল। এইখানেই বেশ লাগছে। অনেক ছেলেমেয়ে আসবে মন্দিরে তাদের মায়ের হাত ধরে। তাদের হাতেই এগুলো মানাবে। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'নাঃ, এগুলো আর ঘরে রাখা যাবে না। সব চলে যাবে। থাকবে তোমাদের স্লোগান, আর—চলবে না, চলবে না।'

—আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। শশা খাচ্ছি। দুধারে কালচে সবুজ আর মাঝখানে কচি কলার পাতায় কোমল আভায় ভরা একঝুড়ি কচি শশার দিকে টুটুল এগোয়।

তিন

—কম্প্রাডর বুর্জোয়াজি মানে কী? ধীরেন মাষ্টার কালীঘাটে আদি গঙ্গার ধারে ছ্যাৎলা আর ছত্রাকছাওয়া জীর্ণ বাড়িটায় তপনদের একতলার ঘরে ভারতীয় বুর্জোয়ার শ্রেণীচরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন। প্রশ্ন করেন এবং উত্তর দেন। ঘণ্টা দেড়েক অতিবাহিত। তক্তাপোশের এক কোণে জমে চায়ের ভাঁড় আর বিড়ির টুকরো।

ধীরেন মাষ্টার অবিভক্ত উত্তরবাংলার কোন জেলার কমরেড। তত্ত্বের ওপর তাঁর ঝোঁক অটুট। রংপুর-দিনাজপুরে যখন তেভাগা আন্দোলনের ঢেউ উঠেছে, চাষীরা লড়েছে মরেছে, তখন একই উৎসাহে ধীরেন মাষ্টার ভারতীয় বুর্জোয়ার শ্রেণীচরিত্র নিয়ে ক্লাস নিয়েছেন অন্ধকারে মাঠের মধ্যে গোল হয়ে বসে। এখন বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে, চুলে পাক ধরেছে, কিন্তু তরুণ কমরেডদের অনেকের চেয়েও রাজনৈতিক তত্ত্বের ওপর আলোচনায় উৎসাহ প্রবলতর।

বাহিরে লরিতে ইট ওঠে। পাড়ের মুখ থেকে বোঝাই-লরি প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে যখন বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় তখন বেশ কিছুক্ষণের জন্যে আলোচনা বন্ধ থাকে। তারপর আবার শুরু হয়। জাতীয় বুর্জোয়া বলতে কি কিছু আছে? তাদের কোন্ কোন্ অংশ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শরিক হতে পারে? কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে, কতদূর পারে না, সেই অস্পষ্ট আলোছায়ায় ধীরেন মাষ্টার অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ায়। ইতিমধ্যে তপনের পরের ভাই নাকে মুখে গুঁজে টালিগঞ্জের এক কারখানায় দৌড়য়। তার পরের মোটাসোটা ফ্রকপরা বোনটা আর দুটো ভাইকে চান করিয়ে দিলে তারা জল গায়ে দৌড়ে উঠোন পার হয়। বাড়ির পুরনো ঝি দামিনী 'আমার গতর খেলে গো' বলতে বলতে কলাইকরা থালায় ধোঁয়াওঠা ভাত, ডাল আর বেগুনভাজা ঠক্ করে রেখে হাঁক দেয়, এ কি গো বড় মানুষের ছেলেরা, গেলা হবে না কি? আর অর্ধেক আঁচড়ানো ভেজাচুলে দুই ভাই প্যাণ্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে ধপ করে পিঁড়িতে বসে খেতে শুরু করে। আধঘণ্টা পর বাড়ির মধ্যে হুটোপুটি শুদ্ধ, বাহিরে লরির আওয়াজও বন্ধ। গলিটার সামনে বটগাছে কাক ডাকে। ধীরেন মাষ্টার বলেন,—কই অনিন্দ্য, আর একবার চা হোক।

এতক্ষণ ধীরেন মাষ্টারের আলোচনার মধ্যে তপন বারে বারে উশখুশ করেছিল। তাহলে আমাদের এখন কী করতে হবে? মোদ্দা কথাটা কী বলুন। ইত্যাদি প্রশ্নে সে যতবার অধীরতা প্রকাশে তৎপর হয়েছে ততবারই রাজনৈতিক তত্ত্ব অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধীরেন মাষ্টার সরব হয়েছেন।

চতুর্থ ব্যক্তিও মধ্যবয়সী। টালিগঞ্জের রেফিউজি পলিটিক্স করেন। অমূল্য ব্যানার্জি বোধহয় কোনো প্রেসের কম্পোজিটর। ফর্সা স্বাস্থ্যবান চেহারা কিন্তু মুখের রং জ্বলে গেছে। তিনিও মাঝে মাঝে অধীরতা প্রকাশ করেন আর টুটুলকে তাঁর চোস্ত বাঙাল ভাষায় খোঁচান,—কী অনিন্দ্য! কিছু কও!

কয়েকমাসের মধ্যে টুটুলের এই চুপ করে যাওয়া তার সহচর তপনের সবচেয়ে বিসদৃশ লাগে।
—টুটুল এখন শিল্পী, 'স'-এ ইংরেজী 'এস'-এর উচ্চারণ করে তপন।

—আহা দাড়িটারে কাটলে ক্যান্? পোর্ট কমিশনের ভদ্রলোক বললেন।

ধীরেন মাষ্টার চটে উঠে বললেন,—ওরকম মেকানিক্যালি চিন্তা করবেন না কমরেড। লেখক ইণ্টেলেকচুয়াল আমাদের পার্টির অ্যাসেট্। লেখা ইজ্ এ ওয়েপন। অনিন্দ্য আমাদের সমাজকে ভেঙে চুরমার করবার জন্যে লেখনী ধরবে।

টুটুল লক্ষ করলে, সশস্ত্র বিপ্লবের কর্মপন্থা নেবার সময় ধীরেন মাষ্টারই ছিলেন সবচেয়ে সরব, এখন প্রায় ঠিক বিপরীত পথে শাসনতান্ত্রিক রাস্তায় ধাপে ধাপে এগোনোর যুক্তিতেও তিনি পটু। টুটুল আগেও লক্ষ করেছে, কিছু কিছু কর্মী আছেন, নেতা আছেন, তাঁরা চারপাশের অবস্থার ওলোট পালোটের সঙ্গে বেশ নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে সে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ধীরেন মাষ্টারের দিকে, তারপর তক্তাপোশের পায়ের কাছে মাটির ভাঁড়টা রেখে আস্তে আস্তে বলে, —তার মানে আমরা এসেমব্লি পলিটিক্স করব, ভোটের যুদ্ধে নামব, এই তো?

—এইটাই শুধু না, দুটোই থাকছে। বাহিরে ও ভেতরে আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

—আর যাই করেন কম্‌রেড গরীব মানষেরে বাউল বোষ্টম বানাবেন না। আমাগোর খালি ঐটা ভয়। গরীব মানষেরে পার্টি কী দিবে? লাঠি ধরবার সাহস দেবে। ব্যস। অমূল্য ব্যানার্জি বললেন।

এই মানুষটাকে টুটুলের বরাবর ভালো লাগে। এমন এক দৃঢ় পদ্মাপারের গোঁ অস্বাভাবিক দারিদ্র্যের মধ্যেও লোকটার মাথা খাড়া রেখেছে যে তার কথাবার্তা সবসময় স্পষ্ট। কিচ্ছু এসে যায় না অমূল্য ব্যানার্জি শিল্প সাহিত্য বোঝে কি না বোঝে, সে অগণিত গরীব মানুষকে তাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় লাঠি ধরতে সাহস জুগিয়েছে, এইটাই আসল কথা।

ধীরেন মাষ্টার চটে উঠলেন। চেঁচিয়ে বললেন—শুধু লাঠিবাজি তো সবাই করতে পারে। জার্মানিতে হিটলার করে নি? আমাদের দেশে জোতদার জমিদার মিলের মালিক গুণ্ডা পুষছে না? তবে?

আবার আত্মসমালোচনা শুরু হয়। ধীরেন মাষ্টার ক্রমাগত অ্যাডভেঞ্চারিজম্, হঠকারিতা, ভ্যানগার্ডিজম্, টেলিজম্, শোধনবাদ, রিভিশানিস্ট ডিভিয়েশান, হেজিমনি অফ্ দ্য প্রলেটারিয়েট প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করতে থাকেন। এই শব্দগুলোর নিশ্চিত নির্দিষ্ট অর্থ আছে এবং সব দেশের গণআন্দোলন জোরদারের মুখে কর্মপন্থা নির্দিষ্টকরণের জন্যে এ শব্দগুলি নিশ্চয় অনেকখানি সাহায্য করে। কিন্তু ধীরেন মাষ্টারের কথায় এ শব্দগুলোর যথার্থতা হারিয়ে যায়। অমূল্য ব্যানার্জি ঘন ঘন হাই তোলেন। গতকাল বহুরাত্রি পর্যন্ত তাঁদের কলোনিতে গোলমাল, বোমা ছুরি চলেছে। মেয়ে-ছেলে নিয়ে ঝগড়া মেটাতে মেটাতে মাঝ রাত। ক্লান্তিতে চোখ রগড়িয়ে বললেন,—এইবার ক্ষান্ করো ধীরেন। আবার তো রবিবার মিটিং। ওগুলো আবার কইবানে।

ধীরেন মাষ্টার আর অমূল্য ব্যানার্জি চলে যাবার পর টুটুল ওঠে অপরিসীম ক্লান্তিতে। আগে এই ধরনের আলোচনার সরলীকরণের প্রবল ঝোঁক যে তার চোখে পড়ে নি তা নয়, কিন্তু এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যে, ধরা ছোঁয়া যায় এমন এক পরিষ্কার পথে তা এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে মাসের পর মাস আলোচনা আগে এমন লক্ষ্যভ্রষ্ট পথহারা মনে হয়নি।

বাহিরে আদিগঙ্গার পাঁকে জোয়ার আসে। বটগাছটার গোড়ায় দরমায় ছাওয়া সরাখুরির দোকানের পাশে কয়লার আর চুন-সুরকির ডিপো। তার গা দিয়ে ঘোলা জল পাক খেতে খেতে ছোটে। এতক্ষণ খড়বোঝাই নৌকোটা কাদায় গেঁথে ছিল। এখন সেটা নড়বার উপক্রম করে। পিঠে কাক নিয়ে মরা মোষ ভেসে যায়। দুই বৃদ্ধা স্নান সেরে ঘাট থেকে উঠে আসেন। তপনের এক জ্যাঠামশাই—তিনিও তাদের বাড়িতে পোষ্য। বিশাল শরীর। প্রায় অথর্ব। ধীরে ধীরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে তপনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন।

—আজ ইলিশ মাছ আন্‌ছস ? বৃদ্ধ তাঁর ভাইপোদের মতো দেশের ভাষা ছাড়েন নি।

তপন বিরক্ত হয়ে বললে,—না, দামটা দিও। নিয়ে আসব।

বৃদ্ধ ঘোলা চোখে ভাইপোর দিকে চেয়ে থাকেন। ঠোঁটের অদ্ভুত ভঙ্গী করে বললেন,—তাহলে কই মাছ আন্। চ্যাপ্টা কই আনবি তপু। যেগুলোর আকৃতি চ্যাপ্টা সেগুলোর স্বাদ ভাল। ত্যাল-কই দিয়া শুক্ষ চাউল কদ্দিন খাই না তপু। আর কয়ডা দিন। আমারে একদিন ভাল করে খাওয়া। তোর ঐ ফ্যান কারখানায় চাকরি হব। আমি বলছি।

—কী সব আজেবাজে বকছো ? আমি কি চুরি করব নাকি ? যেমন পয়সা পাব তেমনি বাজার করব। আর অতো লোভ কোর না। খাট ভর্তি করে তো রাখবে হেগেমুতে। তোমার কোনো লজ্জা নেই জ্যাঠামশাই।

তপনের ধমকানিতে বৃদ্ধ নড়বড় করতে করতে ঘাটের দিকে এগোয়। সেদিকে চেয়ে চেয়ে তপন গজরায়, আশ্চর্য, লোকটা মরি মরি করেও মরে না। লোকটা মরলে খুকীটা বাঁচে। একটা মেয়ের ওপর সারা সংসার !

তারপর হঠাৎ টুটুলের দিকে চোখ পড়ায় অসহিষ্ণুভাবে প্রশ্ন করে,—কখনো বাজারে গেছিস ?

—না, মানে এখন বাবাই বাজার করেন।

—তা বলছি না। বলছি, এরকম অবস্থা হয়েছে যে জেনেশুনে পচা মাছ কিনে বাড়ি ফিরেছিস ?

টুটুল অপ্রস্তুতভাবে বললে,—না। তবে তুই বড্ড পার্সোনালি ব্যাপারটা দেখছিস।

—হয়তো তাই। তপন তার ছোটো তীক্ষ্ণ চোখ ঘাটের দিকে মেলে বললে,—অমূল্য ব্যানার্জির কথাই ঠিক। সব লাঠি মেরে ভেঙে দিতে হবে।

যে প্রবল অসোয়াস্তি নিয়ে টুটুল সেদিন ফিরল তপনদের বাড়ি থেকে তার এক সাময়িক সুরাহা হল কয়েক দিনের মধ্যে। কয়েক দিনের মধ্যে এক প্রচণ্ড রাগে সারা শহর আছাড়িপিছাড়ি খেতে থাকে। সকাল থেকেই রাস্তায় রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে জনতার লড়াই, বোমার আওয়াজ, টিয়ার গ্যাসে বাতাস ভর্তি। সন্ধ্যে হতেই চারিদিক নিষ্প্রদীপ, প্রায় সমস্ত শহরটাই মুক্তাঞ্চল। টুটুল যেন আবার তার হারানো যৌবন ফিরে পায়। লাল নীল রঙীন বাল্‌বে মোড়া বিপ্লবের যে ট্রামটা কুয়াশা ধোঁয়ায় হারিয়ে গিয়েছিল তার কি আওয়াজ আবার পাওয়া যাচ্ছে ? বাস্তবিক দু-তিন বছরের মধ্যে আন্দোলনের চেহারা পাল্টে যাচ্ছে এটা টের পাওয়া যায়। আগে যখন তারা জেলের তালা ভাঙতে গিয়েছিল তখন রাস্তাঘাটে কাতারে কাতারে লোক, মনে আছে টুটুলের জগুবাবুর বাজারের সামনে

ফুটপাতে কমলালেবু কিনছে মেয়েরা, তারকাখচিত সিনেমার পত্র-পত্রিকাগুলো দড়িতে লটকে ছিল, সর্দারজীদের কাঁচা রঙীন পাগড়ি শুকোচ্ছিল হাওয়ায়। আর সেই একই জায়গার চেহারা অন্তত দু-তিনটে রাতে একদম চেনা যায় না!

সে রাত্তিরে টুটুল হাওড়া থেকে ফিরছিল। রাত বোধ হয় নটা। ট্রামবাস বন্ধ। এসপ্ল্যানেড থেকে হাঁটতে হাঁটতে জগুবাবুর বাজারের কাছে আসতে না আসতেই দেখলে চারদিক কুটকুটে অন্ধকার, আলোর চিহ্ন নেই। আর একটু এগোতেই সেই অন্ধকার লাল হয়ে ওঠে আগুনের আভায়। রাস্তা জুড়ে ঠেলাগাড়ির ব্যারিকেড, দুটো ভস্মীভূত ট্রাম অন্ধকারে দুই পৌরাণিক জন্তুর মতো স্থির দাঁড়িয়ে। এমন সময় দূরে হেডলাইটের আলো দেখা গেল। বোধহয় পুলিশের ট্রাক। সঙ্গে সঙ্গে ধারে কাছে তীব্র হুইসিলের আওয়াজ আর ধড়া-ধড় থান ইট পড়ার আওয়াজ। বাড়ির ছাত থেকে ইট-বৃষ্টি। টুটুল পাশের গলিতে ঢোকে। সেখানে অন্ধকারে অনেকগুলো মাথা বেরিয়ে আসে। বেশির ভাগই বারো-চোদ্দ বছরের ছেলে। তাদের যে নেতা তাকে প্রথমে চিনতে পারেনি কিন্তু যখন সামনে এগিয়ে যায় তখন ফুটপাতের কোণে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা আলকাতরার বিরাট জ্বলন্ত গামলাটার আলোয় চিনতে পারে।

—বিলু না? টুটুল এগিয়ে আসে।

—টুটুল-দা, ছেলেটা জড়িয়ে ধরে টুটুলকে। পনেরো ষোলো বছরের ছেলেটাকে টুটুল দেখেছে ভবানীপুরে তাদেরই এক পার্টি কমরেডের বাড়িতে। এখন মাথায় টুপি। গায়ে বোধহয় দাদার কোট চাপিয়ে চেহারাটা যতখানি সম্ভব জঙ্গী করে ফেলেছে।

—পুলিশ আমরা হটিয়ে দিয়েছি টুটুলদা। আমরা ইয়েনান্ বানিয়ে দিয়েছি কলকাতা, এখানে হাত দিয়ে দেখুন। প্যান্টের দুদিকে মৃদু থাপ্পড় দেয় ছেলেটা। তারপর জলজলে চোখে পকেট থেকে একটা খুব নতুন ধরনের শক্তিশালী হাত বোমা বার করে।

—এগুলো পেলি কোথায়?

—আমরা দাদা আরও এগিয়ে গিয়েছি আপনাদের থেকে। সাউথে যাবেন তো। চলুন আমার সঙ্গে।

দুটো মিল্ক বুথ পুড়ছে। চারপাশে ছাই, আগুন, ইট আর পাথরে রাস্তা ভর্তি। কাছেই আবার কোথাও ফায়ারিং শুরু হয়েছে।

অন্ধকারে রাস্তার কোণে একটা লাল পতাকা ইট দিয়ে পোঁতা।

—এইখানে সন্ধেবেলা ফায়ারিং হয়েছে। আপনি টুটুলদা এবার যেতে পারেন। আমাদের এলাকা শেষ। লাল সেলাম। অন্ধকারে তরুণটি হাত মুঠি করলে।

একটু দূরে ভবানীপুর থানাটা অন্ধকারে দ্বীপের মতো লাগে। আলোর নীচে স্টিল হেলমেট চকচক করে। ফুটপাতে ভাঙা কাঁচ পাথর। টুটুল ফাঁকা রাস্তার মাঝখান দিয়ে এগোতে থাকে। ঠিক এই সময় খেয়াল করে নি একটি আতঙ্কিত শান্ত্রী বন্দুক তুলে তার দিকে তেড়ে আসে। টুটুল যান্ত্রিকভাবে হাত দুটো ওপরে তোলে। লম্বা ফর্সা একটা সার্জেন্ট এগিয়ে এসে প্যান্টের পকেট হাতড়ায়। তারপর বিরক্ত হয়ে বলে,—যান, যান।

টুটুল তার মুখটা ফিরিয়ে নেয় পাছে তার মুখ চোখে না পড়ে। কারণ টুটুল কাঁদছিল। অন্ধকারে টুপিপরা তরুণটির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে প্রবল আনন্দাশ্রুর আবেগে সে কেঁদে ফেলেছিল। কলকাতা তার আবেগে ক্ষোভে দেয়ালে মাথা কুটছে। এই মাথা কোটাকে, এই দুর্জয় রাগে ভেঙে খান খান হওয়াকে তার পরিবারের লোকজন আরও বহু লোক, খবরের কাগজ, ব্যঙ্গ করুক, সঠিক বিপ্লবের পথ না হয়ে হঠকারিতার চূড়ান্ত বলে বর্ণিত হোক এইসব বারুদ আর টিয়ারগ্যাসের গন্ধে ভরা দিন-গুলো, কিন্তু তার দেশের যা কিছু ভাল তা এই রাগে ফেটে পড়ার সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত। গত কয়েকদিন থেকেই মনে হয়েছে এই একটা পয়সা ট্রামভাড়া নিয়ে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় পুলিসের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যে লড়াই চলেছে দিনরাত্তির তা কি শুধু রাজনৈতিক উস্কানি, শুধু ভ্রান্তপথে পরিচালনা করে বাংলাদেশের তারুণ্যের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা? তা তো নয়। তাহলে তো এতলোকের এই সম্মিলিত ভাবোচ্ছ্বাসের জোয়ার ব্যাখ্যা করা যায় না। বাংলাদেশের সব গিয়েছে, দেশ ভেঙেছে, রেফিউজি হুকারে দেশ ভরেছে, ক্ষুদীরাম, দীনেশ বাদলের স্বপ্ন এখন খবরের কাগজের পণ্যমাত্র। একমাত্র জেগে আছে বিলুর দল। তারা বোমা আর লাল পতাকা হাতে রাস্তায় বেরিয়েছে। তাদের জন্যে কোন শালার প্রাণ কাঁদবে না? ট্রাম লাইনে দাঁড়িয়ে ক্ষ্যাপার মতো টুটুল চেঁচায়।

চার

এক প্রবল দ্বৈত সত্তার মাঝখানে টুটুল দুলতে থাকে, রাজনৈতিক জগতের সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা জগৎ খুব ধীরে ধীরে তার সামনে খুলতে থাকে।— একদিকে তার রাজনৈতিক জগতের কাজ বাঁধা রুটিনের মতো করে যায়। কিন্তু বারেবারেই কলকাতার রাস্তায় বিপ্লবের জোয়ার যেমন আসে তেমনি প্রবল ভাঁটার কাদায় স্থানকাল গেড়ে বসে। ক্লান্তিতে অবসাদে মুখ থুবড়ে থাকে সারা শহরটা। চৌরঙ্গী আর পার্ক স্ট্রীটের রেস্তোঁরায় সাহেবদের আসন দখলকারী ভারতবর্ষের নতুন ধনী সম্প্রদায়ের ছেলেরা আবার ফুর্তি উড়োয়, শেয়ালদায় রেফিউজি ভিড় বাড়ে। একদিকে বস্তির টিমটিমে আলোয় ধোঁয়ায় আর খাটা পায়খানার গন্ধে মানুষগুলো ধোঁকে, অন্যদিকে গগনচুম্বী প্রাসাদে এফিশিয়েন্সি বাড়াবার জন্যে এয়ারকণ্ডিশাণ্ড প্লান্ট বসাবার ধুম পড়ে। 'মুমূর্ষু কলকাতা' নাম দিয়ে আমেরিকান কাগজে ঘন ঘন বিশেষজ্ঞদের লেখা বেরোয়, দুর্গাপুর অঞ্চলে স্টীলের মায়াপুরী জাতির সমস্যা সমাধানের চিচিং-ফাঁকরূপে কাগজে কাগজে বর্ণিত হয়। উত্তর ভারতীয় ব্যবসায়ীদের দাক্ষিণ্যে গণিকাপাড়ায় ব্যবসা জমে, সোনাগাছিতে রেডিওগ্রামে রবীন্দ্রসঙ্গীত বেলফুলের মালার সঙ্গে পরিবেশিত হয়। আর এই শহরের আনাচে কানাচে ঘুরে ঘুরে এক প্রবল দ্বৈত সত্তায় টলমল করে টুটুল।

আর-একটা জগৎ কী? শিল্প সাহিত্যের আর-একটা জগতে সে আশ্রয় খুঁজেছিল। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে কবিতায় গানে সে আশ্রয় পায় নি। সেই সব ঝকঝকে উদ্দীপ্ত শাণিত কবিতার ঝলকানি তাকে কলকাতার রাজপথের আন্দোলনের মতো হঠাৎ হঠাৎ আলোকিত করে তুলেছে কিন্তু ধরে রাখে নি। বাংলাদেশে বিশেষ করে কলকাতার আশেপাশে শিল্পাঞ্চল জুড়ে এক নতুন

বাস্তব সৃষ্টি হতে চলেছে, তার কোন বিমূর্ত ছবি আগের কোন লেখকে নেই, তা কি ধরা যায় না? আর আধুনিক সচ্ছল পশ্চিম ইউরোপের হাল্কা মেজাজের সঙ্গে এ বাস্তবের গুণগত বৈসাদৃশ্য এ ছবির। সেদিকে কোন আশ্রয় খুঁজে পায় না। একমাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাসে বিশেষ করে ফরাসী ও রুশ উপন্যাসে এই মানসিক আশ্রয় সে পায়। টাকার ছায়া কিভাবে মানুষের মুখে চোখে আর মানসে পড়ে, কিভাবে তা তাকে উল্টেপাল্টে ভিন্ন আকৃতি দেয় সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্যে বালজাক স্তাঁদালের বইয়ের এইসব নায়কদের বিরাট স্বপ্ন আর বিরাট স্বপ্নভঙ্গ এরই মধ্যে সে নতুন বাংলাদেশের নায়কের চিত্রকল্প খোঁজে। আর মহাভারতের পটভূমিকার মতো রুশ উপন্যাসের অগণিত মানুষের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার স্তর তাকে আলোড়িত করে। টুটুল ভাবে যদি সে কোনদিন লিখতে পারে তাহলে মিষ্টি বাংলা গল্প লিখবার জন্যে লিখবে না কিংবা শুধু জালাময়ী কবিতা লিখেই ক্ষান্ত হবে না। সে লিখবে বিভিন্ন স্তরের মানুষকে নিয়ে এক বিশাল পরিবর্তনের কাহিনী—বাংলাদেশ পাল্টানোর কাহিনী। সে কি পারবে? এটা কি তার পক্ষে বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার আকাঙ্ক্ষা নয়? আর তা ছাড়া বোধহয় দেরি হয়ে গেছে। পঁচিশ বছরে পা দিতে চলেছে না সে? এখন কি পারবে? গভীর সংশয়ের দোলায় টুটুল যেমন দোলে তেমনি সাহিত্যের যে প্রবল আকর্ষণ তাকে আগে মাঝে মাঝে আলগোছে টান দিয়েছিল, তা তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলে। লিখে কি হবে সে জানে না, হয়ত আর পাঁচটা বাজে লেখার মতো সেও কতগুলো সাধারণ ইচ্ছাপূরণের তাগিদ পালন করবে মাত্র, সে ভয় নিশ্চয় আছে। কিন্তু এ কথাটা তার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে দানা বাঁধে যে কোনো কিছুর জন্যেই নয়, সমাজ পাল্টানোর জন্যে নয়, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে নয়, চারপাশের উত্থানপতনের মাঝখানে মানসিক আশ্রয় খুঁজে পাওয়ার জন্যেই সে লিখবে।

টুটুল পায়ের শব্দে মুখ তোলে। অস্বাভাবিক ম্লান মুখে বুড়ী দাঁড়িয়ে আছে। কান্না-মোছা চোখে একবার ভাইয়ের দিকে চেয়েই বইয়ের শেলফ ঘাটে। কিছুদিন থেকে টুটুল অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছিল তার বন্ধু ডলুর সঙ্গে কি একটা ব্যাপার চলছে বুড়ীর। একটু বেশীদিন ধরে রগড়াচ্ছে ব্যাপারটা। কিন্তু সে যেচে কিছু বলেনি।

—আজ স্কুল নেই? টুটুল জিজ্ঞাসা করে।

—না, পরীক্ষার খাতা আছে, কান্নাবসা গলায় বুড়ী বলে। টেবিলের ওপর থেকে একখানা বই তুলে নিয়ে বললে—কি বই? ও বাব্বাঃ। টমাস মান্।

—কী হল?

—অতো সীরিয়াস্ বই ভাল লাগে না।

—সীরিয়াস ব্যাপার তো খুব করে বেড়াচ্ছো, আর বই পড়তেই যত আপত্তি। টুটুল আন্দাজে ঢিল ছোড়ে।

বুড়ী ধুম্ করে বইটা টেবিলের ওপর ফেলে বলে ওঠে,—ডলুটা যে এমন ক্যাড হবে ভাবি নি। পড়ে ছাখ্। মুঠোর মধ্য থেকে একটা দলাপাকানো চিঠি টুটুলের দিকে ঠেলে দেয়।

টুটুল সেদিকে হাত না বাড়িয়ে বললে,—কী হয়েছে? ডলু ব্যাক আউট করেছে? মার ছেলে বনে গিয়েছে।

বুড়ী বসে পড়ে পাশের চেয়ারখানায়। আড়ষ্ট ব্যথায় তার তীক্ষ্ণ মুখখানা কোমল দেখায়। সামনের চুল সামান্য পাতলা হয়ে গেলেও তার চেহারার এমন এক ধার আছে যে বয়সের ছাপ পড়ে নি। টুটুলের দিদির বদলে ছোট বোনই লাগে বুড়ীকে দেখতে।

বুড়ী তার চোখের ওপর হাতখানা রেখে বলে,—এতগুলো বছর কেটে গেল। তার থেকে মা যেরকম বলছিল সেরকম ঘটক ডেকে বিয়ে করলেই হত।

—তাতে কি তুই সুখী হতে পারতিস?

—জানি না, বুড়ী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

টুটুল একটু চুপ করে থেকে বললে,—চোঙা কি বলে?

—চোঙাটা এখন কিরকম হয়ে গেছে যেন! নিজেকে ছাড়া একদম কিছু ভাবতে পারে না। তার ওপর আমেরিকা যাচ্ছে, সামনে বিয়ে। ও এখন একেবারে আলাদা জগতের লোক।

—ও যাকে বিয়ে করছে তাকে কি সত্যি ভালবাসে?

—চোঙা বলে ওসব ভালবাসা টালবাসা এখন আউট অফ-ডেট। এখন যেটা দরকার, তা হল কে কত বেশী এফেক্‌টিভ হতে পারে।

—এফেক্‌টিভ?

—হ্যাঁ! এই দু-তিন দিন আগেই চোঙা বলছিল, বিয়ে সম্পর্কে অন্যরকম আইডিয়া থাকলে ফ্রাস্ট্রেশান আসতে বাধ্য।

—তোরও কি মত ঐরকম?

—চোঙা হয়ত ঠিকই বলছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে বুড়ী বললে।

—তুই এখন কী করবি ভাবছিস?

—আমি? মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে বুড়ীর ঠোঁটে। আমি ছেলেমেয়েদের হোম্ টাস্কের খাতা দেখব। গার্ডিয়ানদের কমপ্লেণ্ট শুনব। আর বুড়ো হব।

—যাঃ, তুই বড্ড সেন্টিমেণ্টাল হয়ে যাচ্ছিস। আমাকে ছাখ—প্রেমটেম তো কিচ্ছু হল না। কিন্তু বিশ্বেস কর, আমি মনে করতে পারছি না জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেছে।

—এবারে হয়ত প্রেম করবি। এতক্ষণ পর স্বাভাবিক হাসি হাসে বুড়ী।

—দূর! অনেক বয়স হয়ে গেছে। এখন একটা চাকরি পেলে হয়।

—যাক্ তুই তাহলে শেষ পর্যন্ত চাকরি-বাকরির কথা ভাবছিস।

—হ্যাঁ, আমি এমন একটা চাকরি করব যেখানে আমি জড়িয়ে পড়ব না।

—তুই তাহলে কলেজের মাষ্টারি কর। প্রাণ ভরে ফাঁকি দিতে পারবি।

—ওটা বোধহয় হবে না। মাষ্টারি করতে গেলে তো সাহিত্যের মাষ্টারি। সাহিত্যের ওপর বক্তৃতা করতে আমার ভীষণ খারাপ লাগবে। ওটা এখন আমার কাছে এত সীরিয়াস ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে ওটাকে আমার খাওয়া পরা চালচলনে পড়াশোনায় আমার সব কিছুর মধ্যে পেতে চাই। কোন্‌টা সাহিত্য কোন্‌টা নয় সেটা নিজের অভিজ্ঞতার মারফত যাচাই করে নিতে চাই। বোধহয় লিখতে লিখতে বুঝতে পারব ব্যাপারটা।

—তোর কথা আমি বুঝতে পারি না। একদম বুঝি না। চোঙাকে বরং বুঝি যদিও চোঙা এখন যেন কিরকম হয়ে গেছে।

এর কদিন পরই হঠাৎ সকাল বেলা টুটুলের ঘরে রমেন মুখার্জির আবির্ভাব। হাতে থলিভর্তি গল্‌দা চিংড়ি। তার সাইজ দেখে টুটুল অবাক হয়েছিল। সেই পেল্লাই-শুঁড়ওয়ালা তুঁতে-নীল খোলায় ঢাকা জীবগুলো এখন কলকাতাবাসীর কাছে প্রায় পৌরাণিক জগতের প্রাণী।

—এগুলো কী?

—বৌবাজার মার্কেটে গিয়েছিলাম। দেখলাম গল্‌দা উঠেছে। তোমার সেই ভাগ্যকুলের গল্‌দা খাওয়ার গল্পটা মনে পড়ে গেল। একদিন বলেছিলে না? মুড়োটা ফুটো করতেই গল্ গল্ করে রক্ত বেরিয়ে এল। নিয়ে এলাম। অত ভাল হবে না নিশ্চয়।

টুটুলের কোন ওজর টিকল না। সামান্য পরিচয়েই রমেন সরাসরি স্বর্ণসুন্দরীর সামনে ভেতরের বারান্দায় এনে ফেললে থলিটা। স্বর্ণসুন্দরী খুশিই হলেন। বিশেষ করে বর্তমান জীবনযাত্রায় এই ধরনের প্রায় প্রাক্‌পুরাণিক সৌন্দর্য শুধু আকর্ষণীয় নয়, টুটুলের সন্ন্যাসী ধরনের জীবনে যে সামান্য রং থাকতে পারে তা ভেবে আনন্দ পেলেন।

সেদিন রান্নাঘরে স্বর্ণসুন্দরীর পুরনো হাঁকডাক আবার ফিরে এল। ভবনাথ একবার আস্তে আস্তে টুটুলের ঘরে ঢুকে তার নতুন বন্ধুটির সঙ্গে আলাপ করে এলেন। চোঙা বাড়ি নেই। আমেরিকান কোন ফাউণ্ডেশানে বছর খানেক ওখানকার কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্ত থাকবার আগে একবার মিশর ও মধ্যপ্রাচ্যটা একটু ঘুরে আসতে গেছে জনৈক জার্মান এয়ারওয়েজের নতুন সার্ভিস খোলার সৌজন্যে। খাবার টেবিলে বুড়ীর সঙ্গে আলাপ হয়। বুড়ী ফাঁক পেয়ে টুটুলকে বলে,—তোর অতো বুড়োদের সঙ্গে ভাব কেন? কোনো বোনটোন আছে নাকি? দেখিস!

সন্ধেবেলায় বাংলার মুখ, মূর্তি, আর পট আলোচনার ফাঁকে রমেন বললে,—তুমি আর-একবার স্টার্ট নাও।

—সেইরকম বলছে কেউ কেউ। টুটুল হাসলে।

রমেন তার পুরু চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে বলে,—না না, হেসো না, আমি সীরিয়াসলি বলছি।··· যদি ধরো কেউ তোমাকে বিলেত পাঠায়। ধরো আরও উচ্চশিক্ষার জন্যে। আমাকে একজন বলেছে ··মানে আমারই দূর সম্পর্কের···

টুটুলের গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে একটু অপ্রস্তুত বোধ করে রমেন। আস্তে আস্তে বললে,—সে তোমায় দেখেছে।

—আমি বুঝতে পারছি না, তুমি কী বলছো রমেন। আমাকে একটা চাকরি-বাকরি করতে হবে ঠিকই, কিন্তু বিলেত কেন? আমি যেরকম আছি সেরকমই থাকব।

তারপর রমেনের স্তব্ধ কোমল মুখখানার দিকে চেয়ে বলে,—কী ব্যাপার বলো না? অতো টিপে টিপে কেন বলছো?

রমেন চুপ করে থাকে। টুটুলের চোখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে বলে,—তুমি রাজী হলে গোটা একটা পরিবার বেঁচে যায়।

৫

টুটলের অসোয়াস্তি হয়, সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলও জাগে। রমেন বলতে শুরু করে। তার বলার সারমর্ম টুটুল যা উদ্ধার করে তাহল রমেন তার এক দূর সম্পর্কের অবস্থাপন্ন দিদির একমাত্র মেয়ের সঙ্গে টুটুলের বিবাহের প্রস্তাব করতে চায়। তার স্বামীর ঘোড়ার মাঠে আত্মবিসর্জন উপলক্ষে যে বিপদ ঘটে তা এবং দাম্পত্য জীবনে মিল না হলে যে সব কারণ দেখানো হয় সেই সব মিলেমিশে যা অবস্থা তাতে এখন সে দিদি উত্তর কলকাতায় এক বড় বাড়িতে মেয়ে নিয়ে থাকেন। বাড়ির একতলা দোতলা থেকে ভাড়া আসে। মেয়েটির সম্পর্কে বলতে গিয়ে রমেন তার ভুরু, তার নাক ইত্যাদি সাবেকি বাংলার দুর্গাঠাকুরের মুখের মতো বর্ণনা করে। টুটুলের আন্দাজ হয় মেয়েটি সুন্দরী। তার ওপর এস্রাজ বাজায়, লরেটোতে পড়ে।

—তার মানে ঘরজামাই? তোমার দিদির বাজার সরকার?

রমেন টপ করে দাঁড়িয়ে ওঠে। ম্লানভাবে বলে,—আমি জানতাম তুমি এইভাবে নেবে।

—আর কী ভাবে নেব? আমি কিভাবে একটা গোটা পরিবারকে বাঁচাতে পারি? তুমি জানো, আমি এ-জি-বেঙ্গলে দরখাস্ত করেছি। কেরানীর চাকরি করব। কেরানী জামাই সহ্য করতে পারবেন তোমার দিদি?

রমেন চেঁচিয়ে ওঠে,—তোমার তো সব কিছুই ইকনমিক্ ডিটারমিনিজম। তুমি কী রোজগার করবে সেইটাই তোমার একমাত্র পরিচয় নয়।

—তুমি আমায় হয়ত ভালবাসো বলেই বলছো। একমাত্র মেয়ে, সুন্দরী, বাড়ি আছে—আই. এ. এস্, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার। আমায়…আমায় কেন?

টুটুলের কণ্ঠস্বরে শুধু ব্যঙ্গ ছিল না। কারণ সে টের পাচ্ছিল এই প্রস্তাবের মারফত রমেন তার জীবনের সঙ্গে আরও জড়িয়ে যেতে চায়। রমেনের অস্তিত্বে একটা মস্ত বড় ফাঁক আছে, এটা তার বাংলাদেশের অতীত সন্ধানের ফাঁকে ফাঁকে ছলকে ওঠে। রমেন কিছু আঁকড়ে ধরতে চায়। পারিবারিক বন্ধনে ভয় পেয়েছে, বিয়েথাওয়া করে নি, কিন্তু মনের ফাঁক এত লোকশিল্প করেও ভরে নি, বরং তার অবসর আরও বেদনাময় নিঃসঙ্গ করে তুলেছে।

টুটুল শান্তভাবে বললে,—তোমার দিদি ভুল করছেন। তুমি হয়তো এমন রঙীন করে আমার ছবি তুলে ধরেছো ওঁর সামনে…

—উনি নিজেই তোমাকে দেখেছেন আমাদের ঘরে। তুমি যখন তোমার সাহিত্যের প্ল্যান বলছিলে…

টুটুল সিঁটিয়ে যায়। বলে,—হ্যাঁ, কথাগুলো শুনতে ভাল। কাজে তো কিছু করতে পারছি না।

রমেন বললে,—এ সব কথা যাক্। তুমি তো পড়াতেও পারো রীতাকে, তোমারই সাবজেক্ট, ইংরেজী সাহিত্য। এ সব ব্যাপারে কোনো তাড়া নেই।

পাতলা হাসির রেখা ফুটে ওঠে টুটুলের ঠোঁটের ওপর।—বুঝতে পারছি। তারপর প্রেম। যেরকম বলছো, হয়ত ভালই লেগে যাবে। তারপর বিবাহ, বিলেত, বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে ক্যালকাটা বার—একেবারে বাংলা সিনেমার গল্প—তাই না?

নিস্তব্ধ রমেনের দিকে চেয়ে বললে,—তার থেকে চলো না কোথাও কদিন ঘুরে আসি।

—কোথায়? পাহাড়ে না সমুদ্রে? উৎসাহিত হয়ে রমেন বললে।

—সমুদ্র! সমুদ্র! কলকাতার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে অনেক দিন সমুদ্রের ডাক শুনেছি।

—আমার সে দিদির দু জায়গাতেই বাড়ি আছে—সমুদ্রে পাহাড়ে, রমেন বললে।

—বাঃ, একেবারে বাংলা ছবির গল্প।

—ঠিক আছে, অন্য কোথাও উঠব।

—না না, বাড়ি তো বিয়ে করছি না। ও বাড়িতেই চলো।

[ক্রমশ]

সাবিত্রী

শ্রীঅরবিন্দ

অস্পষ্ট সুদীর্ঘ এক আয়োজন—মানবজীবন,
অচেনা জড়ের বক্ষে জীবনের পথরেখা,
আয়াসে আশায়, সংগ্রামে শান্তিতে ক্ষুব্ধ চক্রাবর্ত এক।
অজেয় শিখরচূড়ে নিরালম্ব আরোহণে
প্রদীপ্ত ছায়ার জাল ভেদ করে অশান্ত অন্বেষা
আধোজানা আবরিত সত্যরূপের, নিত্য অপসৃত ;
অন্বিষ্টের বৃথাই সন্ধান।
সে-আদর্শ নশ্বর কায়ায় বন্দী হয়নি কখনো।
আরোহণ পতনের ক্ষান্তিহীন আবর্তন শুধু,
অবশেষে পথশেষ বিরাট বিন্দুর তীর্থে,
ওপারে প্রোজ্জ্বল সেই এ জীবন অর্ঘপুষ্প যার ;
অতঃপর আমাদের ঈশ্বরের অনন্তে উত্তরণ।[১]

… … …

সুপ্ত অহমের আচ্ছন্ন গহন থেকে
ভেসে আসে কণ্ঠস্বর অজানিত নিমগ্ন সত্যের।
প্রপঞ্চের অন্তরালে সে-সত্য প্রবাহ বহে।
শোনা যায় ধ্বনি তার বিশ্বব্যাপী স্তব্ধতায়,
স্বজ্ঞাত অন্তরে আর গুপ্ত চেতনায়।[২]

… … …

কালের নির্দেশে চলে অবিরাম নাট্যের যোজনা।
সুদীর্ঘ স্বনিত নাট্য প্রবাহ ধারায়
দ্বিধায় সংশয়ে ভরা নিরুদ্দেশ যাত্রার কাহিনী।
ভাসে তাতে ফেনপুঞ্জে বিনিদ্র ভোগের অট্টহাসি
আর কামনাগুঞ্জন, যে-কামনা মৃত্যু মানে না।[৩]

---

1 Page 28 line 30 to page 29 line 9
2 Page 34. line 7 to line 11
3 Page 34 line 16 to line 20

অশ্রুত ধ্বনির যত মর্মর মৃদু কলভাষ
আমাদের হৃদয় ঘিরে ভীড় করে আসে
পায় না প্রবেশদ্বার, তাদের কান্নায় ভরে কাতর প্রার্থনা—
আছে তাতে আজও যারা অবজ্ঞায় রয়েছে অজ্ঞাত,
জন্মের প্রয়াস যার ক্ষান্ত ব্যর্থতায়,
সে-মাধুর্য স্বাদ যার কখনও পাবে না কেহ,
সে-সুন্দর কখনো যা মূর্ত হবে না।
আমাদের নশ্বর বধির এই শ্রবণের অগোচরে
বিশ্বের বিস্তার ছন্দে গাঁথা হয় বিপুল বন্দনা ;
তারই তালে তাল রেখে জীবনের চলার প্রয়াসে
আমাদের সব সীমা সীমাহীনে মেশে,
অন্তের অন্তরে বাজে অনন্তের সুর।[৪]

... ...

যে ভাবনা আহবে এই বিশ্বের পোষণ,
শক্তির অমিত দ্বন্দ্ব অদম্য অশান্ত নিত্য
প্রচণ্ড সংঘর্ষে যার জ্বলে ওঠে তারা,
কায়া পায় ধূলির কণিকা,
বিশ্বের বাসনাপুঞ্জে তাড়িত যে মূক চক্র
উপবৃত্তে ঘোরে মহাকাশে,
মহাকাল বন্যাস্রোতে নিঃসৃত যে প্লাবন জোয়ার,
যে যন্ত্রণা তাড়িত হয়ে দুর্দম লালসা
পৃথিবীর স্থূল পঙ্কে অস্থির আবেগে
গড়ে তোলে মৃত্তিকায় ব্যক্তির প্রতিমা,
যে সন্তাপ প্রকৃতির ক্ষুধার আহার,
বেদনার হুতাশনে যে কামনা সৃষ্টিযজ্ঞে রত,
যে নিয়তি সাধুতাকে করে তিরস্কৃত,
সুদীর্ঘ সুখের অন্ত যে বিয়োগবেদনায়,
প্রেমের করুণ কান্না, দেবতার বিবাদ কলহ,—
সব শান্ত এক সত্যে—যে সত্য স্বয়ং ভাস্বর।[৫]

4 Page 35 line 2 to line 13

5 Page 38 line 13 to line 28

এ গহন চরাচরে কিছু নয় স্পষ্ট সুনিশ্চিত ;
আমাদের অস্তিত্বই দ্বিধা ও সংশয়ে ভরা,
এ জীবন অনিশ্চিত পরীক্ষণ, এই আত্মা
অচেনা অবোধ বিশ্বে কম্পমান আলোকের শিখা।
এ পৃথিবী জান্তব যান্ত্রিক দুর্ঘটন,
মৃত্যুর বিস্তৃত জাল, তারই মধ্যে আমাদের দৈবে বেঁচে থাকা।
যা কিছু জেনেছি সব অসার কল্পনা মনে হয়
যে কাজ হয়েছে সারা, একটা পর্যায় পর্ব
যার শেষ প্রান্ত ঢাকা আমাদের দৃষ্টির আড়ালে,
সবই দৈবযোগ কিংবা নিয়তির খেলা।
যাত্রাপথ আমাদের অজানায় শুরু তার শেষ অজানায়।[৬]

... ...

ক্ষণিক জান্তব মন, এই উত্তরাধিকার নিয়ে
মানুষ এখনও শিশু মহাশক্তি প্রকৃতির কোলে,
মুহূর্তের পারম্পর্যে তার বেঁচে থাকা ;
অনিত্য এই বর্তমানে যৎসামান্য অধিকার তার ;
স্মৃতি তার চেয়ে থাকে প্রেতাত্ম অতীতে,
যত সে এগিয়ে চলে ভবিষ্যৎ নিত্য অপসৃত ;
দেখে সে কল্পিত সাজ, দেখে না সে মুখ।[৭]

... ...

এখানে বিশৃঙ্খলা বিভাজিত একটি জগতে,
শূন্যচারী নিরালম্ব ক্ষণিক গঠন :
জ্ঞান অনুকারী, অপূর্ণ ক্ষমতাবৃত্ত,
পার্থিব কায়ায় ধৃত সুন্দরের শিখা,
শত শত চূর্ণ প্রেমে একের আভাস,
ভাসে তারা, খণ্ড প্রতিচ্ছায়া এক প্রবাহী সূর্যের।
ক্ষণস্থায়ী বিকারী এই জীবনের সমাহার থেকে
একসূত্রে গাঁথা হয় মণিময় হার।[৮]

6 Page 57 line 16 to line 26
7 Page 61 line 16 to line 22
8 Page 88 line 6 to line 11

সচিন্তক জীব এক অচিন্তক লোকে ;
অজানা সমুদ্রে ভাসে একা এক দ্বীপ,
সামান্য সে বৃহৎ প্রয়াসী,
দিব্য স্বজ্ঞান কিছু জান্তব সত্তায়,
অকিঞ্চিৎ অখ্যাত তার জীবনকাহিনী
কর্ম তার সংখ্যায় সংখ্যায় যোগফল শূন্য যার,
চেতনা আলোর শিখা জলে নিভে যেতে,
আশা তার জন্ম আর মরণের ঊর্ধ্বাকাশে তারা।[৯]

... ...

প্রথমে বিন্যস্ত হয় বিশৃঙ্খল বিচিত্র ভিত্তি,
নাস্তি এক, গূঢ় কোন পূর্ণের সঙ্কেত,
যেখানে শূন্যের যোগে অনন্ত বিধৃত
এবং একই ভাষ্য নাস্তির অস্তির,
অন্তহীন নাই শুধু, শূন্যের বিস্তৃত ছক ;
তারই অগণ্যরূপে নিত্যজাত মহাশিশু
চিরঞ্জীব; ঈশ্বরের বিপুল বিস্তারে।[১০]

... ...

এইভাবে সকল বস্তুতে তার দিশা ও সঙ্কেত চিনে
আমরা নিকটে আসি মহাবিস্ময়ের ;
সুন্দরে রয়েছে তার পদচিহ্ন যাত্রাপথের,
মরবক্ষে ভালোবাসা হৃদয়স্পন্দন তার
সুখ তার মোহন মুখের হাসি।
আত্মীয়তা সত্তায় সত্তায়—
সর্বব্যাপী সৃজনী প্রতিভা এই—
সমূহ সৃষ্টিকে বাঁধে সুগভীর অন্তরঙ্গতায়।
আমরা সবার মাঝে আমাদের মাঝে সব—
নান্দন বোধের এই অপরা পর্যায়
আমাদের একাত্ম করে মহাবিশ্ব বিস্তারের সাথে।

9 Page 89 line 6 to line 13
10 Page 113 line 24 to line 30

প্রদীপ্ত আনন্দ হর্ষে দৃশ্য আর দ্রষ্টা মিশে যায় ;
আন্তরিক ঐক্যে অন্বিত কারুকৃৎ কারুকর্ম
ঘনিষ্ঠ সাযুজ্যের আবেগে ও স্পন্দন যাদুতে
হয়ে ওঠে অনবদ্য সর্বাঙ্গসুন্দর।[১১]

... ...

শাসন অতীত এক অধরা গহন সত্তা
রহস্যভরা তিক্ত মধুর জীবনে
সৃষ্টি করে এই খেলা আলোয় ছায়ায়,
কায়ায় কামনা করে আত্মার প্রণয়,
এবং ত্বরিত ক্ষিপ্র তন্তুর কম্পন দিয়ে
যান্ত্রিক স্পন্দনে বাঁধে আলো ভালোবাসা।[১২]

... ...

অজ্ঞানের অতল গহ্বরগুলি অস্তিত্বের সেতু দিয়ে বাঁধা,
কুয়াশায় অবগাঢ় সৌধ এক অর্ধ আলোকিত
আকারের শূন্যতা থেকে দৃষ্টি গোচরে আসে,
আত্মার শূন্যতায় উর্ধ্বে অন্তর্হিত।
বিপুল আঁধারে জন্ম স্বল্প আলোকের,
জীবন জানে না তার যাত্রার শুরু শেষ কোথা।
সব কিছু ঘিরে আছে অন্ধতার কুহেলী এখনও।[১৩]

... ...

এ জগৎ একই কালে বিপুল জান্তব যন্ত্র
এবং মন্থর ধীর উন্মীলন বস্তুজ আত্মার।
প্রহেলিকাময় এই জগতের আদিম প্রভাতে
প্রাচীরবেষ্টনহীন ঘূর্ণমান এই কক্ষে
সর্বত্র আসীন এক নিরাসক্ত ভগবান
যেন আত্মভোলা, গূঢ় অবচেতনার অলৌকিকতায়
আমাদের দৃষ্টি-অগোচর,
তথাপি এখানে সব তাঁরই কীর্তি তাঁরই অভিপ্রায়।

11 Page 126 line 21 to page 127 line 3
12 Page 156 line 24 to line 29
13 Page 170 line 6 to line 12

অনন্ত শূন্যতাপথে বিস্তারিত ঘূর্ণাবর্তে
আত্মশক্তি জড়ে পরিণত, গতিচক্রে আবর্তিত,
বোধহীন, আত্মচেতনহীন, দেহ এক নিমগ্ন নিদ্রায়।
মহাশূন্য স্তব্ধতা নির্ভর
দৃশ্যমান আকারের অগণন সমাবেশ
অনন্ত চেতনগর্ভে হল আবির্ভূত, দেখা দিল
বাহ্যিক অচেতন জাগতিক মাথা।[১৪]

... ...

আকাশের যজ্ঞকুণ্ডে জ্বলে ওঠে অদৃশ্য অনল,
ছড়ায় তা অসংখ্য জগৎ যেন ফসলের বীজ,
ঘূর্ণাচক্রে গড়ে তোলে নক্ষত্রের জ্যোতির্ময় লোক।
তড়িৎ শক্তির এক মহার্ণব
নিরাকার আকারে গড়ে আশ্চর্য তরঙ্গকণিকা,
তাদের নর্তনছন্দে মৃন্ময় কঠিন এই জগৎ নির্মিত;
দোর্দণ্ড ক্ষমতা তার বিশ্রান্ত পরাণুগর্ভে;
কল্পনা অথবা সৃষ্টি ভর আর পরিদৃশ্য জগৎসম্ভার;
আলোকের অভিঘাতে ফোটনের দুরন্তগতি প্রকটক ছটা
নিমেষে স্ফুলিঙ্গবক্ষে করে প্রতিভাত
দৃশ্যত প্রত্যক্ষ এই বিশ্বপ্রতিকৃতি।[১৫]

... ...

কাল নামে অভিহিত অবিরাম চঞ্চলতার
রহস্যঘন নিত্য অনিত্যতাজালে
আবদ্ধ বিধৃত এই বিশ্বব্যাপী নিরন্তর গতি,
এবং নিয়ত তার নবতর ছন্দপাত,
বারংবার আবর্তনে একই প্রবাহের ছক,
বিশ্বজাগতিক নৃত্যে এই স্থাণু বস্তুসমাবেশ—
ধ্যানস্থ মহাশূন্যতায়
প্রলম্বিত শক্তির স্বয়ংক্রিয় অসংখ্য ঘূর্ণন,—
প্রতীক্ষা করে এরা জীবনের ইন্দ্রিয়বোধের জাগ্রত মনের।[১৬]

14 Page 174 line 28 to page 175 line 11
15 Page 176 line 2 to line 12
16 Page 176 line 28 to page 177 line 4

তারপরে কেঁপে ওঠে প্রাণের নিষ্ক্রিয় মৌন মহনিদ্রাঘোর ;
নীরবে ধীরে অন্তরিত মহাশক্তি হয় বিস্ফুরিত,
জীবনের স্বপ্ন জাগে জড়ের অন্তরে,
বাঁচবার আকাঙ্ক্ষায় সচঞ্চল অচেতন ধূলি,
অভাবিত মূর্তজীবন শূন্যগর্ভ মহাকালে চমক লাগায়,
রিক্ত অনন্তপটে অসত্যউদয়
অণোরপি অণু ভাসে নিষ্প্রাণ অসীমে।
সূক্ষ্মতর নিঃশ্বসনে জড়ে জাগে প্রাণের স্পন্দন ;
সজ্ঞান সরব হয় জাগতিক ছন্দবদল ;
কুণ্ডলবেষ্টনে বাঁধে অচেতন মহাশক্তি।
দেখা দেয় নির্জীব শূন্যে বিন্দু বিন্দু জীবনের দ্বীপ,
নিরাকার আকাশে ফোটে জীবন্ত অঙ্কুর।[১৭]

... ...

একটুকু সময় তার একটুতেই শেষ হয়ে যায়।
বহু জোড়াতালি দেওয়া ক্ষণিকের সাহচর্য,
কিছু ভালোবাসা কিছু ঈর্ষা আর ঘৃণা,
নির্বিকার জনারণ্যে বন্ধুতার একটু পরশ,
জীবনের ক্ষুদ্র মানচিত্রে রচে হৃদয়ের ছক।[১৮]

... ...

মাঝে মাঝে মনে হয় সব কিছু দূর-অবাস্তব :
বহুরূপী সংবেদন রূপকথা বলে যায়, তাই দিয়ে গড়া
ভাবের কুহকে যেন আমরা বেঁচে আছি,
অথবা বুঝিবা সব মস্তিষ্কের চলচ্চিত্রপটে
অনন্ত নিদ্রায় দেখা স্বপ্ন কিংবা অলীক কল্পনা।
পূর্ণিমা নিশীথে যাত্রী একা নিদ্রাচর,
অহঙের প্রতিচ্ছায়া, অবোধ স্বপ্নের পথে
গুণে চলে ভৌতিক নিমেষ প্রহর।[১৯]

---

17 Page 177 line 9 line 20
18 Page 186 line 19 to line 23
19 Page 188 line 25 to line 32

ক্ষীণ জীবনের রেখা অনাত্ম এক ব্রহ্মাণ্ডের
অতিকায় ঘূর্ণীকে পার হয়ে চলে যায়,
এবং বিভ্রান্ত সেই বিঘূর্ণিত বস্তুর কুক্ষিতে
আপতিক ক্ষুদ্র এক গোলকের মধ্য থেকে মন দেখে
এবং বিস্ময়ে ভাবে কী সে নিজে, কী এই পদার্থসত্তার।
অন্ধ দৃষ্টিহীন তবু বস্তুগর্ভে আশ্চর্যে গড়ে ওঠা
দৃষ্টি এক অন্তরিত আত্মগত থেকে
লক্ষ্য করে অতি ক্ষুদ্র আত্মসত্তা বিন্দুপরিমাণ
রূপ পরিগ্রহ করে সচেতন ভিত্তিরূপে বিশ্বচেতনার।[২০]

অনুবাদ : সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

20 Page 189 line 10 to line 18

মফঃস্বলি বৃত্তান্ত

দেবেশ রায়

টুলটুলি খুব তাড়াতাড়িই হাঁটে। কীচকের ভিটার পশ্চিমে তালমানদীর পাড়ে খুব মোটা-মোটা কচুগাছ হয়। কারো না কারো জমি নিশ্চয়। কোনো জমি তো আর ভগবানের নয়, কোনো না কোনো গিরির। কিন্তু বরাবরই পতিত। অন্তত যতোদিন টুলটুলি দেখছে ততোদিন পতিতই দেখছে। বছরের মধ্যে বার কয়েক তো টুলটুলিকে দেখতেই হয় কচু আর বুনো আলুর খোঁজে। কিন্তু খোঁজটা আরো সবারও তো জানা। তাই টুলটুলিকে তাড়াতাড়ি হাঁটতে হয়, যাতে সে আগেভাগে পৌঁছতে পারে। কিন্তু এমন তো হতে পারে টুলটুলির মতো আর-একজন গতকাল বা পরশু বা তার আগের দিন বা তার আগের দিন বা সাতদিন আগে ঐ কচু তুলে নিয়ে গেছে। আবার এ-ও হতে পারে আজ প্রথম টুলটুলিই ঐ কচুতে হাত দিল। এই জায়গাটার কচু তুলতে তো আসবে দ্বারিকামারীর লোক, কীচকের ভিটার লোক, গোলান্দিপাড়ার লোক আর সরকারপাড়ার লোক। সবচেয়ে আগে আসে গোলান্দিপাড়া, সরকারপাড়া,—একটা মাঠের তো মাত্র তফাত, তারপর কীচকের ভিটা, তারপর দ্বারিকামারী। ঘরে ধান না থাকতে পারে, কিন্তু কচু আর বুনো আলু বা শাক খোঁজারও তো একটা সীমা সরহদ্দ আছে। প্রথমে বাড়ির আনাচে কানাচে খোঁজাখুঁজি চলে। পাওয়াও যায়। তারপর পাড়ার আশেপাশে, বাঁশবনে, পতিত জমিতে। এমনি করে করে সীমা বাড়ে। বাড়তে বাড়তে নাউয়াপাড়া-সরকারপাড়ার লোকরা বর্ষার মাঝামাঝিই তালমার পাড়ে পৌঁছে যায়। ক্ষিধেও পায়, ক্ষিধে মেটাতেও হয়, কিন্তু সেজন্য তো আর গাঠিয়াপাড়ার লোক এসে তালমার এপারে জমি খোঁচাবে না। আর যদি খোঁচাতে হয়, যদি নিজের সীমানা ছেড়ে অন্যের সীমানায় ঢুকতেই হয়, তাহলে তখন আর কোনো সীমাই থাকে না, চোখ দুটো যেদিকে চায়, সেদিকেই পা দুটো নিয়ে যায়। তখন তালমানদী আর বরমতলের মাঠ—কোনোটাই আর ঠেকাতে পারে না। কিন্তু তেমন অবস্থায় যাবারও তো একটা নিয়ম আছে, কতকগুলো ভাগ আছে। যতো নিয়মছাড়াই হোক, ক্ষুধা আর খাদ্যসংগ্রহের তবুও একটা নিয়ম না-থাকলে এই ভুবনসংসার চলে কি করে! আশ্বিনের শেষ সপ্তাহের কিছুদিন পর্যন্ত আধপেটা ভাত জুটে গেছে। জুটে যায়। তারপর শুরু হয়, চেয়েচিন্তে আনা, ধার করা। তারপর ঘটিবাটি বিক্রি। আর তারপর মাঠঘাটে বুনো আলু আর কচু, নালায় ডোবায় মাছ। এই স্তরপরম্পরার শৃঙ্খলায় আজকালের মধ্যেই কচু আর বুনো আলুর খোঁজে মাঠে নামার কথা। তাই এমন হওয়ার সম্ভাবনা কমই যে আজকের আগেই কেউ কীচকের ভিটের পশ্চিমের জমির কচু গাছে হাত দেবে। কিন্তু টুলটুলির স্বামী খেতখেতুর তো তাও পাঁচ-দশ বিঘে আধি জমি আছে, খেতখেতুর তো একটা গোয়ালঘর আছে। খেতখেতুর তো একটা ঘটি থাকে যেটা বেচা যায়। পাটের দাম বেশি হলে খেতখেতুর তো কলাইকরা থালা থাকে। এর কোনোটাই যাদের নেই তাদের তো সারা বছরটাই খাওয়া খুঁজতে হয়। তারা তো এর ভেতরই বুনো আলু আর কচুতে হাত দিয়ে ফেলতে পারে। পারে। তারা এর মধ্যে কচু তুলে নিয়ে গিয়ে থাকলে টুলটুলির কিছু করার নেই।

তখন টুলটুলিকে আর কোথাও খুঁজতে হবে। এক আশা, সব জায়গার সব কচু এর ভেতরই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা নয়। আর দিন পনরর ভেতর সব কচু শেষ হবে। মাঠেঘাটে কচুর খোঁজ করে যাদের কাতার ধান কাটা পর্যন্ত চালাতে হবে, তাদেরও একটা হিসাব থাকে বনবাদাড় মাঠঘাটের কচু দিয়ে কতোদিন চালাতে হবে। তাই রোজকার কচু রোজ তুলতে হয়। পরের দিনের কচু আগের দিন আনে না। আসলে তেমন আনা যায় না।

কিন্তু এই যে কার্তিকের পাকা ধানের ক্ষেতের ভেতর দিয়ে টুলটুলি প্রায় ছোটে, সেই পাকা ধানের ক্ষেতটাই শেষ হতে চায় না। মাঝেমাঝে আলটা নিচু, তখন ধানক্ষেত বুকের ওপর, মনে হয়, ধানক্ষেতে বুঝি ঢাকা পড়ে যেতে হবে। টুলটুলিকে ধানক্ষেত পেরিয়ে পেরিয়ে কতোদূর চলে আসতে হয় সেটা বোঝবার জন্যই যেন সেই ধানক্ষেতের প্রান্তরের ভেতর থেতথেতুর গোহালঘরের মাথাটা জেগে থাকে, একটুখানি। কোথাও আল উঁচু। তখন চারপাশের ধানক্ষেতের উজ্জ্বল টকটকে সূর্যের আলো ধানগাছে ঠিকরে চোখে লাগে। এই পাকাধানের ক্ষেত, এই পাকা ধানের ক্ষেতে সূর্যের আলোর প্রতিফলন, এই পাকা ধানের ক্ষেতের শুকনো মিষ্টিগন্ধ, এই পাকাধানের ওপর দিয়ে কার্তিকের প্রথম উত্তুরে হাওয়ার শিরশিরানি, এই ক্ষেতের পর ক্ষেত পাকা ধান যে আর শেষ হতে চায় না—এ-সবটাই টুলটুলির কাছে অবাস্তব। মাত্র কদিন পর যে-ক্ষেতের কোণে কোণে গাছের গোড়ায় কাচি পড়বে, মাত্র আরো কদিন পর যে-ক্ষেতের সব জায়গাতেই কাচি হাতে চাষি নেমে পড়বে, মাত্র আর এক মাসের ভেতর যে-মাঠের নির্জনতা কবজির দাপটে শিশিরে ভারি ধানের গোছা নামিয়ে ফেলা আর গোছাশুদ্ধ ধান কাটা আর বাতাস কেটে কেটে ধানের বাঁধা আঁটি ছোঁড়া আর বেলাডোবা সময় জুড়ে মাথায় মাথায় ধানের আঁটি খোলানে নিয়ে যাওয়া আর বেলাডোবা সময় জুড়ে পাখি-গাই-বলদ-মেয়ে-পুরুষের কলরবে অবাস্তব হয়ে উঠবে যেন গল্পকথা,—ধানে ধানে, পাকা ধানে ধানে, কাতারে আমনে, থৈ থৈ টইটম্বুর জলের মতো বীচিভঙ্গমুখর সেই ধানময় প্রান্তরকেই, টুলটুলির মনে হয়, তার আর কচুক্ষেতের মধ্যে সবচেয়ে বড় বাধা। পরিণতশস্যহরিৎ মৃদুগন্ধমন্থর এই ধান্যময় প্রান্তর টুলটুলির কাছে এখন অবাস্তব অর্থহীন বিস্তার শুধু। এই অর্থহীন অবাস্তব বিস্তার ঠেলে টুলটুলি ও তার বেশ কিছু পিছে বৈশাখু আর বেঙ্গু, তার দুই বেটা চলে—বন্যার কুকুর যেমন জল ঠেলে ঠেলে ডাঙার দিকে ছোটে।

ধানক্ষেতটা শেষ হতেই সবুজ ঘাসে ছাওয়া ক্রমশ উঁচু জমি আর পাশাপাশি ধানক্ষেতগুলোর শেষে বড় বড় গাছের নিশানা চোখে পড়ে। এইখান থেকে জমিটা উঁচু হওয়া শুরু। উঁচু হতে হতে ইস্কুলের কাছে উঠেছে, ইস্কুলের পরে হাটখোলা, হাটখোলার পরেও ডাঙা মাঠটা সোজা উত্তরে বয়ে গেছে,—সেই জহুরির কলোনিতে। এই ডাঙা মাঠের পুব পাক দিয়ে রাস্তা আর পশ্চিমপাক দিয়ে তালমা নদী। হাটগোলার পর তালমানদীর উপর কাঠের সাঁকো। নদীর ভেতর পোঁতা দুই সারি থাম্বা আর থাম্বার সঙ্গে বলটু দিয়ে লাগানো লম্বালম্বি তিনটি কাঠ। গত কয়েক সনে ভোটের সময় তার ওপর মুলি বাঁশের বেড়া পড়েছে। সেই বেড়া নতুন থাকতে ভোটের গাড়ি পার হতো, গোরুর গাড়ি তো বটেই। এখন ঝরঝর হয়ে গেছে, খসেখসে পড়ে।

ধানক্ষেতটা পেরিয়ে টুলটুলি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, যেন প্রধান বাধাটা সে পেরিয়ে আসতে

পেরেছে। একবার পেছন ফিরে চায়—কতোটা এসেছে দেখতে, বৈশাখু-বেঙ্গুকে খুঁজতেও হয়তো। কিন্তু কিছু বোঝে না। টুলটুলি চলে আসার পর পেছনে আলের রেখা উপছনো ধানেধানে মুছে গেছে। কিন্তু এই মাঠটা কচ্ছপের পিঠের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে উঁচুতে ক্রমে উঠেছে বলে চারদিকের দৃশ্য ধাপে ধাপে টুলটুলির কাছে ধরা পড়তে থাকায় টুলটুলির ভালোই লাগে। কিন্তু তার পরই তার কেমন একা বোধ হয়। কচ্ছপের পিঠের মতো সেই ঢালু বেয়ে ওঠার সময় দুদিকের অনেকটাই নজরে আসে। যতোই নজরে আসে, ততোই যেন টুলটুলির নিজেকে একা লাগে। একা লাগলে পেছন ফিরে ধানক্ষেতটার দিকেই টুলটুলিকে আবার তাকাতে হয়, যে-ধানক্ষেতের ভেতর তার এমন একলা একলা লাগে নি, ধানের শিষ তার গায়ে এসে পড়েছিল। আর এখন তার দুপাশ ও সামনে ও পিছন ক্রমেই অধিকতর খালি করে করে নিজেকে একলা থেকে একলাতর করছিল টুলটুলি।—এ্যালায় বেলা উঠিবার ধইচছে। সগায় চাহি থাকে আকাশ আর মাটি মিশান ধান বাড়ির পানে, কখন পাকিবার ধরিবে ধানা, কখন পাকিবার ধরিবে। ক্ষ্যাতত্‌ কুনু কাম নাই। কায়ত ঘরত বাহির হবে না। এ্যানং টাইমে কুনো বেটিছোয়া ঘরত বাহির হওয়া ধরিলে সগায় বুঝে সরগোচালী (পাড়াবেড়ানি) চলোছে। সরগোচালীক সগায় চিনে। হামাক দেখিলে সগায় বুঝিবে, ধানক্ষেত উজাইয়া যে-ই বেটিছোয়া হেই ইশকুলের মাঠ পাক পাড়িবার ধরিছে সেইলার প্যাটত ভাত নাই, সেইলার ঘরত ভাত নাই। এই ক্রমোচ্চ ডাঙায় উঠতে কোমরটা একটু এগিয়ে দিতে হয়। কোমরে, পায়ের পাটিতে আর গোড়ালির ওপরের শিরায় টান ধরে: আর হাঁফ ধরে। টুলটুলি ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করে হাঁফ ছাড়ে। সামনে আরো উঁচুতে উঠে গেছে মাঠ, এই ডাঙার ওপর ইশকুল, ইশকুলের পরে হাটখোলা, হাটখোলার পরে আবার মাঠ,—সেই মাঠের পশ্চিমে কচুগাছের ঝাড় বর্ষায় বড় হয়। এই এতোটা মাঠ সম্পুর্ণ একাএকা পেরতে হবে ভাবতে টুলটুলির লজ্জা লাগে। যে দেখবে সেই বুঝবে সে কচুখোঁচানি। এখন চারপাশের ধানক্ষেতের ভেতর থেকে গড়িয়ে উঠে আসা সবচেয়ে উঁচু ও বিস্তারিত এই মাঠের উচ্চতা আর বিস্তার টুলটুলির না-খাওয়া ভোখ-পাওয়া পেটের সব ভাঁজ যেন উদোম করে দেয়, রোদও বাধাহীন। টুলটুলির একটু আড়াল লাগবে, একটু-খানি আড়াল, নইলে সে কচু খুঁড়তে যেতে পারবে না। তাহলে টুলটুলি সোজা উঠছে কেন। সোজা উঠে তার কী হবে। তার চেয়ে যদি এখান থেকে, এখনই, ডাইনে, পশ্চিমে, তালমার দিকে ফেরে তাহলে,—পচ্চিমের ঢালত, তালমার পার দিয়া দিয়া ইশকুলবাড়ির পাছত দিয়া, হাটখোলার পাছত দিয়া কচুগাছের জঙ্গলবাড়িত উঠিবা পারে। টুলটুলি আর সোজা না উঠে ডাইনে বেঁকে। জমিটা গড়ান জমি। বাঁ পাটা তাই পড়ে উঁচুতে, ডান পা-টা নিচুতে। যেন খোঁড়া এমন হাঁটে টুলটুলি, বাঁ পায়ে বেশি জোর আর ডান পায়ে কম জোর দিয়ে দিয়ে। আগে থাকতে যদি টুলটুলির ঠিক করা থাকতো কোন্‌ রাস্তা দিয়ে কোথায় যাবে, তাহলে ধানক্ষেতের ভেতরই আলে আলে পশ্চিমে সরে সরে তালমার পারে চলে যেতে পারতো। এতোক্ষণ তালমার পারে পারে কচু খোঁচাতে পারতো বা তালমার জলে মাছ ছিঁচোতে পারতো। এমন-কি, ধানক্ষেতটা শেষ হওয়ার সময়ও যদি তার মনে হতো, তাহলে এই ঢালুর তলা দিয়ে দিয়ে তালমার পারের দিকে চলে যেতে পারতো। কিন্তু এই গড়ান বেয়ে মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠে টুলটুলির লজ্জা লেগে যায়, এত বড় মাঠে সে একা, বেটিছোয়া

—সেই লজ্জা, তার ক্ষিধে পায়—সেই লজ্জা। এতোখানি বেলা হয়েছে, এখনো টুলটুলি খোঁজাখুঁজি করতে পারে নি। কোন্ রাস্তা দিয়ে কোথায় যাবে, সে-সব আগে ঠিক করা থাকলে এতো দোষ হতো না। বা, যদি টুলটুলি না খেয়ে থাকার জন্য লজ্জা না পেত।—না-খাউয়াইয়ার এ্যানং অ্যালাং ভ্যালাং ভালো না। খাউয়াইয়ার ঘরের ভাঁড়ার ঠনঠনায় আর না-খাউয়াইয়ার ঘরের ভাঁড়ার গদ্‌গদায়। কৌটা টিনের ঠনঠনে খাউয়াইয়ার ভাঁড়ারঘরে বাজনা বাজে। আর না-খাউয়াইয়ার ঘরের ভাড়ার তো নদীর পার আর কাদায়। গদ্‌গদ করে পা গেড়ে যায়। খাউয়াইয়ার ভাড়ার একটুখানি, না-খাউয়াইয়ার ভাঁড়ার মাঠকুড়ানি। খাউয়াইয়ার ঘরের একটুখানি জায়গায় সব সাজানো-গোছানো, কৌটো আর টিনের মুখ খুলে খুলে রান্নার জিনিশ বের করে দেয়। আর,—না-খাউয়াইয়ার ঘরক সকালত উঠি এ্যানং ধানক্ষেত সাঁতরাইয়া হে-ই তালমা নদী হতে মাছ ধরি, হেই হাটখোলার পাছত কচু তুলি, হে-ই কনেক শুখা কাঠি নিয়া ঘরত যাইয়া আন্না (রান্না) করিবার লাগে। তাই অ্যানং অ্যালাং ভ্যালাং ভালো না। হিপাকে আসিবার তো হুপাকে যাচ্ছে; হুপাকে আসিবার তো হিপাকে যাছে। ষ্যানং হাঁসের নাখান হকর পকর করি ঘরঠে বাহির হইছে, টুলটুলির তো জানা উচিত কোন্‌ঠে যাছে, কেনে যাছে। এ্যালায় একবার পাহাড়ত উঠিবার ধইচছে, একবার নামিবার ধইচ্‌ছে। ঢালু জমির গড়ানের মাঝখান থেকে কেউ এমন চওড়াচওড়ি পার হয় না, শিশুরা ছাড়া। আর, এই এতোটা জমি চওড়াচওড়ি পার হতে কতো আর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে পারে তিনবিয়োনি টুলটুলি। তার দুই বাচ্চা ধানক্ষেতের ভেতর কোথাও আছে, দেখা যায় না। এই খাড়া ঢালু জমিটাকে মাঝখানে রেখে চার পাশেই তো ধানি জমি। উত্তরের জমিগুলো টুলটুলি পেরিয়ে এসেছে—ওর ভেতর এখন বেশাখু আর বেঞ্চু। পশ্চিমে তালমা নদীর ওপার থেকে আবার পাকা ধান। পুবে, এই ডাঙা জমির পাশ দিয়ে সড়ক গেছে উত্তরে জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি বাস রাস্তার দিকে আর দক্ষিণে চাউলহাটি বর্ডারের রাস্তার দিকে। এই সড়কের পুব দিকে কীচকভিটা, সরকারপাড়া, গোলান্দিপাড়া, নাউয়াপাড়া—ছাড়া-ছাড়া বাড়ির এক-এক পাড়া, এক-এক গাঁও। এই সব বাড়িঘরের পেছনে আবার ধানক্ষেত। চারদিকে পাকা ধানের পাকা হলুদ, তার ভেতর বাড়িঘরে পোঁতা গাছগাছরার সবুজের রং দূর থেকে কটকট করে। শুধু শুধু চোখ মেলে রাখার স্বভাব আর টুলটুলির হবে কোত্থেকে, কিন্তু বাড়ির আঙিনা থেকে চোখ তুললেই দিগন্ত দেখার অভ্যাসে সে একেবারে সন্নিহিত, একেবারে নিকটের এই ধানক্ষেতের দৃশ্যের দিকে চোখ মেলে। যেন এই বিরতিহীন পাকা ধানের স্রোত, বিরতিহীন দিগন্তের মতোই তার কাছে অবান্তর, আগামী পাঁচ অথবা সাতদিন পর ধান পেকে ওঠা তার কাছে অবান্তর, শাল-সেগুন-গয়েরের জঙ্গলের মতো এই ধানের জঙ্গলে সে কাঠ কুড়োয়, বা কচু খোঁচায়, রোয়া-বোনা-পেকে ওঠার হিসাব তার কাছে নেই। গত তিন দিন যার পেটে ভাত নেই তার কাছে আগামী তিনদিনের পরের ভাতের কোনো হিসাব নেই। সেই বেহিসাবি পারিপার্শ্বিকে টুলটুলি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ডাঙা জমির কিনারে পৌঁছায়।

নিচে তালমা। প্রায় পাঁচ-ছ মানুষ উঁচু পাড়ের মাথায় টুলটুলি। টুলটুলি কোমরে হাত দিয়ে নিচে জলের সোঁতাটাকে দেখে আর পাড়টাকে যাচাই করে নেয়। কার্তিক মাসে আর তালমার

জল আসবে কোথা থেকে। বৈশালী (বর্ষা) দিনে জল বাড়ে, আবার কমে। কার্তিক মাসে এখন তো শুখা। এই উঁচু পাড়টা থেকে তালমার জলের দিকে তাকালে গা ছমছমায়। জলের জন্য না, পাড়ের এই খাড়াটার জন্য। এতো নিচে নদী যে মনে হয় বর্ষায় এই এতোটা জায়গা জলে জলে ভরে যায়। মোটেই তা হয় না। আসলে নদীর পাড়টা উঁচু না, জমিটা উঁচু বলে পাড়টা এতো খাড়া।

কোমরে হাত দিয়ে টুলটুলি সোজা নিচে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে, তারপর ডাইনে তাকায়। ডাইনে খানিকক্ষণ তাকিয়ে আবার বাঁয়ে তাকায়। খোঁপার সঙ্গে ঝোলানো ঝুড়িটাতে একবার হাত দেয়। তারপর দুটো হাতই মাথার ঝুড়িটার ওপর রেখে ডানদিকে কয়েক পা আস্তে আস্তে হেঁটে যায় আর নিচু হয়ে খাড়া পাড়টার গা কোনাকুনি দেখার চেষ্টা করে, সেই পাড়েরই মাথায় দাঁড়িয়ে যতোটা দেখা সম্ভব।

আসলে, টুলটুলি যাচাই করে কোন্‌খান দিয়ে নামাটা সম্ভব। নদীর পারে নেমে যাওয়াটা তো টুলটুলির উদ্দেশ্য নয়। সে এই খাড়া পাড় বেয়ে নামতে চায়। খাড়া পাড়ের গায়ে বুনো আলু, ওল, কন্দ, কচু থাকে। মাটি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সেগুলো বের করতে চায় টুলটুলি। তাই নদীর নিচু পাড়ে সে যায় নি। সেখান দিয়ে তো সবাই ওঠানামা করে, যে যা পায় তাই তুলে নিয়ে যায়। এই খাড়া পাড় বেয়ে নিচে নামা প্রায় অসম্ভব। কোনো রকমে যদি মাটি ধরে ধরে নামা যায়, তাহলে কিছু না-কিছু পাওয়া যাবে। তারপর নদীর জলে মাছ ওঠে কিনা দেখতে দেখতে নদী ধরে ভাটিয়ে যেতে যেতে টুলটুলি সেই হাটখোলার পেছনের কচুর জঙ্গলে গিয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু এই পাড় বেয়ে নামতে গেলে পাড়ের মাথায় পা-রাখার মতো জায়গাটা তো অন্তত দরকার। নইলে তো পাড় গড়িয়ে সেই নদীর পারে গিয়ে পড়বে। তেমনি একটা জায়গা খুঁজছে টুলটুলি। টুলটুলি যেখানে দাঁড়িয়ে ঝোঁকে তার নিচের পাড়টা একটা খাড়া বাটির মতো, ভেতর দিকে গর্ত। যেখানে গিয়ে গর্তটার সীমানা আবার উচু হয়েছে টুলটুলি সেখানে যায়। বাঁয়ে। কিন্তু এমন নিটোল ঢেউয়ের মতো গোল হয়ে পাড়টা ঘুরেছে যে সেখানে শ্যাওলা জমে আছে। কোনো খাঁজ নেই। কিন্তু তার ফলে মাটির সেই গোল ঢেউটা যেখানে সোজা হয়েছে সেখানে একটা খাঁজ তৈরি হয়, লম্বালম্বা খাড়া। পিঠটা হেলান দিয়ে সোজা হয়তো বসা বা দাঁড়ানো যেতে পারে, একটা খাঁজই তো, তা-ও আবার শ্যাওলাধরার মত শক্ত পুরনো খাঁজ, ভার সইবে আর গোড়ালি দিয়ে গুঁড়িয়ে বাঁ হাত দিয়ে খিমচিয়ে হয়তো হাত পা রাখার খাঁজ বানানো যাবে। টুলটলি পা ঝুলিয়ে বসে, দুহাতে মাথার খোঁপার সঙ্গে লাগানো ঝুড়িটা তুলে এনে নিচে ফেলে নেয়, দুহাত দুই পাশে ঘাসের ওপর রেখে একটু নড়ে চড়ে। তারপর দুই হাতের ওপর ভর দিয়ে কোমরটা একটু এগিয়ে নিয়েই উপুড় হয়ে যায়, ডাঙার কানায় বুকটা লেগে থাকে। পা দুটো একটা জায়গার জন্য পাড় আঁচড়াতে থাকে, কখনো পা পাড়ে লাগে, কখনো লাগে না, ঝুরঝুর মাটি ঝরে পড়ে। টুলটুলির শরীরের ভারে মাটি ভেঙে পড়লে বা টুলটুলি হড়কে গেলে, প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ ফুট নিচে নদীর পারে পড়ে যাবে। তার হাতের সামনে কিছু ধরার নেই, ঘাস ছাড়া, পা-ও মাটি পাচ্ছে না। ডাঙার কানায় বুক লাগিয়ে উপুড় হয়ে ঝুলে নিচে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে টুলটুলি বাঁ পা-টা আরো বাঁয়ে ছুঁড়ে সেই খাঁজটায় লাগাতে চেষ্টা করে। এদিকে ঘষতে ঘষতে সে শরীরটাকে প্রায় কিনারে নিয়ে

এসেছে। মাইদুটো শুধু ডাঙার কানায় অতিরিক্ত বাধা হয়ে আছে। ঘষটে ঘষটে টুলটুলি ডান মাই ডাঙা থেকে নামিয়ে আনে, ফলে তার শরীরটা ঝুলে পড়ে। দুই হাতের পাঞ্জায় শরীরটাকে ঝুলিয়ে রেখে বাঁ দিকের সেই খাড়া খাঁজে পা-টা হাঁটু পর্যন্ত আটকে, ডান পা-টা ছুঁড়ে ছুঁড়ে পাড়ের গায়ে একটা গর্তমতো করে ডান পায়ের পাতা সেখানে রেখে টুলটুলি পাড়ের গায়ে সেঁটে যায়। সেইভাবে খানিকক্ষণ থাকে—দুই হাতের আঙুলে পাড়ের মাথাটা শক্ত করে ধরা। পাড়ের গায়ে একটা বিরাট গুণচিহ্নের আকারে সাঁটা টুলটুলির শরীরের ওজনটা বেশ কিছুক্ষণ সময় জুড়ে ধীরে ধীরে হাত থেকে পায়ে চলে আসতে থাকে। টুলটুলির মুখ থেকে তলপেট পর্যন্ত পাড়ের সঙ্গে সাঁটা, দুই পা দুদিকে ছড়ানো, হাত দুটো মাথার ওপরে। কার্তিকের শুকনো মাটি ঝুরঝুর ঝরে যেতে পারে। মাটি না ঝরলেও টুলটুলির পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা,—কারণ তার পা ঠিকমতো কোথাও গাড়া নেই যাতে শরীরের ওজন সামলায়। শরীরে ভার সঞ্চরণের নিয়মে একসময় টুলটুলির ডান পায়ের বাটির রগগুলো শক্ত হয়ে ওঠে। ডান পায়ের পাতার ওপর ভর দেয়া, বাঁ পায়ের হাঁটু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত একটা খাঁজে আটকানো, সেদিকে শরীরটা ঝুঁকে আছে। পাড়ের কানা ধরে থাকা আঙুলগুলো খানিকটা আলগা হতে টুলটুলি প্রথমে ডান হাতটার আঙুলগুলো শিথিল করে, কারণ শরীরটা বাঁ দিকে ঝুঁকে পড়ায় ডান হাতটাতেই টান পড়েছিল। হাতটা শিথিল করলেও কানাটা ধরেই থাকে। শিথিল হাতটা মাথার ওপরে সেই মাটির কানায় থিরথির করে কেঁপে উঠতেই চট্ করে টুলটুলি আবার কানাটা চেপে ধরে কিন্তু তারপরই বোঝে, হাতটা নিজে থেকেই কাঁপছে। খুব ধীরে ধীরে টুলটুলি ডানহাতটা পাড়ের মাথা থেকে নামিয়ে আনে। তারপর শরীরের পাশ দিয়ে ঝুলিয়ে দিতে দিতে টুলটুলি অনুভব করতে পারে এতোক্ষণ এই হাতটার ওপর শরীরের ওজনের চাপ হাতটার শিরা উপশিরা ও পেশী থেকে সরে যাচ্ছে।

মাটির পাড়ের সঙ্গে উপুড় হয়ে সেঁটে থাকার একটা অবস্থায় আসার পর, এখন, টুলটুলি চেষ্টা করে চিত হতে, যাতে মাটির পাড়ের গায়ে বুক মুখ নয়, পিঠ লাগিয়ে সে দাঁড়াতে পারে। পাড়ের সঙ্গে টুলটুলি এমনভাবে সাঁটা যে তাঁর ডান গালটা মাটিতে লেগে থাকে। সুতরাং ঘাড় ঘোরানো যায় না। ঘাড় না ঘুরিয়েই ডান হাতটা বাড়িয়ে মাটি আঁচড়ে আঁচড়ে সে একটা গর্তমতো খুঁড়তে থাকে, যাতে ডান হাত দিয়ে সেই গর্তটা আঁকড়াতে পারে। আঙুলগুলো মাটির ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে সে খুব জোরে জোরে খুঁড়তে পারে না—মাটি খোঁড়ার ঝোঁকে সে শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে পাড়ের গা থেকে খসে পড়তে পারে। আঙুল বাঁকিয়ে ধরা যায় এমন একটা গর্ত খোঁড়া হলে টুলটুলি একটু টেনে দেখতে চায় মাটি খসে যায় কিনা, কিন্তু এতো বেশি জোর দিতে পারে না যাতে সেই জোরের বিপরীত ধাক্কা হাত থেকে শরীরে এসে লাগে।

ডানহাত দিয়ে সেই গর্ত আঁকড়ে, ডান পায়ের ওপর ভর রেখে, বাঁ হাতটার ওপর শরীরটাকে ঝুলিয়ে টুলটুলি বাঁ পা-টাকে সেই লম্বা খাঁজ থেকে তুলে আনে। পাড়ের কানা ধরে মাথার ওপরে বাঁ হাত, মাথাটা বাঁয়ে হেলে সেই বাহুতে লেগে আছে, ডান পা গর্তে ঢোকানো, ডান হাত পাশে মাটির গায়ের গর্ত আঁকড়ে আনুভূমিক, শরীরের কোনো অঙ্গ বেঁকে নেই, সব অঙ্গ টানটান, শুধু বাঁ পা-টা সম্পূর্ণ মুক্ত। ফলে, বিরাট গুণচিহ্নের আকার বদলে টুলটুলিকে বাঁ থেকে ডাইনে

কোনাকুনি উড্ডীন দেখায়। বাঁ পা-টাকে ডান পায়ের পাশে নিয়ে এসে মুহূর্তের মধ্যে টুলটুলি ডান হাতটা গর্ত থেকে খুলে চিৎ হয়ে যায়, মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য সমস্ত শরীরটা পাড়ের কানা ধরা বাঁ হাতটার ওপর সবটুকু ভর রাখে। তারপরই টুলটুলি ডান হাতে সেই খাড়া খাঁজটা জোর কব্জায় ধরে ফেলে। ডান পা যেখানে ছিল সেই গর্তটার ভেতর বাঁ পা-টা ঢুকে যায় আর ডান পা সহ শরীরটা খাড়া খাঁজে আটকে পড়ে। এখন টুলটুলি পাড়ে পিঠ দিয়ে মুখটা বাইরে রেখে দাঁড়াতে পারে। খাঁজটার ভেতর কোমরের ভর থাকায় ডান পা-টা দিয়ে মাটি ঘসে ঘসে ফেলে গোড়ালি রাখার মতো একটা জায়গা বানিয়ে নেয়। একটু নড়ে চড়ে নিজেকে ভালো মতো দাঁড় করিয়ে টুলটুলি মাথার ওপর থেকে বাঁ হাতটা ধীরে ধীরে নামায়। বাঁ হাতটার ওপর এতো টান পড়েছে যে এখন কনুই বাঁকানোর সময় রগটা টনটন করে ওঠে। বাঁ হাতটা ভাঁজ করে বুকের কাছে তোলার পর টুলটুলি সেই খাড়া খাঁজ থেকে ডানহাতটাও ধীরে ধীরে তুলে আনতে পারে।

এতোক্ষণে টুলটুলির শরীর খাঁজে আটকা আর দুই পায়ে খাড়া। মুক্ত দুই হাত দিয়ে এখন টুলটুলি পাড়ের গায়ের ভেতর শেকড়, কন্দ. কচু, বুনো আলু খুঁজে খুঁজে খুঁচিয়ে যেতে পারে। এতো খাড়া যে পাড় বেয়ে কেউ নামে নি, ঠিক সেই পাড়টি দিয়ে এতো কসরৎ করে টুলটুলির নামার উদ্দেশ্য তো একটিই, যেখান দিয়ে কেউ কখনো নামে নি নদীর সেই পাড় দিয়ে কোনো রকমে নামতে পারলে কচু হোক, ওল হোক, কন্দ, বুনো আলু, মিষ্টি আলু, কেশর, বুনো মুলো,—কিছু না কিছু পাওয়া যাবেই।

কিন্তু তিনদিনের বাসি ও আগামী কদিনের অনিশ্চিত ক্ষুধার এই শরীর নিয়ে এই নদীর পাড়ে ঝুলে ঝুলে উপুড় চিত হওয়ার এতো কসরতের পর খুব অপ্রস্তুত হাঁফ ধরে। টুলটুলি জোরে জোরে কবার নিশ্বাস নেয়, যেন এখানে এ-রকম হাঁফ ধরার কথা ছিল না। তারপর, এতোটা শারীরিক শ্রমে ও উত্তেজনায় জলজলে দুই চোখ দিয়ে মাটির দেয়ালটা খুঁজতে থাকে, কোথাও কোনো কচু কন্দের আগা বা গোড়া বেরিয়ে আছে কি না।

যেখানেই দেখে গোছামতো শেকড় বেরিয়ে, সেখানেই টুলটুলি আঙুল দিয়ে খোঁচায়। বেশির ভাগই বুনো গাছগাছরা। আঙুল দিয়ে খোঁচানোর পর যদি সন্দেহ হয় ভেতরে অন্য কিছু থাকতে পারে, টুলটুলি ডালপালা ধরে টানে। বেরিয়ে এলো তো, এলো। নইলে, ফোতার ওপর থেকে একটা ছোট্ট ছুরি মতো বের করে টুলটুলি মাটিটা আলগিয়ে দিতে থাকে। কিন্তু সব শেকড় ধরে টুলটুলি টানে না, সব গাছের ডালপালা টুলটুলি টেনে টেনে দেখে না। চোখ দিয়ে সে দেয়ালটা তন্ন তন্ন করে যাচাই করে। চোখ দিয়ে দেখে যেটাকে সন্দেহ হয় সেটাকে আরো খানিকটা দেখে, যেন সেটার দিকে তাকিয়ে থাকলেই গাছটার মাটির ভেতরের অংশটা টুলটুলির চোখের সামনে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। গত ক মাসের অনির্দিষ্ট ক্ষুধা আর ক্ষুন্নিবৃত্তি গত তিনদিনের পরিপূর্ণ অনাহার আর আগামী কদিনের নিশ্চিত উপবাস কি টুলটুলির ভেতরে কোনো অন্তর্জ্যোতির জন্ম দেয় যার ফলে সে শুধু বাইরের চেহারা দেখে বোঝা যায়, এই ডালপালার ভেতরে এই শেকড়বাকড়ের ভেতরে, মাটির নিচে কোথাও কোনো এমন খাদ্য আছে কি না যা মাটি উপড়ে তুলে আনলে তার বা

তার বাচ্চাদের ক্ষুধার কিছু কিছু অংশ মিটাতে পারে। যতো কম সময়ের জন্যই হোক, মিটতে পারে।

একটা শুকনো কাঠির মতো ডাল ধরে টান দিলে কিছু মাটি সহ ডালটা উঠে আসে। গর্তটার ভেতর সাদা মতো দেখা যায়। আঙুল দিয়ে গর্তটার মাটি আরো খানিকটা ঝরিয়ে দিলে সেই শাদা রঙের চারপাশে ঘিয়ে রং দেখা যায়।—কাশুরা হবা পারে। আঙুল দিয়ে মাটিগুলো আরো ঝরিয়ে দিলেও গর্তটা খুব বেশি বড় হয় না। শেষে ফোতার ভেতর থেকে ছুরিটা বের করে গর্তটা খুঁড়তে থাকে। শরীরের ভার সামলানোর জন্য খুব জোরে টুলটুলি গর্ত খুঁড়তে পারে না। বেশি জোরে খোঁড়ার জন্য তাকে যে-ঝোঁকটা দিতে হবে তাতেই সে টলে পড়ে যেতে পারে। ছুরিটা মাটির ভেতরে ঢোকাচ্ছে, বের করে আনার সময় ছোট ছোট মাটির টুকরো ঝরে পড়ছে। সেই ঘিয়ে রঙের বৃত্ত আর একটু বড় দেখায়।—ওল্দাকচু হবা পারে। আবার কোনোবার ছুরিটা তুলে আনলেও কোনো মাটি খসে পড়ে না। তখন আঙুল দিয়ে মাটিটা ঝরিয়ে দিয়ে আবার ছুরিটা মারতে হয়।—কাশুরা হলি আর লাভ কি। প্যাট তো ভরিবে না। মুখত দিয়া অস্ (রস) খাইয়া ছুবরাটা ফেলি দিবার নাগিবে। তিনদিনের বাসি ক্ষিধা কি আর কাশুরার অসে মিটিবার পারে। কাশুরার ছুবরাটা তো গিলা না যায়,—শুখা খড়খড়া। গিলা গেইলে তো ছুবরাটা দিয়া পেট ভরি যাইত। আর কাশুরা কতো বড় কাশুরা হবা পারে? সেই কাশুরাতে কতো 'অস' ধরিবার পারে? আর না-খাউয়াইয়া মুখ হচ্ছে এতগুল্লান। কোদালের একটা বা দুটো ঘায়ে মাটির চাঙরের সঙ্গে যেটার উঠে আসার কথা সেটাকে মাটির ভেতর থেকে তুলে আনতে একটা হাতের কয়েকটা আঙুল আর একটা ছোট ছুরি দিয়ে গর্ত খুঁড়েই চলেছে টুলটুলি। এখন সেই ঘিয়ে রঙের বৃত্তের ওপরের দিকটা থেকে মাটি খসে পড়ছে। কিন্তু পুরোটা এখনো বেরয় নি। যত বেরচ্ছে না, টুলটুলি ততো-ই খুশি। এটা আগা না গোড়া বোঝা যাচ্ছে না। যদি আগা-ই এতো মোটা হয়, তাহলে গোড়াটা তো আরো কতো বড়, কতো বড়, সামান্য একটা ছুরি আর আঙুল দিয়ে এতো মাটি কতোক্ষণ ধরে সরিয়েই যাবে টুলটুলি, আর কতোক্ষণ পর এই সমস্ত মাটিজোড়া বিরাট গোড়াটা নিয়ে সেই মস্ত ওল্দাকচু বা বুনো আলুটা বেরিয়ে আসবে। এতো বড় যে সেটা বাড়ি বয়ে নিয়ে যেতে কতোবার না জানি ঘাড় থেকে নামিয়ে নামিয়ে বিশ্রাম নিতে হবে আর শেষে হয়রান হয়ে সারা মুখ ঘামে ভিজিয়ে বাড়ি পৌঁছবে, দুপুরে, বিকেলে নাকি সন্ধ্যায়?—বুনা আলু বা ওল্দা কচু এতো বড় হবা ধরিলে এই একোটা দিয়া তো হামরলো তিনজন পুরা মানষির আধাপেটা আর তিন বাচ্চার একবেলা পুরা পেটা আর একবেলা আধাপেটা হবা পারে। ঘরত নুন আছে, ঝালও কনেক আধেক জুটিবার পারে। গিয়া গরম হলত সিদ্ধ করিবার ধরিলে, ধর কেনে, আলু হইলে ঘণ্টা আর কচু হইলে দুই ঘণ্টা নাগিবার পারে। কচু হইলে জলটা বারবার ফেলি দিবার লাগিবে। না-হয় তো গলা চুলকাবার ধরিবে। আর কচু সিদ্ধ জলখান ফেলি দিলে গরম জলের ধোঁয়ার গন্ধখান পাবার তানে ছাওয়া ছোটর ঘর হুমরাইয়া পড়িবার ধরিবে। গরম জলের ধোঁয়ায় সিদ্ধ হইবার গন্ধ পাওয়া যাবার ধরিবে। ধোঁয়ার গন্ধত কায় বুঝিবে ভাত সিদ্ধ হচ্ছে নাকি কচু সিদ্ধ হচ্ছে। ভেতরের জিনিশের ওপরটা এখন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ওপরের মাটিটা খসিয়ে দিলে জিনিশটা তো বেরিয়ে আসবে না, নিচে লেগে থাকবে। তখন তো টুলটুলিকে দুটো হাত দিয়ে জিনিশটা ধরে টেনে বের করতে হবে। কিন্তু টুলটুলি যেরকম দাঁড়িয়ে

আছে তাতে তার পক্ষে তো আর দুই হাত দিয়ে জিনিশটা টেনে বের করা সম্ভব না। যদি পারতো, যদি পারতো টুলটুলি দুই হাতের একটা জোর হ্যাঁচকা টানে মাটির ভেতর থেকে জিনিশটাকে উৎপাটিত করে আনতে! যদি পারতো! তা যখন পারছে না, পারা সম্ভব নয়, তখন টুলটুলিকে নিচের মাটিটা সরাতে হয়, সেই ছুরি দিয়ে, আঙুল দিয়ে, একটু একটু করে মাটি ঝরিয়ে ঝরিয়ে। যতো খুঁড়তে হয়, টুলটুলি ততো তাড়াতাড়ি করে। যতো দেরি হয়, টুলটুলি ততো অস্থির হয়। যতো অস্থির হয় টুলটুলির ততো আশা হতে থাকে ভেতরের জিনিশটা অনেক বড় হয়ে আছে যেন, এতো বড় যাতে তাদের পুরো পরিবার ধানকাটার দিন পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে প্রায়। টুলটুলি বুঝতে পারে না জিনিশটার শেষ পর্যন্ত সে খুঁড়ে ফেলেছে কিনা। গর্তের ভেতর হাত ঢুকিয়ে ছুরিটা দিয়ে ওপর দিকে একটু ঠেলা দিতেই, খানিকটা জমাট কালো মাটি ছিটকে এসে টুলটুলির কব্জির ওপর পড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, টুলটুলি টালটা সামলে নিতে গেলে জিনিশটা গড়িয়ে নিচে পড়ে যায়, টুলটুলির পা কাঁপে আর বুক ধক করে ওঠে, তাড়াতাড়ি দুহাত দিয়ে দুদিকের পাড় ধরে। একটু পরে নিচের দিকে তাকায়, জিনিশটা দেখতে পায় না। না পাক। নিচে নেমে তো দেখবেই।

টুলটুলি তার দুই হাতের সীমানার ভেতর পাড়ের গা-টা শেষবার তন্ন তন্ন করে দেখে নেয়, যদি কিছু থাকে তুলে নেবে। এবার তাকে আবার এক ধাপ নামতে হবে। ছুরিটা ফোতার ভেতর গুঁজে রেখে দুই দিকের পাড় ধরে টুলটুলি একবার নিচের দিকে তাকায় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখটা তুলে নেয়, যেন তার চোখের পাতা যেটুকু নেমে এসেছে সেটুকুর ভারেই সে হুমড়ি খেয়ে হয়ত পাঁচছ-মানুষ-সমান খাতে পড়ে যাবে।

পাড়ের গা খুঁজতে খুঁজতে পাড় বেয়ে নিচে নামার মাত্র একটি উপায়ই তো এখন আছে। ডান দিকে হেলে খাঁজটার গায়ে ভর দিয়ে ডান পায়ের ওপর শরীরের ভার রেখে আভঙ্গ দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে বসার চেষ্টা করা, যতোটা সম্ভব, আর মুক্ত বাঁ পা-টাকে, সোজা, যতোটা সম্ভব, নিচে নামিয়ে, কোথাও আটকে, ওপর থেকে শরীরের ভারটা বাঁ পায়ের ওপর নামিয়ে, নেমে আসা। এই পদ্ধতিতে টুলটুলি শরীরের ভঙ্গি বদলে বদলে, দুই হাতে পাড়ের গা ধরে সামনে সামনে যখন খানিকটা নিচে নতুন জায়গায় দাঁড়াতে পারে,—দুই চোখ সরু করে পাড়ের গা তন্ন তন্ন খোঁজার বদলে, দুই চোখ বুঁজে আসে, মাথাটা একটু হেলে পড়ে, গলার শিরাটা দবদবায় আর তেষ্টা পায়। টুলটুলি খুব আস্তে আস্তে একটা ঢোঁক গিলতে থাকে,—আঠালো লালায় চেটচেটে আর কাঁটাকাঁটা সেই ঢোঁকটা টুলটুলির শুকনো গলায় আটকে যায়। সাঁ সাঁ খালি পেটে নিরেট বাতাসের সেই ঢোঁকটা খুঁজে ফেলতে, চোখমুখ কুঁচকে টুলটুলিকে মাথাটা সোজা করে চোখটা ফেলতে হয়।

চোখ খুললে পাড়ের গায়ে একটা ছোট লতায় টুলটুলির চোখ পড়ে। একলতা। ঘাসের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেছে। খানিকটা পরে সোজা উঠেছে। পাতাগুলো ছোট ছোট জোড়া জোড়া। লতার রং খয়েরের মতো। টুলটুলি সেই ছোট লতাটার দিকে হাত বাড়ায়। ব্যথা ওঠার শেকড়। যে-পোয়াতির কিছুতেই ব্যথা উঠছে না, বা ব্যথা উঠলেও ব্যথা থাকছে না—সরে সরে যাচ্ছে, এই লতার শেকড় বেটে খাওয়ালে তার নির্ঘাত ব্যথা উঠবে। টুলটুলি নেহাত স্বভাবের বশে হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তারপর হাতটা নামিয়ে নিয়ে আসে, তার এখন ব্যথা ওঠার শেকড়

দিয়ে কি হবে। কিন্তু হাতটা গুটিয়ে নিয়েও আবার বাড়িয়ে দিতে হয় টুলটুলিকে,—তারপর আঙুল দিয়ে দিয়ে ঘাসের ভেতরে ভেতরে লতাটাকে ধরে ধরে শেকড়ে পৌঁছায়। ঘাসের গা থেকে লতাটা টুলটুলির হাতে উঠে আসে। ঘাসের গায়ে যেমন, টুলটুলির হাতেও তেমনি লতিয়ে থাকে, যেন টুলটুলি এই পাড় আর ঘাসের মতো এখানেই আছে আর লতাটা তাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠেছে। লতাটাকে ধরে ধরে টুলটুলির হাত প্রায় তার নিজেরই ঘাড়ের কাছে এসে পৌঁছায়। সেখানেই শেকড়টা। একটুখানি লতা, মোটা ঘাসের গোড়ার চাইতেও সরু। আঙুল দিয়ে খুঁড়তে শেকড়টা উঠে আসে। সাদা ভেজা শেকড়। মাটি লেগে আছে। টুলটুলি শেকড়টার একটু ওপর থেকে খুব আস্তে দুই হাতের তর্জনী দিয়ে লতা থেকে শেকড়টাকে ছিঁড়ে নেয়, যেন তুলে নিচ্ছে। যে-লতার শেকড়টাই তুলে ছিঁড়ে নিল টুলটুলি, সেই লতাটাকে খুব মায়ার সঙ্গেই যেন সে পাড়ে আবার শুইয়ে দেয়, যেন ইচ্ছে করলে লতাটা আবার নিজের শেকড় নিজে গজিয়ে নিতে পারবে। তা পারুক আর না-পারুক, টুলটুলিকে ভক্তিভরে তো এ-শেকড় তুলতে হবে। এলো, দেখলো, ধরলো, ছিঁড়লো এমন করে এ শেকড় তুললে তো ফল হবে না। যে-শেকড় গর্ভের শিশুর ঘুম ভাঙাবে, সে শেকড় মায়া দিয়ে না তুললে কি চলে, কাজ হয়, টুলটুলি সকালে স্নান করে নি ঠিকই, কিন্তু তার পেটে তো এক সকালের নয়, তিন-তিনদিনের বাসি উপবাস। সেই ক্ষিধের তাড়নায় প্রথমে দেখেও সে হাত গুটিয়ে নিয়েছিল আর সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে পড়ে যায়, দেখেও কেউ যদি এই শিকড় না তোলে তাহলে তার গর্ভকষ্ট হয়। টুলটুলির মোটে দুই ছেলে, এক মেয়ে। টুলটুলিরই কখন লাগবে বলা যায় না। লোকজনের তো লাগতেই পারে। দরকারের সময় তো মাথা খুঁড়লেও পাওয়া যাবে না। শেকড়টা থেকে ধুলো আর মাটি আস্তে আস্তে ঝেড়ে নিয়ে টুলটুলি ফোতার ভাঁজের ভেতর রেখে দিল।

টুলটুলি দেখতে পায়, যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে সোজা এক লাইনে দূরে এক থোকা পাতা, যেন পাতাগুলিরই শোভা, যেমন, কাঁটা কাঠাল, আনারস, কিন্তু আসলে ওটা বোন্দা শিকড়ের ঝাড়। একটা গর্তের ভেতর গজিয়েছে বলে ওপর থেকে টুলটুলি দেখতে পায় নি, এখন নিচে নেমে আসায় নজরে পড়ে, গর্তের ভেতর থেকে পাতাগুলো বেরিয়ে পাড়ের উপরে ছড়িয়ে। পাতাগুলো খুব চওড়া, মোটা আর কলাপাতার উল্টোদিকের রঙের। বোন্দা শিকড় সাধারণত খুব মোটা হয়। এই বোন্দাটা কতো মোটা টুলটুলি আন্দাজ পায় না।—পাতাগিলা তো মোটাশিলা। মোটাশিলা পাতার গোড়ায় পাতলা কচুও হবা পারে, সব অস (রস) যদি পাতা টানি নেয়। আর না হয় তো খু উ-ব-ই মোটা কচু হবা পারে। য্যানং পাতা মোটা, স্যানং শিকড় মোটা। আগে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যেটা ফেলেছে সেটা কচু না কেশর না বুনো আলু দেখতে পায় নি টুলটুলি। কতো মোটা তাও শেষ পর্যন্ত আন্দাজ করা যায় নি। যদি সেটাতে একবেলার ক্ষিধে মেটানো যেত তাহলে হয়তো কাল সকালে একটা বাতা বা বাঁশ এনে নদীর পারে দাঁড়িয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এটাকে পাড়া যেত। কিন্তু নদীর পারে দাঁড়িয়ে ঐ বোন্দাটাকে বাঁশ বা বাতার সীমানায় পাওয়া যায় বলেই ওটাকে এখুনি তোলা দরকার। নইলে আর কারো আজকের ক্ষিধের জন্যই এটার দরকার হতে পারে। আর এখন বোন্দাটাকে ছেড়ে নদীর পারে নেমে গিয়ে দেখলো আগেরটা ছিল কেশর। তাহলে, তখন কি আবার নিচে থেকে এই পাড় বেয়ে উঠে আসা সম্ভব। কিন্তু টুলটুলি কি করে বোন্দা শিকড়টাকে

হাতে পাবে। ওখানে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। ওপর থেকেই যদি ওটা চোখে পড়তো, তাহলে হয়তো টুনটুনি এদিক দিয়ে না নেমে ঐ বোন্দা শিকড়টার দিক থেকে নামতে চেষ্টা করতো। চেষ্টা করলেই যে নামতে পারতো এমন কোনো কথা নেই। দুপাশের অনেকখানি জায়গার ভেতর এই জায়গা দিয়ে গড়িয়ে পিছলিয়ে তাও নামা যাচ্ছে এই খাঁজটার দৌলতে। টুনটুনি পাড় বেয়ে ধীরে ধীরে তার চোখ তোলে, একবারে নয়, একটু একটু করে, যেন চোখটাও পাড় ভেঙে ভেঙে উঠছে। টুলটুলি একেবারে পাড়ের মাথাটা দেখতে পায়—ভাঙা ভাঙা রেখায় পাড়টা এগিয়ে গেছে। এত সিধে ওপর থেকে টুলটুলি এতোটা নামলো কি করে। এখানে মাটির গর্তের ভেতর থেকে টুলটুলি শুধু টলটলে নীল আকাশ দেখতে পায়, আর এক কোনায় একটা গাছের ঝাঁকড়া মাথা, যেন পাড়ের ওপরের সেই অশেষ ধানক্ষেত থেকে টুলটুলি এখানে লুকিয়ে। সেই নীল আকাশ থেকে সেই গাছের ঝাঁকড়া মাথা, আবার নীল আকাশ, ভাঙা ভাঙা এবড়ো খেবড়ো পাড়, পাড়ের গায়ে ঘাস, মাটি—টুলটুলির চোখ আবার নিচে নেমে আসে। আবার পাড়ের ওপরে ওঠে ঐদিক থেকে কোনো খাঁজ খুঁজে খুঁজে বোন্দা শিকড়টার কাছে নামা সম্ভব নয় আর। আর-এক হতে পারে; পাড়ের মাথা থেকে গোড়ালি ঠুকে ঠুকে যে গর্ত বানিয়ে বানিয়ে নেমেছে, সেই গর্তে পা দিয়ে এক ধাপ ওপরে উঠে তারপর সোজা বোন্দাটার কাছে পৌঁছনর চেষ্টা করা। টুলটুলি বাঁ হাত দিয়ে মাথার ওপরের সেই গর্তটা খোঁজে। পায় না। কিন্তু না পেয়ে আর খোঁজে না। টুনটুনি বুঝে যায়, পাড়ের দিকে পেছন ফিরে দুই হাতের ওপর জোর দিয়ে ওপরে ওঠা শারীরিকভাবেই অসম্ভব। এমনকি সেই চেষ্টাটাও করা যায় না। তখন টুনটুলি সেই খাতটার নিচের দিকেই তাকায়। পাড়টা নদীর কিনারায় গিয়ে মেশার আগে খানিকটা উঁচু থেকে একটু একটু করে যে চওড়া হয়ে নেমেছে—পুরনো পাড় বলেই নিচের দিকটা চওড়া, নতুন পাড়ের নিচের দিকটাই খাওয়া থাকে—তার ওপর দাঁড়িয়ে, পাড়ের সঙ্গে শরীরটা লেপ্টে পা পা করে সরে সরে ঐ বোন্দা শিকড়টার নিচে কোথাও যাওয়া যায় কি ?

অত উঁচু পাড়ের মাঝামাঝি ওরকম সেঁটে থেকে টুনটুলি নিচের সেই জায়গাটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে থাকতে যতোক্ষণ সময় যায়, ততোক্ষণ সময় ধরে একটা কোনো জিনিস নিয়ে ভাবার কোনো অভ্যেসই টুলটুলির নেই। বা টুলটুলিকে যখন এরকম কচু খোঁজার মতো কাজে ঘুরে বেড়াতে হয় না, যখন তাকে চালভোখা, ধানভোখা, চিড়াভোখা এইসব গেরস্থালির কাজকর্ম করতে হয়, তখনো একটা কাজ থেকে আর-একটা কাজে চলে যাওয়াটা এমন পূর্বনির্ধারিত আর সারাটা দিন আর রাত কাজে কাজে এমন ভাগ ভাগ করা যে একটা কাজ না সেরে যেমন আর একটা কাজে হাত দেয়া যায় না, তেমনি একটা কাজ থেকে আর একটা কাজ অনিবার্য এসে যায়। ভেবে ভেবে টুনটুলিকে কাজ থেকে কাজে যেতে হয় না বা একটা কাজে হাত দিয়েও টুলটুলিকে ভাবতে হয় না। টুলটুলির যা কাজ তা নিয়ে ভাবনা নেই, পায়ের কতোটা ঝোঁকে ঢেঁকি ওঠে পড়ে বা কুলোয় কটা টোকায় তুষ ঝরে পড়ে তা নিয়ে আর টুনটুলি ভাববে কি। সে সব তো টুনটুলির হাত পায়ের আঙুলের জানা। এখন যে টুলটুলিকে নিচের সেই জায়গাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়, সেটা ভাবনার জন্য নয়, টুনটুলিকে ওখানে নামতেই হবে, ওছাড়া উপায় সেই—যদি কচুটা পাওয়ার

চেষ্টা করতে হয় আর কচুটা পাওয়া ছাড়া কোনো উপায় টুলটুলির হাতে বা ভাঁড়ারে নেই, আজও নেই, আগামী পাঁচ-সাত-দশদিন থাকবেও না, যতোদিন ধানকাটা না হয়। কিন্তু তবু যে টুলটুলিকে ওরকম একটা অদ্ভুত জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়, তার কারণ, তার দাঁড়ানর জায়গা থেকে নিচের সেই একটু উঁচু মতন জায়গাটাতে পৌঁছবার জন্য দরকারি শারীরিক উদ্যম সে পাচ্ছিল না। পেটে মদ পড়লে মাতালের যেমন সময়চেতনা ও চিন্তার সংগতি নষ্ট হতে থাকে, তেমনি গত তিন দিনের পুরো-পেট ক্ষিধে আর তারও আগের কমাসের ধারাবাহিক ক্ষিধে আর আগামী কয়েকদিনের নিশ্চিত ক্ষিধে টুলটুলির রক্তে সঞ্চারিত হচ্ছে, এখন, এই খাড়া পাড় বেয়ে পথ বানিয়ে বানিয়ে নদীর পুরনো এই পাড়ের গা খুঁজে খুঁজে নামতে নামতে। টুলটুলির শরীরের ভেতর রক্তের প্রবহমানতা কমে আসছে। টুলটুলির শরীরের এক একটা ভঙ্গী বা একটা ভঙ্গী থেকে আরেকটা ভঙ্গীতে পরিবর্তন এখন অপেক্ষাকৃত বেশি সময় নিচ্ছে। দুই হাত দুই দিকে ঝুলিয়ে, দুই গর্তে দুই পা লাগিয়ে, মাটি থেকে তিন চার মানুষ সমান উঁচুতে পাড়ের একটা খাঁজে আটকে থেকে টুলটুলি নিচে সেই উঁচুমতন জায়গাটার দিকে চোখ রেখে এমন অনড়, যেন টুলটুলি ঐ মাটির দেয়ালে দৃশ্য হিসেবে সাঁটা বা মাটির ভেতর খোদা বা মাটির ওপর উৎকীর্ণ,—যেন তাকে নিয়ে মাটি ভেঙে পড়লেই সে নিচে পড়তে পারবে, নচেৎ নয়।

কিন্তু টুলটুলির শরীরের ভেতরে রক্তের গতি কমে আসায় তার পেশী ও স্নায়ুতন্ত্রের গতিও কমে আসছিল। তাই নিচের ঐ জায়গাটা দেখে নিয়ে, সেখানে পৌঁছবার জন্য শারীরিক উদ্যম জোগাড় করতে তার খানিকটা সময় যায়। তারপর সেই মূর্তিটা নড়ে। ডান হাত দিয়ে খুব শক্ত করে খাঁজটা ধরে আর বাঁ হাত দিয়ে পাড়ের গায়ে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে নিচু হয়ে, একটা পা নামিয়ে দিয়ে গোড়ালি ঠুকে ঠুকে মাটির গায়ে গর্ত করে করে পাড় বেয়ে নেমে আসার সেই পদ্ধতিতে টুলটুলি নামে বটে কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে টুলটুলির মস্তিষ্কের যোগাযোগটা দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল বলে, পাড়ের দিকে পেছন ফিরে ঘষে ঘষে নামতে নামতেও টুলটুলির মনে হচ্ছিল তার নামার জন্য যেন ঠিক ঠিক মাপের গর্ত ঠিক ঠিক দূরত্বে খোঁড়াই আছে, তাকে কিছু করতে হচ্ছে না, শুধু নেমে যেতে হচ্ছে; তবে সে কেন ঘুরে গিয়ে পাড়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খাঁজটা ধরে ধরে নেমে যাচ্ছে না, যেমন করে মই থেকে নামতে হয়? প্রশ্নটা ক্রমেই টুলটুলির ভেতরে এমন প্রবল হয়ে ওঠে যে সে যেন যে কোনো মুহূর্তে ঘুরে যেতে পারতো। সেই চওড়া জায়গাটায় পৌঁছে টুলটুলি একবার নিচের দিকে তাকায়, দেড় দু মানুষ উঁচু। টুলটুলি পাড়ের চওড়া অংশটাতে একটা পা রাখে, ডান হাতটা দিয়ে পাড় ধরে। একটা পায়ের পাতার মাথাটুকু আঁটে না এতোটুকু মাত্র চওড়া জায়গাটিতে টুলটুলি এমন ভাবে পা রাখে যেন বোন্দা শিকড়টার কাছে পৌঁছনর জন্য কোনো সাবধানতা দরকার নয়। ধীরে ধীরে টুলটুলির শরীরের ভেতর রক্তপ্রবাহ, পেশীপুঞ্জ, স্নায়ুতন্ত্রীর শিথিলতা ভয় পাওয়া না-পাওয়া, সাবধান হওয়া না-হওয়া ইত্যাদি মানসিক ব্যাপারগুলিকে অকেজো করে দিচ্ছিল, যাতে তার নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া না নেয়া আর প্রয়োজনীয় থাকছিল না।

ঢালুটার ওপর পা দেয় বটে টুলটুলি, হাতটাও মাটির পাড়ের গায়ে রাখে, কিন্তু পর মুহূর্তেই তাকে বসে পড়তে হয়—জায়গাটার আয়তন এতোই কম চওড়া যে দাঁড়িয়ে টুলটুলি নিজেকে

সামলাতে পারবে না। টুলটুলিকে খুব বেকায়দায় বসে পড়তে হয়। ডান পা আর ডান হাত সেই ঢালু মতো জায়গাটায়, বাঁ পা আর বাঁ হাত সমকোণে সেই খাড়া খাঁজে। টুলটুলি ধীরে ধীরে প্রথমে বাঁ পা-টা সরিয়ে আনে, তারপর হাতটা।

এখন টুলটুলি সেই ঢালের মাথায় উবু হয়ে বসে, দুই পা দুই দিকে ছড়িয়ে, যাতে কোমর ও পেট ঢালের বিস্তারের ভেতর থাকে। যদি কোমর আর পাছা ঢালের বাইরের শূন্যতায় বেশির ভাগটা চলে যায় তাহলে টুলটুলি নিশ্চিতই পড়ে যাবে। উবু হয়ে বসলে সাধারণত হাতের ভেতরে হাঁটু দুটো থাকে। কিন্তু কোমরটাকে এগিয়ে আনার জন্য হাঁটু দুটো ছড়িয়ে দিতে হয়েছে আর সেই হাঁটুর ভেতর থেকে হাত দুটো মাথার ওপর উপর উঠে মাটির দেয়ালের গায়ে পাঁচ পাঁচ দশ আঙুল ছড়িয়ে। টুলটুলির বাঁ গালটা পর্যন্ত মাটির দেয়ালের সঙ্গে লাগানো। মাথার ওপরের সেই হাত আর ঢালের ওপর রাখা পা, এক এক সময় এক একটার ওপর থেকে ভার সরিয়ে, অন্য কোথাও নিয়ে, আবার সেখান থেকে ভারটা অন্য জায়গায় সরিয়ে, টুলটুলি একটু একটু করে এগোয়। কখনো তার ডান হাতে আঙুলগুলো সাঁড়াশির মতন বেঁকে যায়, তখন বাঁ হাত আর ডান পা-টা একটু শিথিল হয়ে সরে যায়। পরমুহূর্তে আবার বাঁ হাত আর ডান পা মাটি আঁকড়ে ধরে, তখন ডান হাত আর বাঁ পা একটু সরে যায়। এইভাবে মাটির সঙ্গে নিজেকে হেঁচরে হেঁচরে সেই বোন্দা শিকড়ের নিচুতে টুলটুলি নিজেকে থামাতে পারে। মাথার ওপর খাড়া দুই হাতের তেলোতে পাড়ের গা-টা খুব চেপে কোমরটা টুলটুলি খুব ধীরে ধীরে তুলতে চেষ্টা করে। ডান কবজির ওপর থেকে ঝুর ঝুর করে মাটি ঝরে পড়লেও টুলটুলি কোমরটা একটু তুলতে পারে। কোমরটা তোলার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু দুটো আরো ফাঁক করে দিয়ে কোমরটা আর পাছাটাকে ভেতরে রাখতে হচ্ছে। টুলটুলির তলপেটটা পাড়ের সঙ্গে লাগানো বা প্রায় লাগানো থাকে, দুই মাইয়ের বাধা সত্ত্বেও। সোজা খাড়া দাঁড়ায় টুলটুলি, দুই হাটু ফাঁক—যার বেশি ফাঁক আর সম্ভব নয়, মাথার ওপর খাড়া দুই হাত ফাঁক করা—যার বেশি ফাঁক আর সম্ভব নয়। এই অবস্থায় টুলটুলিকে আরো কিছুটা ওপরে উঠে বোন্দা শিকড়ের গোছাটা ধরতে হবে। টুলটুলি বাঁ পা-টা দিয়ে পাড় আঁচড়ায়, কোনোখানে যদি পায়ের আঙুলের ভর রাখার জায়গা পাওয়া যায়। তারপর হঠাৎ টুলটুলি তার সেই বাঁ পায়ের ওপর ভর দিয়ে শরীরটাকে একদিকে ওপরে তোলে আর বাঁ পায়ের তলা থেকে মাটি ঝরঝর খসে যায়, টুলটুলির সমস্ত শরীরটা ডানদিকে আছড়ে পড়ে আর সেই আছড়ে পড়ার সময় নিজের উৎক্ষিপ্ত হাত দুটো দিয়ে টুলটুলি বোন্দা শিকড়ের পাতার ঝাড়টাকে আঁকড়ে ধরে। পাতার ঝাড়ে পড়্‌পড়্‌ আওয়াজ ওঠে। ডান পাটাকে পাড়ের একটা জায়গায় আঁচড়ে আঁচড়ে আটকে বাঁ-পা-টাকে টুলটুলি জায়গায় নিয়ে আসার চেষ্টা করে। মনে হয় টুলটুলি এখন শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে বোন্দা শিকড়টাকে মাটির ভেতর থেকে তুলে এনে এই দেড়-দু মানুষ সমান উচ্চতা গড়িয়ে পড়ে যেতে চায়। কিন্তু বাঁ পায়ের আঙুলগুলো পাড়ে গাঁথতে পারলে বোন্দার শিকড়ের ওপর দুই হাতের টান একটু শিথিল হয় আর টুলটুলি টের পায় তার ফোতা-টা খুলে যাচ্ছে। খুলে বাঁ বুক থেকে খসে গিয়ে কোমর পর্যন্ত ঝুলে পড়ে, এমনভাবে যাতে ফোতাটা পেটের কাছে পাঁজা হয়ে যায়, ফলে সমস্ত শরীর দিয়ে টুলটুলি মাটিটা আঁকড়াতে পারে না। আবার দুই হাতে ভর দিয়ে টুলটুলি পেটটা উঁচু করে, যাতে ফোতাটা

পড়ে যায়। তখন বাতাস ছিল না। মাটির দেয়ালের গা বেয়ে গড়িয়ে মাটির দেয়ালের লম্বালম্বি ফোতাটা এমন এলোমেলো ছড়িয়ে লেগে থাকে যেন, এইমাত্র বসন ত্যাগ করে টুলটুলি বোন্দার ঝাড়ে ঝুলে মাটির দেয়ালের গায়ে খোদিত মূর্তি হয়ে আছে। দলিতস্তন, বাহুসন্ধির অবকাশে পিষ্ট স্তনতা, উরুর বিস্ফারে নিতম্বের সংক্ষিপ্ততা, বাহুর উৎক্ষেপে কাঁধের লুপ্ত বর্তুলতা, আর সমকোণে দক্ষিণাস্যমুখে মাটির দেয়ালে প্রকীর্ণ সেই মূর্তি সারা শরীরের আক্ষেপে রেখায় রেখায় চলৎমূর্তি রচে রচে অবশেষে উৎপাটিত বোন্দা শিকড় নিয়ে ধ্বংসস্তূপের ধারাবাহিক বেগে দেড়মানুষ দুমানুষ নিচে তালমানদীর পারে খান খান ভেঙে ভেঙে পড়তে থাকে।

টুলটুলির সারা শরীরে একটা প্রবল ঝাঁকি লাগে বটে কিন্তু মাটিটা নরম ঝুরঝুরে থাকায় কোনো একটা জায়গায় ব্যথা লাগে না। পড়ে গিয়েছে টুলটুলি, কোথাও ব্যথা লাগলো কি লাগলো না সেটাও বুঝে ওঠার আগে দাঁড়িয়ে উঠে, হাত বাড়িয়ে, পাড়ের গা থেকে কাপড়টা টেনে নিয়ে, তাড়াতাড়ি গায়ে ফোতাটা বেঁধে নেয়। ফোতার গিঁটটা দিতে দিতেই নিচু হয়ে টুলটুলি প্রথমে ফেলা সেই মূলটা তোলে, তারপর বোন্দা শিকড়টা—ঝুড়িটা উপুড় হয়ে ছিল, সেটাকে সোজা করে টুলটুলি কেশর আর কচুটা তার ভেতর রাখে। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াতেই সামনে নদীর পাড় টুলটুলির চোখের সামনে দুলে ওঠে; তারপরই টুলটুলি আকাশ দেখতে পায় আর চোখের সামনে সব কিছু ঘুরতে থাকলে টুলটুলি সঙ্গে সঙ্গে মাটির ওপর উবু হয়ে বসে পড়ে। দুহাতে মাথা ধরেও টুলটুলি চারপাশের ঘূর্ণি বন্ধ করতে না পেরে পাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে চোখদুটো বুঁজে ফেলে। চোখ বন্ধ করার পরও টুলটুলির মনে হয় সে যেন চোখ বন্ধ করেনি, তার চোখের পাতাটা যেন পেঁয়াজের খোলার মতন পাতলা, তার ওপর হলদেটে রোদ। টুলটুলির চোখের পাতাটা একটু ফাঁক হয়, সামনে নদীর জল, ওপারে ধানক্ষেত, সব কিছু যেন কার্তিকের হিমের পর্দার আড়ালে। টুলটুলি আবার চোখ বন্ধ করে আর বন্ধ চোখের ওপরও যেন কার্তিকের হিমের পর্দা কাঁপে। টুলটুলিকে একটা খুব জোরে নিশ্বাস টানতে হয়, এতো জোরে যে তার ভেতরে ঢোকা পেটটা আরো ভেতরে ঢুকে যায়, যেন নিশ্বাস নেয়া তার শেষই হতো না যদি নিশ্বাস নেয়ার দম তার ফুরিয়ে না যেত, যদি আরো ভেতরে ঢোকার মতো জায়গা তার পেটের থাকতো।—সাতদিন বাদে কুনু কুনু ক্যাতত্ ধান পাকিবার পারে, খ্যাতখ্যাতুর জমিত্ না-ও পারে পাকিবার, একটা কুনো ক্যাতত্ ধান কাটিবার ধরিলেই যেন ভোগটা কনেক কমিবার পারে। দশদিনের বাদে ধান ভোথাবার পারি। অঘনে পৌটি, পুষে চেউটি, মাঘে নারা, ফাগুনে কাড়া। অঘনে ধান কাটিবার ধরিলে ষোল আনা ধান, পুষমাসত বারআনি, মাঘত চার আনি ধান আর বারআনি পোয়াল, ফাগুনত পুরাটাই পোয়াল। এ্যালায় সারা ক্যাতত্ একটা মানষি নাই, মুই এইঠে একা একা মরি যাছু, নদীপাড়ত মরি যাছু, মোর এই কচুবোন্দাখান আর ঘরত পৌছিবে না। আর মোটে সাতদিন আর দশদিনের বাদে সারা ক্যাতত শুধু মানষির মাথা, মানষির মাথা, মানষির ভিড়। মাথাটা ডানদিকে হেলে পড়ায় মাটির দেয়ালে হেলান দেয়া টুলটুলির শরীরটাই ডানদিকে হেলা, ডান হাতটা তেলো উল্টিয়ে সামনে মেলে ধরা, যেন বহু ওপরের আকাশ থেকে হাতটার ওপর আশীর্বাদ বৃষ্টি হবে। নীলাকাশ ছাড়াও আরো একটা আকাশ টুলটুলির ওপরে—পাকা ধানক্ষেতের সোনালি আকাশ।

কখনো বা টুলটুলির চোখ খোলা, কখনো বন্ধ, কিন্তু সব সময়ই তার চোখের সামনে কার্তিকের হিমের জালি পর্দা কাঁপে,—যেন ভোর হবার ধইচ্ছে, আতির আন্ধার সরি সরি যাছে, এ্যালায় চারহো পাথ টলটলাসে, পুবত নাল টকটকি বেলাখান আসি খাড়াইছে,—যেন পুনিমার চান্দ এ্যামং গোল, আর আকাশত যতলা মেঘ উমরার পাথত নাল ছটা নাগিছে, উত্তর পাথত যেইলা পাহাড়, পাহাড়ের মাথত বরফের ঢিপ, বরফের ঢিপত নাল অং গলিগলি যাছে, গলি গিয়া সোনার নাথান হলদিয়া হবে। পশ্চিমপাথে তালমা নদী বহি যাচ্ছে, এইটার জল পরথম্ আলোতে টুলটুলাছে, কনেক জায়গায় হলদিয়া ছিটা, মাছ খিলখিলাছে—টুলটুলির চোখের সামনে সত্যি তালমা নদী, সত্যি জল, সত্যি টুলটুলায়। তার চোখের পাঁপড়িগুলো বোধহয় জড়ানো, তাই সেই সত্য নদী আর সত্য জলের ওপরও কার্তিকের হিমের পর্দা কাঁপে। সেই পর্দায় কার্তিকের অঘ্যানের একটা পুরাপেটি সকালের রঙের খেলা। এই তালমা নদী যখন সত্য ; সেই রঙের খেলাও তখন সত্য। আর সেই রঙের খেলা যদি সত্য, তাহলে টুলটুলির পেটটা যে পুরা, ভরা,—প্যাটত যে কুনহ ভোখ নাই, এক ফোঁটাও ভোখ নাই এটাও সত্য, —প্যাট পুরা না থাকিলে কি কারও অঙের খেলা দেখিবার পারে? টুলটুলি কার্তিকের অঘ্যানের রংময়, সুতরাং পেটভরা সকালে চলে যায়, যখন, ধানক্ষেতত্ আলো আসে আর মানষি আসে, হামাক্ এ্যাসং নদীর চরে একা একা মরিবার লাগিবে না। বেলা ঠাকুর উঠিবার আগত উঠি গোঁবরিয়া ঘোল আর নেথানি নিয়া তামান্ এগিনা (আঙিনা), চুলা, গোহালিয়া, ছানচাবাড়ি মুছি ফেলিবার নাগিবে। তামান্ বাড়িটা শুদ্ধ করিবার নাগিবে। সারাদিন ধরি ধান সিদ্ধ হবে, শুখা হবে, ভোখা হবে। ঘর অশুদ্ধ থাকিলে ধান জাই (নষ্ট) হয়া যাবে। চুয়াপাড়ত গিয়া ঢলঢল করি সব্ব অঙ্গে জল ঢালি স্নান করিবার নাগিবে, কুনো অঙ্গ অশুদ্ধ রাখিলে ধান জাই হয়া যাবে। তারপর আসি ভক্তি দিয়া চুলাত্ আগুন দিবার লাগিবে। মাটির বড় হাঁড়িত জল তুলি দিবার নাগিবে। জলের উপর আগত ভিজান ধান ছাড়ি দিবার নাগিবে। জলখান গরম হইবে, ধানখান গরম হইবে, এগিনাখান গরম হইবে, এগিনা শুখা হইবে, এগিনাত ধান ঢালি দিবার নাগিবে। তামান দিন অ্যানং করি ধানসিদ্ধ আর ধানশুখা, ধানসিদ্ধ আর ধানশুখা। খোয়ার তানে হালুয়ার ঘরের আসিবার টাইম হয়। হালুয়ার ঘর আসিলে—ছোয়াপোয়ার ঘর, হালুয়ার ঘর আর চ্যারকেটুথান পান্তা নিয়া, খোকরা নিয়া এগিনাত খোয়ায় বসিবে। খোয়া হওয়ার বাদে হালুয়ার ঘর আর চ্যারকেট চ্যাটাং চ্যাটাং করি তামাকুটানি ক্ষেতত্ ফিরি যায়। হালুয়ার ঘর চলি গেলে টুলটুলি খোয়ায় বসে, পান্তা থাকিলে পান্তা, খোকরা থাকিলে খোকরা। খোয়ার বাদে কনেক তামাকু টানে। তামাকু শেষ হইল্ কি না হইল্ ধানভোখা সুরু। আষাঢ়ুর বউ কি আসিদিরের বউ আসে আর সামগাইনে ধান ভাঙে। ধান ভোখছে তো ভোখছে, আর তুষ উড়ি উড়ি যাছে, বাতাসত ভাসি ভাসি যাছে, উড়ে, ভাসে, ফাগুন চৈতে অঙ (রং) খেলার তানে আমের বোল যেইনং বাতাসত উড়ি বেড়ায়, সেইনং তুষ উড়ি বেড়াছে, ঝুরঝুর করি ঘাড়ত, গলাত, মাথাত, পড়ছে আর সুরসুরাছে, আর হাঁসি পাছে, তুষের জালায় ভালো করি চাওয়া না যায়, চক্ষু ঢাকা দিবার লাগে আর ঢাকা চক্ষুতে সারা শরীর হিলহিল করি হাসিবার ধরে। সামগাইনে ধান ভোখাইতে ভোখাইতে ঘাম ধরে, ঘাম ছাড়ে, মুখ সপ্‌সপা, ঘাড় সপ্‌সপা, বুক সপ্‌সপা, আর তুষ আসি উড়ি উড়ি

যেইখানটায় খালি অঙ্গ পায় সেইখানটায় বসি যায় আর শরীর সুরসুরায় আর হাসি পায়। তুষের হাসি আর তুষের আগুনের শ্যাষ নাই। আর সামগাইনে ধান ভোগাইতে ভোগাইতে মাঝেমাঝে শুখাবার ধান পা দিয়া নাড়া দিবার নাগে। একবার বাঁ পা দিয়া টানো ডাইনে। আরেকবার ডাইনে পা দিয়া টানো বাঁয়ে। তারপর বাঁ পায়ের গোড়ালিতে মারি ডাইন পায়ের ধান ঝার। তারপর ডাইন পায়ের গোড়ালিতে মারি বাঁ পায়ের ধান ঝার। তারপর মাটিতে আসি দুই পায়ের ধান ঝার। আবার ধান পাছুবার নাগে। ভোখা ধান কুলাত করি মাথার উপর ধর আর ঝাঁকাও। সারা শরীর ঝাঁকে, কুলা-ও ঝাঁকে। তবে না চাল সাফা হবা ধরে। এক ধান কতো নাচ নাগাবার ধরে! তারপর ভাটিবেলায় ক্যাতত ছুটি যাবার নাগে। টুলটুলির তো আর গোরুর গাড়ি নাই রো, আঁটি আঁটি ধান মাথাত করি আনিবার নাগে। আঁটির পর আঁটি ধানে মাথাখান্ পর্বতের সমান্ করি ধানকাটা মাঠ দিয়া হেই ধানকাটা গোড়াগুলির উপর পা দিয়া, হেই তামান্ মাঠখান্ পাড়ি দিয়া, টুলটুলি ঘর চলিবার ধইচছে, ধানের আঁটির ভারত্ টুলটুলির শরীরখান্ ছকল্বকল্ করে। আর সেইলায় বেলাঠাকুর অস্ত যাছেন। পচ্চিম পাখের মেঘত আগুন ধরিছে কিবা এ্যানাং দাউ দাউ লাল। ধানের আঁটিত্ মুখচোখ ঢাকা, টুলটুলি বেলাঠাকুরক ভক্তি দিবার না পারে। কিন্তুক অস্ত যাছেন বেলাঠাকুর আর আগুনের মতো টক্‌টক্‌কা আগুনখানের নাগান অঙ্ (রং) আনি টুলটুলির মুখত, গলাত মাখি দিবার ধরসেন। টুলটুলির তানে বেলাঠাকুর অঙ খেলিবার ধরিসেন। সেই অঙ মুখত মাখি, আঁটি আঁটি ধান মাথায় নিয়া ধানের গোড়া মাড়াইয়া মাঠ মাঠ পার হবার ধরিলে টুলটুলির গলাত্ গান আসিবার ধরে,

আয়না কিনার বায়না দিলাম, জলপাইগুড়ি শহরে,
কাঁকই কিনা হইল না,

ধানের আঁটিত্ চাপা খাওয়া টুলটুলি আপন মনত্ হাসিবার ধরে, কায় আর দেখিবার যাছে হে,

ছোট্হ দাদা মোর বড় দাদাহ্,
অ, তর তানে নাগাল পাহু গে, মাঝ হাটতে,...
এক হালা মোক সন্তরা কিনি দে

আর দিন সাত দশের বাদে হালুয়ার ঘরনীর আর শ্বাস ফেলিবার সময় থাকিবে না, ক্যানং করি আতি (রাত্তি) পোহাইবে আর কানং করি আতি আসিবে তা টেরও পোয়া না যাবে। কিন্তুক অ্যালায়, মরণকালে পরমাত্মা য্যানং নতুন দেহখান ধরিবার তানে পুরান্ দেহখান্ ছাড়ি দিয়া যাছেন, ম্যানং এ্যালায় হেই তালমার পাড়ত তিনদিনের বাসি আর আটদশদিনের আসিবা ভোখত্ কাতর এই টুলটুলির দেহখান্ ছাড়ি দিয়া ঐলা ধানভোখা আর ধানশুখার নাচানি, ধান পাঁজির ঢং, গাইনখান্ মাথার উপর তুলিবার ঢক, ধান নাড়ি দিয়া পা খান্ ঝাড়া, ধানের গোছা মাথাত্ করি ঘরত ফিরি আসা—সেই সগ্ ঢং ঢক টুলটুলিক ছাড়ি চলি যাছে। কিন্তুক অ্যালায় নিচ্চয় করি কহা যায়, টুলটুলি বাঁচুক আর মরুক আর সাতদিনের দশদিনের বাদে তামান্ জায়গায় এই কাজ কামের ঢং ঢক সুরু হবা পারিবে। আর টুলটুলি অ্যালায় তালমা নদীর পাড়ত মুচ্ছা যাছে। টুলটুলি চোখটা খোলে কি খোলে না, তার চোখের পাতার পাপড়ি বোধ হয় জড়ানো, তাই হিমেল পর্দার ভেতর দিয়ে

দেখে সামনে সত্যি নদী, সত্যি জল, সত্যি টুলটুলায়। এই নদীর জলে নেমে এখন তাকে মাছ ধরতে হবে। মাছ ধরে ধরে ভাটিতে আর এক কচুবনের দিকে চলে যেতে হবে। টুলটুলি এ সব দেখলেও ভাবলেও সে একটুও নড়তে পারে না, তার এটা খেয়ালও হয় না সে কতোক্ষণ এমন পড়ে আছে, বোধহয় তার চোখের পাতাও নড়ে না।

ছপ্ ছপ্ একটা শব্দ শোনা যায়, খুব মৃদু।—কুকুর হবা পারে, নদী পার হছে। সেই ছপ্ ছপ্ শব্দের পিছে পিছে একটা খুব পাতলা বুড়ি ভাটি থেকে বাঁকা ঘুরে জলের ভেতর এসে দাঁড়ায়। মাছ খুঁজছে। বুড়ির শরীরের চামরা পেঁয়াজের খোসার মতো ফুরফুরায়, যেন হাওয়ায় উড়ে যাবে—সেই পোড়া কালো চামড়াটা হাড়গুলোর ওপর এতোই আলগা। একটা পাতলা ত্যানায় বুড়ির কোমরটুকু ঘেরা। সেই ত্যানারই অন্য অংশ, যেটা বুকে থাকার কথা, বুড়ি জলের ভেতর ধরছে। তালমা নদীর জলের স্রোতহীনতাও ঐটুকু ছেঁড়া ত্যানার ভেতর বেগ পায়। দুই হাতে মেলে ত্যান্যটাকে জল থেকে তুললে ঝরঝর জল নদীতে পড়ে যায়। জলহীন শূন্য ত্যান্যার শূন্যতা বুঝতে আরো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বুড়ি আবার ছপ্ ছপ্ এগোয়, আবার পিঠটা নোয়ায়, আবার পিঠটা সোজা করে—জলে ঝরঝর শব্দ হয়, আবার ত্যান্যাভেজা শূন্যতার দিকে চেয়ে থাকে। আবার ছপ্ ছপ্। বুড়ি টুলটুলির সামনের জায়গাটা পর্যন্ত আসে। সেখানে জলে আঁজলা পেতে ডাইনে একবার তাকিয়ে ঘাড়টা ত্যানার ওপর ফিরিয়ে নেয়। ত্যানাটা জল থেকে তোলার পর, সব জল ঝরে যাওয়ার পর, ত্যানার ওপর বুড়ির তাকিয়ে থাকা শেষ হওয়ার পর, আবার ছপ্ ছপ্ কয়েক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার পর, আবার জলে ত্যানা বিছানোর আগে পিঠ নোয়াতে নোয়াতে ডানদিকে তাকালে বোঝা যায়, বুড়ি টুলটুলিকে দেখছে। ত্যানাটা জল থেকে তোলার পর, ত্যানার সব জল ঝর্ ঝর্ ঝরে যাওয়ার পর, ত্যানার ওপর বুড়ির তাকিয়ে থাকা শেষ হওয়ার পর ডাইনে বেঁকে বুড়ি টুলটুলির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। টুলটুলির চোখ খোলা। দেখে, হিমের পর্দাটাসহ নদীর ভেতর থেকে সেই—সিনজাকাঠির নাখান (পাঠকাঠির মতন) পাতলা, কালা বুড়িটা উঠি আসিছে। জলের পর খানিকটা কাদা, তারপর ঘেষো জমি। ছপ ছপ শব্দটা বদলে খস্‌খস্ শব্দ ওঠে। বুড়িটা এসে টুলটুলির সামনে সোজা দাঁড়ায়, শুধু ঘাড়টা হুইয়ে টুলটুলিকে দেখে।—বুড়িটা চক্ষু দুইটা জলজল করি তাকাছে। টুলটুলির চোখের সামনে থেকে হিমের পর্দাটা কিছুতেই সরছিল না। টুলটুলির চোখ খোলা অথচ পাতা পড়ে না।—বুড়িটা কনেক খাড়া থাকি একবার ঝুড়িটাক আর-একবার টুলটুলিক নজর করিবার ধরিছে। টুলটুলি সোজা হয়ে বসে পড়তে চায়, কিন্তু তার মনে সন্দেহ হয়, সে তো বসে-ই আছে, তাহলে কি করে আরো বসাব। টুলটুলি ডান হাতটা নাড়িয়ে ঝুড়ির ওপর ফেলতে চায়। কিন্তু যতোটা চাইলে ডানহাতটা উঠবে ততোটা যেন চাইতে পারে না।—হেই ভাতারখাগী ভাবিবার ধইচছে মোর মরণ হইছে। বুড়ি, তুই যদি মোর এই ঝুড়ির দুইটা শিকড়ত হাত দিস, বুড়ি তক মুই খুন করি ফেলাম। এ্যালায় যদি না পারি, এ্যালায়ই যদি আমার মরণ হয়, পেত্নী হইয়া তর ঘাড় মটকাম, ওর মাথা দিয়্যা ছ্যাকাপোড়া খাম। বুড়ি, খবরদার! বুড়িটা যেই নিচু হয়ে হাতটা ঝুড়িটার দিকে এগিয়েছে টুলটুলির ডান হাতটা স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিকতায় বেগে উঠে এসে নিষ্প্রাণ বস্তুর বেগে ঝুড়িটার ওপর পড়ে। বুড়ি সোজা হয়ে যায়। তারপর আবার খস্‌খস্ শব্দ তুলে ঘাস থেকে

জলে নেমে, একবারও টুলটুলির দিকে ফিরে না তাকিয়ে উজানের দিকে সামনের বাঁকের আড়ালে চলে যায়।

চমকে টুলটুলি সোজা হয়। ঝুড়িটার দিকে তাকায়, তার ডানহাত ঝুড়িটার ওপর পড়ে। একটা কচু আর একটা কেশরে ছোট ঝুড়িটা ভরা ভরা লাগছে টুলটুলি ডাইনে বাঁয়ে চায়।—কায়ও নাই। মুই কি স্বপ্ন দেখিবার ধইছছু? মুই নিদ গেইছু? না কি মুই হাতাশ খাইছু? টুলটুলি ঝুড়িটাকে কোলের কাছে টেনে এনে নদীর সোঁতার এদিক ওদিক, ওপারে, তার লুপ্ত স্বপ্ন খোঁজে। বাঁকের আড়ালে ছপ ছপ শব্দ মৃদু থেকে মৃদুতর তুলে টুলটুলিকে সজন স্বপ্নভূমি থেকে নদীপাড়ে নির্জনতর রেখে বুড়ি বাঁক থেকে বাঁকে উজানে চলে গেছে।

ঝুড়িটা নিয়ে পাড় থেকে খসখস নেমে টুলটুলি জলে ছপছপ এগিয়ে যায়। দুই পা ফাঁক করে শিকড়দুটো শুদ্ধুই ঝুড়িটা জলে ডোবায়, তোলে। ঝুড়ি থেকে ঝরঝর জল ঝরে গেলে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। মাছ নেই। শিকড় দুটোর মাটি ধুয়ে গেছে শুধু। এইরকম শব্দ তুলে, নদীর জল ছেঁকে ছেঁকে টুলটুলিকে তালমানদীর ভাটিপথে বাঁক থেকে বাঁকে নির্জনতর চলে যেতে হয়।

বাংলার শিখরমন্দির : স্থাপত্যরূপের বহিরঙ্গ

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

প্রাচীন কাল হইতে বাংলায় যে সব রীতির মন্দির নির্মিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে শিখররীতি অন্যতম। উত্তর ভারতে শিখররীতির চর্চা শুরু হইয়াছিল গুপ্তযুগ হইতে। বাংলাদেশে ঠিক কোন সময় হইতে শিখরমন্দিরের চর্চা আরম্ভ হইয়াছিল সে কথা আজ নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। তবে নবম-দশকে আসিয়া দেখিতেছি শিখররীতির মন্দির বাংলায় সুপরিজ্ঞাত। ত্রয়োদশ শতক হইতে অন্ততঃ দুইশত বৎসর বাংলায় গাঙ্গেয় সমভূমিতে মন্দির চর্চা সম্ভবতঃ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পঞ্চদশ শতক হইতে দেখিতেছি গাঙ্গেয় বাংলায় আবার নূতন করিয়া মন্দিরচর্চা আরম্ভ হইয়াছে। মধ্যবর্তী দুইশত বৎসর দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার পশ্চিম অংশে অর্থাৎ বর্তমান বর্ধমান জেলার উত্তর-পূর্ব অংশ, বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম অংশ ও পুরুলিয়া জেলায় অব্যাহত ছিল। এই সময়ে নির্মিত শিখর-মন্দিরের অধিকাংশই অবশ্য পুরুলিয়া জেলায় অবস্থিত। এই জেলার তেলকূপি গ্রামের ২, ৭, ১১, ১২, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ নম্বর মন্দির, পারা গ্রামের লক্ষ্মী মন্দির, বান্দা গ্রামের একটি পরিত্যক্ত মন্দির এবং দেউলি ও বুধপুর গ্রামের পশ্চায়তন মন্দির-সংস্থানের মন্দিরগুলি ত্রয়োদশ-চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকীয় বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। পুরুলিয়ার বাহিরে বর্ধমান জেলার বরাকর শহরের বেগুনিয়াতে অবস্থিত মন্দিরগুলির কার্তিক, গণেশ ও মহাদেব মন্দিরথল, বাঁকুড়া জেলার দেউলভিড়্যা গ্রামের একটি পরিত্যক্ত মন্দির এবং ধানবাদ জেলার পাঁরা গ্রামের দুইটি মন্দির পুরুলিয়ার উপরিকথিত মন্দিরগুলির সমকালীন বলিয়া মনে হয়।

ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ শতক এই তিনশত বৎসরের মধ্যে মন্দিরগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো অসম্ভব নয়। তবে, বর্তমান প্রবন্ধের জন্য ইহার প্রয়োজন নাই বলিয়া তিনশত বৎসর ধরিয়া স্থাপিত মন্দিরগুলিকে একসঙ্গেই ধরিতেছি। দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতকে বাংলায় শিখরমন্দিরচর্চার যে সমুন্নত ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার একটা আভাস হইতে এই মন্দিরগুলির সৃষ্টি। দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতকে সুন্দরবন, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় অতিশয় পরিমার্জিত বহীঃরেখার মধ্যে বিধৃত লঘুভার সুঠাম ও সুউচ্চ শিখরমন্দির সর্বাঙ্গে অজস্র অলঙ্কারের সজ্জা লইয়া পরিণতি লাভ করিয়াছিল। যে গভীর সৌন্দর্যবোধ ও পরিমাণজ্ঞান এবং উচ্চ শিখরের বহীঃরেখার উপর যে নিয়ন্ত্রণ এই মন্দির-গুলিতে দৃষ্টিগোচর, তাহার ক্রমাবনতির ধারা তেলকূপি বান্দা—পারা—বরাকর—পাঁরা—দেউলভিড়্যা—আটবাই চণ্ডী মন্দিরগুলির আকৃতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে ধরা পড়িবে। দেউলভিড়্যা ও আটবাইচণ্ডীছাড়া অন্য সব মন্দিরগুলিতেই লঘুভার, উচ্চ শিখর নির্মিত হইয়াছে বটে, কিন্তু স্থাপত্যের রূপকল্পনায় বা অলঙ্করণের বিন্যাস ও সজ্জায় সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পজ্ঞানের পরিচয় আর নাই। শুধু পূর্বতন স্থাপত্যরূপের একটা দূরাগত আভাসমাত্র ধরা পড়ে। এই মন্দিরগুলিকে পশ্চিমজটা প্রভৃতি স্থানের মন্দিরগুলি অপেক্ষা পরবর্তীকালে গঠিত বলিবার অন্যতম প্রধান কারণ ইহাই।

পূর্ববর্তী মন্দিরগুলির সঙ্গে পরবর্তী মন্দিরগুলির তুলনাটা একটু বিস্তারিতভাবে করা প্রয়োজন।

আসন হইতে আরম্ভ করা যাক। পূর্ববর্তী মন্দিরগুলির মত পরবর্তী মন্দিরগুলির আসন অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূলতঃ ত্রিরথ। আসনের আকার অনুসারে সমচতুষ্কোণ মন্দিরদেহের প্রত্যেকটি পাশ তিনটি প্রলম্ব ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেকটি রথ-পথ আবার কতকগুলি ক্রমোন্নত অংশে বিভক্ত। পূর্ববর্তী মন্দিরগুলিতে রথ-পগর ক্রমোচ্চ অংশগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে দুইভাবে। এই অংশগুলি যেমন স্থাপত্য-রূপের সাংগঠনিক প্রশ্নে অপরিহার্য অন্যদিকে তেমনি প্রত্যেকটি অংশই আবার সামগ্রিক অলঙ্করণ পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। রথ ও তাহার অংশগুলির কোন মসৃণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ধার-গুলি হইয়াছে বর্তুলাকৃতি। এইরূপ মার্জনার ফলে নিম্নতর পর্যায় হইতে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নয়ন ঘটিয়াছে অত্যন্ত সাবলীলভাবে এবং সামগ্রিক অলঙ্করণবিন্যাসের যুক্তি ধরিয়া। পরবর্তী মন্দিরে রথের ভাগগুলি সবই আছে, কিন্তু তাহাদের শিল্পগত অর্থ ও সৌকর্য দুইই অবলুপ্ত।

একই পরিণতি ঘটিয়াছে মন্দিরের পাভাগে, দেওয়ালের শীর্ষদেশে ও গণ্ডি অর্থাৎ ঊর্ধ্বাংশ বা আচ্ছাদনের উপর সাজানো মোলডিংগুলির ক্ষেত্রে। এই আনুভূমিক মোলডিংগুলির উদ্ভব ও প্রয়োগ স্থাপত্যগত প্রয়োজনে। পূর্ববর্তী মন্দিরগুলিতে রথ-পগর মত আনুভূমিক মোলডিংগুলি সামগ্রিক অলঙ্করণ পরিকল্পনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, পরবর্তী মন্দিরগুলিতে যথাস্থানেই আছে, তবে আলঙ্কারিক প্রয়োজনীয়তা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অলঙ্কারের সে প্রাচুর্যও আর নাই। মন্দিরের দেওয়াল তো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রায় নিরাভরণ। গণ্ডির উপরেও অলঙ্কারসজ্জা সামান্যই। প্রায় আভরণহীন মন্দিরদেহে বৈচিত্র্য সম্পাদনের প্রধান উপকরণ আনুভূমিক মোলডিং। পাদমূল হইতে গভীর শীর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত মোলডিংগুলি যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি স্পষ্ট। মন্দিরদেহের প্রলম্ব ভাগগুলি মোল্ডিংয়ের প্রভাবে অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ মন্দিরদেহের সামগ্রিক রূপের উপর মোল্ডিংগুলির প্রভাবই সর্বাধিক। উচ্চ শিখরের প্রলম্ব আকারও এই প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারিতেছে না।

পরবর্তী মন্দিরগুলিতে মোল্ডিংয়ের আকারও পরিবর্তিত হইবার মুখে। পূর্ববর্তী মন্দিরগুলির মত পরবর্তী মন্দিরে বিভিন্ন আকার ও বিস্তারের মোল্ডিং দৃষ্টিগোচর, তবে সরলীকৃত আকারের প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহ সহজেই লক্ষ্য করা যায়। মোল্ডিংগুলি হইয়া উঠিতেছে দণ্ডাকৃতি সঙ্কীর্ণ।

তবে সমবেতভাবে মন্দিরদেহে মোল্ডিংয়ের বিস্তার কিন্তু বাড়িয়া গিয়াছে। তেলকুপি কয়েকটি মন্দিরে এবং বরাকর ও পাঁরার মন্দিরগুলি উপান বা অধিষ্ঠানযুক্ত। ইহার দেয়াল বেষ্টন কয়েকসার মোল্ডিং বসানো। তাহার উপর রহিয়াছে পা ভাগের কয়েকসার মোল্ডিং। আবার দেওয়ালের শীর্ষদেশ হইতে গণ্ডির শীর্ষ পর্যন্ত সারিবদ্ধ মোল্ডিং বসান। সমগ্র মন্দির-দেহটি যেন মোল্ডিংয়ে আচ্ছন্ন।

এয়োদশ শতক হইতে নির্মিত মন্দিরগুলির গণ্ডি দেখিলে মনে হয় বহীঃরেখার উপর শিল্পীর নিয়ন্ত্রণ শিথিল হইয়া আসিয়াছে। পূর্ববর্তী মন্দিরগুলিতে গণ্ডির দেওয়াল উঠিতে শুরু করে খাড়া ভাবে। খানিকটা উঠিবার পর দেওয়ালগুলি পরস্পরের দিকে ঝুঁকিতে দেখা যায়। গণ্ডির উর্ধগতির সঙ্গে ঝোঁকটাও বাড়িতে থাকে, তবে অত্যন্ত মৃদু ও ধীরভাবে। শীর্ষের একটু নীচে দেওয়ালের বাঁক কিছুটা দ্রুত। কিন্তু একটু পরেই গণ্ডি শেষ হইয়া যাইতেছে। ফলে বেগ বাড়িয়া যে ছন্দপতন ঘটিবে এমন অবকাশ নাই।

তেলকুপির মন্দিরগুলিতেও গণ্ডির দেওয়াল খানিকটা খাড়াভাবে উঠিবার পরে পরস্পরের দিকে সামান্য ঝুঁকিয়া যাইতেছে। কিন্তু শীর্ষের বেশ খানিকটা নীচে দেওয়ালগুলি আকস্মিকভাবে পরস্পরের দিকে এমন দ্রুত ঝুঁকিয়া গেছে, গণ্ডির উপরের অংশের সঙ্গে নীচের অংশের কোন সামঞ্জস্য নাই। একটু অন্যভাবে হইলেও পারার লক্ষ্মী মন্দিরে এবং বরাকর ও পাঁরার মন্দিরগুলিতেও একই রকমের অসঙ্গতি দৃষ্টিগোচর। এই মন্দিরগুলিতে বহীঃরেখার আকস্মিক দ্রুতগতির ফলে একদিকে যেমন ঘটিয়াছে আকস্মিক ছন্দপতন, অন্যদিকে তেমনি গণ্ডির শীর্ষদেশ তাহার পাদমূল অপেক্ষা অনেকটাই ছোট হইয়া গিয়াছে।

বান্দার মন্দিরেও গণ্ডির ছাদ পাদমূল অপেক্ষা ছোট। কিন্তু এই মন্দিরটিতে গণ্ডির দেওয়াল প্রথমাবধিই পরস্পরের দিকে ঝুঁকিয়া উঠিতেছে। পাদমূল হইতে শীর্ষদেশ পর্যন্ত চাহিয়া দেখিলে বোঝা যায় গণ্ডির উর্ধ্বগতির সঙ্গে ওই ঝোকটা নিজের প্রকৃতি অনুসারে ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু সে গতি যুক্তিসঙ্গত পরিণতি লাভ করিবার আগেই গণ্ডি শেষ হইয়া গিয়াছে। ছন্দপতন ঘটিল এইখানে। গণ্ডি শেষ হইবার পর তেলকুপি, বরাকর, পাঁরা, পারা ও বান্দায় সমস্যা দাঁড়াইয়াছে একই প্রকারের। গণ্ডির শীর্ষ যে পরিমাণ স্থান রহিয়াছে তাহাতে সমগ্র মন্দিরদেহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আমলক বসানো সম্ভব নয়। আমলকটি তো হইবে গণ্ডির শীর্ষের অনুপাতে। গণ্ডির শীর্ষ ছোট হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমলকটিও মন্দিরদেহের তুলনায় ছোট এবং সামঞ্জস্যহীন। বস্তুতঃ একবার ছন্দপতন ঘটিয়া গেলে আর সঙ্গতি ফিরাইয়া আনা সম্ভব হয় না। ক্রমে ক্রমে স্খলনটাকেই বাড়াইয়া তোলা ছাড়া আর উপায়ও থাকে না।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বাংলায় কতগুলি শিখরমন্দির নির্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরগুলি রাঢ়ের পশ্চিমপ্রান্ত হইতে পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। অধিকাংশেরই নির্মাণ-উপকরণ ইঁট। মাত্র দু'একটি মন্দির গঠিত হইয়াছিল পাথরে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কুমারডিহির (বর্ধমান জেলা, বরাকরের কাছেই বলা চলে) ও রসা গ্রামের (বীরভূম জেলা) কালী মন্দিরের প্রাঙ্গণে অবস্থিত একটি শিবমন্দিরের উল্লেখ করা যাইতে পারে, উপকরণের পরিবর্তনের ফলে তেলকুপি-বান্দা-পারা-বরাকর-পাঁরার মন্দিরগুলি সহিত এই সময়ের মধ্যে নির্মিত ইঁটের মন্দির-গুলির স্থাপত্য ও রূপগত পার্থক্য স্বাভাবিক কারণেই কিছুটা আছে। তবুও কিন্তু ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের মন্দিরগুলিকে ত্রয়োদশ-পঞ্চদশ শতকীয় শিখরগুলির বংশধর বলিয়া চিনিয়া নিতে অসুবিধা হয় না।

যোগসূত্রটা অনুধাবন করিবার জন্য একেবারে গোড়ায় আসন হইতে দেখা যাক। পূর্ববর্তীকালের পাথরের মন্দিরগুলিতে আসন মূলতঃ ত্রিরথ বা পঞ্চরথ। পাথরের মন্দিরগুলিতে প্রত্যেকটি রথ অনেকখানি ক্রমোচ্চ অংশে বিভক্ত। তাই রথের উদ্গমন যে ঠিক কতখানি অভিনিবেশ সহকারে না দেখিলে তাহা বোঝা যায় না। স্বল্পোচ্চ অংশগুলির ক্রমোন্নতিই বেশী করিয়া চোখে পড়ে। পরবর্তীকালের ইটের মন্দিরগুলিতে আসন প্রায়শই সপ্তরথ। তবে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই রথ পাথরের মন্দিরের আসনে সন্নিবিষ্ট রথের ছোট ছোট অংশগুলির মত স্বল্পোচ্চ। এই অগভীর রথ দেওয়াল বাহিয়া গণ্ডির শীর্ষ অবধি প্রসারিত। ইহারাই সমগ্র মন্দিরদেহকে বিভিন্ন প্রলম্বভাগে ভাগ করিয়া

দিতেছে আসনের পরিধি ও মন্দিরের উচ্চতার তুলনায় রথের অতি সামান্য উচ্চতা বিসদৃশই বলিতে হইবে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ইছাই ঘোষের দেউল (গৌরাঙ্গপুর, বর্ধমান জেলা) দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১১´. ৬´´×১১´. ৬´´।

ইঁটের মন্দিরগুলিতে পা ভাগে বৈচিত্র্য আনিবার চেষ্টা করা হইয়াছে বিভিন্ন ধরনের মোল্ডিং সাজাইয়া। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের মোল্ডিংগুলির প্রকৃত আকার ও বিস্তার সম্পর্কে শিল্পীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিছু ছিল না। মোল্ডিংগুলি যে সরলীকৃতরূপ পাথরের মন্দিরগুলিতে বিকাশ লাভ করিয়াছিল সেইটাই তাহাদের জানা ছিল মনে হয়। শিল্পীরা এই সরলীকৃত রূপটিকে অনুকরণ করিতে গিয়া তাহাকে আরও সরল করিয়া তুলিয়াছেন। পাভাগের উপরে দেওয়ালে মোল্ডিং ব্যবহার করিবার সময় প্রকারভেদ রাখা হয় নাই। দু' একটি ক্ষেত্র ছাড়া মোল্ডিং সর্বত্রই একই ধরনের। দেওয়ালের মোলডিংগুলিরই পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে গণ্ডির উপরে। বর্তুলাকার দণ্ডের মত এই মোলডিংগুলি নোলি নামে পরিচিত সুপ্রাচীন মোল্ডিংয়ের সরলীকৃতরূপ। বরাকর ও পাঁরার মন্দিরগুলিতে এই ধরনের মোল্ডিংয়ে গণ্ডি আচ্ছন্ন।

প্রায় সব মতিরেই দেওয়ালে মোল্ডিং ব্যবহার করা হইয়াছে। শিল্পশাস্ত্রের মতানুসারে দেওয়ালের অঙ্গভাগ করিবার জন্য মোল্ডিং বসানো হইয়াছে, এমন মনে করিবার কারণ নাই। শাস্ত্র অনুসারে আসনের ভাগ ও দেওয়ালের ভাগ সমান হইবার কথা। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকীয় কোন মন্দিরেই এই নিয়ম পালিত হয় নাই। দেওয়াল ভাগ করা হইয়াছে ইচ্ছামত কোন নিয়ম মানিয়া নয়। বরাকর-পাঁরার মন্দিরেও এ বিষয়ে শিল্পশাস্ত্রের নির্দেশ মানা হইয়াছে এমন প্রমাণ নাই।

বাহিরী-দেউলবাড় গ্রামের (মেদিনীপুর জেলা) জগন্নাথ মন্দিরে ইছাই ঘোষের দেউলে ও কবিলাসপুরের (বীরভূম জেলা) ধর্ম মন্দিরে গণ্ডিতে মোল্ডিং ব্যবহার করা হয় নাই। এই মন্দিরগুলিতে গণ্ডি শুধুমাত্র প্রলম্বভাগে বিভক্ত। অন্যসব মন্দিরে দেখিতেছি গণ্ডির রূপকল্পনায় মোল্ডিং অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত। মোল্ডিংয়ের ব্যবহার করা হইয়াছে দুইভাবে। কতকগুলি মন্দিরে যেমন কুমারডিহির (বর্ধমান জেলা) শিবমন্দিরে মোল্ডিং বসানো হইয়াছে খানিকটা দূরে দূরে। এইভাবে মোল্ডিং সাজানো দেখিতে পাওয়া যায় পারার লক্ষ্মী মন্দিরের গণ্ডিতে।

অধিকাংশ মন্দিরেই অবশ্য গণ্ডি ঘনসন্নিবিষ্ট মোলডিং দিয়া আচ্ছন্ন। উপর্যুপরিভাবে সাজানো মোলডিংগুলির মধ্যে ফাঁক অতি সামান্যই। একটি মোলডিংয়ের পর সামান্য একটু নিম্নায়ত ক্ষেত্র, তাহার পরেই আবার আর একটি উদ্গাত মোল্ডিং। সমগ্র গণ্ডিটি এই রকম সঙ্কীর্ণ উঁচু-নীচু আনুভূমিক ভাগে বিভক্ত। গণ্ডিতে বৈচিত্র্য আরোপ করা হইয়াছে এইভাবে। গণ্ডির ঠিক এই পরিকল্পনাই তো দেখিয়াছি বরাকর ও পাঁরার মন্দিরগুলিতে। পারার লক্ষ্মীমন্দিরের গণ্ডিও প্রথমে এই রকম সংকীর্ণ ঘনসন্নিবিষ্ট সঙ্কীর্ণ মোল্ডিং দিয়া আচ্ছন্ন। ইহার উপরে নিয়মিত দূরত্বের ব্যবধানে কয়েকটি স্ফীততর মোল্ডিং দিয়া ঐ গণ্ডিটি কয়েকটি প্রধানভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

গণ্ডির বহীরেখা রচনায় পাথরের মন্দিরগুলিতে যে শিথিলতা ও নিয়ন্ত্রণের অভাব লক্ষ করা যায়, এ কথা একটু আগেই বলিয়াছি। ইঁটের মন্দিরগুলি দেখিলে মনে হয় এই শিথিলতা হইতে একটা যুক্তিসঙ্গত রূপ খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রচেষ্টা চলিয়াছিল। ইছাই ঘোষের দেউলে অবশ্য গণ্ডির

আকৃতি পারা-বরাকর-পাঁরার মতই। গণ্ডি আরম্ভ হইয়াছে খাড়াভাবে। কিছুটা উঠিবার পর গণ্ডির দেওয়ালগুলি ভিতরের দিকে সামান্য ঝুঁকিয়া উঠিতেছে। বাঁকটা অকস্মাৎ বাড়িয়া গিয়াছে শীর্ষের কাছাকাছি আসিয়া।

অন্য মন্দিরগুলিতে কিন্তু গণ্ডি বাহির্বর্তুল দেওয়াল প্রথম হইতেই ভিতরের দিকে ঝুঁকিয়া গিয়াছে। গণ্ডি উঠিয়া যাইতেছে ওই ঝোঁকটাকে অবলম্বন করিয়া বান্দার মন্দিরে গণ্ডি গঠিত হইয়াছে এইভাবে। বান্দায় অবশ্য বক্র রেখায় বিবৃত্ত গণ্ডির নিজস্ব গতি স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই। চারিদিকের বাঁকানো দেওয়ালগুলি পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার আগেই গণ্ডি শেষ হইয়া গিয়াছে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকীয় মন্দিরে বাঁকানো দেওয়ালগুলিকে পরস্পরের সহিত মিলাইয়া দেওয়ার একটা প্রবণতা দেখা যায়। তবে গণ্ডির আকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ। শীতলপুরের (বর্ধমান জেলা) মন্দিরটিতে গণ্ডি দ্রুত বাঁকিয়া গিয়াছে, দেখিতে অনেকটা গম্বুজের মত। ফলে, শিখরটি হইয়া উঠিয়াছে খর্বকায়। অধিকাংশ মন্দিরে কিন্তু গণ্ডিকে উচ্চতর করিয়া তুলিবার প্রয়াস দেখা যায়। পিংকুই (বাঁকুড়া জেলা) গ্রামের শ্যামচাঁদ মন্দির ও আমাদপুর (বর্ধমান জেলা) গ্রামের গোপাল মন্দিরে গণ্ডি উঠিয়াছে সোজা ঢাল বাহিয়া, অনেকটা পিরামিডের মত। তীক্ষ্ণ কোণসম্পন্ন শিখরে সৌন্দর্য সৃষ্টির কোন অবকাশই নাই। এ ধরনের গণ্ডি অবশ্য সামান্যই। বর্তুলাকৃতি শিখরের প্রতি আকর্ষণটাই বেশী। কুমারডিহির (বর্ধমান জেলা) শিব মন্দির, কুলীনগ্রামের (বর্ধমান) গোপাল মন্দির, বৈদ্যপুরের (বর্ধমান) দেউল, বনপাশ-কামারপাড়ার (বর্ধমান) বুড়াশিব মন্দির বৈঁচীর (হুগলী জেলা) গোপাল মন্দির, মহানাদের (হুগলী) জটেশ্বরনাথ মন্দির, বাহিরী-দেউলবাড়ের (মেদিনীপুর জেলা) জগন্নাথ মন্দির, কবিলাসপুরের (বীরভূম জেলা) ধর্ম মন্দির, কোদলার (যশোহর জেলা, বাংলাদেশ) মঠ ও মথুরাপুরের (ফরিদপুর জেলা, বাংলাদেশ) দেউলে গণ্ডির দেওয়াল এমনভাবে বাঁকান হইয়াছে যে বক্ররেখার স্বাভাবিক পরিণতিতে গণ্ডির আকৃতি হইয়া উঠিবে পদ্মকলির মত। কিন্তু অধিকাংশ মন্দিরেই দেখিতেছি শিল্পী গণ্ডিকে বক্ররেখার স্বাভাবিক গতিপথ ধরিয়া স্বচ্ছন্দে তুলিয়া নিয়া যাইতে পারেন নাই। কুমারডিহি, বনপাশ-কামারপাড়া, বৈঁচী, বাহিরী-দেউলবাড়, কবিলাসপুর ও কোদলার মন্দিরে বক্ররেখায় বিধৃত গণ্ডি তাহার স্বাভাবিক গতিপথ হইতে কোন না কোন পর্যায়ে বিচ্যুত। কয়েকটি মন্দিরে দেখিতেছি গণ্ডি কিছুটা উঠিবার পর আকস্মিক ভাবে ভিতরের দিকে বেশী ঝুঁকিয়া গিয়াছে। আবার বাহিরী-দেউলবাড় মন্দিরে ঝোঁকটা প্রথমাবধিই দ্রুত। ভিতরের দিকে ঝোঁক এত বেশী গণ্ডিটিকে খর্বাকৃতি বলিয়াই মনে হয়। পদ্মকলির স্বভাবিক রূপটি এই মন্দিরে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। গতিপথ হইতে আকস্মিক ভাবে বিচ্যুত হইবার ফলে অন্য মন্দিরগুলিতে পদ্মকলির রূপ বিকৃত। শুধুমাত্র কুলীনগ্রাম, মহানাদ ও মথুরাপুরের মন্দির-গুলিতে দেখিতেছি গণ্ডি তাহার নিজস্ব গতিপথ হইতে বিচ্যুত না হইয়া সাবলীল স্বচ্ছন্দ গতিতে উপরের দিকে উঠিয়া যাইতেছে। মথুরাপুরের মন্দিরে অবশ্য গণ্ডি শেষ হইয়াছে পদ্মকলির সূক্ষ্মাগ্র সৃষ্টি হইবার অনেকটা আগেই। কুলীনগ্রামের গোপাল মন্দিরেও পদ্মকলিক সূক্ষ্মাগ্রে পৌঁছিবার আগেই গণ্ডি সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। তবে বান্দায় সমাপ্তিটা যে রকম আকস্মিক ভাবে ঘটিয়াছে, এখানে সেরকম নয়। পরিণতিতে পৌঁছিবার আগে শেষ করিয়া দেওয়ার একটি যুক্তি অবশ্য আছে।

প্রাচীনতর মন্দিরগুলিতে স্থাপত্য ও রূপগত উভয়বিধ প্রয়োজনেই গণ্ডির উপরে থাকিত একটি বৃহদাকৃতি আমলক্। গণ্ডির ছাদের উপর থাকিত বেকী, তাহার উপর নির্ভর করিয়া অমলকের অবস্থান। আমলক বসাইবার জন্য গণ্ডির একটা ছাদ প্রয়োজন, সম্ভবতঃ এই ধারনার বশবর্তী হইয়া বহীরেখা স্বাভাবিক পরিণতিতে পৌছিবার আগেই গণ্ডি শেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একদিকে নূতন রূপ আর অন্যদিকে পূর্বকালের সংস্কার—উভয়ের মধ্যে পড়িয়া শিল্পীর দ্বিধা এখনও ঘুচিতেছে না। মহানদের মন্দিরে কিন্তু এ দ্বিধার পরিচয় আর নাই। পদ্মকলির মত গণ্ডি শেষ হইয়াছে স্বাভাবিক সুক্ষ্মাগ্র লইয়া।

কুলীনগ্রামের মন্দিরে শীর্ষদেশের প্রশ্নে শিল্পীর মনে একটা দ্বিধার পরিচয় আছে বটে, কিন্তু বহীরেখা রচনার প্রশ্নে বিচ্যুতি কোথাও নাই। এই কারণেই মহানাদ মন্দিরের সঙ্গে কুলীনগ্রাম মন্দিরটিকে একসঙ্গে দেখিতে হয়। দুইটি মন্দিরেই গণ্ডি উঠিতেছে নিটোল পদ্মকলির রূপ নিয়া। বাঁকানো বহীরেখাটি উঠিয়া গেছে সহজ, স্বচ্ছন্দ, সাবলীল গতিতে টানা রেখা প্রবাহের মত। গণ্ডির এই বহিরেখা পটচিত্রে ব্যবহৃত রেখার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পটচিত্রে রেখা আঁকা হয় তুলির একটা দীর্ঘ টানে, এমনি সহজ, স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভঙ্গীতে। পটে বা এই মন্দিরগুলিতে সংযত ধৈর্য, স্থির বিবেচনা বা নিয়মিত নিষ্ঠার সঙ্গে শিল্পরূপের সাধনা হয় নাই। নিঃশঙ্ক চপলতার সহজ স্বাচ্ছন্দ্য উভয়েরই প্রাণস্বরূপ।

যে সব মন্দিরে বহিরঙ্গ রচনায় ছন্দপতন ঘটিয়াছে সে সমস্ত মন্দিরেও কিন্তু রূপ সৃষ্টি আদর্শ পদ্মকলি। সহজ, স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতিভঙ্গই শিল্পীর লক্ষ। ত্রুটি ঘটিয়াছে গণ্ডির পাদমূলে বহিরেখার প্রকৃতি অনুধাবন করিয়া তাহাকে যুক্তিসঙ্গত পরিণতিতে পৌছিয়া দিবার অক্ষমতার ফলে। ঐটি সত্ত্বেও কিন্তু টানা রেখার স্বচ্ছন্দ গতি ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা দৃষ্টি এড়ায় না। মোলডিংয়ে আচ্ছন্ন গণ্ডির সজীবতা ও সহজ সৌন্দর্যের কারণ ইহাই। সুপ্রাচীন শিখররীতির শিল্পবোধহীন ক্রমাবনতির ধারা হইতে জন্মলাভ করিয়াও বাংলার ষোড়শ-সপ্তদশ শতকীয় শিখরমন্দির ও তাহার অনুকরণে নির্মিত অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের শিখরগুলি এই কারণে নিষ্প্রাণ পুনরাবৃত্তিতে পর্যবসিত হইয়া উঠে নাই। ঐতিহ্যগত স্থাপত্যরূপকে সরলীকৃত করিয়া লৌকিক শিল্পধারার স্পর্শে তাহাকে সজীব স্বচ্ছন্দ করিয়া তুলিয়াছে। ত্রয়োদশ শতক হইতে প্রায় আড়াই শত বৎসর পর পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার গাঙ্গেয় সমভূমিতে নূতনভাবে মন্দির চর্চা আরম্ভ হইয়াছিল চালারূপকে অবলম্বন করিয়া। বাহুল্য-বর্জিত, স্বচ্ছন্দ সাবলীল রেখাপ্রবাহে বিধৃত চালা পঞ্চদশ শতক হইতে বাঙ্গালীর মনোহরণ করিয়াছিল। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের শিখর মন্দিরগুলির পরিকল্পনাও ওই একই শিল্পাদর্শের ভিত্তিতে। সুপ্রাচীন ঐতিহ্য হইতে সংগৃহীত শিখররূপ ও লোকব্যবহৃত চালারূপ একত্রে গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও পঞ্চদশ শতক হইতে বাঙ্গালীর স্থাপত্যরূপ চর্চায় শিল্পদৃষ্টির অখণ্ডতা এই কারণে কখনও ক্ষুণ্ন হয় নাই।

নির্ঘণ্ট

অধিষ্ঠান (উপাণ)—পত্তন ; যে চাতালের উপর মন্দির অধিষ্ঠিত।

আমলা—আমলকী ফল ; আমলকী ফুলের সঙ্গে সাদৃশ্যবিশিষ্ট মন্দিরের খাঁজকাটা অঙ্গ ; গণ্ডির ছাদের উপর বেকী-বাহিত (নীচে দ্রঃ)।

উপাণ—অধিষ্ঠান দ্রঃ।

গণ্ডি—ধড় ; শিখর ও ভদ্র মন্দিরে দেওয়ালের উপর আচ্ছাদন ; শিখর মন্দিরের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ বক্ররেখায় বিধৃত ও উচ্চাকার।

পগ—শাখা, অংশ ; মন্দিরগাত্রে সন্নিবিষ্ট ক্রমোচ্চ অংশসমূহ।

পাভাগ—পায়ের পাতা ; মন্দিরে দেওয়ালের মোলডিংযুক্ত নিম্নাংশ।

বেকি—কণ্ঠ ; গণ্ডির ছাদের উপর স্থাপিত বর্তুলাকার অঙ্গ ; আমলা ইহার উপর বসান হয়।

রথ—শাখা, অংশ ; মন্দিরের আসনে সমচতুষ্কোণ মূল ক্ষেত্রটির বিভিন্ন বাহুর অংশ ; বাহুর উপর একটি উদ্গত অংশ থাকিলে উহা তিনটি অংশে বা রথে বিভক্ত, এ ক্ষেত্রে আসন ত্রিরথ ; মধ্যবর্তী অংশের উপর আর একটি উদ্গত অংশ যুক্ত হইলে আসন পঞ্চরথ ; এইভাবে ক্রমশ সপ্তরথ, নবরথ ইত্যাদি প্রকারের আসন।

[উল্লিখিত শব্দগুলি প্রধানতঃ ওড়িশায় প্রাপ্ত ও ব্যবহৃত শিল্পশাস্ত্র হইতে সংগৃহীত শিখর মন্দিরের আলোচনায় ওড়িশার শিল্পশাস্ত্রে উল্লিখিত শব্দসমূহ সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়]

গ্রন্থ-নির্দেশ

বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়কুমার, বাঁকুড়ার পুরাকীর্তি কলিকাতা, ১৯৭২

বসু, নির্মলকুমার, 'Temples of Telkupi', R. D. Banerji, *History of Orissa, Vol. II*, Calcutta, 1931.

ঐ 'মানভূমের মন্দির', প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৪০।

বেগলার, জে, ডি, 'A Tour Through the Bengal Province,' *Report of the Archeological Survey of India*, 1872-73, Calcutta, 1878

মিত্র, দেওলা, *Telkupi, Memoirs of the Archeological Survey of India, No. 76* New Delhi, 1965

রাজনগর

অমিয়ভূষণ মজুমদার

রবিবারে বাগচীর কুঠিতে তখন ব্রেকফাস্ট শেষ হয়েছে। কিচেনের জানালাটা দিয়ে সকালের রোদ বেশ খানিকটা প্রচুর হয়ে আসে। সেই রোদে একটা চেয়ারে বসেছে বাগচী। তার পায়ে ভেলভেটের স্লিপার। হাতে পাইপ। কেট একটা টুলে বসেছে সেই রোদেই। পাশে সেলাইয়ের ঝুড়ি টেবলে। সে উলের কিছু বুনছে। এরকম পরিস্থিতিতে কথা না-বলেও পরস্পরের সঙ্গ উপভোগ করা যায়। বাগচী পাইপ ধরালো। সেই টার্কিশ ধূম উপভোগ করলো দু-এক মিনিট। কেট একটা গরম জামা বুনছে। একবার সেটাকে চোখের সামনে বিছিয়ে ডিজাইনটা নির্ভুল উঠছে কিনা দেখে নিলো।

কেট বললো,—জানো, সেদিন রাজকুমার এসেছিলেন। তোমরা ফরাসী বিপ্লব নিয়ে আলোচনা করছিলে সে কথা হলো।

—বলো এবার কি হয়েছে ফরাসী বিপ্লবের কথা।

—তেমন কিছু নয়। বিপ্লবের প্রথম শিকার রাজারানী ও সামন্তরা গিলোটিনে যেতে কাতরোক্তি করেন নি এটা তাঁর কাছে ভালো লেগেছে।

বাগচী পাইপের টানের সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে চেষ্টা করলো গভীরভাবে। পরে বললো,—বলো আর কি আলাপ হলো।

—এটা কিন্তু আগে লক্ষ করিনি। উনি যেন নিজেকে ঠাট্টা করলেন।

—আত্মসমালোচনা বলছো? কই আমি তো এমন কখনও শুনিনি। ওহ, হয়েছে। একটা মৃদু সিনিক ভঙ্গি, তাই না?

—না কি আয়রনি বলবে?

—আমার মনে হচ্ছে কখন কখনও তা থাকে যেন কথার সুরে। কিংবা পুরুষ স্বজাতির সামনে নিজের মনকে কখনই সবটুকু অনাবৃত করে না। প্রিয়ভাষিণী রমণীর সামনে তা ক'রে থাকে।

—খুব বলেছো। সত্যি আমরা তোমাদের বেশী বুঝি তোমরা পরস্পরকে যা বোঝ তার চাইতে।

বাগচী হেসে বললো,—যা বোঝ তা কি রিঅ্যালিটি না অ্যাপিয়ারেন্স?

—আবার দর্শন?

—দেখো, ডার্লিং, একজন হেডমাস্টার অথচ দর্শন জানে না এটাই বা কি কথা? তাছাড়া ইটন্ যেমন ডক্টর আর্নল্ডের এই স্কুলটাও তো বাগচীর।

—হাসছো? তাই হওয়া উচিত নয়?

—হয়তো, হয়তো। কিন্তু দর্শনকে তুচ্ছ ভেবো না। দেখো এখনই তার প্রয়োগ করা যায়। এই যে জামাটা বুনছো। এটা কার তা বলবো? রাজকুমারের জন্য সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

এটা তার জন্য বুনছো ব'লেই তাঁর কথা তোমার মনে আসছে।

—সেটা রং দেখে বুঝতে পারছো। এই প্রিমরোজ রংটা দেখে তোমার মনে হয়েছে এটা তাঁকে মানায়।

—দর্শন নয় বলছো? তা হ'লেও ধরেছি ঠিক। কিন্তু তুমি সত্যি বলো, একজন হেড-মাস্টারের কি আরো বেশী পড়া উচিত নয়?

—ও ভগবান, যদি একটু কম পড়তে!

—তোমাকে গোপনে বলি, ডার্লিং, আমি ভেবেছি আমার শ্বশুরের সংগ্রহ প্লাটিনাম ও ক্যাম্পানেলা আমাকে এই শীতে বেশী টানছে।

কিন্তু কেটের চিন্তা অন্যদিকে গেলো। সে বললো,—আচ্ছা, তোমার এই নতুন পরীক্ষা-বিধিটা নিয়ে সেদিন মিস্টার নিওগীকে বেশ চিন্তিত দেখলাম। ইংরেজি না-জানলে তাকে নিরক্ষর বলা হবে, এমন আইন হয়েছে নাকি কলকাতায়?

বাগচী হেসে উঠলো হো হো করে।

—না, আইন হয়নি। সমাজে যা মানা হয় তা আইনের চাইতেও বড় বিধান, বলো তাই কি না? কলকেতায় ওদের সঙ্গে আলাপে যা বুঝতে পেরেছিলাম তা এই যে ইংরেজি বর্ণমালার জ্ঞান না থাকলে তাকে নিরক্ষর সুতরাং অশিক্ষিত বলা হচ্ছে। তুমি বলো এডুকেটেড্ কথাটার ব্যুৎপত্তি গণ্য না করলেও নিরক্ষর ও অশিক্ষিত কি এক জিনিস। তা হ'লে তো ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের প্রকৃতির-শিক্ষার থিয়োরিই মূর্খতা।

—তুমি সেদিন বলছিলে এদেশের লোকেদের মধ্যে ইংরেজি বর্ণমালার জ্ঞান দূরে থাক, এমন কি বাংলা বর্ণমালার জ্ঞান নেই এমন অনেকে আছেন যাঁদের নীতি ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে নগণ্য মনে করা যায় না, কিন্তু তা কি শিক্ষা? তারা কি দর্শন পড়ে তা বুঝবে?

—তোমার কথার যুক্তি কেউ টলাতে পারবে না। সেজন্যই তো স্কুল। কিন্তু সকলে তো ক্রিটিক অব পিওর রিজনিং পড়বে না। দু-চারজন তা পড়বে বলে দেশের কোটি কোটি মানুষকে বর্ণমালা আর ব্যাকরণ শেখাতে যাই কেন ইংরেজির. আর সেই প্রক্রিয়ায় এক হুকুমে সকলকে নিরক্ষর সুতরাং অশিক্ষিত বলি কেন? কিন্তু, ডার্লিং, সেক্সপীয়র কি লক্ বার্কলে হিউম পড়েছিলেন, ইস্কাইলাস অথবা সফোক্লিল্ কি আরিস্টটস্ পড়েছিলেন।

—তা কি সত্যি হয়? হাঁ, হয়ই তো সেক্সপীয়রই তার প্রমাণ। সেই স্মাল্টি ল্যাটিন এবং লেসার গ্রীক্। ধন্যবাদ।

বাগচী হেসে বললো,—এই দেখো, সেক্সপীয়র কি আমাদের সার্টিফিকেটের অপেক্ষায় ছিলেন?

বাগচী পাইপে মন দিলো।

একটু পরে বললো,—কিংবা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। সেক্সপীয়রের সাফল্য তোমাকে এখন অন্তত আজকের জন্য অন্য কোন কারণে খুশী করেছে।

—আমি বাজি রাখছি তুমি তা কেন বলতে পারবে না।

বাগচী পাইপ তুললো মুখে। চিবুকের দাড়িতে হাত রেখে ভাবলো। হেসে বললো,—খুব

সোজা, খুব সোজা; বাজিতে হেরে গেলে। তোমার চিন্তার গাড়িটা একই মুখে যাচ্ছে। এবং ঠিকঠাক্ অনুমান করছি তোমার আঙুলের ডগায় ওই যে উল্টা কাঠির উপরে নিচে পাক খেয়ে যাচ্ছে সেটাই চিন্তাকেও তন্ময় করেছে। এই দেখো, তবে ইংরেজি হিসেবেও তুমি রাজকুমারকে নিরক্ষর বলতে পারো না। যেভাবেই হোক সুন্দর অক্ষরে উনি নাম সই করেন তার তা কুইল্ দিয়ে। কিন্তু একটি ইংরেজি বাক্যও বোধ হয় লিখতে পারেন না। ফরাসী তবু কিছু আসে। ফরাসী উপন্যাস পড়লে শোনেন। যা শিখেছেন তা বোধ হয় স্বরলিপি। পড়তে পারেন, বোধ হয় লেখেনও।

কেট বাজিতে হার স্বীকার করলো না বটে। বললো,—একটা মজার কথা মনে পড়লো। রাজকুমার কবে যেন বলছিলেন, এর পর স্কুলের ছাত্ররা তাঁকে মূর্খ ভাবতে শুরু করবে।

বাগচী বললো—না, আমি তাঁকে সেক্সপীয়রের মন দিতে চাই না। কিন্তু তোমারই বা কি মনে হয় তাঁর সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পেয়ে? অথবা এ-বিষয়ে নয়নতারার মতই সব চাইতে ঠিক হবে।

—হয়েছে। রাজকুমারকে তোমার গবেষণার স্পেসিমেন কোর না। তোমাকে কি একটু চা দেবো?

—এখনই নয়। কিন্তু তোমাকে আর একটা কথা বলি। যারা প্রথমে সেক্সপীয়রকে ঠিকঠাক্ বড় ব'লে চিনেছিলো তারা কিন্তু আমাদের মতো কমেণ্টারি পড়ার সুযোগ পায়নি। মনে হয় না তোমার?—তখনকার সেই শ্রোতারা সংস্কৃতির দিক দিয়ে অন্তত নাট্যকাব্যের ব্যাপারে আমাদের চাইতে এগিয়েছিলো। তারপর কালে আবার তা হারিয়ে গেলো।

কেট বাগচীর দিকে চাইলো যেন কথাটা বুঝতে। বললো,—তা কি হয় নাকি?

—একটা সমাজের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে হয় না। কিছু লোক থাকে যারা সংস্কৃতির অলিখিত পুঁথি এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্ম ব'য়ে নেয়। কিন্তু চর্চার অভাবে সাধারণের মধ্যে (যেমন ভোকাবুলারির ক্ষেত্রে) সংস্কৃতির একটা দিক লোপ পেয়ে যেতে পারে।

কেট আবার ভাবলো। উলের জামাটাকে উঁচু ক'রে ডিজাইনটা লক্ষ করলো। একবার সে ভাবলো এটার বোনা সম্বন্ধে একটা কথা বলতে পারে সে যা নয়নতারার সঙ্গে হয়েছিলো।

কিন্তু সে বললো,—রাজকুমারের কলকেতা যাওয়ার ব্যাপারটা তা হ'লে বুঝিয়ে বলো। তা কি অন্য সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করা নয়? কিংবা নতুন ফ্যাশন শেখা?

আজ বাইরের কোন টান নেই যেন। বাগচী সামনের একটা টুলের উপরে পা তুলে বসলো।

—নতুন ফ্যাশনকে তুমি ঘৃণা করো? বাগচী হাসলো,—কিন্তু একেবারে লেটেস্ট কাটের স্যুট পরে রাজকুমার যখন তোমার সামনে দাঁড়ান তা কি তৃপ্তিদায়ক বোধ হয় না? অবশ্য তুমি বলতে পারো ইংরেজি টেবল ম্যানার্স এখানেই তুমি শেখাতে পারো। এবং রাজকুমারের পক্ষ থেকে র‍্যাংকিনের বাড়িতে খবর পাঠালে বণ্ড স্ট্রীটের আধুনিকতা তারা এখানেই ডেলিভারি দিয়ে যাবে। তুমি কি ভেবে দেখেছো (কিংবা এটা আমাদের চিন্তার বিষয় নয়) রাজকুমারের দর্জি কে? কিন্তু তা-ও নয়। আচ্ছা তোমার দেশের পিয়ারেরা কেন রানীর ব্যাল্‌মোরাল, বাকিংহাম ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও ঘুরতে থাকে? তারা নিশ্চয়ই সেকালের সেই লিষ্ণেস্টার কিংবা এসেক্সের মতো নয়।

—ওটা তাদের ওয়ে অব লাইফ। তাছাড়া সেখানে এখনও হাউজ অব লর্ডস্ আছে। রাজনীতিকে এখনও তারা বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

বাগচী কথাটা বলার আগে ভেবে নিলো, বললো,- ভুললে চলবে না তিন-চার বছর আগেও দিল্লীতে একটা দরবার ছিলো। আর সে দরবারে আমাদের রাজকুমারের মতো তরুণরাও অংশ নিতেন। বলতে পারো এখন প্রতি জেলায় যেমন কালেক্টর। রাজনীতির জায়গা নিয়েছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। কিন্তু তিন-চার বছর কি সব কিছুর পক্ষেই চূড়ান্ত অতীত?

অদ্ভুত কথা তো? তুমি কি বলতে চাইছো? দিল্লীর সে-সব দরবার তো শুধু ষড়যন্ত্র, শুধু ম্যাচিনেশন্ ছিলো।

—দেখো, রাজনীতিচর্চাকে কখনও কখনও ষড়যন্ত্র ব'লে মনে হয়, আর তা সব দেশেই। লিঙ্কেস্টার এসেক্সদের কথা বলেছো। তখন তাদের জীবনটা কি কোমরে তরোয়াল বেঁধে সুর দড়িতে হাঁটা ছিলো না?

বাগচী হেসে বললো,—দেখো তোমার পিত্রালয়ে যারা মার্চেন্ট লর্ড তাঁরা হাউস অব লর্ডসে বসলেও ট্রেড ট্যারিফকেই লক্ষ্যে রাখে। এখানে নুনের বেনিয়ানরা, মুদিরা রাজা হচ্ছে। তারাও বাড়তি জাঁকজমক টাকার দিকে নজর রাখবে। কিন্তু তোমাদের দেশে লর্ড নর্থ, লর্ড ওয়েলিংটন, সার সিডনি হার্বাট প্রভৃতি একেবারে সেকালের নয়।

—কিন্তু সে সব তো হাউস অব লর্ডসের মধ্যে দিয়ে।

—এখানে হাউস অব লর্ডস্ নেই। এখানে কিছু হ'লে তা অন্য চেহারা নেবে।

—তোমার কথায় আমার কিন্তু ভয় করছে। তুমি কি বলতে চাও আমাদের রাজকুমার—

বাগচী বললো,—তুমি যাকে ভয় বললে তা কি ভয়ই?

—কিন্তু তোমার স্কুল, দেওয়ানজির আধুনিক চাল-চলন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ওই রাজকাছারী। রাজকুমার কি ইংরেজদের পক্ষে খাজনা আদায়ের সিস্টেমের বেশী কিছু?

—এ-সবই স্থায়িত্বের কথা বলে। কিন্তু তোমাকে বললাম যেমন—কিছুই হবে না, হ'লে তা অন্য রূপ নেবে; তা হ'লেও তিন-চার বছরে কোন একটা বড় ব্যাপার চিরকালের মতো অতীত হ'য়ে যায় না। যায় কি? অন্তত মাত্র তিন-চার বছর তার পক্ষে যথেষ্ট সময় নয়।

কেট বললো,—অন্তত তর্ক হিসাবে তোমার কথা উড়িয়ে দেয়া যায় না। ব'সো, চা করি।

কেট সেলাই রেখে উনুনের কাছে গেলো। কয়েকটা টুকরো কাঠ দিয়ে চোঙার মুখে ফুঁ দিয়ে আগুনটাকে শিখায় পরিণত করলো। কেটলি চাপিয়ে সে ভাবলো, এটা একটা কৌতুকের মতো বোধ হয়। কিছুদিন আগেকার গল্পে জানা যায় কোন কোন রাজা ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষী সৈনিক রাখতেন রাজ্যে। আগে পিয়েত্রো, এখন বাগচী নিজে সেই সব ভাগ্যান্বেষীদের মতো কেউ যাদের রাজবাড়ি থেকে নিজের প্রয়োজনে নিযুক্ত রাখা হয়েছে? কিংবা দেওয়ান হরদয়াল? না, প্রকৃতপক্ষে এখন আর দেওয়ান নন। কিন্তু বাইরের সঙ্গে রাজবাড়ির যোগাযোগ তাঁকে বাদ দিয়ে হয় না। অত বড় একজন মানীলোক সম্বন্ধে ভাবা যায় না, নতুবা তাঁকে উআন ম্যান ডিপ্লোম্যাটিক কোর বলতে হয়।

চা ক'রে আনলো কেট। তখন এই কল্পনাটায় সে হাসলো।

আজ ঠিক যেন রবিবারের আবহাওয়াই। চা দিয়ে সে বললো,—এবার রলের চার্চের কথা বলো।

বাগচী বললো,—আমার তো মনে হয় ভালোই হবে। জানো, কাল হঠাৎ একটা কৌতুকের ভাবনা মনে এসেছিলো। রলের ক্যাথলিক উপাসনা যাতে ধুনো-মোমবাতির ব্যবহার আছে তার সঙ্গে আমাদের এদিকের পুজার অনেকটা মিল আছে। জানি না তার চার্চে ভার্জিন মেরির মূর্তিও থাকবে কি না।

—তাই ব'লে কি হিন্দুদের কাছে তাকে আপন বোধ হবে?

—মিল মানুষকে কাছে টানে না?

—কিন্তু তুমি যে বলেছিলে হিন্দুরা ব্যক্তিগত পাপে জন্মান্তরে বিশ্বাস করে, মানুষজাতি হিসাবে পাপের উত্তরাধিকারে বিশ্বাস করে না। তারা কি ক্রাইস্টকে মূল্য দেবে?

—ঠিকই বলছো। আমি এরকম বলতে শুনেছি। কারো কারো ধারণা, মানুষ স্বর্গ-উদ্যান থেকে বিতাড়িত এরকম মনে করার চাইতে মানুষ মূলত পশু এবং ক্রমশ উন্নতির দিকে যেতে পারে, এরকম মনে করা ভালো।

মনে হলো বাগচী শিরোমণির বিতর্কটা সম্বন্ধে আলাপ করবে।

কেট মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলো,—কিছু কি বলছো?

বাগচী ভাবলো কথাটা শিরোমণি বলেছে বটে কিন্তু তা কি সে যেভাবে বলতে চাইছে সে রকম?

কিচেনের সেই আতপ্ত গণ্ডির মধ্যে সুখাসীন দুজন দার্শনিক আলাপও করতে পারে, তাতে ছুটির আবহাওয়া নষ্ট হয় না। কিন্তু এটা রবিবার হতে পারে তাই বলে কিচেনের স্নেই আবহাওয়া দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ছুটিটাকে ধরবে এমন হয় না। গেটের বাইরে অন্য রবিবারের তুলনায় প্রায় এক ঘণ্টা পরে হ'লেও বাগচীর টাট্টু হুঁইন্ ক'রে উঠলো। এমন প্রচণ্ড সে রব যে যেন আবহাওয়াকেই বদলে দিতে পারে।

সেলাই ঝুড়িতে রেখে কেট উঠলো। বাগচীও উঠে দাঁড়ালো।

কেট বলতে পারলো রসিকতা ক'রে যে সে ভেবেছিলো আজ বোধ হয় বাগচী বেরুবে না। কিন্তু সে রসিকতা এর আগে অনেক রবিবারে হয়েছে। বাগচী নিজেই বললো,—সহিসকে বলেছিলাম কাল, একটু দেরিতে বেরুব।

—টাট্টুটাকে কষ্ট দিলে। ওর রবিবারের বরাদ্দ চিনি পেতে এক ঘণ্টা দেরি হলো।

বাগচী হেসে বললো,—সেজন্যই কি জোরে ডাকলো? একেবারে গাধা নয় দেখছি।

প্লেটে চিনি নিয়ে বার হলো কেট। বাগচীও পোশাক পরতে গেলো।

অনেক সময়ে নিজের রসিকতা মনে প্রফুল্লতার স্বাদ নিয়ে ফিরে আসে। তার টাট্টুটা শক্ত বটে কিন্তু আকারে যতো মোটা উঁচুতে ততটা নয়। তার বালামচি মাটি ছোঁয়, বাগচীর পা'ও মাটির হাতটাক উপরে থাকে কিনা সন্দেহ। অস্পষ্টভাবে যা মনে আসছিলো সেটাকে স্পষ্ট করতে সে

চিন্তাকে কথায় আনলো—হ্যাঁ, গাধাই তো। হয়তো তিনি গরীব ছিলেন কিংবা এটা কি সে দেশের প্রথা ছিলো কিংবা জোসেপই বুদ্ধি ক'রে ধীরগামী জন্তুটাকে সংগ্রহ করেছিলো? ক্রাইস্টকে জঠরে নিয়ে ভার্জিন গাধাতেই গিয়েছিলেন। এবং তাঁর জন্মদিন এগিয়ে আসছে।

কিছু দূরে গিয়ে তার মনে হলো তার এই টাট্টুর মতো ঘোড়াকেই প্যাড বলে নাকি? কি যেন কথাটা? অ্যান্ অ্যাবট্ অন্ অ্যান্ অ্যাম্বলিং প্যাড। এক মুহূর্ত সে পংক্তিটাকে চসারের ক্যান্টারবেরির পথে রাখলো। কিন্তু, না টেনিসনেরই লাইন। দেখো, ওটা তো আমাকে দেখেও কারো মনে হ'তে পারে! তার নিজের সম্বন্ধে এটা কেউ রসিকতা করতে পারে ভেবেই বাগচী আপন মনে হাসলো।

ডিস্পেনসারিতে চরণ ছিলো। সে ইতিমধ্যে ওষুধ বিতরণ শুরু করেছে। চরণের একটা জাবেদা খাতা আছে। তাতে সে রোগীর নাম আর কি ওষুধ দেয়া হলো তা লিখে রাখতো। বাগচী লক্ষ করলো আজ সে রোগের লক্ষণও লিখে রাখছে। আজকের রোগীদের মধ্যে জ্বরের রোগীই বেশী। ভুগে ভুগে শীর্ণ। কবরেজ মশায়ের পাঁচন আর সদরের ডাক্তারের কুইনিন বড়ির অভিজ্ঞতায় আকণ্ঠ তিক্ত। উপরন্তু কবরেজ মশায়ের পাঁচন তবু তো যোগাড় করা যায়, কি অসম্ভব খরচ পড়ে সদর থেকে কুইনিন বড়ি আনতে। একজন রোগী বললো এই যে জ্বর মেলোঅরি, তা কি আগে ছিলো না? নাকি এখন কবরেজরাই ভুলে গেছে ওষুধ? ওদিকে অত খরচ করেও কিন্তু আবারও জ্বর হচ্ছে। বাগচী বললো,—চরণ, এটা বোধ হয় হিসাব নেয়া দরকার তোমার ওষুধে জ্বর সারছে যাদের তাদের মধ্যে ফিরে জ্বর আসা কুইনিনের রোগীদের চাইতে বেশী না কম।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রোগীর সংখ্যা কমই ছিলো সেদিন। এক ঘণ্টার মধ্যেই ডিস্পেনসারি খালি হয়ে গেলো।

মানুষের মনে চিন্তা কিভাবে ভেসে ওঠে তা এক কৌতুকের বিষয়। রোগী আর রোগ নিয়েই কথা। হঠাৎ বাগচী বললো,—চলো, চরণ, একটু ঘুরে আসি ফরাসডাঙ্গা থেকে। নাকি তোমার কোন কাজ আছে?

কাজ থাকলেও চরণ তাকে বাগচীর সঙ্গী হওয়ার চাইতে মূল্যবান মনে করলো না। সে বললো,—চাদরটা নিয়ে আসি, সার।

একই সঙ্গে চলতে কেউ পায়ে হেঁটে অন্য কেউ টাট্টুতে—তাতে বরং অসুবিধাই হয়। সুতরাং বাগচীর টাট্টু চরণদাসের দরজায় বাঁধা রইলো। চলতে শুরু করে বাগচী ভাবলো,—হ্যাঁ, ব্রকেডই তো।

যেন কিছু আগে ব্রকেড নিয়ে কথা হচ্ছিল।

বাগচীর চিন্তায় কথাটা উঠলো যেন অসংলগ্নভাবেই কিন্তু প্রকৃতই তা কি অসংলগ্ন? হয়তো এমন হতে পারে সিল্ক ব্রকেডের কথা সে ইতিপূর্বে চিন্তা করেছে। ইংল্যাণ্ডে ক্রিস্টম্যাস হলে সে হয়তো মিঙ্ক কোটের কথা চিন্তা করতো। তারপর সে চিন্তার উপরে অন্য অনেক চিন্তা প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ভুলে-যাওয়া চিন্তাও বোধ হয় স্মৃতিতে থাকে। এবং অনুকূল আবহাওয়ায় তা উদ্ভিন্ন হয়।

ফরাসডাঙ্গায় সিল্কের ব্রকেড তৈরি হ'তো। এখনও কি হয়? একজনও কি নেই যে পারে তৈরি করতে? বাগচী ভাবলো।

বাগচী বললো—আচ্ছা, চরণ, ফরাসডাঙ্গায় কি তাঁত চলে না?

—একেবারেই চলে না তা নয়। আমাদের গ্রামের মতোই জোলাদের কয়েকজন আছে। গামছা, মাঠা বোনে। আগে তো, সার, শান্তিপুরীর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতো শুনেছি। আল্লারাখা বসাক তো এখনও জীবিত। শুনেছি কিছু কিছু ভালো কাজ এখনও করে।

বাগচী ভাবলো এসব সে নিজেও জানে। পিয়েত্রোর কাছে ফরাসডাঙ্গার তাঁতীদের উত্থান-পতনের কথা সে শুনেছে। পঞ্চাশ বছরে একটা শিল্পপ্রধান অঞ্চল উচ্ছন্নে গেছে। ফরাসডাঙ্গায় গেলে বসাকপাড়া, ওস্তাগরপাড়া, সুতাহাটী এমন সব পাড়ার নাম থেকেই বোঝা যায়। কার্পাস আর রেশম দু'রকমেরই সরেস কাপড় হতো এখানে। প্রথম মার খেয়েছিলো ওস্তাগররা। ধোলাইএর কাজ, ছাপার কাজ, রঙের কাজ একেবারে উঠে গেলো। তারপর গেলো রেশম। রেশমের সুতো আসতো চন্দননগর থেকে। কি কার্পাস কি রেশম, বেশীর ভাগ তৈরি হতো থানের কাপড় কারণ বেশীর ভাগই বিলেতে চালান যেতো আর বিলেতে তো তারা ধুতিশাড়ি পরে না। সেটাই বন্ধ হয়ে গেলো। আর এখন তো কলকেতার বড় বাজার থেকে ক্রেপ আর ধোয়া মল্‌মল্, টুইল আর লিনেন লংক্লথ সারা দেশে চালান হচ্ছে, বিলেত থেকেই আসছে।

বাগচী বললো,—বেশ তো, আল্লারাখার সঙ্গেই গল্প ক'রে আসি চলো। সে কি একথান সিল্ক বুনে দিতে পারে না? বাগচী হাসলো।

চরণ বললো,—যদি তাকে পাওয়া যায়। শুনেছি তার ছেলে জেলার সদরে দোকান দিয়েছে। আল্লারাখাও মাঝে মাঝে গিয়ে থাকে।

—নিশ্চয় কাপড়ের দোকান। আর তা হলো তো ভালোই। ওদের বাড়ির জিনিস এখনও বাজার পাচ্ছে।

কিন্তু আসলে এটা তো একটা ছুটির মেজাজ। হরদয়ালের মতো কেউ জানলে ও বিষয়টাকে আলাপে আনলে হয়তো বলতো সোশ্যাল এনকোয়েরি? এবং কেট শুনলে বলতো,—ও! সো রোমান্টিক! এবং বাগচী প্রথমে তা নিজের এই রোমান্টিক আগ্রহকে নিজেই অবিশ্বাস করতে চাইতো, পরে হেসে বলতো,—রিঅ্যালি? ইউ নেভার ক্যান্ টেল্—।

এবং এই মনোভঙ্গীটাকে প্রমাণ করতেই যেন খানিকটা গিয়ে বাগচী বললো,—বসো চরণ, সামনের এই বাগিচাটাকে এসো এই সুযোগে দেখে নিই। আমার মনে হয় ছোটবেলায় কখনও এসে থাকলেও বয়স হওয়ার পর আম চুরি করতে আসো নি আর।

বাগচীর বলার ভঙ্গীতে চরণ হেসে ফেললো, বললো—এখন আমরা কি পাব? তা ছাড়া বড় গাছগুলোর তলায় যে ঝোপঝাড় তার মধ্যে কি চলা যাবে? আর এদিক দিয়ে বোধ হয় যাওয়াও যাবে না যদি খালে জল থাকে।

খালের কথা শুনে বাগচী দাঁড়িয়ে পড়লো।

—সাঁকো নেই বলছো?

—সেই কাঠের সাঁকো আমাদের ছোটবেলাতেই ভেঙে গিয়েছিলো।

বাগচী এদিক ওদিক চেয়ে বাঁয়ের দিকে কিছুটা গিয়ে বললো,—এদিকে দেখো, চরণ, একটা পায়ে হাঁটা পথ। মনে হয় না লোক চলে? বোধ হয় খাল এখানে শুকনো। কিংবা আমরা বোধ হয় খালের খাতেই। সামনে বাগিচাটা ক্রমশ উঁচু নয়?

চরণ বললো,—তা নয়, সার, জায়গাটাই উঁচু নিচু ঢেউখেলানো। আমরা ছোটবেলায় এখানে এসে পাহাড়ে চড়ার শখ মেটাতাম।

জায়গাটা যদি তাকে চারিধারের জমি জমি থেকে পৃথক ক'রে দেখতে হয় (চরণের কথায় তা হয়তো খাল দিয়ে পৃথক করাও), পঞ্চাশ ষাট বিঘা পরিমাণ হবে। এই সমতল দেশে হঠাৎ এরকম হ'লো কি ক'রে ভাবলে প্রকৃতির বৈচিত্র্যর কথা যেমন মনে হয় তেমন মনে হয় খানিকটা মানুষের চেষ্টাও ছিলো সে বৈচিত্র্যকে বিচিত্রতর করায়। এমন হতে পারে খাল কেটে সেই মাটিতেই উঁচু করা হয়েছিলো। কিন্তু খালই বা কেন? সে খালও কল্পনার নয়। বাগচী যেখানটায় দাঁড়িয়েছিলো তার ডানদিকে জমিটা যেন চওড়া তিনটা টেরেসে নেমেছে, আর তার শেষে একটা মরা সোঁতার মতো কিছু। সে দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বাগচী হঠাৎ বিস্মিত হয়ে বললো,—আরো, দেখেছো চরণ, ওটা দেখছি এক জোড়া উইলো।

চরণ বললো,—গাছটা নতুন ধরনের, সার।

—আরে তা তো হতেই হবে। এদেশের নয় যে। অবশ্য আমি জানি না কাশ্মীর অঞ্চলে জলের ধারে এ গাছ হয় কি না। কিন্তু এদিকটা এটা বাগিচা, কিন্তু ওদিকে দেখো ঘাসের রাজ্য। রোদ পড়ে কেমন হাল্কা সবুজ দেখাচ্ছে।

প্রায় আধঘণ্টা সময় তারা এই জায়গাটায় ঘুরে বেড়ালো। দূর থেকে বাগিচা মনে হয়। কিন্তু উপরে উঠে এলে রোদভরা ঢেউতোলা দূর্বাঢাকা ময়দানও চোখে পড়ে।

কথাটা কি বাগচীর মনে আগেই ছিলো? সে ভাবলো এখানে কিন্তু মিশন হাউসটা খুব ভালো হয়। ফাদার র'লে পছন্দ করবে কি না তা সে ভাবলো না। ব্যাপারটা এখনও অনেক দূরের, নিছক কল্পনার। সুতরাং বলা যায় বাগচী নিজে যদি মিশন হাউস করতো এ জায়গাটাকে সে পছন্দ করতো।

চরণ বললো,—বসাকপাড়ায় যেতে কিন্তু আমাদের আগের পথে ফিরে যেতে হবে, সার।

বাগচী বললো—তুমি তো খুব হিসেবি, চরণ। আচ্ছা, বলো। কিংবা, এখানে আর একটু দাঁড়িয়ে দেখো।

এই সময়ে একটা যোগাযোগ ঘটে গেলো। যেখানে তারা দাঁড়িয়েছিলো সেটা একটা বাঁশঝাড়। দাঁড়ানোর কারণ ঝাড়টার বৈশিষ্ট্য বাঁশগুলো যেন বাড়তে পারে নি এমন, কিন্তু একটু লক্ষ ক'রে দেখলেই বোঝা যায় তাদের জাতই আলাদা। সোনালি রংএর সরু সরু (লাঠির চাইতে মোটা একটাও নয়) বাঁশগুলো যেন ফুলবাগানে সখ ক'রে লাগানো যায়। কঞ্চিগুলি যেন লতা।

বাগচী বললো,—বাঃ, চরণ, বাঃ, এতে কি লাঠি হয়।

—না সার, ফাঁপা। দেখতে সুন্দর বটে। বঁড়শি-ছিপ হয়তো হয়।

বাগচী হেসে বললো,—এহে চরণ, বাঁশি মনে হলো না? কিন্তু এটাও বিদেশের। বহুদূর থেকে এনে লাগানো। চলো তা হ'লে। তোমার হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে না তো?

কিন্তু বাগচী থমলো। ফিরতে গিয়ে তার চোখে পড়েছে। ওটা বোধ হয় খালের প্রান্ত যেখানে বেতগাছগুলো আলোতে ঝিরঝির করছে। তার ওপারে দিগন্তে একজন ঘোড়সওয়ার। ঘোড়াটা বাদামী, সওয়ারের গায়ের জ্যাকেটটা গাঢ় নীল, মাথার কালো চুলে রোদ; কিন্তু মাথার টুপিটা পিছন দিকে ঘাড়ের উপরে ঝুলছে, ক্লান্তির ভাবই যেন। সেজন্যই টুপিটাকে অমন করে ঝোলানো, আর ঘোড়াটাও যেন মাটির দিকে ঘাড় নামিয়ে চলেছে সেই নির্জন মাঠের উপরে। ওখানে পথ কোথায়? ঠাহর ক'রে দেখলে রাজকুমার মনে হয়। রাজকুমারই তো, যদিও দূর থেকে মুখের গড়ন বোঝা যাচ্ছে না।

শীতকালের মেঘ যেমন হয়—একটুকরো মেঘ তেমন বোধ হয় ভেসে গেলো অন্তত রাজকুমারের গায়ে যেন একবার ছায়া পড়লো। তারপর আবার উজ্জ্বল রোদে হাল্কা সবুজই পশ্চাৎপট হলো। পটই তো, ছবির মতোই। কানে কিছু শোনা যাচ্ছে না অথচ দেখা যাচ্ছে। রাজকুমারের চিবুক তোলা, যেন দিগন্তে কিছু দেখছেন। এটা কি রাজকুমারের স্বাভাবিক ভঙ্গী? এই চড়ুইভাতির আমেজ নিয়ে ঘুরে বেড়ানো, রোমান্টিক ব্রকেড খোঁজার পটভূমিতে রাজকুমারের এই ছবিটা মেলে না। হঠাৎ কেউ সামনে পড়লে হয়তো তাঁর এই অন্যমনস্ক ভাব থাকে না, ঘোড়াও ওয়েলারের উপযুক্ত ভঙ্গীতে ছোটে। কিন্তু, তা হ'লে, যা তার নিজের দেখা উচিত ছিলো না তাই কি সে দেখেছে—রাজকুমার তাঁর এই ভঙ্গীটাকে নিশ্চয়ই সকলের চোখে পড়তে দিতে চান না।

বাগচী তাড়াতাড়ি বললো,—চলো, চরণ, চলো দেখি সিল্ক ব্রকেড হয় কিনা ফরাসডাঙ্গায়। বাগিচা থেকে বেরিয়ে প্রায় পনেরো মিনিট চলার পর (বেশীর ভাগ তারা মাঠের উপর দিয়ে কোনা-কুনি চললো আল ধ'রে) চরণ বললো, সামনে এই বাড়িগুলোই বসাকপাড়া। বাগচী ভাবলো খালি মাঠ ব'লেই তারা এভাবে চলতে পারছে। কিন্তু এটা কি আশ্চর্য নয়! এবার ধানের দাম বেশ চড়া কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক জমিতে চাষ নেই। পড়ো জমির মতো আগাছা গজিয়েছে।

চরণ ভাবলো,—এটা কি সারের বৈশিষ্ট্য? এমন মানী, এমন মর্যাদার লোক আর কে এ অঞ্চলে? দেওয়ানজি, নায়েব মশায়ের ঠিক পরেই নয় কি? আরও বড় ক'রে দেখো যদি রাজার গ্রামের বাইরে এক ডানকান্‌ই প্রতিপত্তির দৌলতে তাঁর সমকক্ষ হ'তে পারে। কিন্তু কৌতুক দেখো, যেখানে কুঠিতে ব'সে আল্লারাখাকে ডেকে পাঠালে হতো, নিজেই চলেছেন তার বাড়িতে। যারা গ্রামে ঘুরে খৃষ্টধর্ম প্রচার করে তাদের এমন রীতি আছে বটে, সার কিন্তু সে রকম পাদ্রী নন।

বাগচী ভাবলো: এই জমিগুলো যাদের ছিলো তারা হয়তো এখানে নেই। কিন্তু তা কি হয়? কৃষক কখনও জমিকে অনাদর করে?

চরণ ভাবলো: হয়তো বসাকদের কথা জানতে চান।

আল্লারাখার বাড়িটা এখনও সম্পন্ন গৃহস্থের মতো কিংবা দূর থেকে তেমন মনে হয় যদিও হয়তো তুলনা দিতে তেমন এক অতি প্রৌঢ়ের কথা মনে হবে যার দৃঢ়স্বাস্থ্যের কাঠামোটা আছে কিন্তু পেশী শ্লথ হ'য়ে এসেছে, হৃৎপিণ্ড চোখের আড়ালে ক্লান্ত। বাড়ির পাশে একফালি জমিতে কয়েকটা

কার্পাস গাছ, হলুদ ফুলে ভরা। বেশ বড় চৌরী ঘর কিন্তু খড় বদলানো হয় না অনেকদিন। আল্লারাখা বাড়িতে ছিলো। বাড়ির সামনের উঠোনে রোদে ব'সে লাটাইএ দড়ি পাকাচ্ছে তখন। বাগচী ও চরণকে দেখে সে যারপরনাই বিস্মিত হ'লো। চরণ তবু মুখ চেনা। কিন্তু বাগচীর পোশাক পরিচ্ছদ মুখ চোখের চেহারায় আল্লারাখার সদরের বাঙালী হাকিমের কথাই মনে হ'লো। চরণ পরিচয় ক'রে দিলে বিস্ময় বরং আরও বাড়লো। উনি তা হ'লে সেই মাস্টারমশাই যিনি পিয়েত্রোর চিকিৎসা করতেন, শেষ কিছুদিন পিয়েত্রো যার সঙ্গ পছন্দ করতেন, যিনি দেওয়ানজির বন্ধুস্থানীয়, শেষ কথা যার স্ত্রী খাঁটি ইংরেজ মেয়ে। লোকটি অচেনা, কিন্তু এসব গল্প গোপন থাকে না।

আলাপে আসতে বাগচীর এক মুহূর্ত লাগলো না। সে বাড়ির সামনে কার্পাস গাছগুলো থেকেই আলাপ শুরু করলো।

সে বললো,—এটাই কি সব চাইতে ভালো জাতের কার্পাস ?

সে আশা করে নি তার এই কথাটা সত্যি হবে।

আল্লারাখা বললো,—হাঁ, হুজুর, আমার গুরু মিঞা দবীর বক্সের কালে ডুহাল জমিতে এই কার্পাসের চাষ হতো। আমার এই চার-পাঁচটা গাছ।

—কেন, সব চাইতে ভালো কার্পাস যদি, মাত্র ডুহাল কেন ?

—দরকারের না হুজুর, মেজাজের চাষ। সুতো তো তাঁর আমলেও সবই ইস্পিনের হয়ে পড়েছিলো। আমেরিকার তুলো আর কলকেতার বড়বাজারে কেনা বিলেতি সুতো। তবে তিনি বলতো খোদার নাম নিয়ে না বসলে যেমন শেষ্ রক্ষা হয় না, বুনোটে হাঁক্ পড়ে তেমনি আসল তুলোর সুতো না হ'লে সাধ্য কি মাকুর বাতাস সহ্ করে।

চরণ জিজ্ঞাসা করলো, বসাক মশাই, আপনি কি দবীর বক্সকে নিজের হাতে বুনতে দেখেছেন।

—এটা আমার গর্ব। তা গুরুর নামে গর্ব করা যায়। তার তাঁতের ধারে দিনের পর দিন তা দু চার বছর ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছি। তবে না আদায় হ'লো। তা হুজুর (বাগচীকে লক্ষ ক'রে বললো সে) আমার বাড়িতে এখনও চারখানা তাঁতে চার সাগরেদ আছে। কি ধুতি, কি শাড়ি, কি থানে মিশিনকে হারাতে পারে।

—আপনি কি রেশমের ব্রকেড বুনতে পারেন ?

—বোরকেড্ ? বোরকেড্ ? ও, হুজুর বেনারসী ঢং বলছেন। তা হয় আজ্ঞা। না, হুজুর হবে না। সুতো জরি আনা যায়, পালিশদার নেই। ওস্তাগরপাড়ার ওরা যে কয় ঘর আছে জমিজিরাৎ করে। জমসের খাঁ মরার পর সে পালিশদার আর কেউ নেই।

—আপনার অবস্থা তো মোটামুটি ভালো, ওস্তাগরদের এরকম হ'লো কেন ?

আল্লারাখা ভাবলো। ভেবে বললো,—হুজুর একে ভালো বলবেন না। ওস্তাদ দবীর বক্সের কারখানায় বাইশ তাঁত চলতো। শেষে দাঁড়ালো সাতে। আমার এখন চারখানা চলে। সে গুরুর কৃপায় আর রাজবাড়ির দৌলতে। ওস্তাদ মক্কায় গেলেন। নৌকায় তুলে দিয়ে শেষবারের কদম বুচি করার কালে বললেন,—দোয়া করি আল্লারাখা তোমার বিদ্যে মরবে না। তা হুজুর মরতে দিই নাই।

সব সেরার দাম এখনও আছে। ফেসান যতই বদলাক শাড়ি, হুজুর, বিলেতে লারবে না। যদি তা শাড়ি হয়।

—তা হলে তো অবস্থা ভালো থাকারই কথা। চরণ বললো।

—চরণ, বিদ্যে আর ব্যবসা এক নয়। দু'শখানা তাঁত চলতো বসাকপাড়ায়, ত্রিশ বছরে তা এখন পঞ্চাশে নেমেছে। তার মধ্যে ত্রিশখানা বোনে গামছা। আগে লাখটাকার দাদন হতো। এখন ? রাজবাড়ি থাকতে বিদ্যে মরবে না। কিন্তু ব্যাবসা মরেছে। ব্যাবসার বার আনা সাধারণ কাপড়, তা সবই এখন বড়বাজারে।

—কি ওস্তাগরপাড়ার ওদেরও তো বিদ্যাই।

—ঠিক বাৎ হুজুর। ওদের চল্লিশঘর মানুষ তো আর আমার চারখানা তাঁতের পিছনে থাকতে পারে না। পালিশ, রং আর ধোলাই ছিলো ওদের কাজ। এখন এদিকে যে গামছা আর গড়া বোনা হয় তাতে ওস্তাগর লাগে না।

বাগচী বললো,—বসাক মশাই, ব্যবসাকে আবার কি তোলা যায় ?

—খুবই শক্ত হুজুর। তেমন দাদন দেবে কে ? শুনতে পাই ঢাকা-শান্তিপুরে এখনও কলকেতার মহাজনেরা দাদন দেয়। এখানে খবর ক'রে কে দাদন দিতে আসবে ?

বাগচী হেসে বললো,—দাদন তা হ'লে দোষের নয়, কি বলেন ?

—তা দোষের হবে কেন ? একচেটে হলেই লোকসান। জিনিস যদি কদরদান হয় তবে মহাজনে মহাজনে দাদনে পাল্লা লাগে। বাইরের দাদন ঠেকাতে পেত্রো কারিগরদের চাকরান জমিতে বসিয়েছিলেন এক সময়ে। মহাজনে মহাজনে পাল্লা লেগে যখন দাদনের দাম বাড়ে তখন লাভ কারিগরের। কিন্তু তেমন হয় যখন মালের চাহিদা বেশী। এখন চাহিদা কোথায় ? বড়-বেজেরে মহাজনেরা সপ্তাহে এক জাহাজ কাপড় পাচ্ছে না ? আগে ওস্তাদের হাতের বোরকেড যেতো বিলাতে, এখন আসছে যে।

বাগচীর মনে হ'লো এসবই তো সে সাধারণ ভাবে জানতো। সংবাদও সে জেনেছিলো। এখন যেন সে প্রমাণ পাচ্ছে।

সে বললো,— আচ্ছা বসাক মশাই, আজকের মতো আমরা উঠি।

আল্লারাখা বললো,—হুজুর, আমার পূর্বজন্মের সৌভাগ্য যে আপনার পায়ের ধুলো পড়েছে আমার উঠোনে। পিয়েত্রো যাওয়ার পর আর কোন মানুষ আসে নি এ পাড়ায়।

বাগচী হেসে বললো,—কোথায় মঁশিয়ে পিয়েত্রো আর কোথায় এক স্কুলের মাস্টার।

বাড়ির বাইরে কিছুদূর এগিয়ে এলো আল্লারাখা। শেষ কথা সে বললো,—জানা রইলো, হুজুর। তেমন সুতো আর জড়ি পেলে কিছু একটা বুনে নিয়ে যাবো আপনার কুঠিতে।

পথে বাগচী বললো,—আজ একটা জ্ঞান হ'লো, চরণ ; কোন জিনিসই অবিমিশ্র খারাপ নয়। কিংবা বলা যায়, আমরা নিজেরা যে ভালো বিষয় উদ্ভাবন করি নিজেরাই তাকে খারাপ করি।

—আপনি কি বিষয়ে বলছেন, সার ?

—তোমার মনেও নিশ্চয় উঠেছে কথাটা। দাদনের কথাই। আল্লারাখা বলছিলো না

দাদনের অভাবে কারিগরের তাঁত বন্ধ হচ্ছে। শুনে মনে হয় না দাদনের দরকার আছে। যে কারিগর তাকে যদি উৎপন্ন পণ্য বিক্রি হবে কি হবে না ভাবতে হয় তবে সে কাজ করে কখন? কখন একজন ইস্কুল মাস্টার এসে ব্রোকেডের খোঁজ করবে তার উপরে ভরসা করে চল্লিশখানা তাঁত চলে না।

বাগচী হাসলো।

এবং তার এই হাসি কিছু গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়লো। দাদনের কথাটা চরণের মনে ছিলো। কলকেতার কিছু বেনিয়ান, উকীল, উকীলের মুহুরী, ধর্মআন্দোলনে ব্যস্ত কিছু লোক ছাড়া কার মনে ছিলো তখনকার বাঙলাদেশ? নীলের দাদনই তখন দাদন। চরণদাসেরও মনে হলো এই হাসিতে কি মাস্টারমশাই মরেলগঞ্জের নীলের দাদনের কথাও বলছেন। সে একবার লুকিয়ে বাগচীর মুখটা দেখে নিলে।

চরণদাস বললো, (সে চেষ্টা করলো যাতে তার গলার স্বর বিরস না শোনায়, কিন্তু ঠাহর করলে বোঝা যেতো তার ফলে বরং ফাঁপা শোনালো তার গলা)—আমার সাধারণ বুদ্ধিতে কি অতদূর দেখা যায়, সার।

—এ তুমি কি বললে, চরণ? আল্লারাখা যা ধরতে পেরেছে তুমিও তা পারবে। দাদন একচেটে হ'লেই মুস্কিল।

চরণদাস ভাবলো মুস্কিল কথাটা কিছুই বলে না এক্ষেত্রে। সে বললো,—এই মুস্কিল থেকে পরিত্রাণ নেই, সার।

বাগচী পাইপ বার করলো। অভ্যাসবশে হ'তে পারে। কিন্তু মনে হ'লো সে কিছু ভাবতে চায়। বললো,—দেখছি ও পেলেও মুস্কিল, না-পেলেও মুস্কিল। যারা তাঁতীদের দাদন দিতো এখনও দেয় কোথাও কোথাও তার দাদন মতো মাল না পেলে ছেড়ে দিতো না দেবে। কারিগর বাজার খুঁজে বেড়াবে যদি, কাজ করবে কখন? তা ছাড়া অভাবেই দাদন নেয়ার ঝোঁক বাড়ে।

বাগচী পাইপ ধরালো। কিছু পরে বললো,—এক হয়, চরণ, এক হয় যদি তাঁতীরা এখনও যা আছে সবাই মিলে একটা কিছু করে। সবাই মিলে একটা আড়ৎ যাতে দাদনদারদের মুখোমুখী ওরা দাঁড়াতে পারে। বাগচীকে বেশ চিন্তিত দেখা গেলো।

—হ্যাঁ, চরণ, একবুদ্ধিতে হয় যদি বিলেতের মতো কারিগররা গিল্ড করতে পারে। ধরো নীল চাষীরাই যদি এক সঙ্ঘ ক'রে নীলের ফ্যাক্টরি বসায়।

তারা তাড়াতাড়ি হাঁটছিলো কারণ বেলা বাড়ছে।

হঠাৎ হেসে ফেললো বাগচী। বললো,—না, না, চরণ ডাক্তার তা হবে না। কারণ কাপড়ের বাজার ওরা একচেটে করেছে কলের সাহায্যে, আর কল বাড়াচ্ছে আইন করে। নীল তোমরা একচেটে করতে পারতে কিন্তু চালান দেবে কোথায়? তা কি ওরা নেবে, তোমাদের জাহাজী বেনেই বা কে? বলবে কলকেতের কোন ঠাকুর, মল্লিক বা দেব যদি নীলের ফ্যাক্টরী করতো। প্রথম তা তারা করবে না, করলে তারা ডানকানের মতোই দাদন দিতো। দ্বিতীয়ত আইন ক'রে ওরা মল্লিকদের নীল জাহাজে তুলতে দিত না বোধ হয়।

কিন্তু তাদের এ আলোচনায় বাধা পড়লো। ঝোপের আড়ালে ছিলো বলে আগে চোখে পড়ে নি। ঝোপটা মানুষের চাইতে উঁচু বেতের। সেটাকে ঘুরে যেতেই চোখে পড়লো চার পাঁচটি মানুষের কর্মব্যস্ত দলটিকে।

সুরেনের কাজ দেখে তাকে এখন ওভারসিয়ার বলাই ভালো। এমন কি তার আজকের পোশাকটাও এই নামকরণে সাহায্য করে। সুরেনের পরনে আধা-ইউরোপীয় পোশাক, মাথায় শোলার টুপি। ফোর্ট ইউলিয়ামে কাজ করে যদি এই নতুন জীবিকার সন্ধান সে পেয়ে থাকে তবে এ পোশাকটিও সেখানে থেকেই নেয়া। সুরেন দূরে দূরে লাঠি পুঁতে সড়ক কোন দিক দিয়ে যাবে তা ঠিক করছে। তার সঙ্গে কয়েকজন লস্কর তাকে সাহায্য করছে। রাজবাড়ীর আমিন সোনাউল্লা নিজে উপস্থিত। তার সঙ্গে পাইক।

তারা তো রাস্তা জুড়ে নেই, পাশ কাটিয়েও যাওয়া যেতো। কিন্তু দৃশ্যটা এ অঞ্চলে নতুন এবং কৌতূহল মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি (কেউ কেউ বলে তা নাকি মানুষ যখন প্রাণী মাত্র ছিলো তখনও ছিলো)।

চরণদাস বললো,—এখানে এসব কি সুরেন বাবু ?

—রাস্তা সড়ক। সুরেন বললো।

—কাজী সাহেবকে দেখছি যে।

সোনাউল্লা বললো,—তোমার কি ধারণা, চরণ, কাজী মানেই কাজিয়া ?

চরণদাস বললো,—না, হুজুর, মোজা-কাজা না হলে কাজী হয় না তাই জানতাম।

সোনাউল্লা সদর আমিন। নিশ্চয় তাকে আজকালকার ভাষায় অফিসার বলতে হবে। অথচ কারো কারো স্বভাবদোষ থাকে। সে চরণদাসের কথায় ফিক করে হাসলো। কিন্তু সে বাগচীকেও দেখতে পেয়েছিলো। সকলের সামনে কি হাসা যায়!

সোনাউল্লা বললো,—সালাম, মাস্টার সাহেব। আমাদের এই পোষ্টমাস্টারটি কিন্তু সহজ লোক নয়। সকলের সব চিঠি পড়ে বলে সকলের হাঁড়ির খবর জানে। আর তা জানে বলে কাউকে শ্রদ্ধা করে না। এক এক অক্ষরে এক একজনকে কাৎ করে দেয়। ডানকানকে আকার লাগিয়ে ডানকানা করেছে। ছোকরা সাহেব কীবলকে করেছে কেবলে একমাত্র এক একার লাগিয়ে, আমাকেও যে এক আকার উপহার দিয়ে কাজিয়া করেছে তা আর বেশী কি ?

চরণদাস বললো,—ছিছি। আমি অপরের চিঠি পড়বো কেন ?

সোনাউল্লা বললো,—আচ্ছা যাক্, এতদিনে তুমি একবার নিজের ডিফেন্সে গেলে ফরিয়াদী না হয়ে।

বাগচী বললো,—রাস্তাটা কি রাজবাড়ি থেকে সোজা এদিকে আসবে ?

—জী হাঁ। পুরনো পথের উপর দিয়ে গেলে অসুবিধা ছিলো না।

—এতেই বা কি অসুবিধা হবে কাজীসাহেব ?

—সেটাই তো বোঝা মুস্কিল আর সেজন্যই তো সঙ্গে আসতে হয়েছে। আসলে কথাটা সুবিধা-অসুবিধা না হয়ে সুবিধা-দুর্বিধা হওয়া উচিত ছিলো। কারণ দেখা যাচ্ছে যখনই একজনের

সুবিধা তখনই অপরের কুবিধা। সব জমি তো রাজার খাসের নয়। রাস্তায় যাদের জমি যাবে তাদের কথা ভাবতেই আমার আসা।

সুরেন তার তেপায়া টেবলের উপরে যন্ত্রে চোখ রাখলো। কিন্তু ভাবলো: সদর আমিন এসেছেন কারণ সার্ভের ব্যাপারে তিনি বিশেষজ্ঞ, কিন্তু তা যে রায়তের জমির অধিকারের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট তা সে বোঝে নি।

সে চোখ তুলে বললো,—কত জমিইবা হেরফের হবে।

সোনাউল্লা হেসে বললো,—শোন, চরণ চক্রবর্তী, কি বলে দশ হাজার টাকার আর্তোআর্ক হবে। শুনে নায়েবমশায় হেসে কুট, বললেন,—আর্তে তো একটা আর্ক আছে আবার আর্ক কেন? দেখো কাজী কি করে এরা।

সুরেন বললো,—দশ হাজার আর্থওয়ার্ক হবে না। পাঁচ-ছ হাজার হবে।

—বোঝ, সোনাউল্লা বললো।—আর্ক কলাটাকে। টাকায় চার পাঁচটা মুনিষ হলে পাঁচ ছ হাজারে মুনিষ হয় বিশ হাজার থেকে ত্রিশ হাজার। দিনে আট দশ ঘণ্টা কাজ। গুণ করো কত কোদাল মাটি হয়। তুমি তো স্কুলে কাঠাকালি পড়াও শুনি।

সুরেন বললো,—কিন্তু কাজী সাহেব, চরণদাসকে চক্রবর্তী বলছেন আমি তো জানি চক্রবর্তীদের উপরেই ওর রাগ।

সোনাউল্লার গৌরবর্ণ মুখ চাপাহাসিতে লাল মনে হলো কিন্তু বাগচীর সামনে কি সব কথা বলা যায়! সে গম্ভীরমুখে বললো,—ও কিছু মনে করো না। চরণদাস বললেও ঠিকই বলা হয়, কিন্তু আরও ভালো করে বলতে হলে চরণচারণ চক্রবর্তী বলাই ভালো।

বিপদ বুঝে চরণদাস আসুন, সার, বলে হাঁটতে সুরু করলো।

অনেক সময়ে দেখা যায় আমরা নিজে যে কথাটা হয়তো কথার কথা হিসাবেই বলেছি তাকে ভুলতে পারি না। সময়ের ব্যবধান সত্ত্বেও সেটিকে মনে আনতে পারি। এর আগে বাগচী চরণকে রাস্তা ইত্যাদি তৈরী করার ব্যাপার তুলে বলেছিলো কিছু লোক জীবিকার পথ পাবে। সেটা কথার কথা হতে পারে। নতুবা স্বীকার করতে হয় তখনকার দিনে কলকেতার উকীল, উকীল-মহুরী, বেনিয়া, বেনিয়ার-দালাল, ধর্মআন্দোলনে যুক্ত মানুষেরা এক কথায় হুতোমের নক্সায় এবং/অথবা আলালের ঘরের দুলালে এবং জীবনী এবং/অথবা আত্মজীবনীতে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা যা ভাবতো না বাগচী ফ্যাসানের বাইরে গিয়ে কলকেতার বাইরে বিরাট দেশটার অর্থাভাব ও জীবিকা-হানির কথা ভাবছে। সে ভাবলো, তার এই চিন্তাকে দাদন সম্বন্ধে আলাপ ও চিন্তার পশ্চাৎপটেও রাখা যায়, এই প্রকাণ্ড মন্দির, এই রাস্তাঘাট, এসব কাজ চলতে থাকার সব চাইতে ভালো ফল যদিও সেটা উদ্দেশ্য নয়—এই গ্রামের সাধারণ মানুষের কিছু অর্থাগম। আরও সেটা দরকারও যদি দারিদ্র্যকে কিছু দূরে রাখতে হয়; দারিদ্র্য এবং নীলের দাদন একই রূপেয়ার দুই পিঠ।

অথচ, এই যেন চিন্তার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ, এসবই হচ্ছে রাজবাড়ির ফাণ্ডে। রাজবাড়ির সে ভাণ্ড কত বিপুলই বা হতে পারে? একটা দরিদ্রদেশের রাজকীয় ভাণ্ড কতদিন এদের অবিরত কাজ

দিতে পারে? সে ভাণ্ড পূরণ করতেও তো বাণিজ্য চাই। মহামান্য সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজকীয় ঐশ্বর্যও কি ব্রিটিশ রপ্তানী জাহাজগুলোর গর্ভে থাকে না?

চরণদাস কৌতুকের বিষয়, তখন অন্য কথা ভাবছিলো। এবং কৌতুক ব'লেই অন্যের চিন্তা আমাদের বলার বিষয় হচ্ছে। কৌতুক এজন্য যে গ্রামের পোস্টমাস্টার চরণ আর যে জন্য অনেকের পরিচিত তা তার ডানকান-প্রতিরোধের জন্য। ডানকানের মৃত্যু-উত্তর জীবন সম্বন্ধে শ্লেষ সে প্রতিরোধের ক্ষণিক আত্মপ্রকাশ মাত্র। কিন্তু দাদন সম্বন্ধে আলাপ ও চিন্তার পটভূমিতে সে তখন ভাবছিলো: কাজী সাহেবের ও কথাটা সম্ভবত জয়দেবেই আছে। এর আগে গজা মণ্ডল বলেছিলো সে দিন ডাকঘর ছুটি, বনবিবির পূজা নাকি, চরণ? কথাটা আজ বাড়িতে ফিরে বনদুর্গাকে বলবে এই স্থির করলো চরণ। ছুটো রসিকতাই তাকে নিয়ে। একি সত্য হ'তে পারে বনদুর্গাকে সে বেশী ভালোবাসতে পেরেছে অন্য পুরুষেরা নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসে তার চাইতে।

দূর থেকে তখন চারণদাসের ডিস্‌পেনসারী চোখে পড়ছে। ছ'চারজন রোগী বাগচীর খোঁজে এসে অপেক্ষা করছে দেখা গেলো।

চরণ বললো,—সার, আমাদের সেই চক্ষুরোগী ছাত্রটার কথা মনে আছে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়। সেই চক্ষুপ্রদাহ।

—সার, হ্যামোমিলিস কেমন হয়ে থাকে এসব ক্ষেত্রে কোন কাজ করে কিংবা—চরণদাসের কথাটা জড়িয়ে গেলো।

বাগচী বললে,—সে খুশী হয়েছে চরণের ওষুধ সম্বন্ধে চিন্তা লক্ষ করে, হ্যামোমিলিস চক্ষু-প্রদাহে ভালো ওষুধ কিন্তু মার্কসলটা অনেক চওড়া। যদি পাশাপাশি রেখে তুলনা করো, এবং জানবে সে ক্ষেত্রে দুই ওষুধের সাধারণ লক্ষণগুলোকে বাদ দিতে হয়, দেখবে হ্যামোমিলিসে আঘাতের ইতিহাস থাকে।

চরণদাস কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলো। তার কণ্ঠী ওঠানামা করলো। বাগচী তা লক্ষ করে বললো,—কি হয়েছে। ছেলেটাকে হ্যামোমিলিস দিয়েছিলে নাকি মার্কসলের পরে। তাতে কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? সেরে গিয়েছে তো? তুমি ভালো ডাক্তারি শিখবে তা আমি জানি।

—আমি অন্যায় করেছি, সার।

—কেন? নিজের বুদ্ধিতে রোগ সারিয়েয়েছো? একটা ছেলেকে চোখ ফিরিয়ে দিয়েছো? ও, আচ্ছা! তুমি আঘাতের ইতিহাসটা জানতে? ও, আচ্ছা! আমাকে বলো নি কেন? আমি দেখছি এল্ বি ডবলুউ আউট হয়েছি।

বাগচী হাসলো। কিন্তু কয়েক পা গিয়ে তার কপাল যেন ছায়ায় ঢাকা পড়লো। স্বভাবতই তার মনে পড়লো প্রথম যেভাবে সেই ছাত্রটি তার কাছে এসেছিলো। কেমন যেন সাজানো ঠাণ্ডা ব্যাপার। আঘাত যদি হবে তবে উত্তেজনা ছিলো না কেন? যে কোন আঘাত পাওয়ার ব্যাপারে উত্তেজনা থাকে। চরণ নিষেধ করেছিলো কি? কিসের আঘাত। ভয়ঙ্কর আঘাত না পেলে চোখ তেমন হয় না। জেনে শুনে এরকম ব্যাপার গোপন করা চরণের অন্যায় হয়েছে। এটা কি ডানকানের ব্যাপার? তা হলে কেন ভাবলো চরণ যে ডানকানের অত্যাচারের কথা আমাকে বলা

যায় না ? ফরাসডাঙ্গার সেই লাঞ্চ ? সেটাকে কি ডানকানের সঙ্গে আমাদের সাজাত্য, স্বধর্মীয়তা, অথবা সৌভ্রাত্র্য মনে করলে ?

বাগচীর মুখ রাগে কালো হয়ে উঠলো। হাতে হাত ঠুকে সে বললো,—নাটক ? না ? রাজবাড়ির উৎসবে নাটক করতে গিয়ে নাটকীয়তা শিখেছো ? তাই না ?

রাগটা যে কোথায় নিক্ষেপ করবে তাও খুঁজে পেলো না বাগচী।

একবার সে জিজ্ঞাসা করলো,—আমার ছাত্র তো ? ডানকানরা মেরেছে ?

—হাঁ, সার। আপনার ছাত্র। ওস্তাগরদের ছেলে।

পনিটাকে খুলে নিয়ে একটা কথাও না বলে বাগচী পনি চ'ড়ে বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেলো।

পনিটা যে এমন চলতে পারে কে জানতো। টক্‌টক্ টকাটক্। যেন টাট্টুকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে তার স্থূলদেহের গতি। শীতকাল হ'লেও এখন দুপুরতো বটে। সেজন্যই যেন কব্জির কাছে, কপালে টুপির নীচে বাগচী ঘামছে। যেন ব্যথায় অপমানে সে পথ দেখতে পাচ্ছে না। এখন কোন রকমে বাংলোয় পৌছানো চাই। কপাল আর চোখ ব্যথায় অবশ। আর সেই ব্যথায় অবশ চোখ থেকে জলের বদলে যেন রক্ত ঝরছে। ঠোঁট কাঁপছে ফোঁফানো যন্ত্রণায় কিংবা তা যেন 'আমার ছাত্র' এই শব্দ দুটিকে উচ্চারণ করার চেষ্টা।

॥ প্রথম পর্ব সমাপ্ত ॥

সমালোচনা

August 1914. *By* **Alexander Solzhenitsyn.** Penguin. London. 75*d.*

সলজেনিৎসিন-কে নিয়ে কিছু লেখায় ভয় ও দ্বিধার দুটি দিকই আছে। ভয়, কারণ তাঁর ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোনো প্রশ্ন এখানে বাদ দিলেও তাঁকে কেন্দ্র করে সাদা-কালো রূপ দুই কটকটে ভিন্ন প্রতিপক্ষের মধ্যে যে-ঝড় উঠেছে, তাঁর সম্পর্কে কোনো আলোচনায় সেই দুই পক্ষের কোনো একটিকে না বেছে নিয়ে উপায় থাকে না। কারণ, এমন হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়, একেবারেই নয়, যে কোনো-কোনো লেখক বা আলোচক ঐ দুটি পক্ষের যে-কোনো একটিকেও সত্য বলে মেনে নিতে রাজী থাকবেন না। সোভিয়েট রাশিয়ার বিশেষ গুণগ্রাহী না হয়েও কেউ-কেউ হয়তো এ-ক্ষেত্রে ন্যায্যতই সেই দেশের হয়ে আংশিক ওকালতি করতে পারেন। এমন-কি, সলজেনিৎসিনের সাম্প্রতিক নির্বাসনের প্রসঙ্গে মার্কিন পত্রিকা *Time*-কেও বলতে শোনা যায়: The Kremlin's solution was made to appear very nearly humane, in contrast with the worst that had been feared.

ভয়ের পরে এবার মুখ্য কয়েকটি দ্বিধার কথা বলা যাক। দশ বারো বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ নামহীনতা থেকে চোখ-ঝলসানো খ্যাতির উচ্চতম শীর্ষে উঠেছেন এই রুশ লেখক। এক প্রবল পরাক্রান্ত গোষ্ঠী কানে তালা-ধরানো স্বরে শোনাচ্ছেন, ইনিই এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ লেখক। অতএব প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, সত্য মহত্ত্ব কি কখনো এভাবে চিহ্নিত হয়, হেন আকস্মিক দুন্দুভিতে? তবে কি এটা একটা আগাগোড়া রাজনীতিরই ব্যাপার, এবং লেখক মহাশয় স্বয়ং হয় স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় উক্ত সেই শক্তিমান গোষ্ঠীর হাতে ক্রীড়নকই মাত্র? এমনও হয়তো বলা চলে যে সলজেনিৎসিন আজ আর সাহিত্যের বা সাহিত্যিকদের ততটা উপজীব্য নন, বরং ক্রমশই তিনি সাংবাদিকতার জগতের মৎকুণদের অতি-উপাদেয় চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় এক বিষয়।

দ্বিতীয় দ্বিধা হল, যদিও সলজেনিৎসিনের নিজের একটি উক্তি হতে জানা যায় যে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব প্রথমে যাঁরা করেন, তাঁদের পুরোভাগে ছিলেন ফ্রান্সের ফ্রাঁসোআ মোরিআক, তবু যে-বিশেষ একটি দেশ সুরু থেকে আজ পর্যন্ত তাঁকে শীর্ষে তুলতে প্রাণপণ করেছে ও করে চলেছে, তা মহামহিম ও অন্যান্য অশেষ গুণে গুণান্বিত হলেও, শিল্প বা সাহিত্য ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রশ্নে তার বিচারকে মূল্যবান বা এমন-কি নির্ভরযোগ্য বলে মেনে নিতে কারুর-কারুর আপত্তি থাকতে পারে। কারণ এ-কথা তো অন্তত আংশিকভাবে সত্য নিশ্চয় যে সেই দেশ উক্ত ক্ষেত্রে তার নিজেরি যথার্থ জ্ঞানী-গুণীদের সব সময় উপযুক্ত সম্মান দিয়ে উঠতে পারেনি, কাউকে-কাউকে আজো দেয়নি। উদাহরণ স্বরূপ দুটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চট করে মনে পড়া স্বাভাবিক: ওয়ালেস ষ্টীভেন্‌স্‌ ও উইলিয়ম ফকনার। ফকনার অবশ্য এতদিনে আমেরিকায় বেশ গৃহীত, হয়তো একটু অতিরিক্ত

ভাবেই, পূজা-অর্চনার আতিশয্যে তাঁর স্মৃতি ও অবদানের মূল্যায়ন ক্রমশই যেন বড্ড বেশি হৃষ্ট-পুষ্ট—এবং সেটা আজ অস্বাভাবিক ঠেকাও উচিত হবে না এই কারণে যে তাঁর মালমশলা বক্তব্য মানসিকতা ভাষা বা সব কিছুই ভয়ংকরভাবে আমেরিকান ছিল বলেই আমেরিকা তাঁকে যতটা সম্যকভাবে বুঝতে পারবে, অন্য দেশ ততটা পারবে না। না, উল্টে তাঁর ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক ঠেকবে যেটা, সেটা এই যে এমন আমেরিকান হয়েও প্রথম ও উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি যা তিনি পান, পেতে থাকেন বহুদিন ধরে, তা আমেরিকায় নয়, অন্যত্র, বিশেষত ফ্রান্সে, এবং সেই ফ্রান্সেও বিশেষ করে আবার সার্ত্র-এর মতো চিন্তাশীল ব্যক্তির রচনায়। ষ্টীভেন্‌স্ অবশ্য বলবার মতো কোনো স্বীকৃতিই পাননি, আজো তিনি হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন উপেক্ষার অরণ্যে। অতএব এই প্রশ্ন বোঝা শক্ত হতে পারে, সেই একই দেশ সলজেনিৎসিনের প্রসঙ্গে মাহাত্ম্যের চাবিকাটিটি কী করে এক পলকে এত সহজে খুঁজে বার করলেন? এমন দুর্মুখেরও অভাব হয়তো হবে না যাঁরা ভগবদ্গীতার প্রখ্যাত শ্লোকাংশটিকে একটু পাল্টে বলবেন, নিমিত্তমাত্রং ভব সলজেনিৎসিন, যেহেতু রাশিয়া বলেই এটা আমেরিকার কুস্তির একটা অবকাশ। এবং হেন দুর্মুখদের মধ্যে এমন কেউ-কেউও নিশ্চয় থাকবেন, যাঁরা রাশিয়ার নুন আগে কখনো খাননি, পরেও কখনো খেতে চাইবেন না।

সব থেকে মুস্কিল হল, সলজেনিৎসিনকে নিয়ে কোনো আলোচনা মানেই এইসব অর্বাচীন ও এমন-কি অশ্লীল প্রসঙ্গের অনিবার্য উত্থাপন। তবু এত সত্ত্বেও তৃতীয় আরো একটি দ্বিধা যেন বাধার প্রাচীর হয়ে সামনে বিরাজ করে। তাঁর সম্বন্ধে যে-বিপুল পরিমাণ লেখা হয়েছে—হচ্ছে, যার সবই বক্তব্য-অনুযায়ী প্রায় একটি মাত্র খাতেই প্রবাহিত, ওকালতি হয় এ-পক্ষের নয় ও-পক্ষের—এরও বাইরে এমন আর কি কিছু থাকতে পারে যা নিয়ে নতুন কোনো কথা বলা যায়, যে-কথা শুধু নতুনই নয়, যুক্তিযুক্তই হবে? অর্থাৎ, এমন কোনো কথা যা তাঁর লিখনশৈলী নিয়ে, বা কল্পনাশক্তির প্রসার নিয়ে, বা তাঁর বুদ্ধিমত্তা বা চিন্তা বা অন্তর্দৃষ্টির ব্যাপ্তি কিংবা গভীরতা নিয়ে, এবং যার থেকে সূর্যালোকে ঘূর্ণায়মান স্ফটিক-খণ্ডের মতো নানা রঙের বিচিত্র দ্যুতি অন্তহীনভাবে বেরোতে পারে? এ-কথা অবশ্যই সত্য যে যে-ব্যক্তিগত সততা ও সাহসের প্রমাণ তিনি দিয়েছেন, এই কাপুরুষ আধুনিক যুগে তার তুলনা পাওয়া দুষ্কর ঠেকতে বাধ্য। কিন্তু সেই দৃষ্টান্তকে যখন একবার মেনে নেওয়া হয়েছে, নতমস্তকে তার স্তুতিও গাওয়া হয়েছে, তার পরে আর কী বলার থাকতে পারে?

উত্থিত প্রশ্নগুলির সঙ্গে সঙ্গে উত্তর খোঁজা বা দিতে চাওয়া ততটা নয়, যতটা সেগুলি পেড়ে রাখা সাহিত্য-রসিক পাঠকদের সামনে, যাতে তাঁরা এগুলি নিয়ে ভাবতে পারেন—এমনই অভীষ্ট বর্তমান আলোচকের।

শোনা যায়, *August 1914* উপন্যাসটি তিন খণ্ডে সমাপ্য এক সুবৃহৎ রচনার প্রথম খণ্ড মাত্র, এবং এই রচনায় হাত দেওয়ার পরিকল্পনাও লেখকের অনেক দিনের, যেটা এতদিন সম্ভব হয়নি, কারণ ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত জীবনের মন্ত্রণাবিদ্ধ নানান অভিজ্ঞতার চাপে তিনি অন্যান্য রচনায় (যেমন, *One Day in the Life of Ivan Denisovich*, *The First Circle*, *Cancer Wavd*) জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হন। *August 1914* মূল রুশ ভাষায় বেরোয় ১৯৭১ সালে, পারী হতে, বার করেন YMCA Press, যে-প্রেস চালান অধুনা পারী-বাসী কয়েকজন শ্বেত রুশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে জার্মানির

উপর রাশিয়ার অবিবেচিত ও (রাশিয়ার পক্ষে) সর্বনাশা আক্রমণই মুখ্য বিষয়বস্তু এই গ্রন্থের, এবং এই রচনাটিকে ও এর সূত্র ধরে অন্য যে রচনাগুলি পরে আসবে, সেগুলিকেও লেখক এক নতুন ইতিহাসের পর্যায়ে উন্নীত করতে চান—অন্তত এগুলি ইতিহাস বলে গৃহীত হোক, এটাই তাঁর কাম্য। সেই লক্ষ্যে পৌছোতে এ-গ্রন্থে তিনি নানান শৈলীর আশ্রয় নিয়েছেন, যেমন সোজাসুজি সাধারণ আখ্যান-প্রণালী তো বটেই, তাছাড়া পরিচ্ছেদের আকারে ডকুমেণ্টারি সিনেমার মতো চিত্রলিপি, কোথাও সংবাদপত্র থেকে উদ্ধৃতি, কোথাও রুশ প্রবাদের চয়ন, কোথাও বা তৎকালীন সামরিক অভিযানের নির্দেশ-সূচক কিছু মানচিত্রের সংযোজন।

ব্যাপারটা সেই ইপ্সিত ইতিহাস কতখানি হয়েছে, কি একেবারেই হয়নি, তার নির্ণয়ে বর্তমান আলোচক নিতান্তই অসমর্থ। তবে শৈলীর দিক থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক, এটা একটা বিচিত্র ও প্রচণ্ড জগাখিচুড়ি। সিনেমার ভঙ্গীটা হয়তো মার্কিন লেখক দস পাসস-এর *U. S. A.* নামক গ্রন্থ-ত্রয়ীর 'Camera Eye' অংশের হুবহু অনুকরণেই, যে দস পাসস নাকি এককালে রাশিয়ায় বেশ জনপ্রিয় এক লেখক ছিলেন বলে শোনা যায়। তবে কায়দাটা যেন ইতিমধ্যেই বেশ একটু সাবেকী, এর আশ্রয় আজকের ঔপন্যাসিকরা সচরাচর নেবেন না।

কত অসংখ্য চরিত্র যে আছে এই উপন্যাসে—যা আর কিছু নয়, শুধু পড়ে শেষ করতে পারাই কোনো কোনো পাঠকের পক্ষে ঠেকতে পারে ধৈর্যের এক বিপুল পরীক্ষা—তা হয়তো একমাত্র সলজেনিৎসিন-ই জানেন। সামরিক চরিত্রদের মধ্যে প্রধান জেনারল সামসোনোভ (যিনি শোনা যায় ঐতিহাসিক ব্যক্তিই) এবং কল্পিত কর্নেল ভোরোতিন্তসেভ, এবং অসামরিক চরিত্রদের মধ্যে রয়েছেন (লোকে বলেন) লেখকের নিজেরি জীবনের বহু পরিচিত ব্যক্তি, এমন-কি তাঁর পিতা-মাতাও, যদিও অন্য নামে এবং এখানে-ওখানে একটু আধটু পরিবর্তিত আকারে—লেখকের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন স্বয়ং টলস্টয়ও সশরীরে আছেন।

টলস্টয় তো বটেই, সলজেনিৎসিন-এর প্রসঙ্গে কেউ কেউ চেখভ ও দস্তয়েভস্কিরও উল্লেখ করেছেন। কেউ-কেউ আবার এই উপন্যাসটিকে টলস্টয়-এর *War and Peace*-এর সঙ্গে পর্যন্ত তুলনা করেছেন, এবং সেই তুলনার সূত্র ধরে আবার সলজেনিৎসিন-এর কোনো-কোনো কট্টর ভক্ত এমনও বলেছেন যে হেন তুলনা সত্ত্বেও যে এই লেখককে টলস্টয়-এর বিরাট ব্যক্তিত্বের পাশে এক বামনের মতো মনে হয় না, সলজেনিৎসিন-এর সার্থকতার চূড়ান্ত প্রমাণ সেটাই। কারুর-কারুর সন্দেহ হতে পারে, এমন উক্তি হয়তো ঘুরিয়ে এইটেই বলতে চাওয়া যে বিরাটের পাশে একেবারে বামন না মনে হলেও টলস্টয়-এর সঙ্গে সলজেনিৎসিন-এর উক্ত তুলনাটি ধোপে শেষ পর্যন্ত টিঁকবে না। চরিত্রের চিত্রণে লেখকের কৃতিত্ব যদিও উচ্ছ্বসিত হওয়ার মতো কিছু নয়—বিশেষও তাঁর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এমন দস্তয়েভস্কি বা চেখভ বা টলস্টয়-এর কথা মনে রাখলে—তবু সে-কৃতিত্ব প্রশংসার দাবী নিশ্চয় রাখে। নারী-চরিত্রের ভীষণ অভাব, হাস্যরসের সম্পূর্ণ অভাব, আগাগোড়া যেন একটু বিশ-মণী পাথর-পাথর ভাব—এবং বর্ণিত বিষয়বস্তুর সঙ্গে হয়তো অপরিচয়েরই দরুণ, বা লেখকের আবেগের তীব্রতার সঙ্গে উপযুক্ত যোগাযোগ স্থাপনে অক্ষমতারই কারণে, সাধারণ ভারতীয় পাঠকের কাছে এ-গ্রন্থ নীরস ঠেকাও অস্বাভাবিক নয়।

আজ তিনি মোটামুটি এক অর্থে পাশ্চাত্ত্যেরই সম্পত্তি বলে—অন্তত হৈ হৈ তাঁকে নিয়ে পাশ্চাত্ত্যই করছে—এটা তাই বলা যেতে পারে যে প্রকরণের দিক থেকে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য ঔপন্যাসিকদের চোখে সলজেনিৎসিন হয়তো একটু প্রাচীন-পন্থী ঠেকবেন, এবং সেটা তিনি হয়তো জানেনও নিজে খানিকটা। নোবেল পুরস্কার গ্রহণ উপলক্ষে যে-ভাষণ তিনি তৈরী করেছিলেন, তাতে এক জায়গায় বলছেন: 'কেবল চিন্তার জালেই জড়িয়ে পড়বে, এমন কোনো ভঙ্গী থেকে রুশ সাহিত্য বহু দশক ধরে নিজেকে দূরে-দূরে রাখার চেষ্টা করেছে, এড়িয়েছে আজগুবি কল্পনা। সেই ঐতিহ্যকেই আমি যথাসম্ভব শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিয়েছি, এতে আমার লজ্জার কিছু নেই। যে সমাজে একজন লেখক বাস করে, তার জন্য যে সে অনেক করতে পারে, করা তার কর্তব্য, এই ধারণার সঙ্গে রুশ সাহিত্যের যোগ বহুকালের।'

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ্য, বিশেষতঃ যেহেতু *War and Peace*-এর প্রশ্ন এখানে এসেছে, অন্তত একটি বিষয়ে টলস্টয়-এর সঙ্গে সলজেনিৎসিন-এর ঘোর মতানৈক্য রয়েছে। টলস্টয় বলতে চেয়েছেন, যত মহৎই ব্যক্তি হোন না কেউ, ব্যক্তি হিসেবে তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় ইতিহাসের গতিবিধি নির্ণয় বা নিয়ন্ত্রণ করা—উল্টে সময় যখন খারাপ, তখন বড় জোর যা করতে পারেন তিনি, তা সাময়িকভাবে স্রোতে গা এলিয়ে দেওয়া এবং ভালো মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করা। সলজেনিৎসিন-এর মতে, ইতিহাসে ব্যক্তি-মানুষের ভূমিকা চরম, নেতৃত্ব তিনিই দেবেন। তাই, ঐ নোবেল পুরস্কার উপলক্ষে লিখিত ভাষণেই, একবার যদিও তিনি বলছেন যে একমাত্র নিজেরই অন্তর্জগৎ নিয়ে কারবার যে-শিল্পীর, তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, তবু কিছু পরেই তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে যোগ করতে হয়: 'নিজের গজদন্ত-মিনারে বা খেয়াল-খুশীর জগতে আশ্রয় চেয়ে শিল্পী যে কখনো কখনো কিভাবে আসল জগৎটাকে ভাড়াটে দস্যুর হাতে ছেড়ে দেওয়ার ঝুঁকি নেয়, তা দেখলে কষ্ট হয়।'

সর্বশেষে বলা চলে, সলজেনিৎসিন যথার্থই এক শ্রেষ্ঠ লেখক কিনা, এ নিয়ে বিতর্কের যদিও বহু অবকাশ থাকতে পারে, তবু মানতেই হবে যে যেমন তার রচনায় তেমনি তার ব্যক্তিগত জীবনের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এমন কতকগুলি প্রশ্ন তিনি তুলেছেন, যা এই পীড়িত যুগের বিবেকের সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কহীন নয়। এবং সে-প্রশ্নগুলি কিছুটা মোটা-মোটা কথায় হল এই: ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বরূপ কী, এবং সে-স্বাধীনতাকে কতদূর নিয়ে যাওয়া চলে বা তাকে কতদূর নিয়ে যাওয়া সমীচীন ঠেকতে পারে; এবং সাহিত্য কী, রাজনীতি কী, সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কটাই বা কী বা সে-রকম কোনো সম্পর্ক কতখানি বাঞ্ছনীয়। স্বভাবতই তাই, উত্তর যা-ই হোক, অন্তত প্রশ্নগুলিরই জন্য আধুনিক মানুষের দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করেছেন।

লোকনাথ ভট্টাচার্য

বাংলার কীট-পতঙ্গ—গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। আশা প্রকাশনী। কলিকাতা, ৯। মূল্য ২০.০০

শ্রীরামচন্দ্রের বানরসৈন্যরা কিভাবে সেতুবন্ধন করেছিল, সে কাহিনী আমরা অনেকেই শুনেছি কিন্তু ক্ষুদ্র পিঁপড়েরা যে অদ্ভুত কৌশলে নিজেদের দেহ জুড়ে জুড়ে গাছের এক ডালের পাতা থেকে অন্য ডালের পাতা পর্যন্ত সেতু গড়তে পারে, সে খবর আমরা ক'জন জানি? গল্পে যেমন আছে যে, ভালুক তার খোলস ছেড়ে রাজপুত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল, কুৎসিত শোঁয়াপোকা সেইরকম যখন সুন্দর প্রজাপতিতে পর্যবসিত হয়, তখন যে বিস্ময়কর প্রক্রিয়া ঘটে থাকে, তার কতটুকু আমাদের জানা আছে? ময়ূরের নৃত্যের কথা আমরা প্রায়ই বলে থাকি কিন্তু মাকড়সার পূর্বরাগ-পর্বে পুরুষ-মাকড়সা তার সঙ্গিনীর মনোহরণের জন্য কেমন করে নেচে থাকে এবং মিলনের পর স্ত্রী-মাকড়সা কিভাবে তার সঙ্গীটিকে (বোধহয় অনুরাগের আতিশয্যেই) একেবারে উদরসাৎ করতে সচেষ্ট হয়—সে সব সম্পর্ক আমরা কি আদৌ ওয়াকিবহাল? কাকের বাসায় কোকিলের ডিম পেড়ে যাওয়ার কথা আমরা শুনেছি কিন্তু নেউলে-পোকা যে শোঁয়াপোকা বা মাকড়সার দেহের মধ্যেই ডিম পেড়ে দেয়, সেই রোমাঞ্চকর কাহিনী সম্বন্ধে আমরা অনেকেই অজ্ঞ। এই ধরনের অসংখ্য আশ্চর্য ঘটনা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাওয়া যায় আলোচ্য পুস্তকটির প্রবন্ধগুলিতে।

এই পুস্তকে ২৮টি প্রবন্ধ চার ভাগে পরিবেশিত হয়েছে। প্রথম তিনটি ভাগের বিষয়বস্তু যথাক্রমে পিঁপড়ে, প্রজাপতি ও মাকড়সা। চতুর্থ ভাগে মৌমাছি, নেউলে-পোকা, পঙ্গপাল, গঙ্গাফড়িং প্রভৃতির বিষয় আলোচিত হয়েছে এবং সেইসঙ্গে রয়েছে কীট-পতঙ্গের বাজনা, লুকোচুরি ও শিল্পনৈপুণ্যের কথা। জীববিদ্যায় গবেষণা এবং বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা—এই দুই ক্ষেত্রে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম পরিচিত। জীববিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ও স্থলেখক গোপালচন্দ্র, উভয়ের যোগ ঘটেছে আলোচ্য পুস্তকটিতে। কীট-পতঙ্গ সম্বন্ধে তাঁর গবেষণার কথা সহজ সাবলীল ভাষায় পুস্তকটিতে বিধৃত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মানুষের তৈরী গবেষণাগারেই তাঁর গবেষণা সীমাবদ্ধ নয়, আমাদের ঘরের আনাচে-কানাচে, মাঠে-ময়দানে, রাস্তায়-ঘাটে প্রকৃতির যে বিস্তৃত গবেষণাগার, সেখানেও তাঁর কর্মধারা প্রসারিত। তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তির সামনে কীট-পতঙ্গের জগতের বহু রহস্য একের পর এক উন্মোচিত হয়েছে। গোপালচন্দ্র লিখেছেন পিঁপড়ের অপরিসীম নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের কথা, আর তাঁর লেখা পড়তে পড়তে আমাদেব বার বার অভিভূত হতে হয় গবেষক গোপালচন্দ্রের অসাধারণ নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় লক্ষ্য করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন তিনি কাটিয়ে দিয়েছেন কীট-পতঙ্গের জন্ম-মৃত্যু, আচার-ব্যবহার, প্রণয়-কলহ ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে।

গোপালচন্দ্রের ব্যবহৃত ভাষা কেবল সহজ ও সাবলীল নয়, সরসও বটে। 'ক্ষুদে-পিঁপড়ের ব্লিৎসক্রিগ', 'প্রজাপতির লুকোচুরি', 'প্যারাস্যুটিষ্ট মাকড়সা', 'ভীমরুলের রাহাজানি' প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধের নামকরণ থেকে তাঁর সরস মনের পরিচয় পাওয়া যায়। শিবপুরের বাগানে তাঁর একদিনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে 'কীট-পতঙ্গের শিল্পনৈপুণ্য' নামক প্রবন্ধে তিনি লিখছেন, '…গাছটার কাছে গিয়ে দেখলাম কাণ্ডটার চারদিকেই বাদামী রঙের বড় বড় কাঁটায় ভর্তি। কাঁটাগুলি দেখে গাছটার আত্মরক্ষার অপূর্ব কৌশলের কথা ভাবছিলাম। হঠাৎ মনে হলো, একটা কাঁটা যেন একটু

নড়ে উঠলো। বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। কাঁটাটাকে নড়তে দেখলাম কেন? তবে কি চোখের ভুল? বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করতেই নজরে পড়লো একটা কাঁটাই নয়, এখানে-সেখানে অনেক কাঁটাই মাঝে মাঝে নড়ে উঠছে। একটা কাঁটা ধরে টানতেই অতি সহজেই গাছের গা থেকে উঠে আসলো—যেন নরম আঠা দিয়ে আলতোভাবে সংলগ্ন ছিল। কাঁটাটা তুলার মত নরম এবং ফাঁপা। ধারালো ব্লেড দিয়ে একটা কাঁটা চিরে ফেলতেই ভিতর থেকে সরু এবং লম্বা একটা পোকা বেরিয়ে পড়লো। পোকাটার মুখের দিকটা গাঢ় খয়েরী রঙের, কিন্তু শরীরটার রং হালকা বাদামী। কাঁটার মত পদার্থটা যে, পোকাটার বাসা বা বহিরাবরণ মাত্র সেটা সহজেই বোঝা গেল।' ঐ পোকার শিল্পনৈপুণ্যে যেমন আমরা অবাক হচ্ছি, তেমনি কি আমরা অবাক হচ্ছি না গোপালচন্দ্রের রচনানৈপুণ্যে? বস্তুতঃ গোপালচন্দ্রকে জগদানন্দ রায়ের সুযোগ্য উত্তরসূরী বললে অত্যুক্তি হয় না।

মাকড়সার মাছ শিকার, দুই মাকড়সার লড়াই ও পরাজিত মাকড়সার ডিম নিয়ে বিজেতার পলায়ন, মাকড়সার মিলন নৃত্য, কাঠ পিঁপড়ের যৌন মিলন ইত্যাদি বিষয়ে আলোকচিত্রগুলি নিঃসন্দেহে পুস্তকটির আকর্ষণীয়তা বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে। তবে কয়েকটি চিত্র যথেষ্ট সুস্পষ্ট নয়। তাছাড়া বোলতার বাসা বাদে অন্য সব চিত্রগুলিই মাকড়সা ও পিঁপড়ে সম্পর্কীয়। অন্যান্য কীট-পতঙ্গের প্রতি কি এতে কিছুটা অবিচার করা হয় নি?

জয়ন্ত বসু

New Writing in India. *Edited by* Adil Jussawlla. Penguin. London. 45*p*

প্রত্যেক সঙ্কলনগ্রন্থ বিষয়েই দুস্তর মতভেদ স্বাভাবিক ; নির্বাচনপদ্ধতি এবং/অথবা সম্পাদকের মতবাদই যদিচ এর মুখ্যকেন্দ্র, তৎসত্ত্বেও অনস্বীকার্য যে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সমস্যাও অবহেলার যোগ্য নয়। এদেশে অবশ্য অদ্যাবধি সাহিত্য-সঙ্কলনের কোন মান নির্দ্ধারিত হয়নি এবং তাবৎ সঙ্কলনগ্রন্থই নিতান্ত ব্যক্তির খামখেয়াল মেনে চলে। অতঃপর রাজনীতি, গোষ্ঠীচুক্তি ইত্যাদি ঘটনাও স্বতঃই লক্ষণীয়। দেশীয় ভাষায় অবশ্য এ-ধরনের নৈরাজ্য সহনীয় ; কারণ সেখানে পাঠকের যাচাই করবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ নয় ; কিন্তু ইংরেজী বা কোন বিদেশী ভাষায় এমত পাপাচরণে কেবলমাত্র স্বদেশী সাহিত্য-চিন্তার প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় না, সেই সঙ্গে বিদেশী পাঠকও প্রতারিত হন।

স্বীকার্য যে, কোন সঙ্কলনই কোন ভাষার সাহিত্যের সম্পূর্ণ পরিচয় বহনে অক্ষম, কিন্তু মূল ধারা বা ধারাগুলির এবং চিন্তাচর্চার সূত্র ও বিন্যাস সেখানে বিধৃত থাকে। প্রতিনিধিত্বের স্বাধিকারেই সেখানে লেখকের অবস্থিতি আর সম্পাদনাকর্মও এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন। বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থটি প্রসঙ্গে উক্ত বক্তব্যের অবতারণা অনিবার্য ; কারণ, এটি, 'an attempt to introduce the English-speaking reader to Indian writing of the last ten years or so' ; স্বভাবতঃই বিষয় বিবেচনায় এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য এবং ইংরেজী ভাষাভাষীর কাছে এ-গ্রন্থটিই গণ্য

হবে প্রতিনিধিত্বমূলক সঙ্কলনরূপে। এবং দুর্ভাগ্য যে সাম্প্রতিক ভারতীয় সাহিত্যবিষয়ে এমন কিছু প্রবন্ধ লিখিত হয়নি, যার সহায়তায় পাঠক অন্ততঃ বিভ্রান্তির হাত থেকে মুক্তি পেতে পারেন। তদুপরি এদেশীয় আধুনিক সাহিত্যের ইংরেজী সক্ষম অনুবাদও দুর্লভ। স্বভাবতঃই এমত সঙ্কলনই যাদের একমাত্র নির্ভর, তাদের ভিন্নপ্রকার প্রতিক্রিয়া ও মন্তব্য কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। ভূমিকায় অবশ্য সম্পাদক লিখেছেন, 'I have a basic knowledge of three Indian languages—Gujarati, Hindi, and Urdu—can read and write the first two with painful slowness and can only understand a spoken usage of the third. This has meant that my own acquaintance with Indian writing has been largely through discussions with Indian writers, through having their work explained to me by both their admirers and their critics, and through English-language translation of their work.' তবু ভাগ্য যে, সত্য স্বীকারে সম্পাদকের লজ্জা নেই! এবং ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ে এই সীমাবদ্ধ পঠন ও ধ্যানধারণা নিয়ে একটি সঙ্কলন সম্পাদনার দুঃসাহস? অবশ্য সমস্ত ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিছাড়া যে এবম্প্রকার গ্রন্থসম্পাদনা অসম্ভব, এমত বক্তব্যের উপস্থাপনা আমার উদ্দেশ্য নয়; কিন্তু উক্তপ্রকার অপরিচয় নিয়ে সম্পাদনাকার্যে যে অন্ধ সহযোগিতার আশ্রয় নেওয়া হয়, সে-পরিচয় তো বিদেশী ভাষার বহু গ্রন্থেই বিধৃত আছে; এতদ্ব্যতীত সম্পাদকের কিছু নিজস্ব ধ্যানধারণা তো থাকতেই হয়; এদেশে একান্ত ইংরেজী-নির্ভর বা অনুরাগীদের সহায়তায় পরিণাম কদাচ মঙ্গল আনে। এক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। স্বভাবতই, ভারতীয় সাহিত্যবিষয়ে এ-গ্রন্থের সম্পাদক এখানে নানা অজ্ঞতাপ্রসূত মন্তব্য প্রকাশে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি। যেমন, 'It is possible that a poet influenced by some one like T. S. Eliot will write a 'new' kind of poem in an Indian language, which, when translated into English, reads like imitation Eliot.' দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কবির আলোচনা অবান্তর; কিন্তু ভারতীয় ভাষার শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবিদের মধ্যে, যতদূর জানি, বিষ্ণু দে-ই সর্বাধিক এলিঅট-প্রভাবিত; কিন্তু তাঁর কোন কবিতা ইংরেজী অনুবাদে 'like imitation Eliot'? ইংরেজী অনুবাদে বিষ্ণু দে-র কাব্যসঙ্কলন '*History's Tragic Exultation*' (People's Publishing House, Bombay) তো বর্তমানে লভ্য! অথবা '...the Indian gravitates naturally to such European and Latin-American writers as Voznesensky, Pablo Neruda, Borges, and Gunter Grass.' অথবা 'It is no accident that the most potent foreign influences on Indian writing today are Camus, Dostoyevsky, Kafka and Sartre' কী সুগভীর অজ্ঞতা! ভজ্‌নেজ্‌নিস্কি কি প্রভাবিত করবার মতো কবি? কামু বা সার্ত্রে-র দ্বারা প্রভাবিত হবার মতো ক্ষমতাবান সাহিত্যিক কি এদেশে বর্তমান? কোনো তৃতীয় শ্রেণীর সাহিত্যিক বা কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীল হবার এই তো স্বাভাবিক পরিণাম! এবং এমত কারণেই তিনি লিখতে পারেন, Bengali has many excellent theatre groups but according

to Bengalis, only one major playwright, Badal Sircar. কোন্ বাঙালীসন্তান তাঁকে এমত সত্যের সন্ধান দিল? আর এরাই বোধ হয় সম্পাদককে জ্ঞাত করায় যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং বিনয় মজুমদার সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের প্রতিভূ?

গ্রন্থটির পর্ববিভাগে অবশ্য কিছু নতুনত্বের প্রয়াস লক্ষণীয়; সম্পাদকের ভাষায়, 'The first contains writing which has been engendered by certain internationally recognizable events on the sub-continent' '…The second consists of writing that deals with the changing social structure in India' '…The third part consist of writing I shall call 'personal'. অনস্বীকার্য, ভাষাভিত্তিক পর্ববিভাগে এমতপ্রকার গ্রন্থচয়ন সাধারণত অনুসৃত হয়ে থাকে এবং তুলনায় তা বহুলাংশে সুবিধাজনক। কিন্তু উক্তপ্রকার পর্ববিভাগে সমস্যা কেবলমাত্র জটিলতরই হয় না, সেইসংগে নানা নতুন বিভ্রান্তিও অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। কারণ কোন আঙ্গিক নিয়মে একজন সাহিত্যিকের সমগ্র চরিত্র প্রতিবিম্বিত হয় না—একই সংগে তিনি ব্যক্তিগত ও সামাজিক অথবা অন্য তুইচরিত্রের সমন্বয়। স্বভাবতই সম্পাদকের কোন আপাতনির্দ্ধারিত সত্য বা কোনোবিশেষ রচনার বক্তব্যের ওপরে নির্ভরশীল হয়ে মত গ্রহণ শেষপর্যন্ত সত্য হয়ে ওঠে আর এর পরিণামে সেই লেখক কদাচ তার স্ব-অস্তিত্বে প্রতিফলিত হন না। তদুপরি বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদকের যে-নিজস্ব সমস্যা বর্তমান, তা মিথ্যচরিত্রকেই শেষ পর্যন্ত মর্যাদা দিয়েছে। আর এরই পরিণামে নিসিম এজিকিয়েল হয়ে দাঁড়িয়েছেন সামাজিক পরিবর্তনের রূপকার!

সম্পাদকের এমত মন্তব্যের অধিক উদাহরণের উদ্ধৃতি অবান্তর। এবং অবশেষে গ্রন্থটির প্রচ্ছদপটে হিন্দী ফিল্মের নায়কনায়িকার ছবিতেই অনুমেয় সমগ্র পরিকল্পনার মৌলিক উদ্দেশ্য।

নির্মল ঘোষ

With Best Compliments from

The Steel Rolling Mills of Bengal Limited

Office :

28, Strand Road
Calcutta 700 001

Works :

1, Oil Installation Road
Paharpur
Calcutta 700 043

Registered with the Registrar of Newspaper for India under R. N. No. 5480/57

সকলের সাহায্যে ইউকো ব্যাঙ্ক

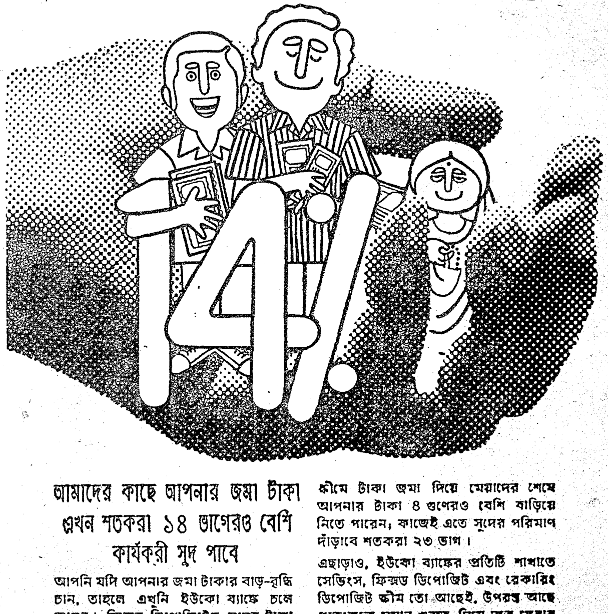

আমাদের কাছে আপনার জমা টাকা এখন শতকরা ১৪ ভাগেরও বেশি কার্যকরী সুদ পাবে

আপনি যদি আপনার জমা টাকার বাড়-বৃদ্ধি চান, তাহলে এখনি ইউকো ব্যাঙ্কে চলে আসুন। ফিক্সড ডিপোজিটের সুদের টাকা রেকারিং ডিপোজিট প্রকল্পে জমা করে দিয়ে আপনি স্বচ্ছন্দেই শতকরা ১৪ ভাগেরও বেশি সুদ পেতে পারেন। অথবা ১৫ বছরের জন্যে আমাদের ক্যাশ ডিপোজিট সার্টিফিকেট স্কীমে টাকা জমা দিয়ে মেয়াদের শেষে আপনার টাকা ৪ গুণেরও বেশি বাড়িয়ে নিতে পারেন, কাজেই এতে সুদের পরিমাণ দাঁড়াবে শতকরা ২৩ ভাগ।

এছাড়াও, ইউকো ব্যাঙ্কের প্রতিটি শাখাতে সেভিংস, ফিক্সড ডিপোজিট এবং রেকারিং ডিপোজিট স্কীম তো আছেই, উপরন্তু আছে প্রত্যেককে সমান গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত সেবার ব্যবস্থা।

বিশদ বিবরণের জন্যে আপনার কাছাকাছি ইউকো ব্যাঙ্কের শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

জনগণকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করছে